গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—৯

বর্ত্তমান জগৎ

দ্বিতীয় ভাগ

ইংরাজের জন্মভূমি

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩২২

PUBLISHED BY CHINTAHARAN GOOHA OF
THE GRIHASTHA PUBLISHING HOUSE.
AND
PRINTED BY ASHUTOSH BANERJEE,
THE INDIA PRESS,
24, MIDDLE ROAD, ENTALLY, CALCUTTA.

[মূল্য ২৷৹ টাকা মাত্র.

বর্ত্তমান জগৎ

দ্বিতীয় ভাগ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিলাত যাত্রা

দ্বিতীয় অধ্যায়

লণ্ডন—বর্ত্তমান জগতের ভারকেন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়

কেম্ব্রিজের আব্‌হাওয়া

চতুর্থ অধ্যায়

লণ্ডনে পুনর্ব্বার

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত অক্‌সফোর্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

সপ্তম অধ্যায়

রবার্ট ব্রুসের স্বজাতি

অষ্টম অধ্যায়

বিলাতী শিক্ষার নবীন কেন্দ্র

নবম অধ্যায়

নব্য বিলাতের জন্মদাতা

দশম অধ্যায়

ইংরাজের বিদ্রোহী ভ্রাতা

একাদশ অধ্যায়

বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—উদ্যোগপর্ব্ব

বর্ত্তমান জগৎ

দ্বিতীয় ভাগ

ইংরাজের জন্মভূমি

প্রথম অধ্যায়

বিলাত যাত্রা

আলেকজাণ্ড্রিয়া

আলেকজাণ্ড্রিয়ায় ২৪ ঘণ্টা কাটাইলাম। কিন্তু প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার সময় করিতে পারিলাম না। আজ সকালে বাহির হইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একটা মালের বাক্স কাষ্টম হাউস হইতে খালাস করিতে তিন ঘণ্টা লাগিয়া গেল। কাজেই আর আলেকজাণ্ডারের নগর দেখা হইল না।

তিনটার সময়ে আমাদের জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। বোম্বাই ত্যাগ করিবার সময়ে দেখিয়াছিলাম—ডকে পার্শী নরনারীগণ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন।

আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় দেখিলাম—মিশরবাসীদিগের ভিড় মাথায় লাল টার্বুশ পরা খৃষ্টান ও মুসলমান জনগণ ঘাটে উপস্থিত—অনেক মিশরবাসী এই জাহাজে ফ্রান্সে যাইতেছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে মিশরীদিগের কুটুম্বিতা অত্যধিক। জাহাজ ছাড়িবামাত্র কতিপয় সীরিয়াবাসী রমণী সাগরকূলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জাহাজ বন্দরের গায়ে লাগিয়াছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়াই সিঁড়ি দিয়া জাহাজে উঠিয়াছি। নৌকায় করিয়া মধ্যসমুদ্রে জাহাজে উঠিতে হয় নাই। কূল ত্যাগ করিবার পর জাহাজ যতক্ষণ পোতাশ্রয়ে ছিল ততক্ষণ বন্দরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। বিশালনগর সমুদ্রের উপর অবস্থিত—প্রধানতঃ উত্তরে দক্ষিণে সুবিস্তৃত। প্রকাণ্ড অট্টালিকাসমূহ বন্দরের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়স্বরূপ দণ্ডায়মান। নগরের ভিতর মধ্যে মধ্যে কলের ধূম নির্গমের জন্য চিম্‌নী দেখা যাইতেছে। পোতাশ্রয়ে অগণিত জাহাজের শ্রেণী। সমুদ্রের ভিতর বহুসংখ্যক প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া কৃত্রিমভাবে কতকগুলি উপসাগর বা হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই কৃত্রিম সাগরশাখার ভিতরেই জাহাজসমূহ আসিয়া লাগে। এইরূপ প্রাচীর-বেষ্টিত বা quay-বিভক্ত সমুদ্র-কোণেই পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হয়। এডেন ও বোম্বাইএর বন্দর এবং পোতাশ্রয় অপেক্ষা আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার বন্দর ও পোতাশ্রয় উভয়ই বৃহত্তর। পোর্ট-সৈয়দের বন্দরও ইহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

পোতাশ্রয় পার হইয়া জাহাজ মহাসমুদ্রে পড়িল। আমরা উত্তরপশ্চিম কোণে চলিয়াছি। বাতাস উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিতেছে, কন্‌কনে শীত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এত ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীগণ বস্ত্রাবৃত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। ভারত মহাসাগরে যতদিন ছিলাম ততদিন ডেকে বসিয়া

হাওয়া খাওয়া একটা প্রধান আরামের কায্য ছিল। এখন ডেকে বসা মহা শান্তিস্বরূপ।

পূর্ব্বে যে জাহাজে চড়িয়াছি তাহা অপেক্ষা এটা যথেষ্ট বড়। আরোহীদিগের সংখ্যাও বেশী। একজন ভারতবাসীও নাই। প্রথম শ্রেণীতে প্রায় সকলেই ফরাসী, ইংরাজী জানা আরোহী এবং নাবিকের সংখ্যা বড় কম।

দুই জাহাজেই খাওয়া দাওয়াব বড় কষ্ট খাঁটি নিরামিশাহারীভাবে যাইতে চেষ্টা করিতেছি। দুই বেলাই প্রায় না খাইয়া থাকিতে হয়। সকালে বিকালে চা-পানের সঙ্গে বিস্কুট খাওযাই দেখিতেছি জীবনধারণের প্রধান উপায়।

মিশরে যে কয়দিন ছিলাম খাওয়াব কষ্ট হয় নাই। যে হোটেলে গিয়াছি সেইখানে অভিপ্রায় মত ভাত, তরকারী, শব্জী ইত্যাদি রন্ধন করাইয়া লইয়াছি। এক হোটেলে আমাদের একজন নিজে রাঁধিয়াই খাওয়াইলেন। তাহা ছাড়া মিশরের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার ফল পাওয়া যাইত। তবমুজ, শঁশা, কমলালেবু, নাশপাতি, আপেল, খেজুর ইত্যাদি নানাপ্রকার তাজা ফল খাইতে পাইতাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে লম্বা লম্বা আখও কিনিয়া খাইতাম। কিন্তু জাহাজে মামুলি টক কমলালেবু দুই বেলা রোজ খাইতে হয়। তাহার উপর, পার্শ্বের সকলে দুর্গন্ধময় মাংস ইত্যাদি আহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ খাইবার ঘরে গেলেই ক্ষুধা দূরীভূত হয়, গা বমিবমি করে।

পোর্টসৈয়দ পর্য্যন্ত আসিতে ততবেশী কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় জাহাজে উঠিয়া অবধি খাওয়া সম্বন্ধে বড়ই কষ্ট পাইতে হইতেছে।

নব্য গ্রীক

কাল রাত্রি ২।৩টার সময়ে জাহাজের একজন লোক সহসা ক্যাবিনে প্রবেশ করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটি বলিল "সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিয়াছে। জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে আসিয়াছি। জাহাজ এখন খুব বেশী নড়িবে। জানালা বন্ধ করিয়া লোকটি চলিয়া গেল। রাত্রে আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

সকালে উঠিয়া দেখি জাহাজ একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ করিতেছে। দাঁড়াইয়া একস্থানে থাকা অসম্ভব। কামরার জিনিষপত্র সবই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক ঘরেরই এই অবস্থা।

সর্ব্বোচ্চ ডেকের উপর যাইয়া দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমুদ্র লক্ষ লক্ষ বিশাল তরঙ্গে পরিপূর্ণ। ভারতমহাসাগরে এত ঢেউ কোনদিনই দেখি নাই। ভূমধ্যসাগরেরও এ পর্য্যন্ত এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখা যায় নাই। কাল পরশু যাহা দেখিযাছি তাহা মিল্টনের কথায় বলা যাইতে পারে—

"The weather was calm, and on the level brine
Sleek Panope with all her sister played."

নীল মখমল বিছাইযা ঘরের মেঝেকে ঢাকিলে যেরূপ দেখায় এই সুবিস্তৃত সমুদ্র প্রাঙ্গণও সেইরূপ স্থির দেখাইতেছিল। কিন্তু আজ ডেকের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাহিন দিকে দেখিতেছি জাহাজের মাথা অনবরত বামে ডাহিনে ঝুঁকিতেছে। এত ঝুঁকিতেছে যে সমুদ্রের শেষ সীমা

চক্ষুর বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের কুঠুরী যে ডেকের ভিতর, উপর হইতে দেখিলাম সমুদ্রের ঢেউ তাহা অপেক্ষা উচ্চতর। জাহাজ যখন বামদিকে ঝুঁকিতেছে তখন বামদিকের কামরার জানালাগুলি জলে ডুবিয়া যাইতেছে। জানালাগুলি যদি দৈবক্রমে খোলা থাকে তাহা হইলে কামরায় জলপ্লাবন উপস্থিত হয়।

সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গলীলা অতি মনোহর। আকাশ মেঘাবৃত। নীল জল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। অগণিত পর্ব্বতাকার তরঙ্গশৃঙ্গ শ্বেত ফেন-রাশি বহন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। তরঙ্গ শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে জলের উপত্যকা সৃষ্ট হইয়াছে। আল্‌মোড়ায় দাঁড়াইয়া সবুজ পর্ব্বতশৃঙ্গের তরঙ্গ দেখা যায়। দার্জ্জিলিঙ্গে দাঁড়াইয়া কুয়াসাবৃত নানারঙ্গে রঞ্জিত পর্ব্বত-মালার গতিভঙ্গী দেখা যায়। ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গমালার গিরিশৃঙ্গ দেখিয়া হিমালয়পর্ব্বত-সমুদ্রের তরঙ্গমালার কথা মনে পড়ে। দাক্ষিণাত্যের গিরিপৃষ্ঠে উঠিয়া এই পর্ব্বত সমুদ্রের লহরী বুঝিতে পারা যায় না।

তারপর সমুদ্রে রঙ্গের খেলা দেখিয়াও মোহিত হইতে হয়। নীল সিন্ধু কৃষ্ণ-ধূসর বর্ণে সাজিয়াছে। তরঙ্গমুখে শুভ্র ফেনরাশি। আবার জাহাজে জল লাগিয়া যে কৃত্রিম স্রোত ও তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে তাহার বিক্ষোভেও নানা রংয়ের আবির্ভাব হইতেছে। স্থানে স্থানে সবুজ ঘাসের বর্ণ—কোথাও বা বেগুনী রংয়ের প্রলেপ। অধিকন্তু মেঘের পথ অতিক্রম করিয়া কখনও সূর্য্যকিরণ সমুদ্রে পড়িলে স্থানে স্থানে রামধনুর উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাগরের এই ভীমামূর্ত্তি দেখিলে জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যায়।

ডেকে হাঁটা এক প্রকার অসম্ভব। অন্যান্য আরোহীরাও সোজা-ভাবে চলিতে পারিতেছেন না। প্রায় সকলেই ডেক্-চেয়ারে লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। দুই এক জন হাঁটিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু টলিতে টলিতে চলিতেছেন—এবং হয় বামদিকে না হয় ডাহিন দিকে কোন আশ্রয় ধরিয়া আছেন। অবশ্য সামান্য মাত্র gymnastics এর নিয়ম জানিলেই এই টাল খাওয়ার মধ্যেই সোজাভাবে দাঁড়াইয়া থাকা ও বেড়ান যায়। জাহাজ নড়ার নিয়ম লক্ষ্য করিয়া পা ফেলিতে পারিলেই বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। তবে বিপদ এই যে সার্কাসের পালোয়ানেরা ১০।১৫ মিনিট মাত্র দর্শকগণের সম্মুখে নিজ কশরত দেখায়। ঐটুকু সময় শরীর ঠিক সোজা রাখা তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ২।৪ ঘণ্টা ডেকে চলিতে চলিতে কেবল পদবিক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি রাখা বড় বিরক্তিজনক। ঘণ্টাখানেক ঐ নিয়মে চলা ফেরা করিয়া সমুদ্র-যাত্রার নূতনত্ব উপভোগ করিয়া লইলাম।

আজ খানা-ঘরে যাইয়া দেখি—টেবিলগুলির উপর দড়ি দ্বারা কাঠের ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। কাঠের ঘরের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য থালা বাটি গ্লাস ছুরী কাঁটা ইত্যাদি সাজান। ঐরূপ ব্যবস্থা না করিলে হুড়মুড় করিয়া সবই পড়িয়া যাইবে। চেয়ার পড়িয়া যাইবার ভয় নাই। কারণ টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সবই মেঝের সঙ্গে গাঁথা। যাহারা খানা সরবরাহ করিতেছে তাহারা মামুলিভাবে চলিতেছে। থালা বাটি হাতে করিয়া তাহারা সার্কাসের পালোয়ানদের কায়দায় আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। আজকার দৃশ্যটা সর্ব্বত্রই মন্দ নয় দেখিতেছি।

একজন গ্রীকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন—এতদ্ব্যতীত ফরাসী, গ্রীক এবং আরবীও ভাল জানেন। ইনি আলেক্জাণ্ড্রিয়ায় ২০ বৎসর হইতে আছেন। এইখানেই এক গ্রীক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ব্যবসায় শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে একটি তূলার কারবারে ইনি ম্যানেজারি করেন। সম্প্রতি ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বিলাত যাইতেছেন।

আধুনিক গ্রীসের বিষয়ে কথাবার্ত্তা ইঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ হইল। প্রাচীন গ্রীসের শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবাসীর বিস্তৃত জ্ঞান দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। ইনি বলিলেন "এথেন্সের মিউজিয়াম জগতের একটা দেখিবার জিনিষ। ফিডিয়াস ও প্র্যাক্‌সিটেনিস নির্ম্মিত ধাতুমূর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হইবে যেন উহারা জীবিত। আমি কয়েকবার পশ্চাৎ হইতে মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া ভাবিয়াছি যেন জীবন্ত মানব শরীরেরই চামড়া দেখা যাইতেছে। ওরূপ মূর্ত্তি আর কেহ গঠন করিতে পারে না।"

আমি বলিলাম "গ্রীসের মতই ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র। কিন্তু গ্রীসের সেই ভাষা, সেই ধর্ম্ম, সেই সমাজ, সেই বিদ্যা আজ কোথায়? আপনারা সেই গ্রীকদিগের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন কি? কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুগণ এখনও সেই প্রাচীন আর্য্যগণের ভাষা, সাহিত্য, আদর্শ সবই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।" ইনি শুনিয়া হিন্দুস্থান সম্বন্ধে কিছু নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন বোধ হইল।

বর্ত্তমান গ্রীস ৮০।৯০ বৎসর হইল তুরস্ক হইতে স্বাধীন হইয়াছে। গ্রীসে কৃষি বিশেষ উন্নত নয়। ভূমি পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। চাষ ভাল হয় না। শিল্পও বিশেষ কিছু নাই। আলেক্‌জান্দ্রিয়া পোর্টসৈয়দ প্রভৃতি নগরে গ্রীকেরাই বাণিজ্য করে। প্রায় সকল দোকানই গ্রীকগণের হস্তগত। কিন্তু একটি দ্রব্যও গ্রীসে প্রস্তুত হয় না। ইহারা জার্ম্মাণ, ফরাসী, আরবী, বিলাতী মালের কারবার করিয়া থাকে মাত্র।

এই ব্যবসায় চালানই গ্রীকদিগের অন্নসংস্থানের প্রধান উপায়। গ্রীসের অধিকাংশ লোকই জাহাজের কাজকর্ম্ম জানে—জাহাজ-কোম্পানী গ্রীসে অনেকগুলি আছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনি বলিলেন "গ্রীসের সর্ব্বত্রই সমুদ্র—সাগর, উপসাগর, সাগর-শাখা ইত্যাদি।

গ্রীসকে একপ্রকার দ্বীপ বলিলেই হয়। তাহা ছাড়া গ্রীসের সমীপবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জেও গ্রীকজাতীয় লোকের বাস। কাজেই সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় গ্রীকদিগের অত্যধিক। সমুদ্রে সাঁতার দিতে তাহারা ছেলেবেলা হইতেই শিখে। ঝড়ের সময়েও ৩।৪ ঘণ্টা সাঁতার দিতে তাহারা অভ্যাস করে।"

আমি জানিতে চাহিলাম "আপনাদের জাহাজ কি গ্রীসেই তৈয়ারী হয়? গ্রীসে কি ভাল ভাল ডকইয়ার্ড, পোতাশ্রয়, জাহাজনির্ম্মাণের কারখানা আছে?" ইনি হাসিয়া বলিলেন, "না—আমরা জাহাজনির্ম্মাণ করি না। আমরা বিদেশ হইতে ছোট ছোট জাহাজ কিনিয়া আনি। সেইগুলি মেরামত করিবার জন্য দুই একটা কারখানা গ্রীসে আছে মাত্র।"

জাহাজের গতি বুঝাইবার জন্য প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র ঝুলান হইয়া থাকে। আজ দেখিলাম—ক্রীট-দ্বীপের দক্ষিণ হইতে গ্রীসের দক্ষিণ দিয়া ইতালী ও সিসিলি দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর দিকে যাইতেছি। রোজ প্রায় ৩৫০ মাইল বেগে জাহাজ চলিতেছে। সকলেই বলিতে লাগিলেন মেসিনা প্রণালী অতিক্রম করিলেই নরম সমুদ্র পাইব। ক্রীট্ হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত সাগর বড় উগ্র।

আজ সমস্তদিন কামরার জানালা বন্ধ। ডেকের ভিতর দিয়া ক্যাবিনে হাওয়া আসিবার আর কোন পথ নাই। কাজেই ঘরে দুর্গন্ধ জমিয়াছে। সকল ঘরেই এক অবস্থা। সমস্ত দিন ডেকের উপর ছিলাম। নির্ম্মল বাতাস সেবনান্তে কুঠরীতে শুইতে আসিতেছি। দুর্গন্ধে ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব। ইলেক্‌ট্রিক পাখা খুলিয়া দেওয়া গেল। জানালা এখনও খুলিবার উপায় নাই। জাহাজ সেইরূপই—বরং কিছু বেশী—টাল খাইতেছে। দরজা খুলিয়া রাখিলাম—যদি কিছু বাতাস আসে।

কামরার সেবককে বলিয়া দিলাম—সমুদ্র নরম হইবা মাত্রই যেন সে জানালা খুলিয়া দেয়। রাত্রি প্রায় ১২।১টার পর আসিয়া সে জানালা খুলিয়া গেল। তখন আমরা ইতালী ও সিসিলির মধ্যে চলিতেছি।

য়োরোপের জাতিপুঞ্জ

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর বুঝিলাম ইতালী ও সিসিলির কোন অংশই দেখা যাইতেছে না। আমাদের বামে ও দক্ষিণে জাহাজের উভয় পার্শ্বেই কতকগুলি পার্ব্বত্য দ্বীপ মাত্র। পর্ব্বতগাত্রে একটি তৃণও নাই। আগ্নেয়গিরিসদৃশ মরুপর্ব্বত সমুদ্রের বক্ষ চিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই পার্শ্বের পাহাড় অল্পক্ষণ মাত্র দেখা গেল। পরে মহাসমুদ্রে পড়িলাম। নাবিকের বলিল ঐগুলি [illegible] দ্বীপের শেষ সীমা।

গ্রীক বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন—"আজ কালকার সভ্যতা মানুষকে ক্রমশঃ বর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে। কেবল সুখভোগ, বিলাস এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধিই মানুষের চরম লক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে। আমরা জীবনের উচ্চতর আদর্শের চর্চ্চা কম করিতেছি।" ইহার মুখে এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম—"ইহার স্বজাতীয় লোকেরাই মিশরের সর্ব্বত্র কাফি-গৃহ, খানা গৃহ খুলিয়া মিশরকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই গ্রীকজাতির চরিত্র সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা অন্যায়।"

গ্রীকেরা ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে কি চোখে দেখে জানিতে ইচ্ছা হইল। ইনি বলিলেন—"ফরাসীরা বাচাল এবং দিলদরিয়া মেজাজের লোক। সর্ব্বদাই হাস্য আমোদে লিপ্ত। বোম্বাই হইতে যে জাহাজে আসিয়াছিলাম তাহাতে ওলন্দাজ চিত্রকর ফরাসী-জাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"ফরাসী অধঃপাতে যাইবে। ইহারা চরিত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সমাজবন্ধন নাই। পরিবার পালন করা ইহারা

ত্যাগ করিতেছে। সকলপ্রকার অসংযম ইহাদের দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে।" ইংরাজ পাদ্রীটিও সেই জাহাজে ফরাসীর নিন্দা করিয়াছিলেন। দেখিতেছি ফরাসীজাতিকে ইউরোপীয়েরা ভাল চোখে দেখে না।

গ্রীকটি বলিলেন—"কিন্তু ফরাসী ভাষা বড় মধুর। ইংরাজীর মত কঠোর ও তিক্ত নয়।" জার্ম্মাণজাতি সম্বন্ধে বলিলেন "ইহারা বড় কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। ইহারা বড় বেশী গম্ভীর—বাজে কথায় কাণ দেয় না। জীবনের লক্ষ্য সুসাধিত করিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তান্বিত।" ইংরাজ সম্বন্ধে ইহার মত—"ইংরাজেরা জার্ম্মাণদের মত গম্ভীর প্রকৃতি নয়। জীবনের সুখ সবই ইংরাজেরা ভোগ করিয়া থাকে। খেলা, বেড়ান, গল্প করা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কাজও করে। কিন্তু ইহারা বড় অহঙ্কারী। সবাকে সরা জ্ঞান করা ইহাদের প্রকৃতি। মিশরে ইহারা কোন ইউরোপীয় লোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিতে চায় না—সর্ব্বত্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে এবং সকলকে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দেখাইতে ভালবাসে।"

সমুদ্রের উগ্রমূর্ত্তি

কাল ইতালীয় সাগরে ছিলাম। আজ ফরাসী সাগরে পড়িয়াছি ভোর রাত্রে কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রণালী পার হইয়াছি। সকালে উঠিয়া দেখি আমাদের পূর্ব্বে কর্সিকাদ্বীপের শেষ পর্ব্বতসীমা। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহাও আর দেখিতে পাইলাম না। নেপোলিয়ানের জন্মভূমি একেবারে অদৃশ্য হইল।

সিসিলি হইতে কর্সিকা পর্য্যন্ত সমুদ্র বেশ নরম ছিল। আজ ভাবিয়াছিলাম সেইরূপ নরমই যাইবে। রীডিংরুমে বসিয়া লেখা পড়া করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ সমুদ্রের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে জাহাজ তুমুলভাবে উঠিতে বসিতে লাগিল। সেদিন ক্রীট হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত আসিতে গ্রীকসাগরে জাহাজের "রোল"-নড়া খাইয়াছি। দ্বিতীয় ধরণের 'নড়া' দেখাইবার জন্যই যেন আজ আমাদের জাহাজকে নাচাইতে আরম্ভ করিল। সমস্ত জাহাজটা একবার উঠিতেছে আর একবার বসিতেছে। সম্মুখভাগ যখন জলের মধ্যে বসিয়া যায় তখন পশ্চাদ্ভাগ উর্দ্ধে উঠে, এবং সম্মুখভাগ যখন উর্দ্ধে তখন পশ্চাদ্ভাগ জলের মধ্যে বসিতে থাকে, ইহার নাম 'পিচ' নড়া। ইহাতে সম্মুখ এবং পশ্চাতের অংশদ্বয়ই বিশেষরূপে ঝাঁকুনি পায়। মধ্য-ভাগে নড়ন-চড়ন কিছু অল্প বটে। কিন্তু এই অংশে থাকিয়াও যে পিচ্-নড়া খাইয়াছি তাহা সহজে ভুলিব না। এখন জাহাজের নামে ভয় পায়।

আজ ঢেউগুলি খুবই বড় বড়—সেদিনকার অপেক্ষাও উচ্চতর এবং বিস্তৃততর। জাহাজের অগ্রভাগ যখন সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করে তখন ঢেউ আমাদের সর্ব্বোচ্চ ডেক পর্য্যন্ত পৌঁছে। আমাদের অনেকের কাপড চোপড় ভিজিয়া গেল—অথচ আমরা চারতলার উপর আছি।

পাঠাগারে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। প্রবলভাবে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া আরোহীরা ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। বসিয়া নয়—প্রায়ই সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন। ধাক্কার ঠেলা সাম্‌লাইতে অনেককেই অপারগ দেখিলাম। আমি পাঁচ মিনিট কাল লেখা পড়া করিলাম। পরে অসহ্য হইল। গা বমি বমি করিতে লাগিল। ঘরের ভিতর একটুকুও হাওয়া নাই। তাহাতে উদ্গারণের প্রবৃত্তি আরও বাড়িতে লাগিল। দু একবার রুমালের মধ্যে বমি করিতে বাধ্য হইলাম। পরে টলিতে টলিতে কোন উপায়ে ঘরের বাহির হইয়া একটা ডেক্‌চেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়া গেল। চোখ খুলিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে। এত বড় জাহাজের ঘন ঘন ওঠা বসা এবং সমুদ্রতরঙ্গের ভিতর উন্মত্তনর্ত্তন দেখিতে গেলে উদ্গীরণের প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়া যায়। কাজেই চোখ বন্ধ করিয়া চেয়ারে লম্বা হইলাম। সোজা চেয়ারে বসিবার ক্ষমতা নাই। মুখের উপর দিয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মত বহিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে শীত বিশেষ ভোগ করিতে হইল সত্য—কিন্তু বমি করার প্রবৃত্তি আদৌ রহিল না।

দুইবারে ১২।১৪ দিন জাহাজে কাটাইয়াছি। ডেক্ চেয়ারের আবশ্যকতা সত্যভাবে একদিনও বুঝি নাই। মনে হইত আরাম করিয়া বসিবার জন্য এইগুলি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আজ বুঝিলাম ইহাই পিচ্-নড়ার একমাত্র ঔষধ।

সকাল ৮॥০ টার সময়ে এই "পিচ্" আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত একভাবে জাহাজের ওঠা বসা কাণ্ড চলিতেছে। চেয়ার হইতে উঠিয়া একবার নীচ তলায় ক্যাবিনে যাইতে চেষ্টা করিলাম। ঢেউএর জল জাহাজে প্রবেশ না করিতে দিবার জন্য সমস্ত জাহাজের সকল জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই শুইবার কামরাগুলি সমস্তই অন্ধকূপের মত দুর্গন্ধময়। নীচে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিলাম না। পুনরায় সেই খোলা হাওয়ার মধ্যে ডেক্-চেয়ারেই শুইয়া থাকিতে হইল।

আমার অবস্থায় অনেককেই দেখিলাম। কেহ কেহ এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত। তাঁহারা মজা দেখিতে লাগিলেন। আমাদের গ্রীক বন্ধুটি বলিলেন তাঁহার কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হইতেছে না। রমণীগণের মধ্যে অধিকাংশই কাবু। কেহই খাইতে গেলেন না। তাঁহাদের খানা উপরে আনা হইল। দুঃখের কথা আমি বেচারা আহার করিবার পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হারাইয়াছি। খানা-ঘরে ত গেলামই না—উপরেই জাহাজের লোকেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেল। তাহাদিগকেও বলিয়া দিলাম—খাইব না!

সমস্তদিন অনাহারে কাটাইতে হইল। সন্ধ্যার পর ২।৪ চামচ্ ভাত আলুভাজার সঙ্গে খাওয়া গেল। না খাইলেও বোধ হয় কষ্ট হইত না। খাইবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। পিচের ঝাঁকুনি খাইয়াই পেট ভরিয়া রহিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের যে অংশে আমরা আছি তাহার কিয়দ্ভাগ জেনোয়া উপসাগর এবং প্রধান ভাগ লাইয়োঁ উপসাগর এই উপসাগরদ্বয়ের সর্ব্বদা সকল ঋতুতেই এই মূর্ত্তি কি না জানি না। নানা লোকে সমুদ্রের উগ্রমূর্ত্তি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে।

রাত্রি ৮ টার পর সমুদ্র শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন কামরায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি ১২ টার সময়ে একবার ঘুম ভাঙ্গিল। জানালা দিয়া দেখিলাম আমাদের বাম দিকে অনতিদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি পর্ব্বত শৃঙ্গ সমুদ্রের বক্ষ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুইটি অনতি-বিস্তৃত দ্বীপের মত দেখাইতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। তাহার কিরণে দ্বীপদ্বয় উদ্ভাসিত। সমুদ্রের জল স্থির। জাহাজ চলিতেছে না। বুঝিলাম আমরা মার্‌সেল্‌-বন্দরে পৌঁছিয়াছি।

মার্সেল ও রোণ-উপত্যকা

প্রায় চারিটার সময়ে উঠিলাম। অথচ নৈশ অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। মনে হইতে লাগিল যেন ছয়টা সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জাহাজ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের বামে সেই দ্বীপদ্বয়। এখন দেখা গেল এই পার্ব্বত্যভূমির বর্ণ শ্বেতাভাবিশিষ্ট—কোন অংশে একটিও তৃণ জন্মে নাই। উপরিভাগে দুর্গের প্রাচীর দেখা যাইতেছে। বুঝিলাম বন্দর ও পোতাশ্রয়কে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি এই উচ্চ দ্বীপদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার উপর মানুষ বুদ্ধি খাটাইয়া সুরক্ষিতকে আরও দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে।

জিনিষপত্র গুছাইয়া ডেকের উপর আসিলাম। জাহাজকে কূলে 'জেটি'র গায়ে লাগাইবার জন্য চালান হইল। দেখিতে পাইলাম সমস্ত নগরের তিন দিকেই পাহাড়—একদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের ভিতরেও দ্বীপদ্বয় বন্দরের প্রবেশদ্বারে পাহারা দিতেছে। নগর পর্ব্বতের পাদদেশে বিস্তৃত—যে ভূমির উপর নগর ও বন্দর স্থাপিত তাহাও পার্ব্বত্য অসমতল। নগরের কোন অংশ উচ্চ, কোন অংশ নিম্ন। এক উচ্চ উপত্যকার পৃষ্ঠদেশে গির্জ্জা দণ্ডায়মান। তাহার সম্মুখস্থ স্তম্ভের শিরোভাগে এক বিশাল মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতগুলি সবই বৃক্ষহীন —চূণের ন্যায় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। মার্সেলের এই পর্ব্বত-প্রাচীর দূর হইতে মিশরের পর্ব্বতমালা এবং লোহিতসাগরের পার্শ্ববর্ত্তী মরুপর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতেছে।

সমুদ্রে যে-কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছে, তাহাদের পাল মিশরীয় তরণীসমূহের কথা মনে করাইয়া দেয়। ত্রিকোণাকার পাল পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। নৌকাগুলি এই পালের জন্য সুন্দর দেখায়।

পোতাশ্রয় নানা অংশে বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টক প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা এই প্রকোষ্ঠগুলি নির্ম্মিত। সকল পোতাশ্রয়ই এক নিয়মে গঠিত। জাহাজ হইতে মাল নামাইবার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া সমুদ্রের কূলকে প্রয়োজন মত বাড়ান কমান হয়। ঝড় বাতাস হইতে জাহাজকে রক্ষা করিবার কথাও পোতাশ্রয়ের গঠন কর্ত্তারা বিবেচনা করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, জলপথে শত্রুরা যাহাতে নগর, বন্দর এবং পোতাশ্রয় সহজে দখল করিতে না পারে তাহার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়। এডেন, আলেকজান্দ্রিয়া এবং মার্সেল তিনটা বন্দরেই প্রায় একরূপ নির্ম্মাণকৌশল।

বন্দরে নামিবামাত্র কাষ্টমহাউসের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মালের মধ্যে তামাক চুরুট ইত্যাদি আছে কি না ইহাই কর্ম্মচারীরা প্রধানতঃ জানিতে চাহে। এখানে বেশীক্ষণ লাগিল না। পোর্টসৈয়দে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা হইয়াছিল। এখানে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

মাল তুলিবার জন্য কুলী খুঁজিতেছি। দেখা গেল একজন মারাঠা যুবক কুলীর সর্দ্দারভাবে আমাদের সম্মুখে হাজির। বিগত দশ বৎসর ধরিয়া সে এক ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে জগতের নানাস্থানে চাকরী করিতেছে।

তাহার সঙ্গে মার্সেল নগর দেখিতে বাহির হইলাম। সুবিস্তৃত সুপরিষ্কার প্রস্তরগ্রথিত রাজপথগুলি নগরের প্রধান শোভা। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাসমূহ রাস্তার দুইধারে দণ্ডায়মান। কৃষ্ণ-ধূসর প্রস্তরনির্ম্মিত

প্রাচীর—ছাদগুলি লালরংয়ের টালি নির্ম্মিত; আমরা ভারতবর্ষে এ-গুলিকে রাণীগঞ্জ টাইল্‌স্ বলিয়া জানি।

রাস্তার উভয় পার্শ্বের সৌধসমূহ এক নির্দ্দিষ্ট রীতিতে নির্ম্মিত। কাইরো ও আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া দেখিয়া আসিবার পর এই নির্ম্মাণ কৌশলের নূতনত্ব কিছুই পাইলাম না। কেবল এই মাত্র বুঝিলাম যে, এই কায়দাই মিশরে মহম্মদ আলির আমল হইতে প্রচলিত হইয়াছে। ফরাসী গৃহ-নির্ম্মাণরীতিই আধুনিক মিশরীয় গৃহ-নির্ম্মাণরীতির জননী। প্রভেদ এই যে, মিশরে গৃহের ছাদ সবই সমতল, এখানে একটাও সমতল নয়, সবগুলিই ত্রিকোণাকার সহজে জল গড়াইয়া মাটিতে পড়িতে পারে।

এখানকার বড় বড় ডাকঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কলিকাতার বড় ডাকঘর হইতে ইহা অনেক ছোট। তবে কায়দা কারখানা অনেকটা একপ্রকার। বাস্তবিক পক্ষে বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় নগরের ইংরাজপাড়া দেখিয়া মিশরের পাশ্চাত্য মহল্লা এবং ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের বড় বড় সহর দেখিলে মনে হইবে পাশ্চাত্য জগতেরই খানিকটা ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য লোকেরা কলিকাতা বোম্বাই ইত্যাদি নগরে আসিলে তাহাদের স্বদেশীয় আবহাওয়া, কায়দা কানুন, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট সবই পাইবে। মার্সেলের আফিস, হোটেল, ব্যাঙ্কগৃহ, রাজপথ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আধুনিক জগতে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম।

মার্সেলের বড় ডাকঘরের কেরাণীকুল আমাদের ভারতীয় কেরাণীকুলের ন্যায়ই অনেকটা নিস্তেজ ও জীবনহীন বোধ হইল। তবে ইহারা হয় ত বেতন কিছু বেশী পায়।

প্রথমেই একটি গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। জাহাজ হইতে এই গির্জ্জাই দেখিতে পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে এই স্থানে একটা প্রাচীন ধর্ম্মশালা ও দেবালয় ছিল। আমরা যে মন্দির দেখিতে গেলাম তাহা ৫০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপর এই গির্জ্জা অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার জন্য বক্রগতি পার্ব্বত্যপথ ত আছেই। তাহা ছাড়া কয়েক বৎসর হইল একটা কল তৈয়ারী করা হইয়াছে। তড়িতের ক্ষমতায় এই কল চালান হয়। তাহার দ্বারা আমরা পাহাড়ের পাদদেশ হইতে দুই মিনিটের মধ্যে একেবারে ঊর্দ্ধভাগে উঠিলাম। এই "ইলেকট্রিক লিফ্টে" একসঙ্গে ৩০ জন লোক উঠিতে বা নামিতে পারে। গৌহাটীর কামাখ্যা মন্দিরে উঠিবার জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা করা যায় না কি?

পাহাড়ের উপর হইতে সমস্ত মার্সেল নগর, বন্দর, পোতাশ্রয় ও পর্ব্বতপ্রাচীর একসঙ্গে দেখিয়া লইলাম। উত্তরে সুদূর বিস্তৃত নগরের লালটালি নির্ম্মিত পীরামিডাকৃতি ছাদসমূহ। তাহার ভিতর ধূমনির্গমের কল। সহরের নানাস্থানে কারখানা ও ফ্যাক্টরীর লম্বা লম্বা চিমণীও অনেকগুলি দেখা গেল। দক্ষিণে সমুদ্র। পশ্চিমে নীলসিন্ধু—তাহার শেষে বন্দর, জাহাজ, নৌকা, মালগুদাম, জেটি এবং পার্ব্বত্য দ্বীপদ্বয়। নগরের তিনদিকে পর্ব্বতপ্রাচীর।

পশ্চিম দিক্ হইতে আমরা গির্জ্জায় প্রবেশ করিলাম প্রবেশ দ্বারেই অত্যুচ্চ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। তাহার শিরোদেশে স্বর্ণ রঞ্জিত বিশাল মেরী-মূর্ত্তি যিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান। এই মূর্ত্তি সমুদ্রের বহুদূর হইতে দেখা যায়।

গির্জ্জার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি দুই পার্শ্বে তিন চারিটা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠে যীশুকে ক্রুশে হত্যা করার প্রস্তরমূর্ত্তি—

কোন প্রকোষ্ঠে জীবনহীন যীশুর শয়নাবস্থা দেখিতে পাইলাম। প্রকোষ্ঠের ভিতর খ্রীষ্টান যাত্রীরা হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।

গির্জ্জার সর্ব্ব পূর্ব্বাংশে প্রধান দেবালয়। সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সম্মুখ হইতে দেখিলাম প্রস্তরময়ী মেরী মূর্ত্তি—যীশু তাঁহার ক্রোড়ে। আমরা ভগবতীর চালি দূর হইতে যেরূপ দেখিয়া থাকি, এই মূর্ত্তিও সেইরূপ দেখিলাম। যাঁহারা মূর্ত্তি পূজা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই মেরীমূর্ত্তিতেও মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইবেন। খ্রীষ্টানেরা নিতান্ত কুসংস্কারপূর্ণ না হইলে হিন্দু দেবদেবী-গণকেও ভক্তি করিতে বাধ্য।

মন্দিরের সকল ভাগই অন্ধকারময়। আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা নাই দেখিলাম। ভাবিলাম পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেরই বা দোষ কি? প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের 'অরেকল্' বা দেবতার আদেশও এইরূপ আলোকবিহীন দেবালয় হইতে বাহির হইত। বিশ্বের চরম সত্য অজ্ঞেয় অথবা অজ্ঞাত বলিয়াই কি দেবমন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সকল দেশের কারি-গরই এক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন? যাহাকে পাইতে হইবে তাহা অনেক অন্ধকারের মধ্যে বিলীন। তাহার জন্য বহু অজানা দুর্গম পথের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্যই কি মন্দির নির্ম্মাণের এই রীতি? দেবদেবীগণের বর্ণ-কল্পনায়ও কি এইরূপ কোন অর্থ আছে?

মন্দিরের প্রকোষ্ঠগুলির ভিতর দেখিলাম অসংখ্য মেডেলাকৃতি গোলা-কার পুষ্পপাত্র। সংবাদ লইয়া জানিলাম মন্দিরে আসিয়া তীর্থযাত্রীরা ঐ সমুদয় স্মরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবানের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিবার সাক্ষ্যস্বরূপ ঐ সমুদয় পদার্থ রক্ষিত হইতেছে। হিন্দুগণের নিকট পূজার অর্ঘ্য অপরিচিত নয়। রোমাণ ক্যাথলিক ও খ্রীষ্টানেরা

অনেক বিষয়েই হিন্দুর পূজা অর্চ্চনা, উপাসনাপদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব পালপার্ব্বণ ইত্যাদি পালন করে। ভগবানের নিকট উৎসর্গ, দেবদেবীর নামে 'মানত" হিন্দুদের ন্যায় রোমাণ ক্যাথলিকেরাও করিয়া থাকে। এই সকল পুষ্পপাত্র এবং যীশুর নানাপ্রকার চিত্রশোভিত মেডেল-সমূহ তাহারই পরিচয়। মিশরের কোন কোন প্রাচীন মন্দির ও কবরের গাত্রে দেখিয়াছি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বযুগের রোমীয়জাতি এইরূপ উৎসর্গ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, প্রাচীন মিশরীয়েরা এবং গ্রীকেরাও এইরূপ করিত। আধুনিক মুসলমানও এইরূপ পীরের সিন্নি, আল্লার দোহাই দিয়া থাকে। মূর্ত্তিপূজার বীজমাত্র যেখানে সেইখানেই নানাপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান।

মন্দিরের সম্মুখাংশে উচ্চ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে মুসলমানী গম্বুজ। এই গম্বুজই গির্জ্জার প্রধানতম দেবালয়ের ছাদস্বরূপ নির্ম্মিত।

মন্দির দেখিয়া সহরের ভিতর দিয়া চলিলাম। এখানে কোন কোন স্থানে রাস্তার মধ্যখানে বৃক্ষরাজি শোভিত উদ্যান বিশেষ। আধুনিক আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীর "মহম্মদ আলি চৌরাস্তা" এইরূপ উদ্যানের নকলেই তৈয়ারী হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। মুসলমানী আমলের দিল্লীনগরেও এইরূপ উদ্যানময় চৌরাস্তা বর্ত্তমান ছিল।

এইরূপ উদ্যান ও চৌরাস্তা মার্সেলনগরের একটা দর্শনীয় বস্তু। এতদ্ব্যতীত রাস্তার মধ্যে মধ্যে জলের কলগুলিও কলাজ্ঞানের নিদর্শন। এই সমুদয় ফোয়ারা কেবলমাত্র জল সরবরাহ করিবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। ফোয়ারাগুলি বড় বড় প্রস্তর-মূর্ত্তির গঠন-শিল্পের উপলক্ষ্য স্বরূপ। প্রসিদ্ধ ভাস্করগণের এই সকল কারিগরি নগরের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলি নগরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাসাদপুরীর

অভ্যন্তরে এই ফোয়ারাসমূহ যথোচিত কারুকার্য্যের সহিতই গঠিত হইয়াছে।

ফোয়ারা-সংশ্লিষ্ট মূর্ত্তি ব্যতীত সহরের নানাস্থানে অন্যান্য মূর্ত্তিও বিরাজিত। প্রসিদ্ধ মার্সেল-সন্তানগণ, মার্সেল-নগরী, সমুদ্র, মার্সেল-বন্দর, রোণনদ ইত্যাদির প্রস্তরমূর্ত্তি কোথাও কোথাও দেখিতে পাই। জন্মভূমির প্রতিমূর্ত্তি অন্য কোন দেশে দেখি নাই। অবশ্য আমরা গঙ্গা-যমুনার পূজা করিয়া থাকি। সুতরাং নদ নদীর মূর্ত্তি কল্পনা আমাদের নিকট নূতন নয়। কিন্তু নগর, পল্লী, জনপদ, বন্দর, প্রদেশ ইত্যাদিকে মূর্ত্তি প্রদান করিবার শিল্প এই প্রথম দেখিলাম। এই প্রণালীতে আধুনিক ভারতের চিত্রকর ও ভাস্করগণ স্বকীয় পল্লী-মাতা, দেশ-মাতা ইত্যাদির রূপ সৃষ্টি করিয়া ধন্য হইতে পারেন। অবশ্য সম্প্রতি চিত্রে আমরা 'ভারত-মাতা'কে পাইয়াছি। এই ধরণের চিত্র ও স্থাপত্য আমাদের শিল্পকলার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবে।

মার্সেল-নগর বাঙ্গালার নিকট একটা অভাবনীয় দিক হইতে সুপরিচিত হইয়াছে। যখন অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" গীত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইত তখন পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ইহাকে ভারতের "মার্সেলে" (Marseillaise)-স্তোত্র নাম দিয়াছিলেন। মার্সেল-নগরবাসী জনগণ যে ভাবে যে সুরে গান গাহিয়া ফরাসীবিপ্লবে যোগদান করিয়াছিল সেই ভাব ও সেই সুর জগতে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই গান ফরাসী জাতির মধ্যে প্রথম প্রচারিত হয়। তাহার পর হইতে এই সুরে ও এই কায়দায় রচিত যে-কোন জাতির গীতকে 'মার্সেলে' গীত বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এইরূপ একটা মার্সেলে-গীত রচিত হইয়াছে—ইহা পাশ্চাত্যগণের ধারণা।

মার্সেল ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর এবং ফরাসীজাতির বাণিজ্য-কেন্দ্র। সুতরাং এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ। কিন্তু মোসাফিরের ন্যায় দেড় ঘণ্টায় সংক্ষেপে সারিতে হইবে। কাজেই শিল্প কারখানা, ব্যবসায়ের আড়ত ইত্যাদি দেখিবার সময় নাই। তাড়াতাড়ি মিউজিয়ামে যাওয়া গেল। মিউজিয়াম-গৃহ সহরের ভিতর সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট গৃহ-নির্ম্মাণ-রীতির একটি প্রধান নিদর্শন। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড তোরণদ্বার-স্বরূপ গৃহ। তাহার মধ্যে জলের ফোয়ারা। নানা প্রস্তর মূর্ত্তির মুখ হইতে জল বিনির্গত হইতেছে। জল দুই তিন ধাপে নিম্নে আসিতেছে। মধ্যের এক ধাপ ভূগর্ভে প্রোথিত। এই তোরণ-গৃহের বামে ও দক্ষিণে মিউজিয়াম। একদিকে চিত্র ও মূর্ত্তির সংগ্রহালয়—অপর দিকে পশুপক্ষী জীবজন্তু বিষয়ক বিদ্যার সংগ্রহালয়।

চিত্র এবং মূর্ত্তিগুলি আধুনিক ও প্রাচীন। প্রায়ই বৃহদাকার—ক্ষুদ্র কারুকার্য্য বিরল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কাহিনী, ফরাসী জাতির ইতিবৃত্ত, ফ্রান্সের পল্লীনগর জনপদ, মার্সেলের বন্দর, পোতাশ্রয়, নদনদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ফরাসী কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পশুপালন, কৃষি ইত্যাদি সকল প্রকার বিষয় এই চিত্রশিল্পে এবং ভাস্কর্য্যে স্থান পাইয়াছে। ফরাসীশিল্পের পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং ফরাসী জাতিকে বুঝিবার পক্ষে এই সংগ্রহালয় বিশেষ উপযোগী। দ্বিতীয় সংগ্রহালয় দৈবক্রমে আজ খোলা ছিল না। বাহির হইতে দেখিলাম প্রাচীরের গায়ে ফরাসী জাতির প্রধান প্রধান প্রাণ-বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী পণ্ডিতগণই আধুনিক জীবতত্ত্ব ও প্রাণ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই কৃতিত্ব এই সংগ্রহালয়ে বুঝান হইয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞান-প্রেমিকের নিকট এই গৃহ অত্যন্ত মূল্যবান্। এখানে নব্য মানবের আবিষ্কৃত

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রথমযুগ প্রদর্শিত রহিয়াছে। ফরাসী জাতিই সেই যুগের ধুরন্ধর—সুতরাং ফরাসীরা তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। প্রাণ-বিজ্ঞানের প্রাচীন ইতিহাস চোখে দেখিয়া বুঝিতে হইলে এই সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করা আবশ্যক হইবে।

দেড় ঘণ্টায় মার্সেল দেখিলাম। মার্সেলের আধুনিক নগর মাত্র চোখে পড়িল। এই অংশ ১৫০।২০০ বৎসরের ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত ৭০।৭৫ বৎসর কালের মধ্যেই বর্ত্তমান অট্টালিকা রাজপথ ইত্যাদির উৎপত্তি। বন্দরের গৌরবও অল্পদিন হইল বাড়িয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা আফ্রিকায় আলজিয়ার দখল করে, এবং ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খোলা হয়। এই দুই ঘটনার পর হইতেই ফরাসী বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

তবে ঐতিহাসিক হিসাবে এ-স্থান অতি প্রাচীন। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ প্রাচীন জনপদ ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণিতে একটিও নাই। ভারতবর্ষে যখন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন প্রায় সেই সময়ে এই স্থানে গ্রীক নাবিকেরা একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা ভূমধ্য-সাগরে যতগুলি বন্দর ও গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র গঠন করিয়াছিল তাহার মধ্যে মার্সেল যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হয়। সে আজ ২৫০০ বৎসরের কথা।

তাহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে ইহা রোমাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম চারি শতাব্দী কাল এই নগর রোমীয় রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। পরে রোমাণ-সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে এই নগরের উপর নানা দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। মুসলমানেরাও একবার এই নগর দখল করিয়াছিলেন। পরে ইহা স্বাধীন হয়।

মধ্যযুগে এই নগর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ইউরোপের ইতিহাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী, নাতিবিস্তৃত জনপদ এবং অল্পায়তন বিশিষ্ট নগর বা

বন্দর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের কথা সম্প্রতি ছাড়িয়া দিলাম। রোমাণ-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর খৃষ্টীয় চতুর্থ-শতাব্দী হইতে ১০০০ বৎসর কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইতালী, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের সকল দেশেই জাতীয়তা, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, একদেশীয়তা ইত্যাদি আদর্শও লক্ষ্যের বিকাশ হয় নাই। বাস্তবিকপক্ষে, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড ইত্যাদি নামে কোন জনপদই ছিল না। প্রত্যেক দেশ অসংখ্য জেলা, নগর, বন্দর, পল্লী ইত্যাদি স্বস্বপ্রধান রাজ্যে বা প্রজাতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।

এই অনৈক্য ইউরোপে বড় শীঘ্র নিবারিত হয় নাই। নগরসমূহ নিজ নিজ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্বাধীন জেলার সঙ্গে বড় শীঘ্র সংযুক্ত হইতে পারে নাই। নিয়তই প্রত্যেক রাষ্ট্রের চতুঃসীমা পরিবর্ত্তিত হইত। ভাষার অনৈক্য, ধর্ম্মের অনৈক্য, সাহিত্যের অনৈক্য, রাষ্ট্র-শাসন প্রণালীর অনৈক্য ইত্যাদি লক্ষ প্রকারের অনৈক্য প্রত্যেক দেশকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-সমাজে বিভক্ত করিয়া রাখিত। এই সকল অনৈক্য বর্ত্তমানকালেও যথেষ্ট আছে। তবে বিগত ৩০০ বৎসরের ভিতর নানা সংগ্রামের ফলে ইউরোপীয় সমাজে রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও দেশীয় ঐক্যের বিকাশ সাধিত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ঐক্য হিসাবে একমাত্র ইংলণ্ডই সর্ব্বপ্রাচীন। অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের আধুনিক সীমা নির্দ্দেশ ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সীমানির্দ্দেশে পাশ্চাত্যেরা একেবারেই সন্তুষ্ট নন। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে বিবাদ চলিতেছে। হল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণিতে বিবাদ চলিতেছে। জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে বিবাদ চলিতেছে। তুরস্ক ও বল্কানের কথা বলিয়া প্রয়োজনই নাই। সুতরাং ইউরোপের তথা কথিত রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ইউরোপের মানচিত্রে জাতিপুঞ্জের সীমা বিভাগ এখনও সন্তোষজনক নয়।

যাহা হউক, মার্সেলনগর মধ্যযুগে ফ্রান্সের অসংখ্য স্বস্ব প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম ছিল। অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালীর সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য বেশী ছিল না। নানা রাষ্ট্রের সঙ্গে একাধিক বিরোধে মার্সেল-বাসীকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলে এই নগরের সকল প্রকার স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ফ্রান্স-রাজ্যের একটা নগরমাত্ররূপে ইহার মর্য্যাদা পায়। একশতবৎসর পরে ফরাসী বিপ্লবে মার্সেল নগরের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এক্ষণে ফ্রান্স-রাষ্ট্রের ইহা সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

১১॥ টার সময়ে গাড়ীতে চড়িলাম। ষ্টেসনে বিশেষ ভিড় দেখিলাম না। গাড়ীগুলি দার্জ্জিলিঙ্গ-মেলের রীতিতে সাজান—প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতে শেষ প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত বারান্দা দিয়া যাওয়া যায়। বোম্বাই, পঞ্জাব ও দার্জ্জিলিঙ্গ-মেলের বেগ অপেক্ষা এখানকার বেগ কিছু বেশী বোধ হইল।

একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেই ভারতবর্ষের রেল-কোম্পানী বিনাপয়সায় গাড়ীতে শুইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখে। কিন্তু এখানে প্রথম শ্রেণীর আরোহী হইয়াও রাত্রে বসিয়া যাইতে হয়। অল্পব্যয়ে বেশী আরাম ভারতীয় রেল-কোম্পানীর ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। সে আরাম মিশরেও নাই এখানেও নাই। তবে বেশী পয়সা খরচ করিতে পারিলে গাড়ীতেই বিলাসের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়া যায়। এখানে কুলীপ্রতি ৮০ লাগে। কাজেই লোকেরা নিজ নিজ মাল নিজ হাতেই বহন করে। কুলীর সাহায্য বেশী আরোহী লয় না। প্রথম শ্রেণীর আরোহীরাও বড় বড় পোর্টম্যাণ্ট দুইহাতে ধরিয়া প্লাটফর্ম্ম হইতে গাড়ীতে বহিয়া আনে দেখিতে পাইলাম।

সন্ধ্যার সময়ে লাইয়োঁ নগরে পৌঁছিলাম। এই নগর রোণনদের উপর অবস্থিত। রেলপথ রোণের ধারে ধারে নির্ম্মিত। গাড়ী হইতে

সর্ব্বদাই রোণ দেখিতে পাইয়াছি। ইহা কালীঘাটের গঙ্গা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ খাল। জলের রং ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। স্রোত মন্দ নয়। কিনারা জলের সঙ্গে প্রায় সমতল। নদীর ধারে উচ্চভূমি দেখিতে পাইলাম না। রোণ-উপত্যকার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নাইল-উপত্যকার সকল দৃশ্য মনে পড়িল। নদী দক্ষিণদিকে উত্তর হইতে সোজা নামিয়াছে। অবশ্য নাইল দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত। দুইই সঙ্কীর্ণ-জলপথ। উভয়ের পার্শ্বদ্বয়েই উর্ব্বরভূমি সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। নদীর এক কিনারা দিয়া রেলপথ সমান্তরালভাবে নির্ম্মিত। নদীর দুইদিকে প্রায় ৮।১০ মাইলেরও কম প্রশস্ত ভূভাগের মধ্যে এই উদ্যানসদৃশ সবুজরংয়ের আবাদসমূহ বিরাজিত। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই শ্রেণী পর্ব্বতমালা নদী ও রেলপথের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

নাইল-উপত্যকা ও রোণ-উপত্যকা নিতান্তই একপ্রকার, তবে মিশরের পূর্ব্বপশ্চিমাংশের পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় মরুপূর্ণ বৃক্ষহীন, বালুকাময় এবং শ্বেতাভ বা রক্তবর্ণ। কিন্তু রোণ-উপত্যকার প্রাচীরস্বরূপ পর্ব্বতমালাদ্বয় বৃক্ষরাজিশোভিত, উদ্যানময় এবং হরিদ্বর্ণ। এতদ্ব্যতীত মিশরের কৃষি-ক্ষেত্রে অনেকটা একঘেয়ে চাষ দেখিয়াছি। এখানে চাষের বৈচিত্র্য দেখিতেছি। লাইয়োঁ পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে নানাপ্রকার উদ্ভিদের চাষ দেখা গেল। অবশ্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রই প্রধান। চোকোলেট, হাইন্‌জ্ ইত্যাদি নূতন নূতন উদ্ভিদের ক্ষেত্রও অনেক। কৃষ্ণবর্ণ সাইপ্রেস বৃক্ষও এই উপত্যকার সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ভারতবর্ষে যেসকল তরুলতার সঙ্গে পরিচিত এখানে তাহা বিরল। ফ্রান্সে গোধূমের চাষ হয় বটে কিন্তু রাস্তায় তাহার পরিচয় পাইলাম না। ধান্যের চাষ এখানে হইতেই পারে না।

গাড়ী হইতে ফ্রান্সের এই অংশ অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

মিশর অপেক্ষা ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশী। সমস্ত দেশই যেন একখানা সবুজরংয়ের বাগান। তাহার মধ্যে স্তরে স্তরে সাজান উচ্চ নিম্ন ভূমি অনেক। মিশরের ন্যায় এ অঞ্চল একটানা সমতল ক্ষেত্র নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড় রোণ-উপত্যকার স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতপৃষ্ঠে, পর্ব্বতগাত্রে, পর্ব্বতশৃঙ্গে সর্ব্বত্রই আবাদ হইতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গ, আলমোড়া, নাইনিতাল, শিমলা ইত্যাদি পার্ব্বত্যদেশের চাষ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা রোণ-উপত্যকার কৃষি-প্রণালী ও চাষের রীতি বেশ বুঝিতে পারিবেন। পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া সিঁড়িরমত ধাপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ধাপগুলি পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপ স্তরবিন্যস্ত কৃষিভূমির মধ্যে মধ্যে সমতল ক্ষেত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ চষা জমির দৃশ্যাবলী অত্যন্ত মনোহর।

আমাদের চারিদিককার সমস্ত আবেষ্টন হরিদ্বর্ণ। যতদূর চক্ষু যায়—পূর্ব্বে পশ্চিমে, ঊর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্র সবুজরঙ্গের খেলা দেখিতেছি। সবুজরঙ্গ কোথাও ঘন সন্নিবিষ্ট কোথাও অল্পসাঙ্কেত। ফরাসীমাতা সর্ব্বত্রই শস্য-শ্যামল বস্ত্রে আবৃতা হইয়া সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মিশর দেখিয়া ভাবিয়া ছিলাম "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা" এমনদেশ আর পাইব কি না সন্দেহ। ফ্রান্স মিশরকেও হারাইয়াছে। এই জন্যই রোণ-উপত্যকার দৃশ্য ফরাসী কবিগণকে তাঁহাদের নন্দন কাননের চিত্র কল্পনায় উদ্বোধিত করিয়া থাকে। সুকুমারশিল্পে, কাব্যে, স্থাপত্যে সর্ব্বত্রই রোণ-উপত্যকার মূর্ত্তি ফরাসী জনগণের আদরণীয় বস্তু।

বাস্তবিকই একটা নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। মিশর এত নূতন বোধ হয় নাই। মিশরে ভারতীয় শাকশব্জীই বেশী দেখিয়াছি। এখানকার গাছপালা অন্যরূপ। এতদ্ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণ-রীতিও নূতন। লাল-টালির পীরামিডাকৃতি ছাদ মার্সেলে আরম্ভ হইয়াছে। রোণ-উপত্যকার

সর্ব্বত্র এই ছাদ দেখিতেছি। সবুজ আবেষ্টনের উপর এই রক্তবর্ণ গৃহগুলি নূতন সৌন্দর্য্যের খনি বলিয়া মনে হয়।

লাইয়োঁ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ মাইল আসিলাম। সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া জনপদ ও লোকালয় দেখা গেল। মিশরের ন্যায় এখানেও বসতি, পল্লী, নগর ইত্যাদি অতি ঘন সন্নিবিষ্ট। কিন্তু লোকসংখ্যা বেশী বলিয়া বোধ হইল না। আবুল্, এভিনিয়োঁ, ভ্যালেন্স ইত্যাদি বড় বড় নগর পথে পড়িল। এই সকল স্থানেই লোকসংখ্যা বেশী।

রোণ-উপত্যকার মৃত্তিকা ঈষৎ শ্বেতাভ। রোণের জলও শ্বেতাভ। মার্সেলের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুলিও শ্বেতাভ। লাইয়োঁ নগরের যতই সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই শ্বেতমৃত্তিকা ছাড়াইয়া কৃষ্ণ, ধূসর, লাল মৃত্তিকা দৃষ্টিগোচর হইল। সাইপ্রেস বৃক্ষ মার্সেল হইতে লাইয়োঁ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইলাম। উত্তরাংশে লম্বা লম্বা পপ্লার বৃক্ষই বেশী।

রাঁচি, হাজারিবাগ ইত্যাদি পার্ব্বত্যদেশের রাস্তাঘাট যেরূপ প্রস্তরময় এবং ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, রোণ-উপত্যকার পল্লীগ্রামস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ রাস্তাগুলিও দেখিতে সেইরূপ। কিন্তু গৃহসমূহ দার্জ্জিলিঙ্গ, শিম্‌লা প্রভৃতি স্থানের রীতিতে নির্ম্মিত। প্রকৃতপ্রস্তাবে পাশ্চাত্য গৃহনির্ম্মাণ-রীতিই হিমালয়ের পার্ব্বত্য নগরসমূহে অনুসৃত হইয়াছে। এজন্যই দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিয়া পাশ্চাত্যেরা স্বদেশ-বাসের সুখভোগ করিয়া থাকেন।

আর্ল নগর মার্সেলের অতি সন্নিকটে। ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি মিষ্ট্রাল এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইনি ফরাসীদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলের উপ-ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। এই অঞ্চল মধ্যযুগের ফরাসী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। প্রোভেন্স্যাল-রীতির রচনাকৌশল সমগ্র ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করিত। ইংরাজী সাহিত্যেও এই কাব্য-

শিল্পের প্রভাব পড়িয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপের মধ্যযুগে প্রেম-সঙ্গীত, হৃদয়োচ্ছ্বাস, গীতিকাব্য, লোকসাহিত্য, ইত্যাদি কাব্যে কয়েক বিভাগ প্রোভেন্স্যাল রীতির নিয়মেই অনুপ্রাণিত হইত। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের নামে প্রোভেন্স কবিগণ ট্রুবেডোর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রেম-দরবার, প্রেমের বিচারালয়, প্রেমের রাজা ইত্যাদি বিষয় এই ট্রুবেডোরগণের সাহিত্যে বিশেষ আলোচিত হইত।

অবশ্য সাহিত্যের সেই যুগ এবং সমাজের সেই অবস্থা ফ্রান্স ও ইউরোপ হইতে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবি মিষ্ট্রাল সেই রচনা-রীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের প্রচলিত ভাষায় কাব্য না লিখিয়া এই জনপদের স্থানীয় ভাষাতেই গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি সুইডেনের বিদ্বৎপরিষৎ ইহাকে পুরস্কার-যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি সেই প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ দেশের ভিতর সংক্রামিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ স্থানীয় লোক-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার নোবেল পুরস্কার-লব্ধ সমস্ত টাকা দান করিয়াছেন। সেই অর্থে সম্প্রতি একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই মিউজিয়ামে প্রাচীন প্রোভেন্সাল-রীতির সাহিত্য বিষয়ক নানা পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রচীন পুঁথি, প্রাচীন লেখকগণের চিত্র, প্রাচীন প্রোভেন্স প্রদেশের রীতি-নীতি আচার ব্যবহার, শিল্প ব্যবসায়, প্রবাদ জনশ্রুতি ইত্যাদি এখানে এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজের অবস্থা বুঝিবার পক্ষে মিষ্ট্রাল প্রবর্ত্তিত এই মিউজিয়াম সাহায্য করিবে।

য়্যাভিনিয়োঁ নগর ইউরোপীয় ইতিহাসের ধর্ম্ম অধ্যায়ে বিশেষ

পরিচিত। চতুর্দ্দশশতাব্দীতে এক সঙ্গে দুইটি করিয়া পোপ বা ধর্ম্ম-গুরু খ্রীষ্টানসমাজে প্রবল হইয়াছিলেন। একজন রোমেই থাকিতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পোপ এই ঝ্যাভিলিয়োঁ নগরে ফরাসী রাজগণের আশ্রয়ে থাকিতেন। সেই যুগকে পোপের বন্দিত্বযুগ নামে অভিহিত করা হয়। সেই যুগের প্রাসাদ, গৃহ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। মিষ্ট্রালের প্রোভেন্স্যাল মিউজিয়ামের আদর্শে প্রাচীন ভারতবর্ষেও স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন, পদ, বাউল ইত্যাদির প্রতি আজকাল সাহিত্যসেবকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য দেশের পুরাতন ধর্ম্মভাব, সামাজিক অবস্থা, শিল্পকর্ম্ম, ইত্যাদি বুঝিবার জন্য এই সমুদয় আবশ্যক।

সম্প্রতি একমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেই এইগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাস-কথাই এই সমুদয় লোকসাহিত্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপকরণের হিসাবে এই সকল পদ আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য সম্মিলন, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পদাবলী, বিষহরির গান, গম্ভীরার গান, বাউল সঙ্গীত, ভাটিয়াল গান, সারি গান, গাজন, পল্লী-প্রবাদ, জনগণের সংস্কার মেয়েলি ছড়া ইত্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। সেইগুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিলে উচ্চ অঙ্গের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যও রচিত হইতে পারে। প্রাচীন কাব্যের আলোচিত বিষয় এবং লোকমত ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসগুলিকে বর্ত্তমান যুগের অবস্থানুসারে নূতন আকার দান করা যাইতে পারে। সুদক্ষ কবি, চিত্রকর ও ভাস্করেরা এই সমুদয় বস্তুর সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন আদর্শ সঞ্চারিত করিবার সুযোগ

পাইবেন। এই সকল কারণে আমাদের প্রাচীন লোক-সাহিত্য-বিষয়ক স্বতন্ত্র সংগ্রহালয় এবং স্বতন্ত্র পরিষৎ দেশের নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নব্য ফ্রান্স

কাল রাত্রি ৮॥০ টায় লাইয়োঁ ছাড়ি। আজ সকাল ছয়টায় প্যারি পৌঁছিলাম। এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া গেল। কাজেই কিছু দেখিতে পাইলাম না।

প্যারি ষ্টেসনে পৌঁছিবার সময়ে হাবড়া ষ্টেসনের সংলগ্ন কারখানা, বাড়াঘর, মালগুদাম ইত্যাদির দৃশ্য মনে পড়ে। বহুদূর বিস্তৃত রেলওয়ের কার্য্যালয়—একটা মহানগরীতে প্রবেশ করিতেছি বুঝা যায়। প্যারি নগরের সন্নিহিত পল্লীগৃহগুলিও নগর-রাজ্ঞীর প্রভাব খ্যাপন করে।

কলিকাতায় প্রবেশপথে শিয়ালদহ ও হাবড়ার নিকটবর্ত্তী খানা-ডোবা এখানে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দর উদ্যান, পরিষ্কার কৃষিক্ষেত্র, সুখী জনগণের আবাসগৃহ অথবা ঐশ্বর্য্যের আকর স্বরূপ কল কারখানা। বস্তুতঃ দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, কৃচ্ছ্রতা, ইত্যাদির চিহ্ন চোখে পড়িল না। ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রায় উত্তর সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিলাম। কোথাও কষ্ট দুঃখের জীবন দেখিয়াছি মনে পড়ে না। অবশ্য ফরাসী জাতির বিবেচনায় এই বিস্তীর্ণ জনপদের বহু লোকালয়কেই নিঃস্ব ও দুঃখী জনগণের পল্লী বলিয়া অভিহিত করা হইবে। কিন্তু আমরা যাহাকে মধ্যবিত্তশ্রেণী বিবেচনা করিয়া থাকি এই দেশের দুঃখী লোকেরাও বোধ হয় তাহা অপেক্ষা সুখী। বাড়ীঘর, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র, রাস্তাঘাট, চালচলন ইত্যাদি দূর হইতে দেখিয়া এই ক্ষুদ্র বৃহৎ পল্লী-গুলিকে আমরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আলয় বিবেচনা করিতে বাধ্য।

কৃষিকর্ম্মের জন্য ঘোড়াগুলি সবই হৃষ্ট পুষ্ট। গোচারণের মাঠে গবাদি পশুসমূহও সুস্থ সবল। মেষপালক যে-সকল জীব লইয়া ফিরিতেছে তাহাদিগকে দেখিলেও আনন্দ হয়। আমাদের দেশে অনাহারে শীর্ণ মৃতপ্রায় নির্জ্জীব লোকসমাজের সহচর স্বরূপ গাভী ছাগল মেষাদি সবই দুর্ব্বল রুগ্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা দেশের অবস্থা গভীর ভাবে বুঝিবার সময় পান নাই তাঁহারাও ভারতবর্ষ এবং ফ্রান্সের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পলকের মধ্যে ভ্রমণ করিলে এক জাতির দারিদ্র্য এবং অপর জাতির ঐশ্বর্য্য অতি সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। ধনবিজ্ঞানের গ্রন্থ না পড়িয়াও এবং দেশের স্বাস্থ্য-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টাদি চোখে না দেখিয়াও পর্য্যটকমাত্রেই বুঝিতে পারেন ফ্রান্স কমলার লীলানিকেতন এবং ভারতবর্ষ লক্ষ্মীছাড়া শ্রীহীন দেশ।

মিশরে দেখিয়াছিলাম এক ছটাক জমিও আবাদহীনভাবে পড়িয়া নাই। তখন ভাবিয়াছিলাম পৃথিবীতে এমন দেশ আর কোথাও আছে কি? বিশাল ভারত মহাদেশে চাসের উপযুক্ত অথচ আবাদহীন কত সহস্র বিঘা জমি পড়িয়া রহিয়াছে তাহা ত আমরা জানি। এজন্য মিশর দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ফ্রান্সও দেখিতেছি এই হিসাবে দ্বিতীয় মিশর। অর্দ্ধ সহস্র মাইল ভূমিখণ্ডের মধ্যে এক ছটাক জমিও ফ্রান্সে নিষ্ফল পড়িয়া নাই। লক্ষ্মীশ্রীর দেশমাত্রেই কি এইরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে থাকিব?

প্যারিতে পৌঁছিবার পথে সমস্ত রাত্রি যথেষ্ট শীত ছিল। প্রত্যূষে দেখিতেছি বৃষ্টি পড়িতেছে। কাল দিনে লাইয়োঁ পর্য্যন্ত যেরূপ গরম পাইয়াছি আজ ঠিক সেইরূপ শীতভোগ করিতেছি। উত্তর ফ্রান্স এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের জলবায়ু কিছু স্বতন্ত্র। দুই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য এবং স্বাভাবিক বৃক্ষরাজিতেও কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করিতেছি।

প্যারিতে পৌঁছিলাম, নগরে যাইবার সময় নাই। ষ্টেসনে ঘণ্টা-খানেক বসিয়া থাকা গেল। ঘনঘন গাড়ী আসিতেছে তাহার মধ্যে অসংখ্য লোক। ইহারা নগরের ভিতর কেরাণী, কার্য্যাধ্যক্ষ, কুলী মজুর ইত্যাদির কার্য্য করে। কলিকাতা বোম্বাই ইত্যাদি নগরে এরূপ কেরাণী ও কুলীর গাড়ী অনেকই দেখা যায়। এ হিসাবে প্যারির কর্ম্ম-কেন্দ্রে লোক-যাতায়াত অত্যধিক মনে হইল না। অবশ্য কর্ম্মকেন্দ্র হিসাবে মার্সেলকে কলিকাতা ও বোম্বাই অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নগর বিবেচনা করিয়াছি।

প্যারি-নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিয়াছিলাম। ঘণ্টাখানেকের ভিতর স্বতন্ত্র গাড়ী করিয়া উত্তর প্রান্তে পৌঁছিলাম। হাবড়া হইতে শিয়াল-দহ পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হইলে যেরূপ হইবে সেই চিত্র কল্পনা করা গেল। প্যারির সুবিস্তৃত রাজপথ, অট্টালিকাসমূহ, দোকান, কাফিগৃহ ইত্যাদির কিয়দংশ গাড়ী হইতে দেখিলাম মাত্র। ঘরে বসিয়া প্যারি-নগরীর বিলাস, আদব কায়দা, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের যে সকল কাহিনী পাঠ করিয়াছি গাড়ী হইতে তাহার সামান্য মাত্র পরিচয়ও পাওয়া গেল না। একটা বৃহত্তর মার্সেলের কোন কোন অংশ অতিক্রম করিয়া যাইতেছি বিবেচনা করিলাম।

উত্তর প্রান্তের ষ্টেসন আমাদের পাঁচটা শিয়ালদহ ষ্টেসনের সমান বোধ হইল। একটা প্ল্যাটফর্ম্মে বিলাত-যাত্রীদের জন্য একখানা ডাক-গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। এই গাড়ীতে ইংরাজী-জানা লোক পাইলাম। এতক্ষণপর্য্যন্ত বিগত ২৪ ঘণ্টার ভিতর ফরাসীদেশে ইংরাজীভাষী এক-জন মাত্র লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। তিনি ব্যবসায়োপলক্ষ্যে জার্ম্মাণ, ইতালীয়, স্পেনীয়, ইত্যাদি অনেক ভাষাই জানেন। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত, ভদ্র ও ধনবান্ ফরাসী জনগণের

মধ্যে ইংরাজী জানা লোক অত্যন্ত বিরল। কোন কোন বড় ষ্টেসনে ইংরাজী-ভাষী ফরাসী কর্ম্মচারী একজন করিয়া আছেন মাত্র। প্রায় হোটেলেই ইংরাজী জানা লোক নাই। এত পাশাপাশি দুই জাতি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করে কি করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে ভাষার অনৈক্য কখনই এত বেশী নয়। হিন্দীভাষী বাঙ্গালী, এবং বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ হিন্দুস্থানীর সংখ্যা বেশ সন্তোষজনক। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলিতে সর্ব্বভারতীয় লোকসমাগমের ফলে ভাবের আদান প্রদান অতি সুসাধ্য। ভারতের প্রাচ্যখণ্ড হইতে কোন বাঙ্গালী পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে এমন কি পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্তও বিশেষ কষ্ট পাইবেন না। কিন্তু ইংরাজ ফরাসীর দেশে আসিলে অতল সমুদ্রে পড়িয়া থাকেন। ইউরোপীয় সমাজে ঐক্য অধিক, কি ভারতীয় সমাজে ঐক্য অধিক?

প্যারি ছাড়াইয়া আমরা বোলোঁ-বন্দরের অভিমুখে ছুটিলাম। পথে আমিয়েন্স-নগর এবং ইটেপ্‌ল্ বন্দর পড়িল। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দক্ষিণ অঞ্চল হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক্। অসমতল কৃষিক্ষেত্রই এদিকে বেশী। কিন্তু চাষ-প্রণালী, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কল, কৃষক-জীবন, ইত্যাদি সবই এক প্রকার। আমাদের দেশে রেল পথের পার্শ্বে ধোপারা ক্ষুদ্র জলাশয়ে কাপড় চোপড় কাচিয়া থাকে। ফ্রান্সেও এইরূপ দেখা গেল।

ধনবিজ্ঞানের মামুলি গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে মনে হইবে ইউরোপে শিল্পই প্রধান, কৃষিকর্ম্ম ভারতবর্ষের একচেটিয়া অন্নসংস্থানের পথ। ভারতবর্ষে শিল্পের অভাব, ইউরোপে কৃষির অভাব! পাশ্চাত্য জগতের কথা উঠিলেই আমরা সর্ব্বাগ্রে “industrialism,” শিল্প-কেন্দ্র, বড় বড় কল

কারখানা, লোহা-লক্কড়, মালগুদাম ইত্যাদির উল্লেখ করি। আর ভারত-বর্ষের বৈষয়িক অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে বাঁধা গৎ আওড়াইয়া থাকি "India is an essentially agricultural country," ভারত-বর্ষ "essentially non-industrial" !

স্বচক্ষে ফ্রান্সকে দেখিলে এই মামুলি কথার অসত্যতা সপ্রমাণ হইবে। এদেশে শিল্পের প্রভাব বেশী কি, কৃষির প্রভাব বেশী তাহা বিচার করা বড় কঠিন। কাগজ পত্র, statistics, ব্যবসায়-শিল্প-কৃষির বিবরণী ইত্যাদি লইয়া মাথা না ঘামাইলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা বুঝিতেছি এখানে কৃষির প্রভাব যথেষ্ট। কৃষিকর্ম্ম ফরাসী জাতির অন্নসংস্থানের প্রধান উপায়। এমন কি ফ্রান্স দেশকে যদি কোন ব্যক্তি কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া বর্ণনা করে তাহার মত অবজ্ঞা করা সহজ হইবে না। ভারতবর্ষের অপেক্ষা ফ্রান্সে কৃষি-সম্পদ বেশী একথা বলিলেও ভুল হইবে না। ফ্রান্সের দক্ষিণ-বন্দর হইতে উত্তর-বন্দর পর্য্যন্ত আসিলাম। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভিতর এত পল্লী ও নগর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু industrialism, commercialism, শিল্পজীবনের প্রাবল্য, কল কারখানার কোলাহল ইত্যাদির ত পরিচয় পাইলাম না।

এইখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ক্রোড় ক্রোড় টাকা এবং সহস্র সহস্র কুলীমজুর কেরাণী ও যোজনব্যাপী মালগুদাম না থাকিলেও শিল্প এবং ব্যবসায় চালান যায়। অল্প মূলধনে, অল্লায়তন কারখানায় অল্পসংখ্যক লোকের সাহায্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের ব্যবহার করিয়া নানা শিল্পকর্ম্ম প্রবর্ত্তন করা সম্ভব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বাহ্য চটক বেশী থাকে না। এজন্য দূর হইতে, বাহির হইতে এগুলি দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না। এই সমুদয় শিল্পে কত লাভ হয়

অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহার আন্দাজ করিতে পারিবে না। কারণ বড় বড় চিমণী, বিশাল কার্য্যালয় ইত্যাদি না দেখিলে সাধারণ লোকেরা কোন কারবারের বিস্তার বুঝিতে অসমর্থ হয়।

ফ্রান্সের ভিতর শিল্পকর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অল্প—এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। রেলপথের পার্শ্বে যত নগর বা পল্লী অতিক্রম করিয়াছি তাহার অনেকগুলিতেই বড় বড় ধূমনির্গমের কল এবং লৌহ-কারখানার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের শিল্প-জীবনের বহির্দৃশ্য ফ্রান্সের কোন স্থানেই দেখিতে পাই নাই। অবশ্য সর্ব্বত্রই লোকালয়ের ধূম নির্গমের কল দেখা গিয়াছে। কিন্তু বড় বড় ফ্যাক্টরীর পরিচয় প্রায় কোন স্থানেই নাই। মার্সেল ও প্যারি ব্যতীত অন্য কোন নগরে এসব বেশী চোখে পড়ে নাই।

কিন্তু শিল্পকর্ম্ম ফরাসী দেশে যথেষ্টই আছে। প্রত্যেক পল্লী বা নগরে কোন না কোন কারবার চলিয়া থাকে। চামড়া, কাগজ, লোহা, তামা, কাচ, বস্ত্র, রেশম, মাছ, আচার, মদ, বিস্কুট, সাবান, মোরব্বা, সুগন্ধিদ্রব্য, চূণ, প্রস্তর, কম্বল, কার্পেট, ফুলফল, ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ, ধাতুজ এবং জন্তুজ পদার্থ হইতে অসংখ্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কেন্দ্রে হয় ত এই সমুদয় শিল্পকর্ম্মের সংখ্যা বেশী, কোন কেন্দ্রে কম। যে জনপদে যে সকল উপাদান প্রচুর পাওয়া যায় সেই জনপদে তদনুযায়ী শিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অবশ্য এই সকল কারবারের মধ্যে প্রত্যেকটিতেই বিশাল কল কারখানা আবশ্যক হয় না। বহুক্ষেত্রে সামান্য সামান্য অনুষ্ঠানেই যথেষ্ট লাভবান্ হওয়া যায়। এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ মধ্যমাকৃতি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ফরাসী দেশের দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই রহিয়াছে। ফরাসী দেশে যতগুলি রেল-ওয়ে ষ্টেসন ততগুলি শিল্প-কেন্দ্র। শিল্প ও কৃষি এদেশে সমভাবে বিস্ত-

মান। কৃষিজাত দ্রব্যগুলি শিল্প-কেন্দ্রে নীত হইতেছে। সেখানে নূতন নূতন পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। আবার শিল্প কারখানার প্রয়োজন অনুসারে পার্শ্ববর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদ্ তৈয়ারী হইতেছে। কৃষির বন্ধু শিল্প, এবং শিল্পের বন্ধু কৃষি।

কৃষি ও শিল্পের এরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা ভারতবর্ষে ত নাইই—মিশরেও নাই। মিশরের সম্পদ্ কৃষিজাত। ভারতবর্ষের ন্যায় মিশরও বিদেশীয়গণের শিল্পসামগ্রীর বাজার মাত্র। শিল্পচর্চ্চা ভারতবর্ষেও কম, মিশরেও কম। এমন কি, বিদেশীর হস্তে কয়েকটা চিনির কল ছাড়া মিশরে কোনপ্রকার শিল্প-কেন্দ্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতবর্ষ ও মিশর চিরকাল এরূপ ছিল না। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই দুই দেশেই কৃষির বন্ধু শিল্প এবং শিল্পের বন্ধু কৃষি দেখা যাইত। তখন এই দুই দেশ কৃষিপ্রধান কি শিল্পপ্রধান তাহা বিদেশীয় পর্য্যটকগণের বুঝিতে কষ্ট হইত।

যাহা হউক বর্ত্তমান ফ্রান্সে কৃষিপ্রাধান্য ও শিল্পপ্রাধান্য এক সঙ্গে বিরাজমান দেখিলাম। ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত জনগণের দেশে বৈষয়িক অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। পল্লীর চাষীরা যে সকল জিনিষ জোগাইতেছে তাহার প্রতিবেশী শিল্পীরা সেই সকল দ্রব্য হইতে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। অল্প ব্যয়ে, অল্প শ্রমে, এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আর কোন সদুপায় আছে কি ?

ফ্রান্সের বৈষয়িক অবস্থা বুঝিতে হইলে আর একটা কথা জানা আবশ্যক। এদেশে রেলপথ আমাদের দেশের নগর বা পল্লীর রাস্তা ঘাটের ন্যায় অসংখ্য। যাতায়াতের সুবিধা, আমদানী রপ্তানীর সুযোগ ইহা অপেক্ষা আর কি থাকিতে পারে ? এই উপায়ে এখানকার প্রত্যেক পল্লী কেবল শিল্প-কেন্দ্র ও কৃষি-কেন্দ্র মাত্র নয়। সকল স্থানই ব্যবসায় এবং

বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। অন্নসংস্থানের উপায় সমস্ত দেশ ভরিয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সর্ব্বত্রই বিরাজমান। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বলিতে পারি? কোন একটা জেলার চিত্র কিরূপ?

প্রকৃতি ফ্রান্স-ভূমিকে নিজগুণে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিয়াছেন। ফরাসীজাতি স্বীয় পরিশ্রমে স্বদেশের সুযোগ-সুবিধাসমূহ ব্যবহার করিয়া জনগণের অভাব মোচন করিতেছে। এইরূপে মানব ও প্রকৃতির সমবায়ে দেশময় ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কোন পর্য্যটক ফ্রান্সের বাহ্যদৃশ্য এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এই মতই প্রচার করিবেন।

বোর্দোবন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক পল্লী এবং নগর অতিক্রম করিয়াছি। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক কৃষি শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদির অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, ফ্রান্সের প্রত্যেক নগরেই একজাতীয় জিনিষ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এদেশের প্রত্যেক জনপদই ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীন জীবনের অনেক নিদর্শন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য রোমীয় যুগের চিহ্নগুলিই এখানকার সর্ব্বপ্রাচীন বস্তু। তারপর মধ্যযুগের আরম্ভ। রোমীয় সাম্রাজ্য চতুর্থ শতাব্দীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই সময় হইতে নেপোলিয়নের যুগ পর্য্যন্ত ১৪০০ বৎসর কাল ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ অসংখ্য প্রকার চলিয়াছে। সেই বিচিত্র রাষ্ট্রীয় জটিলতার চিহ্ন নগরে নগরে বিদ্যমান। তারপর আধুনিক বিজ্ঞান কলকারখানার যুগ এক শতাব্দীকাল ধরিয়া চলিতেছে।

সুতরাং রোমীয় অট্টালিকা ও ধর্ম্মমন্দির এবং নাট্যশালা, খ্রীষ্টান দেবালয়, ধর্ম্মমন্দির ও শবস্থান, রাজপ্রাসাদ, ওমরাও প্রাসাদ, দুর্গ, সৈন্যাবাস, নগর-প্রাচীর ইত্যাদি নানা প্রকার ইষ্টক প্রস্তরাদি নির্ম্মিত

গৃহ ভগ্ন বা অভগ্ন অবস্থায় প্রায় সকল স্থানেই ন্যূনাধিক পরিমাণে রহিয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণের রীতি নানা যুগে নানা প্রকারের ছিল। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন নির্ম্মাণ-রীতিও চোখে পড়িবে। মুসলমানেরা দক্ষিণ ফ্রান্সের খানিকটা দখল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবও স্থানে স্থানে লক্ষ্য করা যায়।

এই সকল গৃহাদি অবশ্য যথাস্থানেই রহিয়াছে। সেইগুলি দেখিতে হইলে নগর বা পল্লীর ভিতর ভ্রমণ আবশ্যক হইবে। এতদ্ব্যতীত আজ্‌কালকার ফরাসীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বস্তুসমূহ প্রায় প্রত্যেক নগরেই সংগৃহীত করিতেছেন। এজন্য প্রত্যেক নাতিক্ষুদ্র জনপদেই এক বা ততোধিক মিউজিয়াম নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহ বেশী দূরে চালান করা হয় না।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশে একটিমাত্র মিউজিয়াম আছে। প্রদেশবাসী জনসাধারণ এই সকল মিউজিয়াম দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রায়ই পায় না। বড় সহরের বিশাল ভবনে প্রবেশ করিয়া কয়জন পল্লীবাসী কৌতূহল নিবারণ করিতে সাহস পায়? কিন্তু প্রত্যেক জেলায় ছোটখাট সংগ্রহালয় থাকিলে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কেরাণী, হাকিম সকলের চোখের সম্মুখে দর্শনীয় বস্তুগুলি বিরাজ করে। সংগ্রহালয়ের আবহাওয়া জেলার মধ্যে জ্ঞানলাভের একটা নূতন উপায় স্বরূপ হয়। কথায় কথায়, বিশেষ কষ্ট কল্পনা না করিয়াও জনসাধারণ এই সকল মিউজিয়ামের অন্তর্গত দ্রব্যসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে। দেশবাসীকে স্বদেশের মূর্ত্তি বুঝাইবার পক্ষে ইহা ব্যতীত আর কোন সহজ পথ অবলম্বন করা অসম্ভব।

তারপর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের জন্য এই সকল বস্তু দর্শন করিতে চাহেন তাঁহারা জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রদেশের বড় সংগ্রহালয়ে

আসিলেই তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ সুযোগ পাইতে পারেন। সুতরাং অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নব নারীর হৃদয়ে স্বদেশের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য ভারতবর্ষের ভিতর ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সংগ্রহালয়ের প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যতস্থানে যত বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয় সমস্ত জাতির ভিতর জ্ঞানবিস্তার করিবার সুবিধা তত বেশী সৃষ্ট হয়। দেশের মধ্যে কোন এক স্থানে একটা বিশাল কেন্দ্র স্থাপন করিলে মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত উপকার লাভ করে না।

বিশেষতঃ বিশাল সংগ্রহ কেন্দ্রে নানা জেলার, নানা প্রদেশের, নানা জাতির তথ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলি দেখিয়া জনগণ বিশেষ উপকৃত হয় না। সে সমুদয় পদার্থ তাহার নিকট নিতান্তই অপরিচিত। কিন্তু যে জেলায় বা যে জনপদে লোকেরা বাস করে সেই স্থানের স্মরণ যোগ্য পদার্থ নিকটবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে জমা থাকিলে লোকেরা সহজেই সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিচিত সামগ্রীগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে ক্রমশঃ অপরিচিত ও দূরদেশীয় বস্তুসমূহ জানিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ জন্মে।

ফরাসী জাতি এই নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। এই জন্য তাঁহারা নগরে নগরে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ফলতঃ মিউ-জিয়াম বা সংগ্রহালয় ফরাসী জনগণের নিকট আজবখানা বা যাদুঘর নয়। তাহারা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় জীবনের উৎসস্বরূপ বিবেচনা করে।

ফ্রান্সের প্রত্যেক জনপদেই আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। প্রায় সর্ব্বত্র একটা করিয়া চিত্রশালা ও স্থাপত্য-ভবন দেখা যায়। ফরাসী জাতির মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে এবং বর্ত্তমানকালে যে সকল চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কারুকার্য্য-

গুলি এই সকল ভবনে সংগৃহীত রহিয়াছে। অবশ্য বিদেশীয় শিল্পীদিগের কার্য্যও যথাসম্ভব রক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানে মিউজিয়ামের সঙ্গেই সুকুমার শিল্প-ভবন। কোথাও বা শিল্প-ভবনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, ফরাসী দেশের মধ্যে সুকুমার শিল্প-ভবন নগরমাত্রের একটা প্রতিষ্ঠান। ফরাসী দেশে প্রাচীন ও আধুনিক কালে কি কম শিল্পী জন্মিয়াছেন?

এই সকল সুকুমার শিল্পভবনে একটা নূতন ধরণের চিত্র ও মূর্ত্তি দেখা যায়। মার্সেল-নগরে দেখিয়াছি দেশ, নদী, পর্ব্বত, ইত্যাদির প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেক নগরের চিত্রকর বা ভাস্করই নিজ নিজ জনপদকে এই উপায়ে মূর্ত্তিমান্ করিয়া রাখিয়াছেন। ফরাসী জাতি সত্যই মূর্ত্তিপূজক। স্বদেশ-সেবা-পরায়ণ জাতি মাত্রেই কল্পনা দ্বারা দেশের জলমণ্ডল, স্থলমণ্ডল, নভোমণ্ডলকে মূর্ত্তিদান করিয়া জনগণের আত্মীয় বন্ধু দেবতা ইত্যাদির ন্যায় সুপরিচিত শ্রদ্ধাযোগ্য ও ভক্তিপাত্র করিয়া তোলেন। হিন্দু জাতিও প্রকৃতি পূজা, তীর্থযাত্রা, সমুদ্র-স্নান, পীঠস্থান, তরুলতার পূজা, দেবগণের পশুবাহন, গঙ্গাগোদাবরীর আরাধনা, কাশী কামাখ্যা মাহাত্ম্য ইত্যাদির প্রচার করিয়া স্বদেশ-মাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই কি ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত করেন নাই? ভারতবাসীর ধর্ম্ম-তত্ত্ব কি দেশ-ভক্তিরই সহায়ক ও পরিবর্দ্ধক নয়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

লণ্ডন—বর্ত্তমান জগতের ভার-কেন্দ্র

লণ্ডনে পল্লীজীবন

এক নিঃশ্বাসে ফরাসী দেশ শেষ করিলাম। ভূমধ্য-সাগর হইতে ইংরাজ-সাগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ফ্রান্সের বোলোঁ বন্দরের ঠিক অপর পারে ইংলণ্ডের ফোকষ্টোন বন্দর। এই বোলোঁ বন্দরেই নেপোলিয়ান ইংরাজজাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু ১৮০৫ সালে স্পেনের নিকটবর্ত্তী ট্র্যাফ্যাল্‌গারের জলযুদ্ধে তাঁহার সমস্ত রণতরী ইংরাজসেনাপতি নেল্‌সন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ানের জীবনের সাধ ভূমিসাৎ হয়। ইংলণ্ডের এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া নেল্‌সন ইংরাজজাতির সর্ব্বাগ্রগণ্য বীরপুরুষরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। নেপোলিয়ানের দর্পহারীকে ইংরাজেরা সত্যসত্যই মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজের জাতীয়-জীবনে এত বড় আশঙ্কার কারণ আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। এই আশঙ্কা দূরীভূত হইবার পর আনন্দ, গৌরববোধ এবং নিরাপদ জীবনযাপনের আশাও এত প্রবলভাবে আর কখনও জাগে নাই। কাজেই ইংরাজজাতি নেল্‌সনের জন্য সর্ব্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

উনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে নেল্‌সন ইংলণ্ডের জাতীয়-জীবনে নবীন আশা, উদ্যম এবং সাহসের সঞ্চার করিয়া যুগান্তরের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর হইতে ইংরাজ নিষ্কণ্টকভাবে জগতে বিচরণ করিতেছেন। ইংরাজের বিশ্ব-সাম্রাজ্য উনবিংশশতাব্দীর এই ঘটনার পরেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে থাকে। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পতনের পর ইংরাজ স্থির উন্নতির পথে উঠিয়াছেন। যুগ প্রবর্ত্তক নেল্‌সন আধুনিক ইংরাজদিগের পরমারাধ্য দেবতাস্থানীয়।

নেপোলিয়নের এই ইংলণ্ড-আক্রমণ-সম্পর্কিত আয়োজনের সংশ্রব থাকায় বোলোঁ-বন্দর আধুনিক জগতের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীবীরের সেই প্রয়াসের পরিচয় স্বরূপ কোন কোন অট্টালিকা এবং পোতাশ্রয়ের কিয়দংশ বন্দরের ভিতর এখনও দেখা যায়। বোলোঁ-নগরে এই বিফলতা ও নৈরাশ্যের চিহ্নসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। অপর পারে ইংরাজজাতির গৌরব ও সাহসিকতার কীর্ত্তিস্তম্ভ লণ্ডননগরের "ট্র্যাফ্যাল্‌গার স্কোয়ারে" সদর্পে দণ্ডায়মান। অত্যুচ্চ মনুমেণ্টের উপর নেল্‌সনের প্রতিমূর্ত্তি ফরাসী-জাতিকে বিদ্রূপ করিতেছে। সফলতা ও বিফলতার স্মৃতিচিহ্ন এত পাশাপাশি আর কোথাও আছে কি না জানি না।

বোলোঁ হইতে ফোক্‌ষ্টোন আসিতে ১॥০ ঘণ্টা মাত্র লাগে। ছোট জাহাজে ফেরী পার করা হয়। দার্জ্জিলিঙ্গ পথে দামুকদিয়ার সারাঘাটে যত বড় ষ্টীমার এপার ওপার করে এই জাহাজও প্রায় তদ্রূপ। সাগর সঙ্কীর্ণ বটে, কিন্তু এক পার হইতে অপর পার দেখা যায় না।

এই ক্ষুদ্র সাগরেও ভয়ানক পিচ্-নড়ন সহ্য করিতে হয়। লাইয়োঁ উপসাগরে জাহাজে যত কষ্ট পাইয়াছি এই ক্ষুদ্র নদীতুল্য সাগর পার হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী কষ্ট পাইলাম। সমুদ্রের রং এখানে নীল নয় —শ্বেতাভাযুক্ত সবুজ। তুমুলভাবে তরঙ্গমালা সর্ব্বদা জাহাজকে

অস্থির করিতেছে। কোন উপায়ে ডেক্ চেয়ারে শুইয়া থাকিয়া দেড় ঘণ্টা কাটাইয়া দিলাম।

প্রায় ১॥০ টা ২টার সময় ফোক্‌ষ্টোনে জাহাজ থামিল। বন্দরের গৃহগুলি দেখিতে ফরাসী-নগর ও পল্লীসমূহের গৃহাবলীর মত। তবে ফ্রান্সে লাল টালীর ছাদ দেখিয়াছি। এখানে ছাদগুলি শ্লেটে প্রস্তুত। শ্লেটের রং কাল অথবা লাল। কিন্তু ছাদের গঠন একপ্রকার—ফরাসী-নগর এবং ইংরাজ-নগরে তফাৎ করা কঠিন।

ফরাসী কুলী মজুর অপেক্ষা ইংরাজ কুলী মজুরেরা কিছু বেশী লম্বা চৌড়া বোধ হইল। অবশ্য কুলীদের গায়ের জোর বুঝা কঠিন। প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদের শারীরিক ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সুয়েজখালে এবং মিশরের নানা স্থানে কুলীদিগকে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট দেখা গিয়াছে। ইংরাজ কুলীরা প্রায় তদ্রূপই হইবে।

বিলাতেও কাষ্টম হাউস। 'অবাধ-বাণিজ্য-নীতি'র প্রবর্ত্তক জাতিও, দেখিতেছি, বিদেশী তামাক চুরুটের আমদানীর উপর শুল্ক বসাইয়াছেন! পুরাপুরি অবাধ-বাণিজ্য কোনদেশেই চলে না। সকলেই স্বদেশী-শিল্পের "সংরক্ষক।"

ফোক্‌ষ্টোন নগরের পশ্চাতে একটি অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। সমুদ্র হইতে এই পর্ব্বতমালাকে নগরের দুর্গ বা প্রাচীর মনে হইতেছিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ফোক্‌ষ্টোন নগরের কিয়দংশ দেখিতে পাইলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীঘর, মেজে-বাঁধান, পালিশ করা রাজপথ ইত্যাদি ফরাসীদেশেরই দৃশ্য মনে করাইয়া দিতেছে। ফ্রান্স ছাড়িয়া অন্য কোন দেশে আসিয়াছি বোধ হইল না।

তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ফ্রান্সের সুন্দর সুন্দর কৃষিক্ষেত্র, সবুজবর্ণ উদ্যানমালা, স্তরবিন্যস্ত

আবাদভূমি ইত্যাদি আর দেখিতে পাইতেছি না। একমাত্র তাহাতেই বিবেচনা করা যায় যে নূতন কোন দেশের ভিতর দিয়া যাইতেছি।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চলে আমরা রহিয়াছি। পশ্চিম দিকে যাইতেছি। আমাদের উত্তরে কথঞ্চিৎ দূরে অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে। তাহার পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে ফরাসী ও ইংরাজদিগের গৃহসমূহ দেখিতে পাইতেছি।

আজ সকালে প্যারিতে পৌঁছিবার সময় হইতেই বৃষ্টি পাইতেছি। আকাশ সর্ব্বদা মেঘযুক্ত। কনকনে বাতাস। বোলোঁ যাত্রা, ইংরাজ-সাগরে এবং ফোক্‌ষ্টোনে গাড়ীতে উঠিয়া অবধি সর্ব্বদাই শীত ভোগ করিতেছি। জলও গুঁড়ি গুঁড়ি পড়িতেছে। এ সকল দেশে ওভার-কোট এবং ওয়াটারপ্রুফ দুইই সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। ফোক্‌ষ্টোন হইতে যত ইংরাজ দেখিতেছি সকলের সঙ্গেই হয় গায়ে না হয় হাতে এই দুইটি কোট রহিয়াছে। এপ্রিল মে মাসেই এই অবস্থা।

ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর চেয়ারিং ক্রশে পৌঁছিলাম। বন্ধু ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন—মাথায় ভারতীয় স্বদেশী পাগ্‌ড়ি। সঙ্গে মালপত্র অনেক ছিল। ষ্টেসনের পুলিশ নিজে চেষ্টা করিয়া মটর গাড়ীতে এগুলি তুলিয়া দিল। মটর চালাইয়া ট্র্যাফ্যাল্‌গার স্কোয়ার, হাইড্‌পার্ক ইত্যাদি লণ্ডনের বিখ্যাত স্থান দেখিতে দেখিতে আস্তানায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

লণ্ডনের উত্তর পশ্চিম সীমায় রহিয়াছি। একজন ট্রাম কর্ম্মচারীর গৃহে অতিথি। অবশ্য খরচপত্র সবই দিতে হইবে। কর্ম্মচারীর পত্নী আমাদের অভিভাবক। রন্ধনাদি সকল কর্ম্মই তিনি করিয়া দেন। আমরা এই পত্নীকেই চিনি—পত্নীই গৃহের কর্ত্রী।

এ পাড়ায় থাকিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ শিমলার লাল-খোলার ছাদযুক্ত চিমনীওয়ালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাসের কথা মনে পড়িল। অতি নিস্তব্ধ

অঞ্চল—লণ্ডনে আছি কিনা সন্দেহ হয়। আমাদের গৃহের সম্মুখে অতি প্রশস্ত ও পরিষ্কার রাস্তা। এই ধরণের গৃহ রাস্তার দুই ধারে অনেক-গুলি দেখিতে পাইলাম। লোকালয়ের অন্তরালে পল্লীজীবন যাপন করিতেছি। লণ্ডন-নগরের মধ্যে এরূপ নীরব মুক্ত-বায়ু-বিশিষ্ট অঞ্চল আছে পূর্ব্বে ভাবি নাই। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ভালই দেখিতেছি।

মহানগরীর বৈচিত্র্য

এই বাড়ী অত্যন্ত ছোট। সহর হইতে বহু দূরে। খরচ পত্র অবশ্য কম এবং অঞ্চলও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য গৃহকর্ত্রী বলিলেন এখানে আমাদিগকে তিনি রাখিতে অসমর্থ।

অল্প আয়ের পরিবারেরা এদেশে অতিথি রাখিয়া থাকে। গৃহস্বামী বাহিরে কাজ করিয়া পয়সা আনেন। তাহার পত্নী অতিথিদিগকে স্থান ও আহার্য্য দিয়া উপার্জ্জন করেন। এই জন্য গৃহের কিয়দংশ সর্ব্বদা খালি রাখা হয়। অতিথিগণের নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহাতে ঘর ভাড়া, খাওয়া খরচ ইত্যাদি সব উঠে। অধিকন্তু কিছু বাঁচে। ফলতঃ বড় বাড়ীতে বাস করা এবং কিছু উপার্জ্জন করা—দুইটা সুবিধা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারেরা এই উপায়ে পাইয়া থাকে। ঘর পরিষ্কার করা, জুতা ঝাড়া, বাসন ধোয়া ইত্যাদি অতিথিগণের সকল প্রকার কাজই গৃহ-কর্ত্রী করিয়া থাকেন। ইহাতে এদেশে অপমান নাই।

গৃহকর্ত্রীকে এজন্য সর্ব্বদা বেশ খাটিতে হয়। তিনি সকালে চা দিবার পূর্ব্বে ঘরের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। তার পর যথাসময়ে আহার্য্য প্রস্তুত করা এবং পরিবেষণ করাও ইঁহার কর্ত্তব্য। অথচ অতিথিগণের নিকট জনপ্রতি সর্ব্বসমেত ৯০।১০০ টাকা মাত্র মাসিক লইয়া থাকেন। আমাদের হিসাবে এ খরচ অত্যধিক সন্দেহ নাই। কিন্তু বিলাতের ধারণায় ইহা অপেক্ষা কম খরচে কোন লোকের মাস চলিতে পারে না। হোটেল মাত্রেই ইহা অপেক্ষা বেশী খরচ।

আজ লণ্ডনের পশ্চিম অঞ্চলের অনেকগুলি রাস্তা দেখা গেল। মার্সেলে দেখিয়াছি সমস্ত নগরটাই এক ছাঁচে ঢালা। রাজপথের উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাসমূহ এক রীতিতে নির্ম্মিত। লণ্ডনে সেরূপ দেখিতেছি না। ছাদগুলি অবশ্য সবই একরূপ। কিন্তু গৃহের সম্মুখ ভাগ এক এক রাস্তায় এক এক প্রকার। এমন কি কোন কোন রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই প্রকার গৃহনির্ম্মাণ রীতির নিদর্শন।

কোন রাজপথের বাম পার্শ্বের সকল হর্ম্ম্যই এক রীতিতে নির্ম্মিত-দক্ষিণ পার্শ্বের সকল হর্ম্ম্যই অপর কোন কায়দায় গঠিত। স্তম্ভ, অলঙ্কার, কার্ণিশ, খিলান ইত্যাদির রচনা এবং সমাবেশ দুই পার্শ্বে দুই ধরণের। অবশ্য যে পার্শ্বের কোন গৃহে এক রীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহার সকল গৃহেই সেই রীতি দেখিতে পাই। কিন্তু অপর পার্শ্বের গৃহগুলিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের স্তম্ভ, তোরণদ্বার ইত্যাদি নির্ম্মিত।

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায়, রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতি অবলম্বিত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের বৈচিত্র্য লণ্ডন-নগরে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু অঞ্চল হিসাবে, পাড়া হিসাবে, রাস্তা হিসাবে এবং পার্শ্ব হিসাবে ঐক্য ও সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলা-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছি। ফলতঃ, নগরের সৌন্দর্য্য যারপরনাই বাড়িয়াছে।

এত বড় নগরের সকল অংশে নিতান্ত একঘেয়ে ঘরবাড়ী থাকিলে কদাকার দেখাইত। নগরটা চক্ষুর পীড়াদায়ক হইয়া পড়িত। কিন্তু লণ্ডনকে বহুসংখ্যক নগরে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নগরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গৃহ-রচনারীতির অবলম্বন নগরের শোভাসম্পদ পুষ্ট করিয়াছে।

আজ কাল যে লণ্ডন দেখিতেছি তাহা ২৫০ বৎসরের নগর। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে পুরাতন নগর ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। পুরাতনের দু-একটা মাত্র গৃহ বর্ত্তমান আছে।

এই গেল নগরের ইট কাট চূণ শুরকির কথা। তারপর লোক জন। লণ্ডনের এক অংশ দেখিলে অন্য অংশের অবস্থা বুঝা যায় না। কোন অঞ্চলে দোকানবাজার বেশী, কোন অঞ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাঙ্কের প্রাধান্য। কোথাও বা বিদ্যাচর্চার আব্হাওয়া, অপর কোন স্থানে হয়ত শিল্প-কেন্দ্র ও কল কারখানার কোলাহল। বোম্বাই কলিকাতা ইত্যাদি বড় বড় সহরমাত্র সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

আমরা নিভৃত পল্লীনিকেতনে বাস করিতেছি। পাড়ার নাম—গোল্ডার্সগ্রীণ। ইহার ঠিক বিপরীত স্থানও দেখিলাম। রয়েল এক্সচেঞ্জের সমীপবর্ত্তী অঞ্চল লণ্ডনের টাকার বাজার। বড় বড় ব্যাঙ্ক এইখানে অবস্থিত। আমার বন্ধুরা এই অঞ্চলের এক দোকানে পুস্তকাদি কিনিতে প্রবেশ করিলেন। আমি লণ্ডনের জনতা বুঝিবার অভিপ্রায়ে রাস্তার এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গোল্ডার্সগ্রীণে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি—পনর মিনিটের ভিতরেও একটা লোকের সাক্ষাৎ পাই নাই। এখানে দেখিতেছি—রাস্তার ধারে এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার জো নাই। পিপীলিকার সারির মত সহস্র সহস্র লোক যাওয়া আসা করিতেছে। কেহই ধীরভাবে চলিতেছে না—ইহাদের যাতায়াতকে হাঁটা বলা যায় না। সকলেই যেন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে। কাহারই এদিক ওদিক তাকাইবার এক মুহূর্ত্তও সময় নাই। এই অবিশ্রান্ত জনতাপ্রবাহ দেখিতে হইলে একটুকু স্থানের আবশ্যক। অতটুকু স্থানও রাস্তার ফুটপাথে পাওয়া অসম্ভব। লোকের ভিড় ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকি সাধ্য কি? কোন উপায়ে দোকানের দরজার ভিতর হইতে অগণিত লোকের শোভাযাত্রা দেখিতে থাকিলাম।

লণ্ডনজীবনের এই কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া আধুনিক জগতের গতিবিধি

বেশ বুঝিয়া লইলাম। প্রবল বেগে বাষ্প চালিত শকটের ন্যায় পৃথিবীর জাতিপুঞ্জ চলাফেরা করিতেছে। সকলেই ছুটিতেছে—কেহ কাহারও দিকে তাকায় না। প্রত্যেকেই নিজ কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য অন্ধ-ভাবে দৌড়াইতেছে। ধীরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিবার সুযোগ এ সংসারে পাওয়া যায় না। হয় অন্যান্য সকলের সঙ্গে চলিতে হইবে, হাঁটিতে হইবে, দৌড়াইতে হইবে। নতুবা জনতার চাপে, ধাবমান জাতিপুঞ্জের প্রভাবে পদস্খলিত হইয়া অতলসাগরে ডুবিতে হইবে। গতিশীল জগতে গতি-হীনের স্থান নাই। নিশ্চল নিরপেক্ষভাবে জগৎকে দেখিতে চেষ্টা করা মৃত্যুর শরণাপন্ন হওয়ার সমান। তাহার ফলে জগতের কোন নিভৃত কোণে নিরাপদ জীবন যাপন সম্ভবপর হইবে না। বরং বিচরণশীল কর্ম্মপ্রবণ জাতিসমূহ কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া জগৎ হইতে দূরীভূত হইতে হইবে।

কর্ম্মময় লণ্ডনের সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে এই মহানগরীর যাতা-য়াতের উপায়গুলি দেখা কর্ত্তব্য। এই একটা সহরের মধ্যে ৬০০ রেল-ওয়ে ষ্টেশন আছে! রাস্তা ঘাটেরত সীমা নাই। তাহারপর ট্রামওয়ে এবং ইলেকট্রিক অম্নিবাস গাড়ীর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকে। আজকাল ঘোড়ারগাড়ী দেখিতে পাইতেছি না। মোটরকারের সংখ্যা যে কত তাহা দর্শকগণের পক্ষে আন্দাজ করা অসম্ভব।

কেবল তাহাই নহে। ভূমির উপরে লণ্ডন-নগরী তাঁহার সন্তান সন্ততির চলাফেরার পথ কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া ভূমির নিম্নভাগে এক বিচিত্র পথ-প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছেন। লণ্ডনের মাটীর নীচে একটা দ্বিতীয় লণ্ডন নগরের লোকজন চলাফেরা করিতেছে। সকলকে যদি ভূমির উপরকার পথ দিয়াই চলিতে হইত তাহা হইলে ধাক্কাধাক্কি

করিয়াই পথিকেরা মারা পড়িত। কারণ ভূগর্ভে যতগুলি পথ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ে এবং ইলেক্‌ট্রিক ট্রামওয়ে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল গাড়ীতে অসংখ্য লোক প্রতি মুহূর্ত্ত যাওয়া আসা করিতেছে। লণ্ডনের শুধু ভূগর্ভ দিয়া যতলোক চলাফেরা করে পৃথিবীর অনেক বড় বড় সহরেও বোধ হয় অত লোকের গতিবিধি দেখা যায় না।

আজ লণ্ডনে মহা ধূমধাম চলিতেছে। ডেন্‌মার্কের রাজা সপত্নীক বিলাতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে ডেন্‌মার্কের হৃদ্যতা বাড়িয়া চলিল। উভয় পক্ষের রাজ-বক্তৃতাতেই এই সুর বাজিতেছে। সংবাদপত্রগুলিও এক স্বরে এই কথা বলিতেছে।

কিছুদিন হইল পঞ্চম জর্জ্জ ফ্রান্স বেড়াইয়া আসিয়াছেন। প্যারির জনগণ বিলাতের রাজাকে যৎপরোনাস্তি আদর করিয়াছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব বিগত দশবৎসর হইতে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ঘটনায় বন্ধুত্বের জের আরও চলিবে।

১৮১৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরাজজাতির সন্ধি স্থাপন হয়। আর এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই ঘটনা জগতে বিশেষরূপে প্রচার করিবার জন্য লণ্ডনে মহাসমারোহের সহিত একটী প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। তাহাতে আমেরিকাবাসী এবং ইংলণ্ডবাসী জনগণ কৃষি, শিল্প, চিত্র, ব্যবসায়, শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শনগুলি প্রদর্শন করিবেন। দুই জাতির মধ্যে সখ্যভাব স্থায়ী করিবার পক্ষে ইহা একটা প্রধান উপায়—এই রূপই বিলাতের লোকেরা ভাবিতেছেন।

দেখিতেছি একমাসের ভিতর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রমণ্ডলে বিশেষ কতকগুলি স্মরণযোগ্য ঘটনা ঘটিল। জগতে নূতন কোন পরিবর্ত্তন না হইতে

দেওয়াই ইংরাজজাতি পছন্দ করিতেছেন। ইঁহারা সর্ব্বত্র শান্তি চাহেন —নূতন কোন প্রকার শক্তির উদ্ভব ইঁহারা জগতের পক্ষে কল্যাণকর বিবেচনা করিতেছেন না। বিলাতের সংবাদপত্রগুলি সবই স্থিতি ও শান্তির প্রচারক দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার পর স্যাভয় থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গেলাম। সেক্সপীয়রের Mid Summer Night's Dream নাটকের অভিনয় হইল। নাট্য হিসাবে আমি ইহাকে কোন দিনই পছন্দ করিতাম না। জীবনের গভীর কথা ইহার আলোচ্য বিষয় নয়। মোটের উপর একটা হাল্‌কা পাতলা অগভীর জীবন যাপনের চিত্র এই নাট্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদনামূলক বিষাদাত্মক নাট্যে হৃদয়ের যে সকল বৃত্তি জাগরিত হয় এ নাট্যে তাহার আভাষ মাত্র নাই। মাঝে মাঝে গাল ভরিয়া হাসিবার সুযোগ পাওয়া যায় মাত্র। অবশ্য এই জন্যই এই অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এরূপ হাসি ঠাট্টা, আমোদ প্রমোদেরও প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা এই নাট্যের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে লম্বা লম্বা উপদেশ বা স্বগত কথা ইত্যাদি বিশেষ শোভা পায় না। বিশেষতঃ এই নাটকের গল্পও এমন কিছু ঘটনাবহুল নয় যে মাঝে মাঝে সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া মনোযোগ বাড়াইতে হইবে। সকল দিক্ হইতেই এই নাটক নাট্য হিসাবে অতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত।

যাহা হউক, সেক্সপীয়ারের নাটক আজকাল প্রায়ই অভিনীত হয় না। এজন্য দেখিতে গেলাম। নৃত্য গীতাদিই এই অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ। তাহাই উপভোগ করা গেল। আর হাসির রোলেও যোগদান করা গেল। বুঝিলাম—সেক্সপীয়ার যে যুগের জনগণের জন্য লিখিয়াছিলেন সেই যুগে ইহা যথেষ্ট আদরই পাইত।

বিলাতী নৃত্যের ভঙ্গী ভারতবর্ষে অনুসৃত হওয়া উচিত কি না তাহা বলিতে পারি না। নৃত্যকলা কখনও বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু ইহা বেশ বুঝিলাম যে, বিদেশীয় নৃত্যেও ভারতবাসী সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অনেক লক্ষণ পাইবেন। বিশেষভাবে মনে হইতে লাগিল যে, এক সঙ্গে অনেকের নৃত্যব্যাপারে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার রীতিই বিলাতী নৃত্যকলায় প্রধানতঃ প্রশংসাযোগ্য। ইংরাজী গীতের স্বরকেও অবজ্ঞা করা চলে না। অনায়াসেই এই স্বর বুঝিয়া উঠা যায়। স্বরজ্ঞ তালজ্ঞ রসজ্ঞ না হইয়াও ইংরাজী নৃত্য গীত বাদ্যে স্বদেশীয় ওস্তাদ-গণের কলাজ্ঞান বুঝিতে পারা গেল। অবশ্য রীতি সম্পূর্ণ পৃথক্।

মিউজিয়াম-পাড়ায় ভারতীয় চিত্রশিল্প

গোল্‌ডার্সগ্রীণের নিভৃত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া টেম্‌সের তীরে আসিয়া বাস করিতেছি। লণ্ডন-নগর প্রসিদ্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই অঞ্চল সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই স্থান বিখ্যাত। আজকাল এই জনপদ মহানগরীর অন্যতম পাড়া মাত্র। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা স্বতন্ত্র নগররূপে পরিগণিত হইত। এই মহাল্লার নাম ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার বা পার্ল্যামেণ্ট-পাড়া। যাঁহারা ওয়ার্ডসোয়ার্থের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যে এই পাড়ার অন্তর্গত টেম্‌স্‌-সেতুর সহিত পরিচিত।

আমাদের হোটেল সেই কাব্য-প্রসিদ্ধ সেতুরই নিকটবর্ত্তী। পার্ল্যামেণ্ট-গৃহ, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারয়্যাবি ইত্যাদি ইংরাজজাতির জীবন-কেন্দ্রসমূহও ঘরে বসিয়া দেখিতে পাইতেছি। ফলতঃ জগদ্বিখ্যাত আবেষ্টনের মধ্যে আমাদের গৃহ অবস্থিত। ইংরাজের প্রাচীন ও বর্ত্তমান জাতীয় জীবন-ধারা এই কেন্দ্রেই পুষ্ট।

আমাদের গৃহও ইংরাজসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সভা পরিষদাদির সম্মিলন এই হোটেলে হইয়া থাকে। নামজাদা সমিতিসমূহের সভ্যেরা এই হোটেলকে খানা-ঘরভাবে ব্যবহার করেন। এই গৃহেরই এক প্রকোষ্ঠে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডা-রাষ্ট্র-সংগঠনী আইন তৈয়ারী হইয়াছিল। কেবল তাহাই

নহে। ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে এই গৃহের ভূমি চির-প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড হইতে শিখিয়া আসিয়া ক্যাক্‌স্‌টন বিলাতে প্রথম ছাপাখানা প্রস্তুত করেন। তখন চতুর্থ এডোয়ার্ড এ দেশের রাজা ছিলেন। আমরা আজ যে জমির উপর বাস করিতেছি সেই জমিব উপরেই ক্যাক্‌স্‌টনের মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্নিকাণ্ডে তাহা ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এক্ষণে যে গৃহ বর্ত্তমান তাহার এক প্রাচীর-গাত্রে এই বৃত্তান্ত লিখিত রহিয়াছে। তাহাতে চিত্রও আছে। ক্যাক্‌স্‌টন তাঁহার প্রথম মুদ্রণ-কার্য্যের নমুনা রাজা এডোয়ার্ডকে দেখাইতেছেন—চিত্রে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাড়ী ঘর মহাল্লা ইত্যাদি সবই এঅঞ্চলে বিখ্যাত বটে; কিন্তু লোকের ভিড়, গাড়ীর ভিড় বেশী নয়। হোটেল, বাজার দোকানের গোলমাল কিছু কম। অবশ্য লোকের যাতায়াত গোল্ডার্সগ্রীণ অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক। কিন্তু লণ্ডনের ব্যাঙ্কপাড়া হিসাবে এই পার্লামেণ্ট-পাড়া পল্লীগ্রাম স্বরূপ।

আজ লণ্ডনের স্কুল-পাড়া দেখিতে গেলাম। সে অঞ্চলও এই প্রাচীন ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারের মত কিছু নিভৃত। বড় বড় বাড়ীঘর প্রশস্ত রাজপথ ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু ইংরাজের কর্ম্মজীবন ওখানে বুঝা যায় না। অম্নিবাস, ট্রাম, মটরকার ইত্যাদির গমনাগমন অল্প। অথচ ঐ অঞ্চল লণ্ডনের চিন্তা-কেন্দ্র। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ঐ জনপদে অবস্থিত।

লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় ত আছেই। কেবল তাহাই এই স্থানের গৌরব নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-গৃহসমূহও এই মহাল্লার মধ্যে দেখিতে পাইলাম। এতদ্ব্যতীত সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিকৃতি স্বরূপ মিউজিয়াম,

ল্যাবরেটরী, সংগ্রহালয়, প্রদর্শন-গৃহ ইত্যাদিও এই পাড়াকে চিন্তা-জগতের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। এই সকল বিদ্যাকেন্দ্র দেখিলে ইংরাজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা এক সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজজাতি অতীতে কি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে কি করিতে চাহেন বিদ্যার এই জীবন্ত উৎসে আসিয়া অনায়াসেই বুঝিয়া লইলাম। এই অঞ্চলের অধিকাংশই নবনির্ম্মিত। বিগত একশত বৎসরের ভিতর ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও নূতন নূতন দিকে উন্নতি হইতেছে। ইংরাজ-সাম্রাজ্য এবং জগতে ইংরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও গত শতাব্দীরই ফল। সুতরাং ক্রম বিকশিত আধুনিক ইংরাজজাতির জীবন-কথা এই আবেষ্টনের অন্তর্গত গৃহে গৃহে বিবৃত রহিয়াছে।

এখানকার Natural History Museum বা জীবতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরে ঘরে বালক বালিকারা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর নিকট ফড়িং, প্রজাপতি, পশুপক্ষী, তরুলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতেছে। কেহ বা প্রদর্শিত নমুনাগুলি দেখিয়া ছবি আঁকিতেছে—কেহ বা বস্তুগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় শুনিতেছে। কোথাও শিক্ষয়িত্রী তাঁহার ছাত্র বা ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কোথাও বা শিক্ষক জীবজন্তু সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন। এই মিউজিয়াম দেখিয়া প্রকৃত বিদ্যালয়ের দৃশ্যই দেখিলাম।

সংগ্রহালয়, প্রদর্শনী ইত্যাদির যথার্থ উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার। এজন্য লণ্ডনে বিশেষ ব্যবস্থাও আছে। সংগৃহীত বা প্রদর্শিত বস্তুগুলি বুঝাইবার জন্য সরকারী লোক নিযুক্ত আছেন। তিনি বিনা পয়সায় দর্শকগণকে ঘরে ঘরে লইয়া যাইয়া বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। প্রত্যেক সংগ্রহালয়ের সংলগ্ন এবং সংশ্লিষ্ট পাঠাগারও আছে। প্রয়োজন

হইলে সেখানে যাইয়া গ্রন্থাদি পাঠ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারিগণ গবেষণার সুযোগও পান। নিম্নতম বিদ্যালয়ের নিতান্ত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রগণ এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই মিউজিয়ামকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বরূপ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত।

এখানকার বিদ্যালয়গুলিও মিউজিয়মাদির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে। শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ভ্রমণ, পর্য্যবেক্ষণ, বস্তুদর্শন, ইত্যাদির প্রাধান্য রহিয়াছে, কাজেই প্রদর্শনী, সংগ্রহালয়, ল্যাবরেটরী, কারখানা, বিজ্ঞান-গৃহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পর্য্যটন ছাত্র ও শিক্ষকগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

এইজন্য বিদ্যালয়ে ও মিউজিয়ামে সংযোগ অত্যাবশ্যক। লণ্ডন-বাসীরা একথা বেশ বুঝিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে মিউজিয়ামের কর্ত্তৃ-পক্ষেরা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে বিশেষ সাহায্য করেন। আবার বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরাও মিউজিয়াম দর্শন শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ, মিউজিয়ামের যথার্থ উদ্দেশ্য লণ্ডনে সাধিত হইতেছে। কলিকাতার এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মিউজিয়াম-গুলি কি এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত? অবশ্য প্রতিষ্ঠাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইব "হাঁ"। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমুদয় কেন্দ্র হইতে শিক্ষা-প্রচার ও জ্ঞান-বিতরণের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে মিউজিয়ামাদি দর্শনের কোন স্থানই নাই। কাজেই যাদুঘর যে একটা বিদ্যালয় তাহা আমাদের গ্রাজুয়েটগণও বুঝিবার অবসর পান না!

লণ্ডনের এই মিউজিয়ামে পশুপক্ষী তরুলতা অর্থাৎ জীবজগতের নানা বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ সুন্দর সংগ্রহালয় জগতে আর

কুত্রাপি নাই। প্রত্যেক বস্তু বুঝাইবার জন্য তাহার নিম্নে সুবিস্তৃত বিবরণও লিখিত রহিয়াছে। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান অথবা প্রাণি-বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ সঙ্গে না আনিলেও এই বিবরণ পাঠ করিয়াই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে এই গৃহগুলি একখানা বিরাট সচিত্র জীববিদ্যাবিষয়ক বিশ্বকোষেব বিভিন্ন অধ্যায়স্বরূপ।

শুনা যায় প্রতি বৎসর ৫০০,০০০ লোক এই মিউজিয়াম দেখিতে আসে। অথচ ইহা বিখ্যাত "ব্রিটিশ মিউজিয়ামে"র সামান্য এক অংশ মাত্র। "ব্রিটিশ মিউজিয়াম" নামক বিরাট সংগ্রহালয়ের অধিকাংশ লণ্ডনের অন্য মহাল্লায় স্থাপিত।

জীব-তত্ত্ব সংগ্রহালয়ের নিকটেই "ইম্পীরিয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্"। এই গৃহে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদের নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, ভারতবর্ষ, সুডান ব্রহ্মদেশ, সিংহল—ইত্যাদি পৃথিবীর যত স্থানে ইংরাজের প্রভাব, রাজ্য বা অধিকার আছে সকল স্থানের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও জন্তুজ পদার্থ এই গৃহে দেখিতে পাইলাম। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যে কোন বিষয়ই এই গৃহে বিচরণ করিয়া জানিতে পারা যায়।

ইহা কেবল যাদুঘর বা আজব-খানা মাত্র নয়। ইহা একটা সাধারণ স্কুল গৃহও নয়। পুঁথিগত বিদ্যার প্রচার করিবার জন্যই এই ইন্‌ষ্টি-টিউট স্থাপিত হয় নাই। ইংরাজজাতির ধনসম্পদ ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্য বাড়াইবার জন্য এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও স্থায়ী করিবার জন্যই এই গৃহের বস্তুগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা হাতেকলমে ব্যবসায় চালাইতে-ছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্যই এই ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রবর্ত্তন। এজন্য রসয়ান, ভূতত্ত্ব, আকরতত্ত্ব, শিল্প, কৃষি, বয়ন, রঞ্জন ইত্যাদি নানা বিদ্যায় পারদর্শী বহু পণ্ডিত এই সংগ্রহালয়ের পরিদর্শক। ইহাঁরা

নিয়মিতরূপে এই গৃহে বসিয়া লেখাপড়া করেন, গবেষণা করেন, অনুসন্ধান করেন, এবং নিজ নিজ পাঠের ফলসমূহ গ্রন্থাকারে বা পুস্তিকাকারে প্রচার করেন। ইতিমধ্যে কৃষিবিষয়ক, শিল্পবিষয়ক এবং বাণিজ্যবিষয়ক বহু রচনা প্রকাশিতও হইয়াছে। অধিকন্তু এখান হইতে একখানা ত্রৈমাসিক পত্র বাহির হয। তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ ধনাগমের নানা উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিযা থাকেন।

এই গৃহের প্রতি শিল্পী, ব্যবসায়ী, মহাজন, ব্যাঙ্কার, বৈজ্ঞানিক, ধনবিজ্ঞানবিৎ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ বিশেষ অনুরক্ত। তাঁহারা এক নিঃশ্বাসে বিশাল সাম্রাজ্যের বৈষয়িক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধাগুলি বুঝিয়া লইতে পারেন। বিশ বৎসর হইল এই ইন্‌ষ্টিটিউট খোলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইংরাজের ধনশক্তি এবং রাষ্ট্রশক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়িয়াছে।

ইম্পীরিয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সংগ্রহালয়ে কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশসমূহের আর্থিক অবস্থা বুঝাইবার জন্য চিত্র, ফটোগ্রাফ, দ্রব্য, ম্যাপ, তালিকা, পুস্তিকা, বিবরণী, নক্সা ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন আর একটা মিউজিয়ামে জগতের সকল দেশেরই নানা প্রকার তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পাইলাম। ইহার নাম "ভিক্টোরিয়া য়্যাণ্ড য়্যাল্‌বার্ট মিউজিয়াম"। চারি পাঁচ বৎসর হইল ইহা খোলা হইয়াছে।

এই সংগ্রহালয়ে প্রাচীন বস্তু এবং ঐতিহাসিক তথ্য বেশী নাই। "ব্রিটিশ মিউজিয়ামে"ই এই সমুদয় অধিক প্রদর্শিত। কিন্তু ভিক্টোরিয়া সংগ্রহালয়ে সকল দেশের কারুকার্য্য, সুকুমার শিল্প, ধনাগমের উপায় ইত্যাদিই সবিশেষ বিবৃত। কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, ধাতুর কাজ, বয়নশিল্প, স্থাপত্য, গৃহনির্ম্মাণ, চিত্রাঙ্কন, নক্সা করা, পুস্তক মুদ্রন, গ্রন্থ প্রকাশ, কাচের কাজ, কাদামাটির কাজ, এনামেল এবং অন্যান্য শিল্প

সম্বন্ধে এই মিউজিয়ামে জ্ঞানলাভ করা যায়। এই সমুদয় শিল্প কোন্ সময়ে কোন্ দেশে কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহাও বুঝিতে পারি। জনসাধারণ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এইগুলি দেখাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষ আগ্রহান্বিত। এখানে আসিয়া সহস্র সহস্র ইংরাজ নানা শিল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিয়াও যায়।

ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ামের এক অংশের নাম ভারতীয় সংগ্রহালয়। কলিকাতা মিউজিয়ামের শিল্প, ও ঐতিহাসিক বিভাগে যে সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে এখানেও সেই জাতীয় দ্রব্য রক্ষিত হইয়া থাকে দেখিতেছি। এই গৃহে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নমুনাই বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম। এতগুলি ভারতীয় চিত্র পূর্ব্বে একসঙ্গে কখনও দেখি নাই। প্রায়ই মুসলমানী যুগের রচনা। রাজপুত, পাহাড়ী, মোগল এবং কাশ্মীরি—এই সকল ধরণের চিত্রাবলীতে এই গৃহের অধিকাংশ ভরিয়া গিয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলার এরূপ সুন্দর সংগ্রহালয় ভারতবর্ষের কুত্রাপি নাই।

এতদ্ব্যতীত, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কতকগুলি নিদর্শনও এই গৃহের কয়েকটা প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এইগুলি প্যারি-নগরের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। ফরাসীরা এই সমুদয় কারুকার্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাহা শুনিয়াই ইংরাজেরা এই গুলিকে লণ্ডনের প্রদর্শনীতে স্থান দিয়াছেন। এই চিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ একখানা পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন যে, এগুলিকে একটা "promise" বা ভবিষ্যতের সূচনা মাত্ররূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। Fulfilment বা সিদ্ধিলাভের পরিচয় এই সকল নমুনায় নাই। অর্থাৎ ভারতশিল্পীরা এখন চিত্রবিদ্যায় হাতে খড়ি দিতেছেন মাত্র। এখন ইঁহাদের সাধনার যুগ

চলিতেছে। ভবিষ্যতে নব্য ভারতীয় চিত্রকলা কিরূপ দাড়াইবে এখনও বলিবার সময় আসে নাই।

আধুনিক চিত্রগুলি প্রাচীন চিত্রাবলীর পার্শ্বেই রক্ষিত। তাহার ফলে ভারতীয় কারিগরীর দুই যুগ তুলনা করা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন দর্শকই একসঙ্গে প্রাচীন এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নব্যকলার পরিচয় পাইবেন। মোটের উপর, এই ঘরে প্রবেশ করিলে চিত্রশিল্পে ভারতবাসীর ক্রমবিকাশ বুঝিতে কাহারও বেশী কষ্ট পাইতে হয় না।

কলিকাতায় বিগত ছয় বৎসরে নব্যকলার যে সকল নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইগুলির অনেকই এখানে দেখিতে পাইলাম। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি নূতন চিত্রও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ হয় এবার কলিকাতায় এগুলি দেখান হইয়াছিল। এবারকার কলিকাতার চিত্র-প্রদর্শনী অল্পকালের জন্য খোলা ছিল। এজন্য এই সমুদয় ভারতবর্ষে বেশী প্রচারিত হইতে পায় নাই।

আধুনিক চিত্রাবলীর প্রকোষ্টে দেখিলাম, একব্যক্তি অতি মনোযোগ সহকারে নোটবুকে মন্তব্য লিখিতেছেন। আলাপে জানিলাম, ইনি রুশ। কবিতা-রচনায়, কাব্য-সমালোচনায় এবং চিত্র-সমালোচনায় ইঁহার খুব ঝোঁক। ইনি বলিলেন, "আমি এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে রুশ ভাষায় একটা প্রবন্ধ লিখিব—এই জন্য নোট সংগ্রহ করিতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভারতের আধুনিক চিত্রসম্পদবিষয়ে রুশিয়ার লোকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইবে কি?" ইনি উত্তর করিলেন, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমার স্বদেশবাসীরা বিশেষ ব্যগ্র। আজকাল রবীন্দ্রনাথের কাব্য রুশিয়ায় বিশেষ সমাদৃত। ইতি-মধ্যে "গীতাঞ্জলির" রুশ অনুবাদের তিন সংস্করণ বিক্রী হইয়া গিয়াছে।

আমি নিজেই তাঁহার "গার্ডেনার" গ্রন্থের অন্তর্গত কোন কোন কবিতার রুশ অনুবাদ করিয়াছি। তাহার আদরও কম নয়।"

ইনি প্রথমেই বলিলেন, "মহাশয়, যদি দুঃখিত না হন, তাহা হইলে বলি যে, আপনাদের চিত্রশিল্পীরা বিদেশীয় কায়দাসমূহ নকল করিতেছেন কেন? জাপানী ও ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব আপনাদের এই নব্য চিত্রকলায় অত্যধিক দেখিতে পাইতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আমাদের শিল্প চিরকাল একভাবেই থাকিবে? যুগে যুগে নূতন নূতন রীতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতশিল্পের নূতন নূতন আকার ফুটিয়া উঠিবে না? আজকাল ভারতবর্ষে সমগ্র বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভারতবাসীর জীবন কি এই শক্তিসমূহ অস্বীকার করিয়া বিকশিত হইতে পারে? কাজেই আধুনিক ভারতীয় শিল্পে বিশ্বের সম্পদই সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?"

ইনি বলিলেন, "বিদেশীয় রীতি অনুকরণ করা ভারতবাসীর পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নয়। অবশ্য জগতের সকল প্রকার রীতিই আপনারা আলোচনা করুন ও শিক্ষা করুন। আপনাদের শিল্পীরা জগতের নানা প্রকার কায়দার পরিচয় গ্রহণ করুন। তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। শিক্ষার জন্য এই সমুদয়ের প্রয়োজন আছে। নানা জিনিষ না দেখিলে চোখ ফুটে না। কিন্তু যখন আপনারা ছবি আঁকিতে বসিবেন তখন এই সকল পরকীয় জিনিষ মনে রাখিবেন না। সকলগুলি ভুলিয়া গিয়া নিজ কল্পনাশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবেন। স্বকীয় সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং শিল্পবোধ এতদিনকার শিক্ষার ফলে যেরূপ পুষ্ট হইয়াছে তদনুসারেই কার্য্য করিবেন। যাহা কিছু দেখিতেছেন, শিখিতেছেন ও বুঝিতেছেন সকলই আপনাদের নিজস্ব হইয়া যাওয়া আবশ্যক। যথার্থরূপে হজম ও

মজ্জাগত হইয়া গেলে পরকীয় শিল্পের প্রভাবে কোন শিল্পীর ক্ষতি হয় না। কিন্তু দেখিতেছি, আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা বিদেশীয় প্রভাব এখনও পূর্ণরূপে হজম করিতে পারেন নাই। পরকীয় রীতিগুলি এই শিল্পচর্চ্চার অঙ্গীভূত হইয়া গেলে ভারতের আধুনিক চিত্রকরগণ জগতে একটা নূতন রীতির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার পূর্ব্বাভাষ এই কারুকার্য্যের মধ্যে যথেষ্টই দেখিতে পাইতেছি।

এই বলিয়া তিনি আমাকে রাজপুত, মোগল, পাহাড়ী ও কাশ্মীরি চিত্রগুলি দেখাইলেন। তাঁহার মতে ঐ "সমুদয় অতি উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম্ম। ঐ সকল চিত্রে Perspective বা পারি-প্রেক্ষিক নাই সত্য; কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতিই হয় নাই। প্রত্যেক চিত্রেই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যেক কার্য্যেই চিত্তের ভাব পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ণসমাবেশও নিখুঁত। পাশ্চাত্য চিত্রকরগণও ঐরূপ রং ফলাইতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিবেন।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি আরও বলিলেন, "এই প্রাচীন চিত্রসম্পদের পারম্পর্য্য রক্ষা করাই আধুনিক ভারতশিল্পীগণের কর্ত্তব্য। এরূপ উচ্চশ্রেণীর কারুকার্য্য যেদেশে আছে তাহার সন্তানগণ বিদেশ হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবেন কেন?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি রুশ ভাষায় যে প্রবন্ধ লিখিবেন তাহার সার মর্ম্ম আমাকে বলিতে পারেন কি?" তৎক্ষণাৎ ইনি আমাকে চিত্রগুলির সম্মুখে লইয়া গেলেন। প্রত্যেক চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই-জনে নানা আলোচনা হইল।

মুকুলচন্দ্র দের রংফলাইবার ক্ষমতা আছে। 'অপ্সরার নৃত্য' চিত্রে নর্ত্তন অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর কারিগরি

বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রত্যেক রেখা সার্থক—একটিও বাজে লাইন বা দাগ নাই।

ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার এক একটা ছবির মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রত্যেকটা বিষয় সুচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু সকল-গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। মেঘের চিত্রে তিনটি পদার্থ আছে রমণী, ময়ূর ও মেঘ। এই তিনটির ভিতর যে কোন দুইটি বস্তু থাকিলেই সৌন্দর্য্য বাড়িত।

অসিত হালদারের পেন্সিল-স্কেচ্ ও নক্সাগুলি অতি মনোরম। কিন্তু কোন কোন রেখায় ও কল্পনায় জাপানী প্রভাব পরিস্ফুট। অথচ তাহা অন্য কায়দার সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় নাই।

নন্দলালের কার্য্য দেখিয়া ইনি বিশেষ প্রীত। ইঁহার মতে নন্দলাল ছবি আঁকিতে যেরূপ দক্ষ, রং সমাবেশে সেরূপ পটু নন। নীল সবুজ ইত্যাদি রংএর সামঞ্জস্য বিধান করিতে ইনি পারেন নাই। রাজপুত রীতির বর্ণসমাবেশ গভীর ভাবে বুঝিলে নন্দলালের দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-জীবন চিত্রটি দেখিয়া রুশ সমালোচক যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রামায়ণের দৃশ্যসমূহও অতি সুন্দর।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি রচনাই এখানে প্রদর্শিত। রুশ সমালোচক এগুলি বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না। ইঁহার মতে গগনেন্দ্র নাথের শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যধিক; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কার্য্য-গুলি ইনি প্রায়ই নিখুঁত বলিলেন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবনীন্দ্র-নাথের বয়স কত?" আমি বলিলাম, "ইনিই নব্য শিল্পের প্রবর্ত্তক। অন্যান্য যে সকল শিল্পীর কার্য্য এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ইঁহার ছাত্র।"

ইনি পূর্ব্বে অনীন্দ্রনাথের নাম শুনেন নাই এবং ভারতীয় চিত্রের

সংবাদও রাখেন নাই। ইনি বলিলেন, "এই সমুদয় চিত্র যদি ইউরোপের নানা প্রদর্শনীতে প্রচারিত হইতে থাকে তাহা হইলে অত্যধিক মূল্যে এগুলি বিক্রী হইবে। কেবল তাহাই নহে। সমস্ত জগতের চিত্র-শিল্পীরা এই ভারতীয় কলা হইতে নূতন শিক্ষা পাইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনাদের চিত্রকরেরা বর্ণসমাবেশের ক্ষমতা লাভ করিলেই ভারতীয় চিত্র-শিল্প-জগতে এক অভিনব রীতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে। ইহাঁদের "ডিজাইন" কারবার ক্ষমতা এবং চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা এখনই নিরপেক্ষ সমালোচকগণ প্রশংসা করিতে বাধ্য।"

অবনীন্দ্রনাথের "মডার্ণ-রিভিউ"-প্রসিদ্ধ উষ্ট্র-চিত্র সম্বন্ধে রুশ সমালোচক বলিলেন "সবই ভাল হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ-বিন্যাস পাকা হাতের নয়।" যে চিত্রে সখী নায়িকাকে নায়কের মূর্ত্তি দেখাইতেছেন, তাহাও ইনি যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। সখী, রাধা এবং মূর্ত্তি তিনটি বস্তুই অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। সমস্ত চিত্রের ভিতর দিয়া একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে! এরূপ ভাবময় চিত্রের মূল্য অত্যধিক। নায়িকার উরু অত্যন্ত বৃহদাকার ও কদর্য্য দেখাইতেছে সত্য, কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি ঐ দিকে যাইবে না। মুখশ্রী ও চিত্রের সামঞ্জস্যই সকলের চোখে আগে পড়িবে। কাজেই ঐ খুঁতে চিত্রের অঙ্গহানি হয় নাই।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে রংফলান প্রায়ই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। ওমারখাইয়ামের আলোচ্য বিষয়গুলি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু ছবির নীচে কবিতার পদগুলি না লিখিলেই ভাল হইত। কারণ কবিতা পাঠ করিয়া ছবির অর্থ বিশেষ বুঝা যাইতেছে না। বরং ছবিগুলি দেখিয়াই উচ্চ অঙ্গের শিল্পকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'নির্ব্বাসিত যক্ষের পত্নী-চিত্রটি দেখিলেও যে কোন দেশের যে কোন দর্শক বিরহের

দৃশ্য বুঝিতে পারেন। ইহার নীচে কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। বর্ষা ঋতু বুঝাইবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ একটি অন্ধকারময় বনভূমিতে তিনটি নর্ত্তকীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বর্ণ, অঙ্কন, রেখাপাত, মনোভাব, গতি, ভঙ্গী, ইত্যাদি সবই এই চিত্রে সুষ্ঠু হইয়াছে। রমণীত্রয়ের আকার কিছু দীর্ঘ সত্য—কিন্তু নৃত্যের অবস্থায় ইহাদিগকে যেরূপ সাজান হইয়াছে তাহাতে সেদিকে দর্শকের চোখ যাইবে না। সকলেই নৃত্যের চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবেন।”

এই গৃহে থাকিতেই প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রাবলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া রুশ সমালোচকের সঙ্গে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাদের আধুনিক শিল্পীরা অতি ক্ষুদ্রাকার চিত্র আঁকিয়া থাকেন, মনে হইল না কি? ইঁহারা বড় বড় ছবি আঁকিতেছেন না কেন? আপনি কি বিবেচনা করেন যে, ইঁহাদের সে ক্ষমতা নাই?” ইনি বলিলেন, “না, ক্ষুদ্র ছবি আঁকিতেই বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। বড় ছবি অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ভারতবাসীর সেজন্য দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিল্পক্ষমতা আপনাদের আছে—জগতের লোকে এ কথা বলিবে। আমি আপনার স্বদেশকে বৃথা বাড়াইতেছি না।”

ইনি আবার বলিলেন, “আপনাদের চিত্রকার্য্যগুলি জগতের সকল প্রসিদ্ধকেন্দ্রে প্রদর্শিত করুন। শীঘ্রই আধুনিক ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ সম্মানের যোগ্য হইবে। সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা আপনারা জগতে যত প্রসিদ্ধ হইতে পারিবেন, শিল্পচর্চ্চা দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ হইতে পারিবেন। কারণ আপনাদের সাহিত্য সত্যভাবে হৃদয়ঙ্গম করা বিদেশীয়গণের পক্ষে অসম্ভব। আপনাদের মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত না হইলে কেহ সাহিত্যরস উপভোগ করিতে পারিবেন না। অনুবাদ মাত্র পাঠ

করিয়া সাহিত্যের মর্ম্মকথা গ্রহণ করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ ২।৪।১০ খানা গ্রন্থের অনুবাদ হইলেই বা কি হইবে? কোন সাহিত্যের একখানা গ্রন্থ বুঝিতে হইলে সেই সাহিত্যের প্রাচীন নবীন অসংখ্য গ্রন্থের সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু চিত্র বুঝিবার জন্য কোন ভাষায় পণ্ডিত হইবার প্রয়োজন নাই। চিত্রসমূহ মানবজাতির সাধারণ ভাষায় শিল্পীর মনোভাব প্রকাশ করে। চিত্রের ভাষা জাতিহিসাবে ভিন্ন ভিন্ন নয়। জগতের সকল জাতি এবং সকল জাতির সকল লোকই এক চিত্র-ভাষা ব্যবহার করে। এখানে অনুবাদের প্রয়োজন নাই—ব্যাখ্যা সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। ভাষান্তরিত করিয়া মৌলিক চিত্রের রহস্য বুঝাইবারও আবশ্যক হয় না। মানুষমাত্রই যে কোন চিত্র দেখিয়া সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী জাতির হৃদয়-কথা অনায়াসে বুঝিতে পারে। এজন্য ভারত-বর্ষকে আধুনিক জগতে প্রচারিত করিতে হইলে চিত্রশিল্পের সাহায্য গ্রহণ করাই অত্যাবশ্যক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে, শিল্পের উপর জাতীয় চরিত্রের কোন প্রভাব নাই? যে কোন হিন্দুই কি খ্রীষ্টান শিল্পীদিগের যে কোন কার্য্য সহজে উপভোগ করিতে পারেন? যে কোন খ্রীষ্টানই কি হিন্দু কারিগরের যে কোন শিল্পকার্য্যে সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারেন? ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি না জানিলে কি ভারতীয় চিত্রকলা অন্য দেশের লোকেরা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন? আমরাই কি পাশ্চাত্য জগতের পূর্ব্বাপর ইতিহাস-কথা না জানিয়া পাশ্চাত্য শিল্প বুঝিতে পারি?"

রুশ সমালোচক বলিলেন—"বাস্তবিকই চিত্রশিল্প সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজনীন। সকল যুগের সকল লোকই যে কোন চিত্র বুঝিতে সমর্থ। অবশ্য কোন কোন জিনিষ বুঝাইবার জন্য ভিন্ন

ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হয়। তাহাতে ক্ষতি কি? বৈচিত্র্যে জনগণের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্রের নীচে কোন কবিতার পদ বা বিবরণ লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ছবির নীচে কিছু না লিখিলেও সকলেই বিষয়টা সহজে বুঝিতে পারে।

ইংরাজ শিল্পীরা সাধারণতঃ চিত্রের নীচে বর্ণনা লিখিয়া রাখেন। কিন্তু ফরাসী ও রুশ চিত্রকরেরা ইহা পছন্দ করেন না। মনে করুন, রেফেলের প্রসিদ্ধ ম্যাডোনা-চিত্রের নীচে 'ম্যাডোনা' শব্দ পর্য্যন্ত লেখা নাই, তথাপি জগতে এমন কোন লোক আছে কি যে এই চিত্র দেখিয়া মাতৃভাব বা ধাত্রীভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে?

দেবদেবী, জনগণ, তরুলতা, জীবজন্তু ইত্যাদির কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরগণ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মেই করিয়া থাকেন। ভারতীয় দেবদেবীগণের রং ও মূর্ত্তি দেখিতেছি কতকগুলি বাঁধা নিয়মের অধীন। সেগুলি আমরা জানি না—বুঝিও না। কিন্তু সেগুলির সৌন্দর্য্য এবং উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতেছি না? দেবদেবীসমূহের শাস্ত্রীয় রূপ রক্ষা করিয়াও আপনাদের চিত্রকরগণ যথোচিত ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড এবং পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিকের সাহায্যে উত্তম কারুকার্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন। আপনাদের প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। কোন কোন মূর্ত্তির একাধিক হস্তপদ মুখ চোখ দেখিতেছি বটে—কিন্তু তাহাতে শিল্পীরা মূর্ত্তিকে বিসদৃশ বা বীভৎস করিয়া তুলেন নাই। বরং সমস্ত চিত্রের মধ্যে এগুলি বেশ সামঞ্জস্যের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিল্পীর অভিপ্রায়ও ঐ সমুদয়ে যৎপরোনাস্তি দক্ষতার সহিত প্রচারিত হইয়াছে।"

ইয়োরোপীয় "নবাভ্যুদয়ে"র চিত্রকলা

কাল প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন দেখিয়াছি। আজ প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রশিল্প দেখিতে গেলাম। 'ন্যাশন্যাল গ্যালারি' নামক সংগ্রহালয়ে প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য চিত্রাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত ট্র্যাফ্যাল্‌গার স্কোয়ারের সম্মুখে এই গ্যালারি অবস্থিত।

সাফ্রেজিট আন্দোলনের পাণ্ডা-রমণীদের উপদ্রবে আজ কাল চিত্র-ভবনের অনেক প্রকোষ্ঠ বন্ধ থাকে। ইঁহারা রাষ্ট্রে স্ত্রীজাতির অধিকার ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন। যে সকল পুরুষ এই অধিকার প্রদানের বিরোধী তাঁহাদিগের বাড়ীঘর, ফটোগ্রাফ, ছবি, মূর্ত্তি ইঁহারা নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত। ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে এরূপ ইংরাজ পুরুষগণের চিত্রও আছে। কতকগুলি এই রমণীগণের অত্যাচারে ইতিমধ্যেই নষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য গ্যালারির ইংরাজ-বিভাগ প্রায়ই আজকাল বন্ধ থাকে। কাজেই ইংরাজ-চিত্রশিল্পের পরিচয় লইতে পারিলাম না। ইতালীয়, ওলন্দাজ এবং স্পেনীয় প্রধানতঃ এই তিন জাতীয় শিল্পিগণের কার্য্য দেখিবার সুযোগ পাইলাম মাত্র।

প্রাচীন ইউরোপীয় শিল্পের সর্ব্ব প্রথম যুগ এই গ্যালারিতে দেখান হয় নাই। কারণ গ্রীক ও রোমীয় শিল্পের নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয় নাই। যাহাকে সাধারণতঃ মধ্যযুগ বলে, 'প্রাচীন' শব্দে সেই যুগের কথাই বলিতেছি। সেই সময় হইতে নিতান্ত আধুনিক বা সমসাময়িক কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুগের চিত্রাবলীই এই ভবনে দেখিতে পাইলাম।

মধ্যযুগে ইতালীপ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সকল নগর ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালীর ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, পেডুয়া, পাইসা, ভেনিস ইত্যাদি নগরসমূহ ইউরোপীয় সভ্যতার যথার্থ কেন্দ্র ছিল। তখনও ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি বিশেষ কোন খ্যাতিলাভ করে নাই। ইতালীয় সভ্যতাই প্রকৃতপক্ষে এই যুগের ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইউরোপের দেশে দেশে ইতালীর নগরসমূহই সকল বিষয়ে অনুকরণ করা হইত। এখানকার সাহিত্যই পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্র চিন্তার ও কর্ম্মের আদর্শ বিতরণ করিত। ইয়োরোপের Renaissance বা নবাভ্যুদয় ইতালী হইতেই সুরু হইয়াছিল।

ইতালীর চিত্রকলা বলিলে আমরা এই যুগের চিত্রকলাই বুঝিয়া থাকি। আধুনিক ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল চিত্রশিল্পীদিগের গৌরব করেন তাঁহারা এই যুগেই ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন নগররাষ্ট্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

লণ্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ইতালীয় চিত্রশিল্পের প্রধান প্রধান তিনটি রীতির ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। এই তিন শিল্পরীতি ভিন্ন ভিন্ন তিন কেন্দ্রে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই তিন কেন্দ্রের বিখ্যাত ওস্তাদগণের নাম বটিসেলি, রেফেল এবং টিশিয়ান।

ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র অঙ্কন করিতেন। তখনও খ্রীষ্টধর্ম্মের সংস্কার আন্দোলন আরব্ধ হয় নাই। তখনও রোমাণক্যাথলিক নিয়মে মূর্ত্তিপূজা, মেরিপূজা, খ্রীষ্টপ্রেম, সাধুসেবা, মালাজপা, মন্ত্রপাঠ,— ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোন মতই প্রচারিত হয় নাই। ইতালীর নগরগুলি সবই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল এবং পরস্পর-বিরোধী ছিল সত্য ; কিন্তু

ধর্ম্ম মত বা ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া তখনও বিশেষ কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই এই তিন কেন্দ্রেই চিত্রের পরিকল্পিত বিষয় একরূপই ছিল। এই চিত্রগুলি দেখিলে হিন্দু নরনারীও প্রকৃত ধর্ম্মভাব, ভক্তি-তত্ত্ব, মাতৃসেবা, ভগবৎ-প্রীতি অনায়াসেই শিখিতে পারেন। হিন্দু ও খ্রীষ্টানের চিত্ত সেই যুগে অনেকটা এক ভাবেই অনুপ্রাণিত হইত---এবং প্রায় একই প্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে উভযের হৃদয় গঠিত হইত। মধ্যযুগের এই ইতালীয় ভক্তি-চিত্রগুলি হিন্দুর মনে তাহার স্বধর্ম্মই জাগাইয়া দেয়। তবে এই চিত্রকলায় শারীবিক সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য বেশী রাখা হইয়াছে। অনেকগুলিতে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হয় নাই।

বটিসেলি যে শিল্প-কেন্দ্রে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে চিত্রকরগণ সহজ সরল স্বাধীনভাবে স্বকীয় প্রতিভা দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেকটা পরকীয় প্রভাবের অধীন ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহাদের শিল্পে পারিপ্রেক্ষিক বা perspectiveএর পরিচয় নাই। ইঁহাদের চিত্রগুলিই ইতালীয় চিত্র-কলার প্রাথমিক স্তর। এইগুলি দেখিলে মুসলমানী অলঙ্কার-রীতি কথঞ্চিৎ মনে পড়ে।

পারিপ্রেক্ষিকের জ্ঞান রেফেল এবং টিশিয়ানের কার্য্যে যথেষ্টই বুঝিতে পারা যায়। টিশিয়ানের শিল্প-রীতিতে আমরা রক্তবর্ণের প্রাধান্য অত্যধিক দেখিতে পাই। ইনি এবং ইঁহার শিষ্যবর্গ চিত্রে এই রং খুব বেশী ঢালিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য ইঁহাদের কার্য্যে লাল-টুপিযুক্ত ধর্ম্ম-যাজকগণের মূর্ত্তি কিছু বেশী। প্রকৃত প্রস্তাবে যখন হইতে পারিপ্রেক্ষিকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল তখন হইতে শারীরিক গঠন, মাংসপেশীর আকৃতি ইত্যাদি বাহ্য বস্তুই চিত্রে প্রধান স্থান পাইতে থাকিল।

এই যুগে ভারতবর্ষে যে চিত্র-শিল্প বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে এইগুলির তুলনা অনেক বিষয়েই চলিতে পারে। এমন কি, মধ্যযুগে চীন এবং জাপানেও যে চিত্র-শিল্পের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেগুলিও এই সঙ্গে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য। চীনও জাপানী শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কোন কোন প্রকোষ্ঠে দেখিতে পাইলাম।

Victoria and Albert Museumএর Indian Section, National Galleryএর Italian Section এবং British Museum-এর Chinese and Japanese ornamented (illustrated) books নামক আল্‌মারীগুলি এক সঙ্গে দেখিলে দর্শকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, এই চারি জাতির চিত্র-শিল্পের মধ্যে উচ্চ নীচ স্থান বিতরণ করা বড়ই কঠিন। হৃদয়ের ভাব বুঝাইবার জন্য, এক এক জাতি এক এক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার জন্য জাপানী হয়ত ইতালীয় চিত্রাবলীর অর্থ না বুঝিতে পারেন, ভারতবাসী হয়ত জাপানী চিত্রশিল্প বুঝিতে কষ্ট পাইবেন, এবং পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ ভারতীয় চিত্রকলার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু এই জাতিগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যগুলি ভুলিয়া গিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, জপানী, চীনা, হিন্দুস্থানী এবং ইতালীয় সকল চিত্রকরই জীবনের এক আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। অধিকন্তু সকলেরই প্রচার করিবার ক্ষমতাও প্রায় এক প্রকার। রেখাপাত করিতে প্রায় প্রত্যেক জাতিই সমান দক্ষ। এক রঙ্গের সঙ্গে অপর রঙ্গের সংযোগ ও সমাবেশ সাধন করিতেও সকলেই সমভাবে পারগ।

প্রভেদের মধ্যে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় একটি। প্রথমযুগে ইতালীয় চিত্রকলায় পারিপ্রেক্ষিক ছিল না। ক্রমশঃ তাহারা চিত্রগুলিকে

এই লক্ষণ-সমন্বিত করিতে শিখিয়াছেন। মূর্ত্তি-চিত্রনে শারীরিক সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও পরবর্ত্তী যুগের ফল। কিন্তু বোধ হয় ভারতীয় চিত্রকলায় এই লক্ষণের চর্চ্চা ও সাধনা একেবারেই হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত চিত্রকরগণের প্রেরণা এবং জীবনযাপনও অনেকটা একপ্রকার। সকলেই রাষ্ট্রের সাহায্যে অথবা ধর্ম্মগুরু এবং ধর্ম্মমন্দিরের সংশ্রবে জীবন যাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজসরকার অথবা দেবালয়ের সম্পত্তি হইতে ইহাঁদের শিল্পকর্ম্মের জন্য অর্থ ব্যয় করা হইত। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন নগরে এইরূপে সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক দেবালয়, দেবমূর্ত্তি, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, কারুকার্য্য সকলেরই পুষ্টি সাধন করা হইত। কেবলমাত্র রাজপূতানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ও পরস্পর শত্রুরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইতালীয় নগরগুলির তুলনা করিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। যোধপুর, উদয়পুর, জয়পুর ইত্যাদি স্থানের চিত্রশিল্প ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জেনোয়া ইত্যাদি নগরের চিত্রশিল্পের ন্যায় সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

অধিকন্তু খ্রীষ্টান শিল্পিগণের অনেকেই যথার্থ সাধক ও ভক্ত ছিলেন। কোন কোন চিত্রকর উপাসনা না করিয়া চিত্র আঁকিতে বসিতেন না। তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাঙ্কনকে সত্য সত্যই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের শিল্পীরাও এই ভক্তিভাবেই অনুপ্রাণিত হইতেন। হিন্দুর শিল্পশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়।

সুতরাং ইতালীর রীতিসমূহের ন্যায় ভারতীয় রীতিসমূহও জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু দুঃখের কথা আমরা আমাদের শিল্পের পরিচয় কখনই পাই নাই। আমাদের কোন শিল্প আছে তাহাও

জানি না। পাশ্চাত্য জগৎ প্রত্যেক নগরের নামে, প্রত্যেক ওস্তাদের নামে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতি প্রচার করিয়া গৌরবান্বিত হয়। আমরা সমগ্র ভারতের ভিতর কোন একটি মাত্র শিল্প-রীতি ছিল কি না তাহাও জানিতে পাই না। কাজেই জাতীয় গৌরব বোধ জাগিবে কোথা হইতে? অথবা জাতীয় গৌরব বোধ জাগিলে আমরাও জেলায় জেলায়, অন্ততঃ প্রদেশে প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-রীতির প্রচার করিতে শিখিব। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কুমার স্বামীর প্রয়াসে 'রাজপুত' 'পাহাড়ী' ইত্যাদি নাম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ও গৌড়ীয় শিল্প-রীতির আভাষ দিতেছেন! বঙ্গদেশে ওস্তাদ বীতপাল এবং ধীমানের নামে স্থাপত্য-বিদ্যা পূর্ব্বযুগে চলিত। তাঁহাদের আমলে চিত্রকলার অবস্থা কিরূপ ছিল? এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান এবং সংগ্রহ হয় নাই।

ইতালীয় শিল্প ধর্ম্ম-শিল্প। ধর্ম্মজীবনের আনুষঙ্গিকভাবেই এই শিল্পের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু ওলন্দাজদিগের চিত্রকলায় ধর্ম্মজগৎ বিশেষ স্থান পায় নাই। তাঁহারা কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, গৃহস্থালী, সমাজজীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদিই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাঁদের একজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম রেম্ব্রাণ্ড। রেম্ব্রাণ্ড আলোকের পার্শ্বেই অন্ধকার দেখাইতে বিশেষ ভালবাসেন। ইহাঁরা চিত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক অংশ অতি নিখুঁতভাবে আঁকিয়া থাকেন। দুই চারিটা রেখা টানিয়া সঙ্কেতে বুঝাইতে ইহাঁরা চেষ্টা করেন না। চিত্রে কোন বৃক্ষ আঁকিলে তাহার প্রত্যেকটি পত্র ইহাঁরা দেখাইয়া থাকেন। এক একটি চিত্রের জন্য ইহারা যথেষ্ট সময় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন। চিত্র দেখিয়া ইহাঁদিগকে কষ্টসহিষ্ণু জাতি বলিয়া অনুমান করা যায়।

ইতালীর ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্পের যুগগত হইলে স্পেন ও হল্যাণ্ড ইউরোপের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই

দুই প্রদেশের লোকেরাই ইউরোপে ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, ধনসম্পদ, নৌশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে অগ্রণী। তখনও ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। অনতিদূর ভবিষ্যতেই ফ্রান্স ইউরোপের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন,— ইংলণ্ডের কাল তখনও বহু ভবিষ্যতে।

কনষ্টান্টিনোপল মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে ইতালীর গৌরব নষ্ট হয়। ভূমধ্যসাগরের পথ ত্যাগ করিয়া ইউরোপীয়েরা নূতন পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ আমেরিকায় এবং ভারতে আসিবার নূতন পন্থার আবিষ্কার। এই নবযুগের নূতন উদ্যমে স্পেন এবং হল্যাণ্ডই পথপ্রদর্শক। এইজন্য মধ্যযুগের অবসানে এই দুই জাতির প্রাধান্য ইউরোপে দেখিতে পাই।

ইতিমধ্যে ইউরোপে ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মসংগ্রামে রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে। ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার ভিতর স্পেন রহিয়া গেলেন প্রাচীন ক্যাথলিক মতাবলম্বী, হল্যাণ্ড নূতন সংস্কারবাদীদিগের মত অবলম্বন করিলেন। এই নূতন মতে দেবদেবী, মূর্ত্তি, উপাসনা, ভক্তি, সাধু ইত্যাদি সকল বিষয়েই ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কাজেই হল্যাণ্ডের চিত্রকলায় ইতালীয় ধর্ম্ম-শিল্প বা ভক্তি-তত্ত্ব পাই না। তাঁহারা নাগরিক আঁকিয়াছেন, নাবিক আঁকিয়াছেন, প্রেমিক আঁকিয়াছেন, কৃষক আঁকিয়াছেন। আমরা ওলন্দাজশিল্প দেখিয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজদিগের আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থা বেশী বুঝিলাম। তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা যে নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য রোমাণ-ক্যাথলিক-রীতির মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক

হয় না। এজন্য তাঁহাদের শিল্পে মেরী, শিশু, সাধুসন্ত মহাপুরুষ, ক্রশ, বলিদান ইত্যাদির পরিচয় নাই।

কিন্তু ঐ যুগের স্পেনীয় চিত্রে কি দেখিলাম? সেই ইতালীয় ধর্ম্ম-শিল্পই স্পেনে তখনও বর্ত্তমান। তাঁহাদের চিত্রকলায় প্রধানতঃ মেরিতত্ত্ব এবং যীশুতত্ত্বই বুঝিতে পারা যায়।

মেরি-তত্ত্ব, যীশুতত্ত্ব, সাধুতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে ইতালীয় ও স্পেনীয় অনেক চিত্রই দেখিলাম। এই সকলের মধ্যে অবশ্য একটা সাধারণ ঐক্য ও সমতা নিশ্চয়ই আছে। সকল জাতির শিল্পী এক বাইবেল-বর্ণিত কাহিনীই চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু মূর্ত্তি-কল্পনায় সকলেই কোন এক আদর্শের নকল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। ইতালীয় ওস্তাদেরা পরস্পর নকল করিতেন না। স্পেনীয় ওস্তাদ ভেলাস্কোয়েজের রচনাও ইতালীয় শিল্প হইতে অনুকরণ নয়। বিষয়ের পরিকল্পনায়, আকৃতির সৌষ্ঠববিধানে, মুখশ্রীর ভাববিকাশে এক একজন এক এক-প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং মেরী-মূর্ত্তি অনেক প্রকার, যীশু মূর্ত্তি অনেক প্রকার, মহাত্মাগণের মূর্ত্তিও অনেক প্রকার।

আমাদের হিন্দুস্থানেও শিবমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং রামমূর্ত্তি সকল প্রদেশেই কি কোন এক আদর্শ অনুসারে অঙ্কিত বা গঠিত বা খোদিত হইয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন কারিগরের হাতে আমাদের প্রসিদ্ধ দেবদেবীগণ কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন আকার পাইয়াছেন। অবশ্য মোটের উপর এই বিভিন্নতার মধ্যে একটা শাস্ত্রীয় ঐক্য লক্ষ্য করা কঠিন হইবে না।

রুশ ঔপন্যাসিক

জয় বা পরাজয়, সফলতা বা বিফলতা সংসারের নিত্য ঘটনা। এই ঘটনাসমূহের প্রভাব মানবচরিত্রের উপর অত্যধিক। যদি কোন কার্য্যে সফল হই তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎ জীবন যেরূপ হইবে কার্য্যে বিফল হইলে তাহার ঠিক অন্যরূপ হইবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন"—নিয়মটা চিরকাল লোকের আদর্শ স্বরূপই রহিয়াছে। এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কারণ কার্য্যের সুফল বা কুফল মানুষের জীবনকে চিরকালই প্রবলভাবে গঠন করিয়া আসিয়াছে। সফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনে আর বিফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনে আকাশ পাতাল পার্থক্য। দুইএর চিন্তা, কর্ম্ম, হাবভাব, আশা আকাঙ্ক্ষা দুই ভিন্ন জগতের পদার্থ।

ব্যক্তিগতজীবনে সফলতা বিফলতার প্রভাব অনেক সময়ে আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। একজনের জীবনে আশা, উদ্যম, উৎসাহ দেখিয়া বুঝি এই ব্যক্তি পূর্ব্বে ক্রমাগত উন্নতির পথে উঠিয়াছে। আর একজনের মুখে বিষাদের ছায়া ও নৈরাশ্যের কালিমা দেখিয়া অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি যে তাহার হৃদয় পূর্ব্বে কোন ঘটনায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রায় সকলেই এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন।

এই দৃষ্টান্ত জাতিগত জীবনেও বড় কম নয়—বরং বেশী। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা জাতিগত জীবনের উপর সফলতা ও বিফলতার প্রভাব লক্ষ্য করিতে শিখি না। ঐতিহাসিকেরা, শিক্ষকেরা এবং রাষ্ট্র-

নীতিবিশারদেরা কোন জাতীয় চরিত্রের ভাল মন্দ আলোচনা করিতে যাইয়া তাহার গঠনে পূর্ব্ববর্ত্তী কৃতকার্য্যতা বা নৈরাশ্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন না।

একবার যে কোন উপায়ে গা ঝাড়িয়া দাঁড়াইতে পারিলে সমাজের মধ্যে নানা সদ্‌গুণের সঞ্চার হয়। আবার কোন কারণে পতন হইলে জাতির চরিত্রে নানা দোষ প্রবেশ করিতে থাকে। উত্থান ও পতনের ফলে জনগণের মধ্যে দুই স্বতন্ত্র প্রকার আব্‌হাওয়া সৃষ্ট হইয়া যায়।

লণ্ডনে আসিয়া একটি সফলতাপ্রাপ্ত জাতির সংশ্রবে ও মধ্যস্থলে বাস করিতেছি। গত শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ-সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথেই উঠিয়াছে। বিংশশতাব্দীর ইংরাজ সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ নহেন। বিংশশতাব্দীর ইংরাজ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরাজও নহেন। সেই সকল যুগে ইংরাজেরা ইউরোপের প্রধান জাতি ছিলেন না—ইংলণ্ড পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল না। তখন অন্যান্য জাতিপুঞ্জ ইউরোপে আধিপত্য করিত। কিন্তু উনবিংশশতাব্দীর প্রথম হইতে ইউরোপের বিজয়শ্রী ইংলণ্ডের হস্তে সৌভাগ্যপতাকা দান করিয়াছেন। তাহার ফলে ইংরাজ আজ জগতে সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি।

এই উচ্চ গৌরব ও মর্য্যাদালাভের দ্বারা ইংরাজচরিত্র কি কম গঠিত হইয়াছে?—জাতীয় জীবনে অনেক উচ্চ আদর্শ আসে নাই কি? উন্নতস্থানে উঠিলে তাহার জন্য মানুষের দায়িত্ব বাড়িয়া যায়। সেই সম্মান রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতে হয়। জগতে প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজজাতিকে উনবিংশশতাব্দীর সকল সময়ে সজাগ থাকিতে হইয়াছে।

কাজেই বিংশশতাব্দীতে লণ্ডন দেখিলে এক উন্নত এবং উন্নতি রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়ী জাতির

গুণরাশি ইহাঁদের ভিতর দেখিতে পাই। কুলী মজুর, ঝী চাকর, দোকানদার, গাড়োয়ান, পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত সকল লোকই শৃঙ্খলাপ্রিয়, ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতি বোধ হয়। অবশ্য কোন জাতির মধ্যে উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষ. সাহিত্যের রসবোধ, চিত্রকলার সৌন্দর্য্যোপলব্ধি ধর্ম্মজ্ঞান, পরোপকার ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া দুই চারিদিনের কার্য্য নয়। কিন্তু লোকের সঙ্গে লোকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহার, সৌজন্য শিষ্টাচার, বাধ্যতা, এই সকল গুণ এখানে একদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছি।

মানব-চরিত্রের বাহ্য দোষগুণই সহজে বিদেশীয়ের চোখে পড়ে। ইংরাজের বাহ্যগুণ দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ ভারতবাসী ইংরাজমাত্রকে ভারতবর্ষে হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা রূপে দেখিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে তাহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন চোখেই হিন্দুস্থানীরা ইংরাজকে দেখিবার সুযোগ পান। স্বদেশে ইহাঁদের ভয়ে ভারতবাসীরা গৃহে বসিয়া ভাত হজম করিতেও অপারগ। কিন্তু বিলাতে তাঁহাদেরই স্বজাতীয় কুলী মজুর ঝি চাকরদিগকে খাটাইতে পারেন। ভারতবাসীর জুতাব্রুশ করা হইতে পায়খানা পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সকল কাজ ইংরাজেরাই করিতেছে। তাহার উপর ইহারা প্রত্যেক কথায় মিষ্টভাবে 'Sir' শব্দ ব্যবহার করে। একে ইংরাজকে ভৃত্যরূপে দেখা তাহার উপর তাহাদের ভৃত্যোচিত নম্রতা—এই সকল কা'রণে ভারতবাসী ইংলণ্ডে আসিয়া চিত্তহারা হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

অধিকন্তু, ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের একটা অধীন দেশ তাহা প্রায় ইংরাজই জানেন না। দুই চারি দশজন ভারতকর্ম্মচারীর পরিবারস্থ লোকজন ব্যতীত বেশী লোক ভারতবর্ষের কথা শুনেনই নাই। সুতরাং ভারতবাসীরা সাধারণ ইংরাজের নিকট, ফরাসী, রুশ, চীনা, জাপানী ইত্যাদি কোন বিদেশীয় লোকমাত্রের ন্যায় বোধ হয়। ভারতবাসী

বিলাতে পরাধীনতা বিশেষ বুঝিতেই পারেন না। ফলতঃ ইঁহারা ইংরাজদিগের গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন।

অবশ্য চিত্ত-সম্মোহনের আর একটা কারণও আছে। ভারতবাসী ইংলণ্ডে যে যে বিষয়ে ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও গৌরব দেখিতে পান আমাদের সেই সেই বিষয়ে সামান্যমাত্র জ্ঞান নাই। উনবিংশশতাব্দীতে ইংলণ্ড এবং ইউরোপ ঠিক যতখানি উঠিয়াছে আমরা ঠিক ততখানি নামিয়াছি—একথা বলিলে ভুল হইবে কি? পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র নূতন শিল্প, নূতন বিজ্ঞান, নূতন প্রাসাদ, নূতন কলার বিকাশ নিত্য নিত্য হইতেছে। অথচ এই যুগে ভারতবর্ষে একটি একটি করিয়া সকল বিষয়ের পতন ও বিনাশ হইয়াছে। পাশ্চাত্যজগতে আশার সঞ্চার অনবরত হইতেছে—আমাদের সংসারে দারিদ্র্য দুঃখ ও নৈরাশ্যই চিরসহচর। এই সংসার হইতে ঐশ্বর্য্যের মহলে প্রথম পদার্পণ করিলে চোখ ঝলসিয়া যাইবে না কেন? পাশ্চাত্য সংসারকে স্বর্গ মনে হইবে না কেন? তখন কারণ বিবেচনা বা বিশ্লেষণ না করিয়াই স্বজাতিকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি হইবে এবং বিজয়ী উন্নত জাতিকে সর্ব্বাংশে অনুকরণ করা লক্ষ্য হইবে। ইহা ত অতি স্বাভাবিক।

সুতরাং আধুনিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের তুলনা না করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু ইংলণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য, জগদ্ব্যাপী বাণিজ্যসম্পদ, সুরম্য প্রাসাদাবলী এবং বিশাল দোকান বাজার কারখানা দেখিয়াও ভারতবাসীর হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। একবার মাথা তুলিতে পারিলে সকলেরই অভ্যুদয়-যুগ অনায়াসে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের এখন সেই অভ্যুদয়-যুগ চলিতেছে। সফলতাপ্রাপ্ত ইংরাজ-সমাজ এবং বিফলতাক্রান্ত ভারতবাসীর জীবনে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকিবে—ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখিলে ইংলণ্ডপ্রবাসী হিন্দুস্থানীর চিত্ত বিচলিত হইবে না।

পক্ষান্তরে, সফলতা, কৃতকার্য্যতা ইত্যাদির কোন কুফলও নাই কি? গভীরভাবে ইংরাজচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিব যে পরাধীন ভারতবাসীর সমাজে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে রাজার দেশেও তাহা অন্য আকারে যথেষ্ঠ বর্ত্তমান। ধন মান বিলাস সম্পদ সাম্রাজ্য নীতি, ইত্যাদির প্রভাব ইংরাজজাতিকে বেশ আক্রমণ করিয়াছে। সত্যই, অর্থ অনর্থের মূল। দাসত্ব এবং দারিদ্র্য গুণরাশিনাশী সন্দেহ নাই। কিন্তু সাম্রাজ্য ভোগ এবং প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষাও কম অনিষ্টজনক নয়।

আমাদের হোটেলে ইতিমধ্যে দু একদিন কতিপয় ইংরাজ ব্যবসায়-সমিতির সম্মিলন ও ভোজ হইয়া গিয়াছে। আজ দেখিলাম আমাদের স্বদেশী কংগ্রেস-ধুরন্ধরগণের সভা হইতেছে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণকে এই সভায় দেখা গেল।

এই বৎসর বিলাতে "ইণ্ডিয়া কাউন্সিল"-সংস্কার আরম্ভ হইবে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, শিপাহী বিদ্রোহের পর, এই কাউন্সিলের গঠন হইয়াছিল। তখন ইহার কার্য্যপরিচালনায় ভারতবাসীর কোন হাত ছিল না। এতদিন ভারতবাসীরা এই কাউন্সিলের মতামত গঠনে মুখ্যতঃ কোন অধিকার পান নাই। এইবার কংগ্রেসের ধুরন্ধরগণ বিলাতে ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছেন। ইঁহাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে ভারত-সচিবকে জানান হইয়াছে। ভারতবর্ষে মনোনীত ভারতবাসীদিগকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য-পদ প্রদান ইঁহারা ভিক্ষা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত, ইংলণ্ডের কোন কোন ভারতবন্ধু জন-নায়ক যাহাতে এই ভারতশাসনবিষয়ক সমিতিতে স্থান পান তাহার জন্যও ইঁহারা ব্যগ্র। যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে কর্ম্ম-চারী ছিলেন তাঁহাদিগকে এই সভায় সভ্য না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—এই মত কংগ্রেস হইতে প্রচারিত হইয়াছে।

ভারত প্রতিনিধিগণ ভারতসচিবকে জানাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার জন্য ভারতীয় সভ্য এবং ইংলণ্ডের ভারতবন্ধু ইংরাজ সভ্য এই দুই শ্রেণীর লোক নির্ব্বাচন অত্যাবশ্যক। অবশিষ্ট সভ্যগণকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ইচ্ছা নিযুক্ত করুন—তাহাতে ভারতবাসীর কোন আপত্তি নাই। তবে এই শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা সমান যেন থাকে।

সন্ধ্যাকালে রুশবন্ধুর গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল। গিয়া দেখিলাম তিনি ভারতীয় চিত্রকলা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে রুশ ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রুশিয়ার সর্ব্ববিখ্যাত দৈনিক পত্রে উহা প্রকাশিত হইবে। এই পত্রের পাঠক সংখ্যা ৩৫,০০০,০০০ !

এই পত্রের জন্য ইনি প্রতিমাসে ক্ষুদ্র বৃহৎ ৫।৬টি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। বিদেশীয় শিল্প, সমাজ, সাহিত্য, সঙ্গীত, রাষ্ট্র, কৃষি ইত্যাদি নানা বিষয়ে রুশিয়ার জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদান করা এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ইনি এই উদ্দেশ্যে ২।৩ বৎসর করিয়া ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করেন। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাইবেন। গমনাগমনের সমস্ত খরচ পত্রিকার কার্য্যালয় হইতে ইনি পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মাসিক বেতন ত আছেই। ইহাই ইঁহার প্রধান আয়।

অধিকন্তু ইনি একজন উপন্যাস-লেখক। উপন্যাস রচনা করিয়াও ইনি অর্থ উপার্জ্জন করেন। প্রধানতঃ মুসলমানী সমাজজীবন সম্বন্ধে ইনি গল্প লিখিয়া থাকেন। এইরূপ উপন্যাসের কাট্তি রুশিয়ায় মন্দ নয়।

সম্প্রতি ইনি রবীন্দ্রনাথের "Gardener" গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা রুশভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থই দেখিলাম। ইনি বলিলেন "আমিই—রবীন্দ্রনাথকে রুশিয়ার জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রচার করিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম—"আপনি কবে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম পরিচয় পান?" ইনি বলিলেন "যে দিন নোবেল পুরস্কারের ঘোষণা হয়। তাহার পরে আমি আমার একজন কবিবন্ধুকে "গীতাঞ্জলি" পাঠাই। এই কবি লিথুয়ানিয়া-প্রদেশবাসী। ইহাঁর চিন্তাপ্রণালী অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত। ইনি গ্রন্থ অনুবাদ করিলেন। ইতিমধ্যেই রুশ অনুবাদের তিন সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।"

ইনি "গার্ডেনার" খুলিয়া দেখাইলেন কোন্ কোন্ কবিতা ইনি অনুবাদ করিয়াছেন। "ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সম্মুখ পথে। আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বল কি মতে?"—শীর্ষক কবিতাটি ইহাঁর খুব ভাল লাগিয়াছে।

ইনি ফ্রান্সের সার্বোঁ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞানে উৎকর্ষের উপাধি পাইয়াছেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইহাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। দেখিলাম ইনি আমাদের প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দুরসায়নগ্রন্থও কিনিয়াছেন।

রুশ ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন "রুশিয়ায় সকলদিকেই বড় দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, সাহিত্য প্রতি দশবৎসরেই অত্যধিক বদলাইয়া যাইতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "পিটার দি গ্রেটের আমলের সাহিত্য-বীরগণ কি এখন আপনাদের পাঠক-সমাজে আদৃত হন না?" ইনি বলিলেন "তাহাদের ভাষা আজকাল বুঝা কঠিন।" আলোচনায় বুঝাগেল "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের আজকাল যে অবস্থা, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রুশ সাহিত্যসেবিগণেরও আধুনিক রুশিয়ায় সেই অবস্থা। কেবল লমনসফ কেন, করমসিন (১৭৬৬-১৮২৬) এবং জুকর্ষ্কি (১৭৮৩-১৮৫২) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সাহিত্যবীরগণের রচনা এক্ষণে রুশিয়ায় কেহ পাঠ করিতে চাহে না।

তারপর আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে গল্প হইল। ইংলণ্ডের লোকেরা রুশিয়ার শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বুঝিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহার আলোচনা হইল। আমি বলিলাম "লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Russian Review নামক ত্রৈমাসিক পত্র গত দুই বৎসরাবধি বাহির হইতেছে। কতিপয় রুশলেখকও ইংরাজিতে রুশিয়ার কথা প্রচার করিতেছেন। আপনি এই কাগজ খানা পাঠ করেন কি?" ইনি বলিলেন "প্রধানতঃ রাষ্ট্র নীতি, ও অর্থ-নীতি সম্বন্ধেই এই পত্রে প্রবন্ধাদি বাহির হয়। এজন্য আমি ইহা বিশেষ পছন্দ করি না। তবে Vinogradaff এর ন্যায় প্রসিদ্ধ রুশ অধ্যাপক যখন এই পত্রিকার কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহা নিশ্চয়ই সুসম্পাদিত হইতেছে বলিতে পারি।"

ইনি ইংরাজজাতিকে বড়ই চিন্তাহীন, কারুকার্য্যহীন, নীরস হাল্কা বিবেচনা করেন। ইনি বলিলেন "ইংরাজেরা আজকাল থিয়েটারে নিতান্ত চ্যাংড়ামির প্রশ্রয় দেয়। সামান্য সামান্য প্রেম-কাহিনী, হাস্য কৌতুক এবং আমোদ প্রমোদ ব্যতীত থিয়েটারে ইহারা অন্য কিছু চায় না। সেক্সপীয়ারের বিষাদাত্মক নাট্যগুলি জার্ম্মাণিতে, রুশিয়াতে, এমন কি জাপানেও আদৃত হইতেছে। কিন্তু ইংরাজেরা সেক্সপীয়ারকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইল একব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিয়া Midsummer Night's Dreamএর অভিনয় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহাতে বেশী লোক হইত না। এই অভিনয় সুচারুরূপে করিবার জন্য ইহাঁকে রুশিয়ায় সেক্সপীয়ারের নাট্য দেখিয়া আসিতে হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম "আপনি যে কথা বলিতেছেন সে হিসাবে বোধ হয় রুশিয়া এবং নরওয়ে ও সুইডেনের সাহিত্যই আধুনিক জগতে শ্রেষ্ঠ। আপনার স্বদেশীয় ঔপন্যাসিকগণ দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ক

গভীর ও জটিল প্রশ্নগুলিই আলোচনা করিয়া থাকেন। জীবনের আদর্শ, সমাজের ভবিষ্যৎ, লোকচরিত্র, জাতি-গঠন, দারিদ্র্যের নিবারণ, ঐশ্বর্য্যের কুফল এই সকল কথা ইব্‌সেন ও টলষ্টয়ের সমকক্ষগণ অতিবিস্তৃত রূপেই বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইঁহাদের সাহিত্যে মানবের চরিত্র, মানবের আদর্শ, মানবের সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে রুশ ও স্কাণ্ডিনাভিয়ার সাহিত্য আলোচিত হইতে থাকিলে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইব। অশিক্ষিত নরনারীগণের জীবন, অবনত সমাজের আকাঙ্ক্ষা, নিম্নশ্রেণীর মহত্ত্ব, গণ-শক্তির প্রভাব, ব্যক্তিমাত্রের সম্মানবোধ—ইত্যাদি নব নব আলোচ্য বিষয় ভারতীয় সাহিত্যে স্থান পাইবে।”

রুশ ঔপন্যাসিক বলিলেন “আপনারা আমাদের একজনমাত্র সাহিত্য-বীরকেই বেশী জানেন। কিন্তু টলষ্টয়ের অপেক্ষা মহত্তর চিন্তাবীর আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন। তাঁহারা টলষ্টয়েরই সমসাময়িক ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের যশ শীঘ্রই টলষ্টয়ের কীর্ত্তিকেও বোধ হয় লুপ্ত করিবে।”

আমি বলিলাম—“বোধ হয় তুর্গেনেভ (Turgenev) এবং দস্তয়েব্‌স্কি (Dostoyevski) এই দুই জন উপন্যাস লেখকের নাম করিতেছেন? ইঁহাদের রচনাবলী এবং জীবন ও সাহিত্যের সমালোচনা ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সকল গ্রন্থ এখনও প্রচারিত হয় নাই।”

ইনি বলিলেন “হাঁ—ইঁহাদের গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের কোন রচনায়ই পাইবেন না। বিলাতের কবি বার্ণার্ডশ সে দিন বলিয়াছিলেন আধুনিক ইংরাজী নভেল ও নাটক ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার জন্যই লিখিত হইয়া থাকে। ইহারা হ্যাম্‌লেটের

সঙ্গে ওফেলিয়ার বিবাহ দেখিতে চাহে। সেক্সপীয়ারের বিখ্যাত নাটক-খানা এই ইচ্ছানুসারে "সংশোধিত" করিয়া লইলে ইহারা "হ্যাম্‌লেটে"র অভিনয়ে খুসী হয়! কাজেই দস্তয়েবস্কি বা তুর্গেনেভ ইত্যাদির রচনা ইংরাজী সাহিত্যে আদৃত হওয়া কঠিন। ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মধ্যে এক ব্যক্তিও নাই যিনি মানবের সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতার দুরূহ তত্ত্বগুলি কলানৈপুণ্যের সহিত বিবৃত করিতে পারেন। দস্তয়েবস্কির Poor Folk ("দরিদ্র জনসাধারণ") বা The Rocollections of the House of the Dead ("কারা-গৃহের স্মৃতি") এবং তুর্গেনেভের Recollections of a sportsman ("শিকারীর আত্মকথা") ইত্যাদি লিখিবার ক্ষমতা কোন ইংরাজের নাই।"

মুসলমানী নাটক—
'কিস্মেত'

প্রাচ্য-দেশকে বুঝিবার জন্য ইংরাজেরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এসিয়ার হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান জাতিসমূহের জীবনকথা আজকাল ইংরাজ-সমাজে আদৃত হইতেছে। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস, এবং বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইবার জন্য বিলাতের জনগণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার নানা পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনে একটা "প্রাচ্য-সমিতি" গঠনের বিরাট আয়োজন চলিতেছে। তাহাতে ইংরাজ পণ্ডিতেরা প্রাচ্য মানবের আদর্শ, শিল্প, সাহিত্য, চিন্তাপদ্ধতি, কার্য্যপ্রণালী, সকল বিষয়ে গবেষণা করিবেন। এতদিন ইংরাজেরা ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং এমন কি রুশ অপেক্ষাও প্রাচ্য-দেশকে কম জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপের প্রায় সকলদেশেই এক বা একাধিক 'প্রাচ্য-সমিতি' আছে। কিন্তু ইংরাজসমাজে একটিও নাই। এইজন্য লর্ড কার্জন সে দিন এক প্রকাশ্য সভায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর মতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রাচ্যদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিল্প, ইতিহাস ও দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

যাহা হউক, কিছুদিন হইল জাপান, পারস্য, চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের প্রতি ইংলণ্ডের সুধীগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সে দিন একজন ইংরাজ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ইংলণ্ডে আদৃত হইবার কারণ

আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন ইংরাজের নববিকশিত প্রাচ্য-সমাদর-প্রবৃত্তিই ইহার মূল। তিনি ইংলণ্ডে প্রাচ্য-সমাজকে বুঝিবার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন—"Then came the talk about the Delhi Durbar, and the Durbar itself , and all that vague interest in Eastern art, Eastern thought and Eastern literature, which had been steadily, if quietly, growing since the opening up of Japan, concentrated upon India. Hence the success of *Kismet*, of pseudo-Oriental dances, of the Russian ballet and *Summurun*." দেখা যাইতেছে, ১৯০৫ সালে জাপানের জয়লাভের পর হইতেই ইংরাজেরা প্রাচ্যকে বুঝিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রাচ্যসমাজে এই জীবনস্পন্দন লক্ষ্য না করিলে ইংরাজজাতির মধ্যে এত শীঘ্র প্রাচ্যসমাদরের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ।

কাল রাত্রে "গ্লোব" থিয়েটারে 'kismet' দেখিতে গিয়াছিলাম। "কিস্‌মেতে"র আদর ইংরাজসমাজে খুব বেশী। 'গ্লোব' থিয়েটার 'স্যাভয়' থিয়েটারেরই মত—বাড়ীঘর, সাজ সরঞ্জাম, কার্য্যপরিচালনা, মঞ্চ, বসিবার স্থান ইত্যাদি সবই প্রায় একপ্রকার। দুইরাত্রেই থিয়েটারে লোক-সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। দর্শকগণের মধ্যে কাহাকেও কথাবার্ত্তায় অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল বোধ হইল না।

দুই থিয়েটারেই দেখিলাম—নৃত্যগীতে বা অভিনয়ে দর্শকেরা বিশেষ প্রীত হইলে অভিনেতারা যবনিকা-পতনের পরেও মঞ্চের উপর আসিয়া দর্শকগণকে অভিবাদন করিয়া যান। সার্কাসের অভিনেতারাও এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা বোধ হয় পাশ্চাত্যদেশের রীতি। কোন ব্যক্তির প্রশংসা পাইলে তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করা এই সমাজের

নিয়ম। এজন্য প্রশংসাপ্রাপ্ত নায়ক নায়িকা বা নটনটীরা অভিনয় বা নৃত্যগীতের পরক্ষণেই অবনতমস্তকে দর্শকগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ করেন।

সেদিন Midsummer Night's Dreamএর শেষ রজনী ছিল। অভিনয়ের পর কর্ম্মকর্ত্তা এবং অভিনেতারা সকলে মিলিয়া ড্রপসিনের সম্মুখে মঞ্চের উপর দাঁড়াইলেন। দর্শকেরাও সমবেত হইয়া প্রায় ৫ মিনিটকাল করতালি দ্বারা নিজেদের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। থিয়েটারের কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন "আপনারা এই বিখ্যাত নাটকের বর্ত্তমান নাট্যকারকে যে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, দুঃখের কথা তাহা নিজে দেখিবার জন্য তিনি উপস্থিত নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে পত্রদ্বারা আপনাদের প্রীতি জানাইব।" দেখিলাম পরদিন প্রত্যূষে টাইম্‌স-পত্রে এই উৎসাহ ও আনন্দের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

"কিস্মেতে"র অভিনয় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ইহা দেখিলে সমগ্র মুসলমান সভ্যতার চুম্বক দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত হইয়া যায়। মুসলমানজগতের এমন কোন ঘটনা বা দৃশ্য নাই—যাহা এই নাটকের ভিতর কোন না কোন আকারে সন্নিবেশিত হয় নাই। থিয়েটারের কর্ম্মকর্ত্তারাও এই অভিনয়কে সকলপ্রকারে খাঁটি মুসলমানসমাজের যথাযথ চিত্ররূপে দর্শকগণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বালিকা, হাটবাজার, বিচারালয়, জেলখানা, মসজিদ, কবর, নগর পল্লী, রাস্তাঘাট বাড়ীঘর—সবই এই অভিনয়ে ইংরাজের নিকট নূতন ও বিচিত্র বোধ হইবে। এই নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য অভিনয়ের ভিতর অসংখ্য নায়ক-নায়িকা, বালক-বালিকা, নটনটীর অবতারণা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র দুই চারিজন মুসলমান স্ত্রী পুরুষ দেখিলে মুসলমান সভ্যতার চিত্র বিদেশীয়-

গণের নিকট পরিস্ফুট হওয়া কঠিন। কিন্তু নানা-সম্প্রদায়ের নানা-ব্যবসায়ের, নানা-চরিত্রের, নানা-বয়সের নানা-নরনারীকে চোখের সম্মুখে নানাপ্রকার কার্য্যে ও চিন্তায় ব্যাপৃত দেখিলে ঐ সমাজের সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং খুঁটিনাটিই চিত্তের মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এজন্য 'কিস্মেত' দেখিয়া ইংরাজেরা মুসলমানজগৎকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার সুযোগ পাইতেছেন। আমরাও তিনঘণ্টার জন্য বিলাত ছাড়িয়া মিশর, এশিয়ামাইনার এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বিচরণ করিলাম। আমাদেরই সুপরিচিত লোকজন আমাদের সম্মুখে বিরাজমান দেখিলাম।

কোন চিত্রে মুসলমানসমাজে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বুঝা যায়। কোন অভিনয়ে রাজা প্রজার সম্বন্ধ পরিস্ফুট। ইংরাজেরা মুসলমানী শিল্প, উপাসনাপদ্ধতি, চিত্রাঙ্কন, ব্যবসায়, এবং হাট বাজার করাও দেখিবার অবসর পাইলেন। রাষ্ট্রের পরিচালনা, মন্ত্রী বা উজিরের অবস্থা, ষড়যন্ত্র, বিচারপদ্ধতি এসব পরিষ্কাররূপেই বুঝা গেল। রমণীজাতির অবস্থা, তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, স্ত্রীস্বামীর সম্বন্ধ, বিবাহের নিয়ম, গৃহস্থালী ইত্যাদি পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনও সুন্দররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, একটা নূতন জাতিকে বুঝিতে হইলে যতগুলি বিষয় জানা আবশ্যক সকল গুলিই এই নাটকে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে।

নাট্যকারকে প্রশংসা বেশী করিব কি থিয়েটারের কার্য্যাধ্যক্ষকে বেশী প্রশংসা করিব বুঝিতে পারিতেছি না। নাট্যকারের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কার্য্যাধ্যক্ষও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কোন কোন দৃশ্যে প্রায় চল্লিশজন আবালবৃদ্ধবনিতার প্রবেশ দেখান বড় সহজ কথা নয়। প্রত্যেককে আবার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে, ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে লিপ্ত দেখান আরও কঠিন। এই অভিনয়ে দেখিলাম,

কোন এক ফকিরের চেহারা বা পোষাক আর একজন ফকিরের অনুরূপ নয়। কোন এক রমণীর চাল চলন অন্য রমণীর চাল চলনের মত নয়। কোন এক ভৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ বা চরিত্রও অন্য কোন ভৃত্যের সাজ সজ্জার মত নয়। এত বৈচিত্র্য ও এত বিভিন্নতা না দেখাইতে পারিলে কি একটা বিদেশীয় সমাজের বাহ্য জীবন এবং ভিতরকার জীবন কোন সম্পূর্ণ নূতন সমাজের নিকট বুঝান যায়?

কলিকাতার কোন থিয়েটারে খাঁটি রুশ সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে একটা অভিনয় করিতে হইলে গ্লোব থিয়েটারের এই প্রয়াসের অনুরূপ কার্য্য করা হইবে। প্রথমত রুশজাতির সম্বন্ধে কত বিষয় জানা আবশ্যক? দ্বিতীয়তঃ, তাহা বুঝাইবার জন্য কত সরঞ্জাম আবশ্যক? এই কথাগুলি বুঝিলেই গ্লোব থিয়েটারের কিস্মেত অভিনয়ের মাহাত্ম্য বুঝা যাইবে।

আর একটা বিষয়ও লক্ষ্য করিলাম। মুসলমান সমাজকে বিদ্রূপ বা তিরস্কার করিবার জন্য এই নাটক প্রণীত হয় নাই। ইহা একটা 'caricature' 'নক্সা' বা প্রহসন মাত্র নয়। ইংরাজকে মজারগল্প শুনাইবার জন্যই নাট্যকারের প্রয়াস ছিল না। তিনি মুসলমান জাতির একটা যথাসম্ভব সত্য বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দর্শকেরা প্রকৃত মুসলমানগণের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পরিচয় পাইতেছেন।

ইংরাজ-সমাজে এবং মুসলমান-সমাজে প্রায় কোন বিষয়েই সাদৃশ্য নাই। এজন্য নায়ক নায়িকাগণের কাজকর্ম্ম হাবভাব ইত্যাদি বুঝিতে ইংরাজ দর্শকদিগের কিছু কষ্ট পাইতে হয়। অনেক ঘটনা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতে বাধ্য। কিন্তু বিস্ময় বা হাস্য বিদ্রূপ বা অবজ্ঞার ফল নয়। সম্পূর্ণ পৃথক জীবনযাত্রাপদ্ধতির প্রথম পরিচয় পাইয়া সকলেই এইরূপ আশ্চর্য্য হইয়া থাকে।

মানবজাতির একটা নূতন শাখা সম্বন্ধে ইংরাজ-জনগণ এই অভিনয় দেখিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতেছেন। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান-সভ্যতার একটা মিউজিয়াম, সংগ্রহালয় বা প্রদর্শনী। ইতিহাসের নানা-গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিক্ষিত ইংরাজেরা যত শিখিয়াছেন এই অভিনয় দেখিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাহা অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। ইহাই কিস্মেত অভিনয়ের বিশেষত্ব ও গৌরব।

কিন্তু এই খানেই অবার ইহার অসম্পূর্ণতা। একটা বায়স্কোপের যে ফল, একটা সিনেম্যাটোগ্রাফের যে ফল, এই অভিনয়েরও ঠিক সেই ফল বুঝিতে পারিলাম। থিয়েটারের অভিনয়-কলাকে সাধারণ দৃশ্য-প্রদর্শনের সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে। কাজেই উচ্চ অঙ্গের অভিনয়-রীতির স্থান এই নাটকে অত্যল্প। ছবি দেখা, বিচরণশীল মূর্ত্তি দেখা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দৃশ্য দেখা, নানা জাতির স্বভাব দেখা, বিচিত্র রীতিনীতির সজীব বিবরণ দেখা—এই সমুদয়ই কিস্মেতের প্রাণ।

কিস্মেতে কাব্যকলা অপেক্ষা এবং নাট্যশিল্প অপেক্ষা ম্যাজিক-লণ্ঠনের দ্বারা চিত্রপ্রদর্শনের ভাব বেশী পাইলাম। তাহার দ্বারা জিনিষগুলি খুব ভালরূপেই মনে স্থান পায় সত্য; কিন্তু কাব্য হিসাবে, অভিনেতাদিগের কৌশল হিসাবে, নাট্যকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা হিসাবে, নাটকের গল্প-রচনা হিসাবে এই অভিনয় হইতে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই না। কেবল নাচ, গান, লোক পরিবর্ত্তন, দৃশ্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। প্রত্যেক দৃশ্যেই নূতন নূতন জিনিষ দেখিয়া প্রীত হইতেছি। যেন এক নিঃশ্বাসে মিশরের সকল নগর ঘুরিয়া আসিলাম। গল্পাংশের পারম্পর্য্য মনে না রাখিলেও ক্ষতি হয় না। যেখানে সেখানেই চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও দৃশ্য পাওয়া যায়।

কাজেই কিস্মেত দেখিয়া মোটের উপর দুইটা ধারণা স্পষ্ট হইল।

প্রথমতঃ ইংরাজজাতি অন্য সমাজকে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। তাঁহাদের কবি ও লেখকগণ বিদেশীয় সমাজের তথ্যসংগ্রহে নিপুণ। থিয়েটারের কার্য্যাধ্যক্ষ, এবং বায়স্কোপ ও সিনেম্যাটোগ্রাফের প্রদর্শকগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের তথ্যসম্বন্ধে যথার্থ চিত্র সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট। বিশেষতঃ এই চিত্রগুলির ভিতরকার কথা বুঝিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের আছে। এই কার্য্যে তাঁহারা নিতান্ত গোলমেলে খিচুড়ি সৃষ্টি করেন না, অথবা "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চাপান না। পরকীয় সমাজের নানা দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া ইঁহারা তাহার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সুসম্বদ্ধ চিত্র প্রদান করিতে সমর্থ।

দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী সাহিত্যে মানব-সমাজের গভীরতম তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয় কি না সন্দেহ। নাট্যের দ্বারা চরিত্র গঠন করা, লোকমত তৈয়ারী করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না। দর্শকেরা সারা দিনের কর্ম্মের পর রাত্রে আনন্দ উপভোগ করিতে আসেন। চিন্তাপূর্ণ নাটক দেখিতে ইঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। Midsummer Night's Dream এবং Kismeth দুই-ই এই ধারণা বদ্ধমূল করিল। থিয়েটার বর্ত্তমান বিলাতে শিক্ষালয় নহে—নরনারীগণের বিলাসভবন। কাফি গৃহের ন্যায় সময় কাটাইবার একটা আড্ডা।

অবশ্য কিস্মেতের গল্পাংশ সাধারণ ইংরাজের অপরিচিত কোন সভ্যতারই একটা চিত্র। ইহাতে 'উজীরে'র বিচার দেখিলাম। 'খলিফা'র শোভাযাত্রা দেখিলাম, মসজিদে নামাজ পাঠ শুনিলাম। ইহার ভিতর বাজারের মধ্যস্থলে দোকানদারগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হাতাহাতি আছে। উজীরে খলিফায় রেষারেষির চিত্র আছে। ডাকাত সর্দ্দারের অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী এবং লোমহর্ষণ কার্য্যাবলী আছে। তাহার উপর, গুপ্ত প্রেম ও বেগম মহলের অসদ্ব্যবহার ত আছেই।

মোটের উপর আখ্যায়িকাভাগ ইংরাজ-দর্শকগণের সুবোধ্য না হউক চিত্তরঞ্জন করিতে বাধ্য। কিন্তু নাটকে ঘটনার জটিলতা বা বহুলতা নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণের চেষ্টা নাই। কোন আর্থিক বা সামাজিক সমস্যার অবতারণা করা হয় নাই। সাদাসিধাভাবে একটা গল্প বলিয়া যাওয়া হইয়াছে। গল্পের ভিতর দিয়া কোন আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিতে পাই না। ডাকাত-বীর হাজের অদ্ভুত জীবনযাত্রাই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজেরা এইরূপ নাটকে কি শিখিতেছেন? নূতন দেশের পরিচয় পাওয়া ছাড়া তাঁহাদের জীবনে নূতন কোন আদর্শ ও ধারণা প্রবেশ করিতেছে কি? বাস্তবিক, নাট্য-সাহিত্য হিসাবে "কিস্মেত" ইংরাজের অবনত অবস্থারই সাক্ষ্য। ইংরাজজীবন বড় ফাঁপা ও আদর্শ-হীন হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডনে একজন হিন্দু ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি এখানে সাত বৎসর বাস করিতেছেন। তাঁহার গৃহে আজ নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার সময়ে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা কাল এখানে গল্প হইল। গিয়া দেখিলাম ব্যারিষ্টার ও ব্যারিষ্টার-পত্নী স্বহস্তে বাগান প্রস্তুত করিতেছেন। রমণী ভারতীয় সাড়ী পরিধান করেন। 'মডার্ণরিভিউ' এবং কুমার স্বামীর গ্রন্থনিচয়ে প্রকাশিত বহু ভারতীয় চিত্র ইহাঁর গৃহের নানা স্থানে ঝুলান রহিয়াছে।

এই গৃহটি ইহাঁদের নিজের সম্পত্তি। আট দশ কামরা আছে। গোল্ডার্সগ্রীণ মহাল্লার ন্যায় একটা নিভৃত পল্লীতে ইহা অবস্থিত। নগরের কোলাহল অথবা ধূম-ধূলি এখানে বেশী প্রবেশ করে না। পরিষ্কার রাস্তার দুইধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরসমূহের সারি। এইরূপ এক একটা কুটীরের মাসিক ভাড়া প্রায় ১২৫৲। দার্জ্জিলিঙ্গ সিমলা অপেক্ষা বাড়ীভাড়া এখানে বেশী নয়।

ব্যারিষ্টার-পত্নী আমাদের আহারান্তে বীণা বাজাইলেন এবং গান শুনাইলেন। হিন্দী ও বাঙ্গালা গান হইল।

ইনি 'সাফ্রেগিট্'—রমণী জাতির অধিকার প্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। লণ্ডনের রমণী-ধুরন্ধরগণের সঙ্গে ইঁহার বেশ বন্ধুত্ব আছে।

ইংরাজ-সমাজের অনেক তথ্য ইঁহাদের নিকট পাওয়া গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্রমশঃ ভারতের প্রাচীন আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে এই-রূপ ইঁহাদের মত। Back to the country, Back to the Land, Back to Nature, Back to the Family ইত্যাদি স্বর এ সমাজে আজকাল প্রায়ই শুনা যায়। এখানকার ভূমি-সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য প্রস্তাব হইতেছে—প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু সম্পত্তি থাকা আবশ্যক। সাধারণ ইংরাজপরিবারে গৃহস্থালীর অংশ একটুকুও নাই। দোকান ও হোটেল হইতে খাদ্যদ্রব্য সবই আনা হয়—রন্ধনাদি কার্য্য প্রায় গৃহেই করিতে হয় না। রমণীরা সমস্তদিন এখানে ওখানে যাহার তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়—অথবা আফিসে, দোকানে, হোটেলে, টাইপ্‌রাইটিঙ্গ, কেরাণী-গিরি ইত্যাদির কার্য্য করে। এইরূপ জীবন যাপন অপেক্ষা গৃহে বসিয়া স্বামী পুত্র কন্যাগণের জন্য রন্ধনাদি করাই শ্রেয়স্কর—আজকাল ইংরাজগণ এরূপ ভাবিতে শিখিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কেম্ব্রিজের আব্‌হাওয়া

বহির্দ্দৃশ্য

রবিবারে লণ্ডন জনপ্রাণী হীন। আজ কেম্ব্রিজে আসিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিতে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইল: রাস্তাঘাটে লোকের যাতায়াত একেবারেই নাই। সমস্ত নগর যেন নিদ্রিত। দোকান ঘর সবই বন্ধ। মহানগরীর এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারি নাই।

কেম্ব্রিজে পৌঁছিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। রেল-পথের দুইধারে লণ্ডনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণস্বরূপ পল্লীসমূহ দেখা গেল। ফরাসী দেশে যেরূপ দৃশ্য দেখিয়াছি এখানকার দৃশ্য সেরূপ নয়। প্রথমতঃ গৃহগুলির ছাদের আকার কথঞ্চিৎ ভিন্ন। অনেকগুলি গৃহ পরে পরে একসঙ্গে সাজান। কিন্তু ফ্রান্সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে গৃহগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়তঃ এখানে কলকারখানা, ধূমের চিম্‌নী ইত্যাদির সংখ্যা অধিক। ফ্রান্সে এসব বেশী দেখি নাই। তৃতীয়তঃ, আজকাল ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে বসন্ত বা গ্রীষ্মকাল চলিতেছে—মোটের উপর উভয় দেশই হরিদ্বর্ণ উদ্যান ও বনভূমিতে সুশোভিত দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ইংলণ্ডে কৃষিকর্ম্ম

ফ্রান্সের মত বিচিত্র ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নয়; দেখিতে ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সই বেশী সুশ্রী।

১২টার সময়ে কেম্ব্রিজে পৌঁছিলাম। ক্ষুদ্র ষ্টেসন—কোন জাঁক জমক নাই। ষ্টেসনের বাহিরেও সহরের কলরব বা জনস্রোত নাই। নিতান্তই নীরব পল্লীগ্রাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলির সংখ্যাই বেশী। তাহাদের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপোতাবাসস্বরূপ বোর্ডিং-গৃহ। হোটেল, কাফিগৃহ, দোকান বাজার ইত্যাদি বিশেষ সম্পদ্‌বিশিষ্ট নয়। শিল্প, ব্যবসায় বা বাণিজ্যের কোন অনুষ্ঠানই বোধ হয় এখানে নাই।

কেম্ব্রিজও রবিবারে লণ্ডনের ন্যায় জনপ্রাণীহীন। দোকান হোটেল সবই বন্ধ। বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম। আজ আসিব তাঁহার জানা ছিল না। কাজেই আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই। কোন ছাত্রাবাসে একটুকুমাত্র খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেল না। দোকান সব বন্ধ— রবিবারে একটা ফল পর্য্যন্ত কোথাও কিনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনাহারে কাটাইতে হইল। হঠাৎ এক বন্ধু খবর দিলেন "কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নে"র হোটেলে খানা এখনও শেষ হয় নাই। সেখানে গেলে কিছু পাওয়া যাইতে পারে।" এখানে আসিয়া দুই একটা ফল আহার করা গেল।

পরে ইউনিয়নের এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিলাম। ইউনিয়নের গৃহ ছাত্রগণের নিজ চাঁদায় তৈয়ারী। ইহার গ্রন্থাগার মন্দ নয়। ইউনিয়নের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহারা স্বহস্তে স্বাক্ষরিত নিজ নিজ গ্রন্থ বা উপহার বা অন্য কোন স্মরণ চিহ্ন পাঠাইয়াছেন। সেগুলি কাচের আলমারীতে সাজান রহিয়াছে। লাইব্রেরীতে বসিয়া প্রায় ৭।৮ জন ছাত্র লেখা পড়া করিতেছিল।

এই ইউনিয়ানে কেম্ব্রিজবিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যে কোন ছাত্র যোগ

দান করিতে পারে। বার্ষিক চাঁদা স্থিরীকৃত আছে। ছাত্রগণের ভিতর হইতেই সভাপতি ইত্যাদি নির্ব্বাচিত হন। পার্লামেণ্ট মহাসভার নিয়মে ইহার কাজ কর্ম্ম চলিয়া থাকে।

এখান হইতে বাহির হইয়া ট্রিনিটি কলেজের ভিতর দিয়া ক্যাম-নদীর ধারে গেলাম। কলেজের মধ্যে ধর্ম্মমন্দির প্রধান অংশ। তার পর ছাত্রগণের জন্য আবাসগৃহ ও ভোজনালয়। কলেজ বলিলে আমরা কতকগুলি লেখাপড়া করিবার জন্য বেঞ্চটুলযুক্ত গৃহ বা বক্তৃতালয় বুঝি। ট্রিনিটি কলেজে সেরূপ বক্তৃতালয় ও পাঠাগার বোধ হয় ২।৪ টা মাত্র। এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রধান অংশ ছাত্রাবাসের জন্য নির্ম্মিত।

ছাত্রেরা সকলেই কলেজে থাকিবার স্থান অনেক সময়ে পায় না। তাহারা বাহিরে খুঁজিয়া বোর্ডিংগৃহ সংগ্রহ করে। এইরূপ বোর্ডিং: গৃহের সংখ্যা কেম্ব্রিজে অল্প নয়। সকল ছাত্রকেই এক শাসন মানিয়া চলিতে হয়।

ট্রিনিটি কলেজের মত ২০টা কলেজ কেম্ব্রিজ-পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। এই সকলগুলি লইয়া কেম্ব্রিজবিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। যে-কোন কলেজের ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলা হয়। যে-কোন কলেজের ছাত্র ইচ্ছা করিলে যে-কোন কলেজের যে-কোন অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে।

প্রত্যেক কলেজে ছাত্রাবাসই অট্টালিকার প্রধান অংশ—বক্তৃতাগৃহ অত্যল্প। কিন্তু সমগ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কলেজের বক্তৃতালয়, ইত্যাদিতে যে কোন ছাত্র আসিতে অধিকারী। কাজেই কোন কলেজে বক্তৃতালয় বেশী না থাকলেও ক্ষতি নাই। মোটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতালয় সংখ্যা সন্তোষজনক। এতদ্ব্যতীত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং ল্যাবরেটরীও আছে। কোন কলেজের স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরী নাই।

ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রেরা এই কলেজের অন্তর্গত ছাত্রাবাসে অথবা ইহার পরিচালিত নগরের বোর্ডিংগৃহে থাকিতে বাধ্য। লেখা পড়া সম্বন্ধে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। অন্যান্য কলেজের বক্তৃতালয়ে যাইয়া নিজ অভিপ্রায় মত অধ্যাপকগণের নিকট বক্তৃতা শুনিতে পারে। এমন কি, কোন বক্তৃতালয়ে না গেলেও ছাত্রদিগকে বাধ্য করিবার কোন নিয়ম নাই।

ট্রিনিটি কলেজের পশ্চাতেই একটা ক্ষুদ্র নালা প্রায় ৮।১০ হাত প্রশস্ত। ইহার নাম ক্যাম-নদী! কয়েকটা বাধান সাঁকো নদীর উপর দেখিতে পাইলাম। অপরিষ্কার শৈবালপূর্ণ জলরাশির উপর সাধারণ ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু দেখিয়া নর্দ্দমার চিত্র মনে পড়িল।

নদীবক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা। তাহার মধ্যে ২।৩।৪ জন ছাত্র ও ছাত্রী বসিয়া বই পড়িতেছে বা শুইয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। প্রতিদিনই ক্যাম-নদীর ধারে এবং নদীবক্ষে বহুসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী এইরূপে স্ফূর্ত্তি করে। কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয় না। অতি সহজেই তাহারা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে। কাজেই জলক্রীড়া, নৌকাচালান, বেড়ান, গল্প করা ইত্যাদি এখানে সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। ইহার নাম 'ইউনিভার্সিটি লাইফ' বা বিশ্ববিদ্যায়ের আবহাওয়া।

সেতু পার হইয়া এল্‌ম্‌ বৃক্ষ-শ্রেণীর ভিতর দিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিলাম। এই অঞ্চলকে backs বা পশ্চাদ্ভাগের বনভূমি বলে। এই বাগানে ছাত্রেরা রবিবার ভিন্ন প্রবেশ করিতে পায় না। অন্যান্য দিন অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষেরা এই বাগান ব্যবহার করেন। বাগানের কোথাও কুঞ্জবন, কোথাও মাঠ, কোথাও বক্র পথ। মাঝে মাঝে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। এইরূপ একটা বেঞ্চে বসিয়া একজন পাঞ্জাবী

ছাত্রের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম। ইনি লাহোর হইতে ১৮ বৎসর বয়সে এম্, এ পাশ করিয়া এখানে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপস্ (বা অনার) কোর্স অধ্যয়ন করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সিবিল সার্ব্বিসের চেষ্টাও আছে। দেখিতে দেখিতে দুইজন মান্দ্রাজী ছাত্র আসিলেন। ইহাঁদের একজন ইতিমধ্যে সিবিল সার্ব্বিস পাশ হইয়াছেন। নবেম্বর মাসে কর্ম্ম-স্থলে গমন করিবেন। ইহাঁদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই বাগানে ইংরাজ-জাতির কত বড় বড় লোক বিচরণ করিয়া গিয়াছেন! এই এল্ম্-তরুসমূহ কত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের স্মৃতি বহন করিয়া দণ্ডায়মান! কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা ইহা হইতে কোন উৎসাহ পায় কি?

আজকাল পৃথিবীতে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে কাইরো নগরের "এল্-আজার" বা মস্‌জিদ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্ব প্রাচীন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইহার প্রতিষ্ঠা। তারপর নবমশতাব্দীতে প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। তাহারও দুই শতাব্দীর পরে কেম্ব্রিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রাচীন কলেজের নাম "সেইণ্টপিটারহল-কলেজ।" বলাবাহুল্য, আমাদের তক্ষশীলা ও নালন্দা এবং মুসলমানদিগের এল-আজার ইত্যাদি বিদ্যালয়ের ন্যায় কেম্ব্রিজ-বিদ্যালয় প্রথম অবস্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম শিক্ষারই একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। কাজেই গির্জ্জার প্রাধান্য এখানে খুব বেশী। প্রাচীন গৃহগুলি মঠের সন্ন্যাসিগণের বাসভবন স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন কথা ভাবিতে ভাবিতে হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী এবং মান্দ্রাজী বন্ধুগণের সঙ্গে ট্রিনিটি কলেজের অভ্যন্তরস্থ একটা ছাত্রগৃহে প্রবেশ করিলাম। কলিকাতায় ইডেন হিন্দু হোষ্টেল ইত্যাদি ছাত্রাবাস অপেক্ষা এখানকার ঘরগুলি স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইল না। এখানে একজন

মান্দ্রাজীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি গণিতশাস্ত্রে প্রতিভাবান্। ইহাঁর অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক মুগ্ধ হন। তাহার ফলে ইহাঁকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া এখানে রাখা হইয়াছে।

ইনি মান্দ্রাজের কোন কার্য্যালয়ে ৩০৲ টাকা মাসিক বেতনে চাকরী করিতেন। এণ্ট্র্যান্স পাশও করা ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে গণিতের চর্চ্চা করিতে করিতে অনেক নূতন দিকে মাথা খুলিয়া যায়। পরে গণিতে বিশেষজ্ঞদিগের সঙ্গে চিঠিপত্র চলিতে থাকে। অবশেষে ইহাঁর আলোচনায় প্রীত হইয়া কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক ইহাঁর জন্য 'সাইজার' বৃত্তি (Sizar) প্রদানের ব্যবস্থা করেন। নিতান্ত দরিদ্র কিন্তু যথার্থ মেধাবী ছাত্র না হইলে এই বৃত্তি কেহ পায় না। ইনি তিনবৎসর কাল এই বৃত্তি পাইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ইহাঁকে কোন লেখা পড়া করিতে হইবে না—পরীক্ষা দিতেও হইবে না। নিজের খেয়ালমত ইনি মৌলিক অনুসন্ধান করিতেছেন এবং ইহাঁর উৎসাহদাতা অধ্যাপককে তাঁহার গণিতচর্চ্চায় সাহায্য করিতেছেন। ইংরাজ অধ্যাপকের আন্তরিক গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইলাম।

রাত্রিকালে ভারতীয় ছাত্রদের পরিষৎ বা "ইণ্ডিয়ান্ মজলিশ" দেখিতে গেলাম। আলোচনা হইতেছে "ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত কিনা।" "মজলিশে"র অবস্থা ভাল নয়। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৫ জন ভারতীয় ছাত্র। তাহাব মধ্যে প্রায় ৭৫ জন মাত্র এই পরিষদের সভ্য। তাহার ভিতরও অর্দ্ধেকে চাঁদা দেন না! আজ রাত্রে উপস্থিত ২০ জন। দলাদলি, রেষারেষি, হামবড়াভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির ফলে এই প্রতিষ্ঠান মৃতপ্রায়।

ভারতীয় ছাত্রের লাভালাভ

কেম্ব্রিজে এ দুই দিন অত্যন্ত গরম। রৌদ্র তাপ এত বেশী যে পোষাক পরিয়া রাস্তায় বাহির হইলে ঘর্ম্মাক্ত হইতে হয়। শুনিলাম জুন মাসে আরও গরম পড়ে। গ্রীষ্মকালের দিবাভাগ আমাদের দেশীয় অবস্থারই অনুরূপ দেখিতেছি।

শ্রীযুক্ত য়্যাণ্ডার্সনের নাম আজকাল বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তিনি সিবিলসার্ভিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বাঙ্গালা ভাষা জানেন বলিয়া ইহাঁর গৌরব। ইনি কেম্ব্রিজে বাস করেন। ইনি কেম্ব্রিজে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু দেখিবার সুযোগ তৈয়ারী করিয়া দিবেন বলিলেন। আমি বলিলাম "কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-সপ্তাহে আমি এখানে এক সপ্তাহ কাটাইতে চাহি। সেই সময়ে আপনার সাহায্য পাইলে কৃতজ্ঞ হইব।"

য়্যাণ্ডার্সন সাহেব বঙ্কিমের উপন্যাস অনুবাদ করিতেছেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় এই অনুবাদ প্রকাশ হইতেছে। য়্যাণ্ডার্সন বঙ্কিম বা বঙ্গসাহিত্যের অন্য কোন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন না। ইনি বলিলেন "আজ কাল আমি ছন্দের আলোচনা করিতেছি। হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাতী ভাষার ছন্দোরীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু সাহায্য চাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজ নিজ পাঠে এত ব্যস্ত থাকে যে আমার এই কাজে সাহায্য করিবার সময় পায় না।"

ম্যাণ্ডার্সন সাহেবের উদ্যোগে এখানে একটা নৃতত্ত্ব-বিষয়ক মিউজিয়াম স্থাপিত হইতেছে। ভারতবর্ষের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, লোক জন, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সংস্কার ইত্যাদির কোন নিদর্শন এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এই সংগ্রহকার্য্যে ইনি কিছু সাহায্য চাহেন।

ম্যাণ্ডার্সনের পরামর্শ অনুসারে কিংস্ কলেজের অধ্যাপক ডিকিন্‌সনের নিকট গমন করিলাম। ইনিও এক হিসাবে ভারতবর্ষে সুপরিচিত। ইঁহার Letters from John Chinaman বা "চীনাম্যানের চিঠি" নামক গ্রন্থ ভারতবাসীরা আদর করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে ইউরোপীয় সভ্যতার এবং চীনা সভ্যতার তারতম্য দেখান হইয়াছে। তাহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের আদর্শ খানিকটা প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার গ্রন্থে ভাবুক হিন্দুগণ স্বকীয় সভ্যতার বীজমন্ত্র কিছু কিছু পাইবেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থও পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার গৃহে গিয়া দেখিলাম তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যস্ত। কাজেই কার্ড রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর দুইটি বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। প্রথমটির নাম Leys "লীস্।" প্রকাণ্ড উদ্যানের ভিতর এই পাঠশালা অবস্থিত। ইহার প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পূর্ব্বে পত্র পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু ২।৩ দিন হইল ইনি বাহিরে গিয়াছেন—কাজেই এ-যাত্রায় দেখা হইল না। অন্য একজন শিক্ষক আমাদিগকে সকল বস্তু দেখাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম "পরে যখন আসিব তখন দেখা যাইবে।" সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের জন্য একটা নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিত্তিস্থাপনের জন্য স্বয়ং রাজা কেম্ব্রিজে আসিয়াছিলেন। নবগৃহে প্রবেশ, নূতন অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপন, প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন ইত্যাদি

উৎসব-ব্যাপারে বিলাতের রাজা ও রাণী প্রায়ই আহূত হন। ইঁহারা প্রধানতঃ সমাজের এই সকল কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। রাষ্ট্র-পরিচালনায় ইঁহাদের হাত কিছুই নাই। পার্ল্যামেণ্ট, ক্যাবিনেট এবং প্রধান মন্ত্রীই রাষ্ট্র-শাসনের জন্য দায়ী। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রে রাজা সাক্ষীগোপাল মাত্র।

দ্বিতীয় বিদ্যালয়ের নাম Perse School বা পার্স-বিদ্যালয়। ইহার নাম কেম্ব্রিজে খুব বেশী। য্যাণ্ডার্সনও ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের গৃহ ও উদ্যানাদি সবই লীস-বিদ্যালয়ের অনুরূপ। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পার্স নামক একব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক Dr. Rouse কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত জানেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক। যাঁহারা সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য সংস্কৃত চর্চ্চা করেন তাঁহারা রাউসের নিকট শিখিয়া থাকেন। ইঁহার অনেক ছাত্র ভারতবর্ষে নানা কর্ম্ম করিতেছেন। প্রায় সকলেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

ইনি বলিলেন "আপনি ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ের যে কোন শ্রেণীতে যাইয়া আমাদের শিক্ষা-প্রণালী দেখিতে পারেন।" আমি বলিলাম "এ-যাত্রায় সময় অল্প। আগামী বারে দেখিবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি আপনার সঙ্গে গল্পের সাহায্যে যাহা জানিতে পারি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।"

ইনি ইংরাজী ফরাসী এবং অন্যান্য ভাষা শিখাইবার নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার কিছু বিবরণ গ্রহণ করিলাম। ইনি বলিলেন "ব্যাকরণ বাদ দিয়া ভাষা শিখাইবার রীতি আমি অবলম্বন করিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সাধারণতঃ কতবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রেরা আপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে ?" ইনি বলিলেন "উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রেরা এখানে থাকে। সাধারণতঃ ১৮ বৎসর বয়সে এখানে আসে। আমি আরও অল্পবয়সের ছাত্র চাহি; তিন বৎসর বয়স্ক ছাত্র সংখ্যাও আমার মন্দ নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি বেশী বয়সের ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চাহে তাহা হইলে কি করেন ?" ইনি উত্তর করিলেন "এরূপ ছাত্র প্রায়ই লহ না। কারণ আমাদের এখানকার শিক্ষাপ্রণালী অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; সুতরাং কাজ চালান বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের সঙ্গে আপনাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি ?" ইনি বলিলেন "ইংলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গেই আমাদের কোনরূপ সংশ্রব নাই। আমরা উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে যাহা শিখাইয়া থাকি তাহার ফলে ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা আছে। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের শিক্ষিত ছাত্রগণের পক্ষে কঠিন নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাদের ছাত্রেরা কি সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইবার জন্য ইচ্ছা করে ?" ইনি বলিলেন "প্রায়ই না। আমাদের বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর ৫০ জন ছাত্র বাহির হয়। তাহাদের মধ্যে ৭।৮ জন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করে। অবশিষ্ট ছাত্রেরা ব্যবসায়ে, শিল্পে, কৃষিকর্ম্মে, দোকানদারীতে লাগিতে যায়। অনেকে অষ্ট্রেলিয়া, নীউজীল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশে চাষ আবাদের কাজে নিযুক্ত হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিল্প এবং কৃষিকর্ম্মে অভ্যাস করান হয় কি ? কোন্ বয়সে ছাত্রেরা এই সমুদয় শিক্ষা করে ?" ইনি বলিলেন "শেষ তিন বৎসর এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাদের ছাত্রেরা সকলেই সকল বিষয় শিক্ষা করে। কাহাকেও কোন একটা বা দুইটা বিষয় বর্জ্জন করিতে দেওয়া হয় না—কাহাকেও কোন একটা বা দুইটা বিষয়ে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার প্রয়াস তখন আমরা করি না। চিত্রাঙ্কন, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, প্রাণী-তত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, আকর-তত্ত্ব ইত্যাদি সকল প্রকার বিজ্ঞান ১৬ বৎসর বয়স পয্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রই শিখিতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও গণিত ত আছেই। তাহার পর শেষ তিন বৎসর আমাদের কতকগুলি বিভাগ আছে। ছাত্রদিগকে এই সকল বিভাগের এক একটি মাত্র বাছিয়া লইতে বলা হয়। কেহ কৃষি, কেহ শিল্প, কেহ পদার্থ-বিজ্ঞান, কেহ গণিত, কেহ ইতিহাস ইত্যাদি গ্রহণ করে। এইরূপে তিন বৎসর শিক্ষা-লাভের পর যাহার যেরূপ অভিরুচি সে সেইরূপ শিক্ষায় ব্যবসায়ে বা কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া থাকে।

শিল্প শিক্ষার বিভাগ এখনও আমাদের অতি শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। শীঘ্রই আমরা ইহার উন্নতিবিধান করিব। কৃষি শিক্ষার জন্য আমাদের ব্যবস্থাও এখন পয্যন্ত বিশেষ উন্নত নয়। তবে আমাদের একটা সুবিধা আছে। আমরা কেম্ব্রিজবিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ল্যাবরেটরী ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং আমাদের পাঠশালায় উন্নত ল্যাবরেটরী না থাকায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিংস্ কলেজ, ট্রিনিটি কলেজ, ইত্যাদির ল্যাবরেটরীতে কি আপনাদের শিশু ছাত্রেরা যাইতে ও কাজ করিতে

পারে ?” ইনি বলিলেন “কিংস্ বা ট্রিনিটি বা অন্য কোন কলেজেই একটাও ল্যাবরেটরী নাই। ল্যাবরেটরীসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ-সম্পত্তি—কোন কলেজের সম্পত্তি নয়। সকল কলেজের ছাত্রদিগকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে হয়। আমাদের পাঠশালার জন্যও ঐরূপ অধিকার আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পাইয়াছি।”

আজ রমণী-বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। ইহা দেখা বড় কঠিন। স্ত্রী-ছাত্রের সঙ্গে আলাপ না থাকিলে এই বিদ্যালয়ে বা ছাত্রাবাসে প্রবেশ নিষেধ। সম্প্রতি এখানে একজন বাঙ্গালী কন্যা শিক্ষা পাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কিন্তু তিনি বাহিরে গিয়াছেন, দেখা হইল না।

এখানকার রমণী-বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা মন্দ নয়। কিন্তু কেম্ব্রিজের কড়া নিয়মে কোন ছাত্রীকে উপাধি প্রদান করা হয় না। স্ত্রীজাতির প্রতি অবিচার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এই বনিয়াদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান পাণ্ডা। সাফ্রেগেট-আন্দোলন এই সকল কারণেই সৃষ্ট হইয়াছে।

ফিরিবার সময়ে আজ আর একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের Backs বা পশ্চাদ্ভাগে স্থিত বনভূমির ভিতর প্রবেশ করিলাম। ক্যামনালাও আর একবার দেখিবার সুযোগ পাইলাম। খালবক্ষে সেই নৌকাশ্রেণী এবং ছাত্র ও ছাত্রীগণের জটলা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

সেতু পার হইয়া কিংস্ কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা গেল। প্রায় ৫টা বাজিতেছে—এমন সময়ে এই বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ গির্জ্জাঘরে গমন করিলাম। পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘাকৃতি অত্যুচ্চ অট্টালিকা—প্রাচীর গাত্রে নানা প্রকার মূর্ত্তি এবং রঙ্গিন কাচে ধর্ম্মচিত্র অঙ্কিত। বিশাল হর্ম্মের ভিতর সামান্য মাত্র আলোক প্রবেশ করিতেছে। মিল্টনের কথা মনে হইল—

"Storied windows richly dight
Casting a dim religious light."

যথাসময়ে বামদিক হইতে এক সারি শিশু শ্বেতবসনে আবৃত হইয়া পূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিল—ডাহিনদিক হইতে কিংস্ কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকগণও শ্বেত পোষাক পরিধান করিয়া প্রবেশ করিল। লম্বা গৃহের পূর্ব্বাংশে উপাসনাদি হয়—পশ্চিমাংশে দর্শকগণ বসিতে পায়। মধ্যস্থলে উচ্চস্থানে বিশাল অর্গ্যান—যন্ত্র, ইহা বাজিয়া উঠিল—পূর্ব্বাংশে উপাসনা আরম্ভ হইল। আমরা অনেকক্ষণ পশ্চিমার্দ্ধে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম।

এই উপাসনায় যোগদান করিতে খৃষ্টান ছাত্রেরা বাধ্য। সপ্তাহে অন্ততঃ ৫ দিন তাহারা ধর্ম্ম-মন্দিরে আসিয়া বসে। এই গৃহের নির্ম্মাণ-রীতি বিচিত্র। কারণ গির্জ্জাঘরের প্রধান অংশ ব্যতীত অন্য অংশগুলি এই গৃহে বুঝা যায় না। পার্শ্বগৃহ বা aislesগুলি এই nave বা প্রধান গৃহে বসিয়া দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা দেখিয়া বুঝিলাম যে ঐগুলি পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিবার পথ। কিন্তু দরজাগুলি বন্ধ থাকিলে মনে হয় এই মন্দিরে aisles নাই—একমাত্র naveই ইহার সম্বল। বাহির হইয়া দেখিলাম—aislesএর উপরকার ছাদগুলি এক নূতন রীতিতে নির্ম্মিত। naveএর ছাদ অপেক্ষা এই ছাদগুলি নিম্নতর এবং দূর হইতে ঢেউ কাটা ও গড়ান বোধ হয়। কাজেই মন্দিরের বহির্দৃশ্য চমৎকার। কিংস্ কলেজের এই চ্যাপেল সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। ইংরাজীসাহিত্যে তাহা প্রসিদ্ধ।

কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের ট্রাইপস বা অনার অর্থাৎ উচ্চতম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি দেখিলাম। আমাদের এম্, এ,

পরীক্ষার জন্য যে সকল প্রশ্নপত্র তৈয়ারী হয় তাহা অপেক্ষা এগুলি কঠিন মনে হয় না। এমন কি সেগুলি হইতে কোনরূপ পার্থক্য বুঝাও গেল না। আমাদের এম্, এ, উপাধিপ্রার্থী ছাত্রেরা যে-সকল গ্রন্থ পাঠ করে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম এখানকার ছাত্রেরা তদপেক্ষা বেশী কিছু পাঠ করে না। গ্রন্থসংখ্যা, প্রশ্নরীতি ইত্যাদি সবই মামুলি, চিরপরিচিত।

তবে কেম্ব্রিজ ইত্যাদির নামে আমাদের জিহ্বায় জল পড়ে কেন? প্রধান কারণ এখানকার শিক্ষকেরা সকলেই নিজ নিজ আলোচ্যবিষয়ে যথাসম্ভব বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকিতে চেষ্টা করেন। ইঁহাদের সময়, সুযোগ ও অর্থ বেশী। অধিকক্ষণ ব্যয় করিয়া, যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অধ্যাপকেরা বক্তৃতা প্রস্তুত করেন। ছাত্রেরাও অত্যধিক অর্থব্যয় করে বলিয়া তাহার মূল্য আদায় করিয়া লইতে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকে। উন্নত শিক্ষার আর কোন লক্ষণ ত এখানে আছে বলিয়া বোধ হইল না।

চিন্তাশীল ও পরিশ্রমী ছাত্রেরা কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যতটা শিক্ষা করে এখানকার ছাত্রেরা তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু শিখে বা বুঝে তাহা অনুমান করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের ভাল ছেলে এবং এখানকার ভাল ছেলে প্রায় একপ্রকার।

সুতরাং কেম্ব্রিজে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা আসিলেই যে তাহারা মহা-পণ্ডিত হইয়া পড়ে তাহা না ভাবাই ভাল। যে-সকল ছাত্র ভারতবর্ষে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে তাহারাই এখানে আসিয়াও ভাল ফল দেখাইবার উপযুক্ত। তাহারা পূর্ব্বেও ভাল শিখিত, এখানেও ভাল শিখে। গাধা পিটাইয়া মানুষ করিবার ব্যবস্থা এখানে নাই। বরং গাধা ছাত্র এখানে গাধাই থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ ছাত্রেরা এখানে সকলেই স্বাধীন। লেখাপড়া না করিলেও কেহ কিছু বলেন না। কোন অধ্যাপকের কোন কোন বক্তৃতা না শুনিতে গেলেও কেহ বাধ্য করেন না।

শিক্ষক ও ছাত্রের যোগসাধন অতি অল্প। অধ্যাপকগণের সহবাস কোন ছাত্রই পায় না বলা যাইতে পারে। Residential বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাদের সনাতন 'গুরুগৃহ' ও 'আচার্য্যকুল' হইতে কত স্বতন্ত্র তাহা কেম্ব্রিজে আসিয়া সত্যভাবে বুঝিলাম। চরিত্র-গঠন, জীবন-বিকাশ, ভবিষ্যতের আদর্শ-সৃষ্টি, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ইত্যাদির পুষ্টিসাধনে ছাত্রেরা অধ্যাপকের কোন সাহচর্য্য ত পায়ই না। এমন কি, লেখাপড়া, গ্রন্থপাঠ, মানসিক শিক্ষা, ইত্যাদি সম্বন্ধেও ছাত্র এবং শিক্ষকে আদানপ্রদান ও ভাববিনিময় অতি অল্প। অধ্যাপকগণের কোন প্রভাবই কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পায় না।

কাজেই ভারতীয় ছাত্রেরা কেম্ব্রিজে আসিয়া বিশেষ উপকৃত হয় না, এইরূপ আমি বিবেচনা করি। অবশ্য দৈবক্রমে সুযোগ অনেক আসিয়া জুটিতে পারে—তাহার ফলে হয় ত কোন ছাত্র কোন অধ্যাপকের সাহাচর্য বেশী লাভ করিল। কিন্তু তাহার উপর ত নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু বিলাতী ছাত্রদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মেই যত শিখিতে পায় আমার বিশ্বাস ভারতীয় ছাত্রেরা তত শিখিতে পায় না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহাদের জন্য নূতন কতকগুলি সুযোগ বা অধিকার সৃষ্ট করা হইয়াছে তাহা নহে। আমার বিশ্বাসের অন্য কারণ আছে।

প্রথমতঃ, ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অনেক বিষয় শিখিয়া থাকে। সাধারণ পাঠশালায় ইহারা জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। ইহাদের কাণ্ডজ্ঞান বেশী বিকশিত হয়। আমাদের বি, এ, উপাধিধারী ছাত্রেরা মোটের উপর যতদিকে দৃষ্টি ফেলিতে সুযোগ পায় এখানকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তদপেক্ষা বেশী দিকে সুদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু ইহাদের হস্ত-পদ চক্ষু-কর্ণ সকল

ইন্দ্রিয়ই ন্যূনাধিক শিক্ষিত হইয়া থাকে—ইহারা সরস সজীবভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করে। ফলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দৃঢ়তর, বিস্তৃততর এবং গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস্-শ্রেণীতে ভারতীয় ছাত্র অপেক্ষা বিলাতীছাত্র বেশী উপকার লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী ছাত্রেরা স্বদেশী আবহাওয়ায় বসিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহিত্য বেশী শিখিবে আর হিন্দুস্থানী ছাত্র বিদেশীয় সমাজে থাকিয়া তত শিখিবে না তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ। অধিকন্তু ছাত্রে ছাত্রে ভাববিনিময় এবং কর্ম্মবিনিময় বিলাতী ছাত্রসমাজে যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভারতীয় ছাত্রসমাজে সেরূপ হইতেই পারে না। ইংরাজ ছাত্রেরা ইউনিয়ানের বক্তৃতায় ২৪ ঘণ্টা রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করে। সামাজিক উৎসব, ক্রীড়াকৌতুক, নাচগান, নৌকাবিহার, ক্রিকেট পোলো হকি ইত্যাদি ইহাদের অনবরত চলিতেছে। এই সকল কার্য্যে ভারতীয় ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে যোগদান করিতে পারে। কিন্তু করিতে গেলে যথেষ্ট অর্থব্যয় আবশ্যক। অত খরচ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহা ছাড়া করিয়াই বা লাভ কি? বিলাতী ছাত্রেরা এই সকল ব্যায়াম, উৎসব, সম্মিলন ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ় হইতে থাকে। এই শিক্ষা ও খরচ তাহাদের বৃথা যায় না। ভবিষ্যতে তাহারা দেশের নায়ক, সমাজের কর্ত্তা, ক্রীড়াস্থলের কাপ্তেন, সমরবিভাগের সেনাপতি, সম্মিলনের সভাপতি ইত্যাদি হইবার সুযোগ পায়; কাজেই এখন হইতে তাহারা সেজন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমাদের ছাত্রেরা এখন এসব শিখিয়া ভবিষ্যতে কি করিবে? তাহাদের সকল পথই অবরুদ্ধ। একমাত্র ব্যারিষ্টারী বা শিক্ষকতা তাহাদের সম্বল। এই অবস্থায় অন্য কোনরূপ কর্ম্মের আন্দোলনে যোগদান

করিবার সুযোগ তাহাদের ঘটে না। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে ভারতীয় ছাত্রেরা সাধারণতঃ যোগদান করিতে উৎসাহী হয় না। যোগদান করিলেও বিশেষ উপকার বোধ করে না। কিন্তু ইংরাজ-ছাত্রেরা এই সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। তাহার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারা বেশী পটু ও কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানশীল হয়।

কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রগণের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু ফেলিলাম। প্রথমতঃ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—তাহার উপর বাঙ্গালী পাঞ্জাবী মাদ্রাজী মারাঠা বিরোধ। এই সকল বিরোধের মূলে ব্যক্তিগত প্রশংসাকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার ও পরশ্রীকাতরতা।

আজকাল বিলাতী ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ভারতীয় ছাত্রগণকে ভাল চোখে দেখে না। তাহাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রেরা সমান ভাবে এবং বন্ধুভাবে প্রায়ই মিশিতে পায় না। এই বিদেশীয় বিদ্বেষের আব্‌হাওয়ায় আশা করা যায় যে, ভারতীয় ছাত্রেরা দলবদ্ধ ভাবেই থাকিবে। কিন্তু ঠিক উল্টা দেখিতেছি। আমাদের ছাত্রমহলে নাম করিবার ইচ্ছা, নিজকে বড় করিবার চেষ্টা প্রত্যেকের মধ্যেই অত্যধিক। এই স্বার্থপরতা এবং নীচ পরশ্রীকাতরতাই এখানকার ছাত্রগণের পরস্পর-বিদ্বেষ ও অনৈক্যের প্রকৃত কারণ। কিন্তু এই জঘন্য প্রবৃত্তি যথাসম্ভব ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ইহারা অন্য উপায়ে এবং অন্য আকারে দল পাকাইয়া থাকে। কেহ বলে বাঙ্গালীরা বড় অহঙ্কারী, তাহাদের সঙ্গে মিশা অসম্ভব। কেহ বলে মাদ্রাজীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিতে চাহে না। এইরূপে পাঞ্জাবী ও মারাঠা ছাত্রেও পরস্পর গোলযোগ বাধিয়া থাকে। ব্যক্তিগত কলহকে জাতিগত রেষারেষির আকার প্রদান করিবার জন্য অহঙ্কারী ও স্বার্থপর ছাত্র-নায়কেরা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে। মোটের উপর, একটা বিষময় ফল দেখিতে

এখানকার ভারতীয় ছাত্রেরা নিজের কথাই বেশী ভাবে—দেশের কথা ও সমাজের কথা এবং জাতীয় ভবিষ্যতের কথা আদৌ ভাবে না। যেটুকু ভাবে তাহা অলীক বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও নিরর্থক। তাহার মূল্য অতি সামান্য মাত্র। এজন্যই নিজ নিজ সম্মানের কোন ত্রুটি হইলে ইহারা সহ্য করিতে পারে না। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। ইহারা প্রায় সকলেই ধনবানের পুত্র—ইহাদের পয়সার অভাব নাই। যাহারা টাকা খরচ করিয়া ব্যারিষ্টারী শিখিতে আসে তাহাদের পক্ষে ব্যক্তিগত এবং পরিবার-গত মান সম্ভ্রমের কথা ভুলিয়া থাকা অসম্ভব। কাজেই কাহাকেও ক্ষমা করা এবং নিজে ক্ষতি স্বীকার করা ইহাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

ভারতবর্ষে আমাদের জননায়কগণের যেরূপ পরস্পর বিদ্বেষ ও অনৈক্য তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যেও সেইরূপ ভাব থাকিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কথা ভাবা অতি সহজ। জাতিগত, সমাজগত এবং দেশগত চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু একবার সেই আদর্শ হৃদয়ে স্থান পাইলে মানুষের দায়িত্বজ্ঞান জাগে—নিজকে ভুলিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মে। তখন নিজকে ছোট করিয়াও সমষ্টিগত কর্ম্মে লিপ্ত থাকা যায়। কিন্তু সে আদর্শ ভারতসমাজে এখনও বেশী পরিমাণে সৃষ্ট হয় নাই। কাজেই ব্যক্তিগত বিরোধ ভুলিয়া জাতিগত সম্মান পুষ্ট করিবার প্রবৃত্তি এখনও বিকশিত হয় নাই।

কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রসমাজের এই শোচনীয় চিত্র দেখিলাম। বুঝিলাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণের অভিনয় সাত সমুদ্র তের নদী পারেও চলিতেছে। আর ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম—ইহারাই কয়েক বৎসর পরে নিজ নিজ প্রদেশের জন-নায়ক হইয়া বসিবে!

কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার খুব বেশী। কেম্ব্রিজপল্লীতে যখন প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এখানে কতকগুলি কুঁড়েঘর এবং কর্দ্দমাক্ত বন জঙ্গল ও গলি পথ মাত্র ছিল। সে আজ সাত আটশত বৎসরের কথা। তাহার পর ধর্ম্ম-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব কত সাধিত হইয়াছে। আজকালকার নগর প্রধানতঃ বিদ্যার কেন্দ্র মাত্র। ধর্ম্মের, সমাজের, শিল্পের বা রাষ্ট্রের গণ্ডগোল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুখ্যতঃ সৃষ্ট হয় না। কিন্তু নগরের শাসনকর্ম্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের যথেষ্ট হাত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিই নগর-শাসন-সমিতির অধিনায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়েব পরামর্শ এবং সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বিচারকার্য্য হয় না; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় এই হিসাবে একটা ছোট খাট রাষ্ট্র বিশেষ।

শুনিয়া সুখী হইলাম সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক, এবং কর্ত্তৃপক্ষ সমবেত হইয়া আমাদের অধ্যাপক শীল মহাশয়কে একটা ভোজ দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনালয়ে নিমন্ত্রণ করা ইহাঁরা উচ্চ অঙ্গের সম্মান বিবেচনা করেন।

—

চতুর্থ অধ্যায়

—❀—

লণ্ডনে পুনর্ব্বার

পার্ল্যমেণ্ট-ভবন

লণ্ডনে লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বড় সহজ নয়। এখানকার প্রায় সকলেই ব্যস্ত—যার যত নাম তিনি তত বেশী ব্যস্ত। সময় ইহাঁদের একেবারেই নাই। সাধারণতঃ বিকালে চা-পানের সময়ে ইহাঁরা দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে চা-পান করিতে করিতে যতটুকু আলাপ পরিচয় হইতে পারে তাহা অপেক্ষা বেশী হওয়া কঠিন। ঘনিষ্ঠতর বন্ধু হইলে নৈশভোজন বা মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ইহাঁরা নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সেই সময়ে এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ কেহ কেহ নিজগৃহে করেন, কেহ বা কোন হোটেলে করেন। ফলতঃ যে সময়ে তাঁহারা আহার করিতে বসেন সে সময়ের মধ্যেই গল্প-গুজব পরামর্শ উপদেশ যাহা কিছু থাকুক তাঁহাদিগকে সারিয়া লইতে হয়।

অনেক সময়ে একাকী দেখা করা অথবা নিমন্ত্রিত হওয়া ঘটিয়া উঠে না। কেন না লণ্ডনের কর্ম্মঠ লোকদিগের বন্ধুসংখ্যা কম নয়। কাজেই তাঁহারা একত্র একাধিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে বাধ্য হন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু না হইলে বা প্রয়োজনীয় কাজ না থাকিলে একাকী আলাপ

করা একপ্রকার অসম্ভব। আর এক কথা। এখানকার কোন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে নিজে কাজের লোক হওয়া আবশ্যক। অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় কথা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কোন কাজ নাই, অথবা কাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই, কেবল মাত্র চাক্ষুষ দেখা করিতে যাওয়া এখানকার "করিতকর্ম্মা" লোকেরা পছন্দ করেন না। কোন লোকের মত বুঝিতে হইলে তাঁহার গৃহে যাইয়া বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই—প্রধানতঃ তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। সুবিধা হইলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাওয়াও আবশ্যক। এই সকল কথা মনে না রাখিয়া হঠাৎ দেখা করিতে গেলে বেকুব হইতে হয়। "পত্র পাঠ বিদায়" ভিন্ন তখন আর কোন গতি থাকে না।

এখানকার কোন লোক অপর কোন লোকের নিকট একজন নূতন ব্যক্তিকে শীঘ্র পরিচিত করিয়া দিতে চাহেন না। এই ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা কি সত্যই কাজের লোক তাহা ভাল করিয়া না জানা থাকিলে ইঁহারা বড়ই বিপদে পড়েন। ভুলক্রমে কোন বাজেলোককে কাহারও নিকট পরিচিত করিয়া দিলে পরে ইঁহারা তাঁহাদের তিরস্কার সহ্য করেন। কাজেই এ-বিষয়ে ইঁহারা বিশেষ সতর্ক। এই কারণে এখানকার কোন লোকের পরিচয়-পত্র লইতে চেষ্টা না করাই কর্ত্তব্য। তৎপরিবর্ত্তে নিজেই যাঁহার নিকট প্রয়োজন পত্র-ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সঙ্গে নিজের পরিচয় প্রদানও নিতান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য এই উপলক্ষ্যে খানিকটা আত্ম-প্রশংসা এবং আত্ম-কাহিনী প্রকাশ না করিলে কার্য্য উদ্ধার হয় না। আমাদের দেশে অবশ্য ইহা বড়ই নিন্দনীয়। মোটের উপর, নিজে পত্র লিখিয়া আলাপ করা এবং নিজের প্রচারিত ছাপা পুস্তিকা গ্রন্থ বা কার্য্যবিবরণী ইত্যাদির ব্যবহার এদেশে অনিবার্য্য। আর কোন উপায়ে

এখানকার চিন্তাশীল বা কর্ম্মী লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করা বা উপদেশ গ্রহণ করা অসম্ভব।

সুতরাং ইংরাজসমাজের আদর্শ, চিন্তাপ্রণালী, আন্দোলন এবং নূতন নূতন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসমূহ বুঝিতে হইলে নিজের পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত অধিককাল এদেশে বাস করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আলাপ পরিচয়ের সময় করিয়া উঠা কঠিন। সুতরাং যথেষ্ট অর্থব্যয়ও আবশ্যক।

এদেশে এরূপ অনেক জিনিষ আছে যাহা দেখিবার বা বুঝিবার জন্য কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তাহার জন্য অর্থব্যয় যথেষ্ট। যতগুলি মিউজিয়াম, প্রদর্শনী, সংগ্রহালয়, ক্লাব, পরিষৎ, সভাসমিতি, পাঠশালা, সম্মিলন, থিয়েটার, নাচ-গৃহ, চিত্রশালা লণ্ডনে আছে এইগুলি বুঝিবার জন্য কোন লোকের পরামর্শ লইবার প্রয়োজন নাই। এই সমুদয় সম্বন্ধে নানা প্রকার 'গাইডবুক্' বা প্রদর্শিকা প্রায় দোকানেই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এসকল বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যও প্রচুর রহিয়াছে। সেইগুলি কিনিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য এই প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখা নিতান্ত আবশ্যক এবং এতদ্বিষয়ক সাহিত্য পাঠও প্রয়োজন। সুতরাং অর্থব্যয় কম হয় না। কোনমতে লণ্ডনে খাওয়া থাকার খরচ লইয়া আসিলে কেহই ইংরাজসভ্যতার মর্ম্মকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বাহির হইতে কতকগুলি প্রাসাদ দেখিয়া যাইবেন মাত্র। সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপ বাহ্যদৃশ্য মাত্রই দেখিতে পান।

আজ পার্ল্যামেণ্টের কমন্স্-গৃহে র্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের সঙ্গে দেখা হইল। ৪ টার সময় তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। এক দুই তিন পাহারা পার হইয়া একটা গোলাকার গৃহে

প্রবেশ করিলাম। প্রবেশপথে এবং গৃহে ইংরাজেতিহাসের বহু ঘটনা চিত্রিত বা খোদিত রহিয়াছে। পার্ল্যামেণ্টের অতীত জীবন অট্টালিকার গাত্রে এই উপায়ে লিখিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পার্ল্যামেণ্টের নবগৃহ-প্রবেশোৎসব সম্পন্ন হয়।

সভ্যগণের সঙ্গে যখন তখন দেখা করিবার নিয়ম নাই। গোলাকার গৃহে বহুলোক সমবেত দেখিলাম। সকলেই সভ্যগণের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। কেহই সভাগৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। গৃহের দ্বারসমীপে কয়েকজন প্রহরী বিশেষ সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে। তাহাদের হাতে কতকগুলি ছাপান কার্ড রহিয়াছে। দেখিলাম প্রত্যেক দর্শককে ইহারা একখানা করিয়া কার্ড দিতেছে। আমিও একখানা কার্ড পাইলাম। ইহাতে সভ্যের নাম, নিজের নাম ও ঠিকানা এবং সভ্যের সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্য লিখিয়া দিতে হইল। কার্ড তৎক্ষণাৎ সভা-গৃহে লইয়া যাওয়া হইল না। দর্শকগণ দ্বারসমীপে সারি দিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া প্রাচীর গাত্রের চিত্রিত কাচ এবং রাজা, রাণী ও মন্ত্রীদিগের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। পাহারাওয়ালারা দর্শকগণকে নিতান্ত ব্যস্ত করিয়া রাখে। সারি ভাঙ্গিয়া হঠাৎ দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই ইহারা আমাদিগকে মহা তিরস্কার করিতে উদ্যত। কলিকাতার রাস্তায় ভিড় হইলে পুলিশের যেরূপ আধিপত্য দেখা যায়, পার্ল্যামেণ্ট সভা-গৃহের প্রবেশপথেও জনতা নিবারণের জন্য পুলিশ কর্ম্মচারীরা সেইরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে।

চারিটা বাজিয়া গেল। একে একে সভ্যেরা চা খাইতে বাহির হইতে লাগিলেন। যাঁহার সঙ্গে যে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহার সঙ্গে তিনি যথোচিত কথাবার্ত্তা রাস্তায় দাঁড়াইয়াই শেষ করিতে লাগিলেন। খানিক পরে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেব আসিয়া উপস্থিত।

ইঁহাকে দেখিয়া চেনা চেনা বোধ হইল। কিন্তু কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময়ে ইনি বলিলেন "আমি নিশ্চয় আপনাকে চিনি। কেবল আপনার পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য একটুকু দেরী হইল।" তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে বাকী থাকিল না।

প্রবেশপথ হইতে তিনি আমাদিগকে ভোজনালয়ে লইয়া গেলেন। টেম্‌স্‌-নদীর ধারেই পার্ল্যামেণ্টের এই প্রকোষ্ঠগুলি অবস্থিত। চা-পানের জন্য ভৃত্যকে আদেশ করা হইল। চেয়ারে বসিয়া নদীবক্ষের নৌকাশ্রেণী এবং অপর পারের গৃহরাজি দেখিতে পাইলাম। হাবড়ার পার হইতে কলিকাতার পার যেরূপ দেখায় মনে হইল সেইরূপই দেখিতেছি। নদী অবশ্য এখানে হুগ্‌লি নদীর ½ অংশ মাত্র।

ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেবকে প্রথমেই বলিলাম "আমি লণ্ডনের মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য দেখিতে ও বুঝিতে চাহি। গ্রন্থপাঠ করিয়া যাহা জানা যায় সে সম্বন্ধে সাহায্য চাহি না। এখানে চোখে দেখিয়া দু একটা কার্য্যের বিভাগ এবং কার্য্যের পরিচালনার পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ খরচপত্র, আয়, ট্যাক্সের হার এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ব্যয়ের বিভাগ সম্বন্ধে কোন কর্ম্মচারীর নিকট মৌখিক বিবরণ শুনিতে চাহি।" ইনি বলিলেন "লণ্ডনে ইহা অসম্ভব। খুবজোর বাড়ীঘর দেখান যাইতে পারে। কিন্তু কেহই আপনাকে আফিসের ভিতর লইয়া এটা ওটা দেখাইবে না। তবে ছাপান বার্ষিক রিপোর্ট ইত্যাদি পাইতে পারেন। আর মৌখিক বিবরণ দ্বারা কার্য্যপ্রণালী বুঝান যে সে লোকের সাধ্য নয়। নিতান্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত একাজ আর কেহ পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের সময়াভাব।

তবে একটা কাজ করিতে পারি। লীড্‌স্‌, এবং ম্যাঞ্চেষ্টারে আপনি যাইবেন কি?"

আমি বলিলাম "নিশ্চয়। ঐ নগরদ্বয়ে শিল্প-শিক্ষা, নিম্ন-শিক্ষা, এবং শিল্পের কারখানা ও ফ্যাক্টরীসমূহ দেখিতে ইচ্ছা করি। অল্পদিনের ভিতরই ঐ অঞ্চলে যাইব স্থির করিয়াছি।"

ইনি বলিলেন "ঐ দুই নগরের মিউনিসিপ্যালিটিও ইংলণ্ডে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার কর্ম্মচারিগণ লণ্ডনের ধুরন্ধরদিগের মত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন না। তাঁহাদের দুএকজনকে আমি পত্র লিখিতেছি। তাঁহারা যত্ন করিয়া আপনাকে সকল বিষয় বলিতে পারিবেন আশা করি। মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া আর কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার সাহায্য আমার করা আবশ্যক?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লণ্ডনের পোতাশ্রয়, জাহাজনির্ম্মাণ করিবার কারখানা, ডক্ ও বন্দর ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ আছে কি?" ইনি বলিলেন "এই সমুদয়ের কি দেখিতে চাহেন? বাহির হইতে রাস্তাঘাট, জাহাজ, বাড়ীঘর দেখা কঠিন নয়।" আমি বলিলাম "যদি আপনার কোন এঞ্জিনীয়ার বন্ধু থাকেন তবে তাঁহার সাহায্যে জাহাজনির্ম্মাণ এবং বন্দর-শাসনের কয়েকটা তথ্য সহজে বুঝিতে চাহি। এ-সকল বিষয়ে আমার পুঁথিগত বিদ্যাও নিতান্ত কম। চোখে দেখিয়া এবং বিশেষজ্ঞের কথা শুনিয়া একটা ধারণা করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।" ম্যাক্ডোন্যাল্ড সাহেব বলিলেন, "বড় বিপদ। ডক্গুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর নিজ সম্পত্তি, গবর্মেণ্টের পরিচালিত পোতাশ্রয় একটাও নাই। কাজেই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী অথবা বড় বড় কর্ম্মচারীদিগের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবর্গ না হইলে ভিতরে যাইয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে না। ইহাঁদের কোন কোন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন রাষ্ট্রীয় আলোচনায় ইহাঁদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করিয়াছি।

কাজেই ইহাঁদের নিকট আমার পরিচয়পত্রের মূল্য এক্ষণে কিছুই নাই।”

এই বলিয়া তিনি খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়া গিয়া একজন বন্ধু-সভ্যকে আমাদের নিকট লইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন “সাউদাম্পটন বন্দরের সর্ব্বপ্রধান জাহাজ-কোম্পানীর কর্ত্তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। তাঁহার নিকট পত্র লিখিলে তিনি ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু আপনারা সাউদাম্পটন যাইতে প্রস্তুত আছেন কি? এখান হইতে রেলে বোধ হয় দুই কিম্বা আড়াই ঘণ্টার পথ।” বলা বাহুল্য, সর্ব্বত্র যাইতেই প্রস্তুত আছি। ইহা শুনিয়া র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের বন্ধু তাঁহার ধনী বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া-দিলেন।

অন্যান্য অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। প্রসিদ্ধ ইটন-বিদ্যালয় সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড বলিলেন “উহা দেখিয়া কোন লাভ নাই। বিলাতের জনসাধারণ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী পছন্দ করে না। পুরাতন প্রথায়, মামুলি নিয়মে বড় লোকের ছেলেরা ওখানে লেখাপড়া শিখে। কাগজে পত্রে ইহার নাম সুপ্রচারিত। কিন্তু সমাজে উহার কোন প্রভাব নাই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কৃষিকর্ম্মে সুদক্ষ কোন ব্যক্তি আপনার বন্ধু আছেন কি? আমি ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামে যাইয়া কিছুকাল চাষ আবাদ দেখিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি এখানে বৈজ্ঞানিক নিয়মে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী কৃষিকার্য্যের বিবরণ পাঠ করিয়াছি—চোখে দেখিতে চাহি। মাটি প্রস্তুত করা, সার প্রস্তুত করা, জল প্রস্তুত করা, হাল দেওয়া, পশুপালনের নিয়ম ইত্যাদি সব জিনিষের চাক্ষুষ পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক।” ইহাঁর পরিচিত এরূপ কোন লোক

নাই যিনি বিলাতের কৃষিকার্য্য দেখাইতে পারেন। আমি বলিলাম "সেদিন কেম্ব্রিজের পার্স বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষকের বিবরণ শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের কোন বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র বা পশুশালা নাই।" ইনি বলিলেন "কিন্তু তাঁহারা কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রের কোন কোন মালিককে নিশ্চয়ই জানেন। তাঁহাদের কৃষি-ছাত্রেরা অধিকাংশই কৃষি-ব্যবসায়ীদিগের সন্তান। পার্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেই অভিভাবকগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিতে পারিবেন।"

শেষে ধন-বিজ্ঞান, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ এবং মাধ্যমিক-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। ইনি বলিলেন "সেদিন আমি কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ানে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছি। পরশুদিন গ্লাসগো যাইতেছি। সেখানে স্কটল্যাণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের একটা সম্মিলন ও বার্ষিক উৎসব হইবে। তাহাতে ২।৩টা প্রবন্ধ পাঠ এবং পরস্পর আলোচনা হইবে। সকাল আটটা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সম্মিলনের কার্য্য চলিবে। আমার বক্তৃতার বিষয় "The place of Secondary Education in a national System."

প্রায় এক ঘণ্টা ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের সঙ্গে কাটাইয়া কেন্‌সিংটন মহাল্লার মিউজিয়াম-পাড়ায় দুই এক জনের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। এই পাড়ায় লণ্ডনের বিদ্যা-কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। আজ এ অঞ্চলের উদ্যানে প্রবেশ করা গেল। উদ্যানের ভিতর একটা রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। প্রাসাদ দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রহরীরা বলিল সাফ্রেজিটদের দৌরাত্ম্যে আজকাল ইহা বন্ধ।

উদ্যানের এক অংশে একটি সুবিশাল ও সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মিত। প্রিন্স য়্যাল্‌বার্ট ইংরাজজাতির অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার স্মরণস্তম্ভস্বরূপ দুইটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি উদ্যানের ভিতর—অপরটি তাহার সম্মুখে রাস্তার অপর পারে। এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি একটি বৃহদাকার গোলাকৃতি সঙ্গীতভবন। এখানকার গ্যালারিতে এক সঙ্গে ১০,০০০ লোক বসিতে পারে। এই সঙ্গীতালয় লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়, ইম্পীরিয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, বিজ্ঞান-গৃহ ইত্যাদির সংলগ্ন।

উদ্যানের ভিতরকার স্মৃতিচিহ্ন একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভ সাধারণ মনুমেণ্ট বা মিনার নয়। গথিক গৃহনির্ম্মাণ-রীতি অনুসারে উচ্চ মঞ্চোপার একটি মন্দিরাকৃতি গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। গৃহের ভিতর য়্যাল্‌বার্টের মূর্ত্তি। গৃহের ভিত্তির চারি প্রাচীরে ইউরোপের বিভিন্ন যুগের শিল্পী, কবি, গায়ক, বাদক, লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর, ইত্যাদির মূর্ত্তি নির্ম্মিত। মঞ্চের চারি কোণে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা এই চারি ভূভাগের পরিচয়স্বরূপ চারটি মূর্ত্তি-সঙ্ঘ অবস্থিত। প্রত্যেক মূর্ত্তি-সঙ্ঘে প্রত্যেক ভূভাগের বিশিষ্ট পশু ও জাতির মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। শিল্পকলা হিসাবে এই স্মৃতিস্তম্ভ জগতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বস্তু। ইহা দেখিলে ক্ষুদ্র আয়তনে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাচীন নবীন সকল চিন্তাধারের পরিচয় পাওয়া যায়।

য়্যাল্‌বার্ট মেমরিয়্যাল হইতে লণ্ডনের স্কুল-পাড়ার ভিতর দিয়া গৃহে ফিরিলাম। পথে দেখিলাম এই নগরের ব্যবসায়-কেন্দ্র পিকাডিলি-মহাল্লার এক পাঁচতলা বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। সাধারণতই এই রাস্তা লোকারণ্য থাকে। অগ্নিকাণ্ডে মহাজনতার সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয় শতাধিক মোটরকার, অম্নিবাস ইত্যাদি রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ফায়ার-ব্রিগেড্ বিভাগের দমকল আসিয়া উপস্থিত হইল। আজকাল কলিকাতায় দমকলের যেরূপ ব্যবস্থা লণ্ডনেও ঠিক তাহাই। এক মিনিটের ভিতর রাস্তা হইতে পাচতলার ছাদের উপর সিঁড়ি তোলা হইয়া গেল। সমস্তই তড়িতের ক্ষমতায় নিষ্পন্ন হইতেছে। পলকের মধ্যে ব্রিগেডের লোকেরা ছাদের উপর উঠিল। দেখিলাম এত জনতার মধ্যে কেহই কোন গোলমাল করিতেছে না। চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। এতবড় ব্যবসায়-মহাল্লা এবং তাহার ভিতর একটা বড় দোকানে আগুন লাগিয়াছে। কিন্তু গোলমাল একটুকুও নাই। এ-দেশের লোকেরা কথা কিছু কম বলে!

বিলাতের গ্রন্থ-ব্যবসায়

লণ্ডনের প্রায় ১৫।১৬ মাইল পশ্চিমে উইণ্ডসর-প্রাসাদ। ইহার দুই তিন মাইলের ভিতর ইটন-বিদ্যালয়। ইটন-বিদ্যালয় দেখিবার জন্য কোন পত্র এখনও পাই নাই। কিন্তু এ-অঞ্চলে আজ অন্য উদ্দেশ্যে বেড়াইতে আসিলাম। বিলাতী গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণের কার্য্যপ্রণালী এখানকার একজন অধিবাসীর নিকট বুঝিতে পারা গেল।

এখানে আসিতে হইলে অক্‌স্‌ফোর্ড যাইবার রেলগাড়ীতে চড়িতে হয়। বাস-গাড়ীতেও আসা যায়। আমি রেলে আসিলাম।

লণ্ডনের বড় বড় তিনটা রেলওয়ে ষ্টেসন দেখা হইল। প্রথম দিন চেয়ারিং ক্রশে নামিয়াছি। সে দিন কেম্ব্রিজ যাইতে আর একটা ষ্টেসনে উঠিয়াছি। আজ অক্সফোর্ড যাইবার ষ্টেসন দেখিলাম। প্রত্যেক ষ্টেসনই আমাদের হাবড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেসনদ্বয়ের সমবেত আকার ও বিস্তৃতি অপেক্ষা বৃহত্তর বোধ হইল। প্ল্যাটফর্ম্ম-সংখ্যা, গাড়ীর যাতায়াত, যাত্রীর দল, ষ্টেসনের বাড়ীঘর, রেল কোম্পানীর কারখানা ও কার্য্যালয় ইত্যাদি বাহির হইতে দেখিয়া বুঝিলাম আমাদের দেশের দুইটা বড় ষ্টেসন একত্র করিলে যেরূপ দেখায় বোধ হয় লণ্ডনের প্রত্যেক ষ্টেসনই তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর ও বিশালতর। তিনটা মাত্র ষ্টেসন স্বচক্ষে দেখিলাম। এরূপ আরও কত এই মহানগরীর ভিতর আছে!

ষ্টেসনগুলি দেখিলেই লণ্ডনের ব্যবসায়-সম্পদ বুঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজজাতির এঞ্জিনীয়ারবিদ্যা এবং লোহালক্কড়ের কারখানা ইত্যাদির প্রভাব অনুমাণ করা যায়। বলা বাহুল্য এখানকার ম্যানেজার হইতে

আরম্ভ করিয়া কুলী পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোকই ইংরাজ। সুতরাং লণ্ডনের শিল্পসম্পদ এবং ব্যবসায়-গৌরব বলিলে ইংরাজজাতির ঐশ্বর্য্য ও ধনগৌরব বুঝিতে হইবে।

কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই বা মান্দ্রাজের শিল্প-গৌরব বা ব্যবসায়-সম্পদ বা বাণিজ্যশ্রী বলিলে কি বুঝিব? তাহার দ্বারা ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা বিন্দুমাত্রও জানা যায় না। কারণ ঐ সকল কেন্দ্রে কতকগুলি কুলী ও কেরাণী ব্যতীত আর কেহই ভারতবাসী নয়। আমাদের দেশীয় বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পরিচালনায় অথবা মূলধনে প্রায় স্থানের শিল্প ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হয় না। যাহা কিছু সবই পরকীয়। অথচ আমরা না বুঝিয়া সংবাদ পত্রে প্রচারিত 'Prosperity of Calcutta,' 'Growing Trade of Bombay' ইত্যাদি শব্দে মোহিত হইয়া যাই! 'লণ্ডন-নগরের সম্পদ' বলিলে লণ্ডনবাসী জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু কলিকাতা বা "বোম্বাই নগরের ঐশ্বর্য্য বা ব্যবসায়-গৌরব" বলিলে বাঙ্গালীজাতি বা মারাঠা ও গুজরাতী জনগণের ধন-সম্পদ বুঝা যায় না। সুতরাং ঐরূপ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, কলিকাতা বা বোম্বাই ইত্যাদি নগরের ভিতর দিয়া ক্রোড় ক্রোড় টাকার কারবার চলিয়া থাকে—এই সকল কেন্দ্রে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অনুষ্ঠান এবং আমদানী ও রপ্তানী নিতান্ত অবজ্ঞেয় নয়। কিন্তু নর্দ্দমার ভিতর দিয়া জল গড়াইয়া যায় বলিয়া কি নর্দ্দমাকে জলাশয় বলিতে পারি?

১৫।১৬ মাইল রেলপথের দুইধারে প্রথমতঃ কারখানার অসংখ্য চিমণী দেখা গেল। বোধ হয় ম্যান্‌চেষ্টার, লিভারপুল ইত্যাদি নগরের চিত্র এখান হইতে কিছু অনুমান করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, লণ্ডন এক হিসাবে যেমন কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড, অপর হিসাবে ইহা ম্যাঞ্চেষ্টার

বা লিভারপুল। ইংলণ্ডের সকল প্রকার শক্তির চরম দৃষ্টান্ত এই মহানগরীর ভিতর পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ কৃষিভূমি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ভাবিলাম ইংলণ্ডকে কেবলমাত্র কলকারখানার দেশ বলা নিতান্তই অন্যায়। ফ্রান্সে দেখিয়াছি কৃষি ও শিল্প দুইই সমানভাবে বিদ্যমান। ইংলণ্ডেও কৃষির আয়োজন মন্দ কি? অবশ্য এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ফ্রান্সের মত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাই নাই।

এই সকল কৃষিভূমির স্থানে স্থানে ইটের পাজা। বিজ্ঞাপন দেখিয়া বুঝিলাম, লণ্ডনের বড় বড় কারবারের স্বত্বাধিকারীরা এই সকল ইষ্টক-কারখানার মালিক

যথাস্থানে পৌছিয়া দেখিলাম আমার বন্ধু মূক এবং বধির। কিন্তু লেখা পড়া বেশ শিখিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য রচনায় ইনি নবীন গ্রন্থকারগণকে নানা প্রকার সাহায্য করিতেও অভ্যস্ত। এই প্রকার কার্য্য করিয়াই ইনি জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত টাইপ্‌রাইটিং কাজও ইহঁার আছে। লেখকেরা ইহঁার নিকট হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিলে ইনি প্রয়োজনমত সংশোধন পূর্ব্বক টাইপ্ করিয়া দেন। প্রত্যেক হাজার শব্দের জন্য ইনি এক টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইনি গ্রন্থের সূচীপত্র এবং নির্ঘণ্ট পত্র ইত্যাদি প্রস্তুতও করিতে পারেন।

ইংলণ্ডের লোকেরা সকল বিষয়েই আজ কাল শ্রমবিভাগ-নীতি মানিয়া কার্য্য করে। সাহিত্যের কথাই ধরা যাউক। সাহিত্য এখানে একটা ব্যবসায় বিশেষ। অন্যান্য ব্যবসায়ের যে নিয়ম এই ব্যবসায়ে ঠিক সেই নিয়ম চলে। সাহিত্য-সেবীরা কৃষকস্বরূপ বা সূত্রধর বা কর্ম্মকারের ন্যায় বিবেচিত হন। ইহাদের তৈয়ারী কার্য্য বাজারে বিক্রী হয়।

প্রকাশকেরা সাহিত্যের বাজারে ক্রেতা। গ্রন্থকারেরা এক পক্ষ এবং প্রকাশকেরা অপর পক্ষ। ইহাঁদের দুইজনে আদান প্রদান হইয়া গেলে পর বাজারের অলিতে গলিতে চিন্তারাশি প্রবেশ করিয়া থাকে।

লেখক-সম্প্রদায়ের ভিতর উচ্চ নীচ নানা স্তর আছে—নানা শ্রেণী আছে, নানা জাতিবিভাগ আছে। কেহ লিখেন, কেহ নকল করেন, কেহ সূচীপত্র প্রস্তুত করেন, কেহ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন, কেহ পুস্তকাদি ঘাঁটিয়া প্রয়োজনীয় গ্রন্থের তালিকা করিয়া থাকেন, কেহ ভ্রমসংশোধন করিয়া দেন ইত্যাদি। প্রকাশক মহলেও এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ ও জাতিবিভাগ আছে—কেহ সংবাদপত্রের সম্পাদক, কেহ দোকানদার, কেহ মুদ্রাকর, কেহ বিজ্ঞাপন-প্রচারক, কেহ সমালোচক, কেহ সমালোচনা বা প্রশংসা পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বা দোকান-দারের নিকট পাঠাইয়া দিবার ভার লন ইত্যাদি। সুতরাং আড়তদার, মহাজন, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, কারিগর, ওস্তাদ, বিশেষজ্ঞ, পরামর্শদাতা, হিসাব-পরীক্ষক, ইত্যাদি যত প্রকার লোক সাধারণ ব্যবসায়ে দেখা যায় ঠিক তত প্রকার লোক সাহিত্য-ব্যবসায়েও বর্ত্তমান।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের এখানে গ্রন্থসমালোচনার কি নিয়ম?' ইনি বলিলেন 'প্রথমতঃ সংবাদপত্রে বা সমালোচনাপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশকগণের এজন্য চেষ্টিত থাকা আবশ্যক। গ্রন্থকারের সঙ্গে সমালোচকগণের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকাশকেরাই সমালোচনা সম্বন্ধে দায়ী। অর্থব্যয় যাহা কিছু প্রয়োজন প্রকাশকেরাই তাহা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ যে কাগজে প্রকাশকেরা বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়া থাকেন সেই কাগজেই গ্রন্থের সমালোচনাও বাহির হয়। সম্পাদকেরা সহজে সমালোচনা গ্রহণ করেন না।"

ইনি বলিলেন "লেখক ও গ্রন্থকারগণের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য একটা সমিতি আছে। তাঁহারা প্রকাশকদিগের অত্যাচার হইতে গ্রন্থকারদিগকে বাঁচাইয়া থাকেন। সমিতির নাম "গ্রন্থকার-সমিতি"। আমার বিশ্বাস এই সমিতির সভ্য হইলে গ্রন্থকারেরা প্রকাশকদিগের জুয়াচুরি, প্রতারণা এবং দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি পান। প্রকাশকেরা গ্রন্থকারদিগের স্বার্থ নষ্ট করিতে প্রায়ই চেষ্টিত। কিন্তু বিগত বিশবৎসর হইতে "গ্রন্থকার-সমিতি"র প্রয়াসে প্রকাশকেরা অনেকটা কাবু হইয়াছেন। এই সমিতি বহুস্থলে ইহাঁদিগের নিকট হইতে গ্রন্থকার-গণের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া দিয়াছেন—পাণ্ডুলিপি তুলিয়া লইয়াছেন—অন্যায় সর্ত্ত বন্ধ করিয়াছেন ইত্যাদি।"

সূচীপত্র, নির্ঘণ্টপত্র, সংশোধন, টাইপরাইটিং, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণ ইত্যাদি নানাবিষয়ে কথা হইল। এই সকল কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ কত সময় এবং অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা জানিয়া লইলাম। বুঝিতে পারা গেল—বিলাতে অতি অল্প সময়ে এবং সামান্য খরচ করিলেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি টাইপ করা এবং নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা হইয়া যায়। তাহার জন্য গ্রন্থকারের কোন প্রকার উদ্বেগ আবশ্যক হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার বন্ধু মূক ও বধির। দুই তিন ঘণ্টা কাল কাগজে লিখিয়া আলাপ হইল। ইহাঁর পত্নী সর্ব্বদা কাছেই বসিয়াছিলেন। মূক-বধিরগণকে শিখাইবার প্রণালী আলোচিত হইল। দেখিলাম ইহাঁরা আমাদের মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীবাবুকে জানেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইহাঁরা ভারতবর্ষে এই শিক্ষাবিস্তারের পথপ্রদর্শকরূপে বর্ণনা করিলেন।

রমণী বলিলেন "কোন দেশেই মূক বধির সংখ্যা বড় কম নয়। অথচ ইহারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর কার্য্যোপযোগী লোক। অনেকে চিত্রে,

অনেকে সাহিত্যে, অনেকে অন্যান্য সুকুমার শিল্পে, এমন কি কেহ কেহ সঙ্গীতবিদ্যায়ও পারদর্শী। সুতরাং যাঁহারা মূক বা বধির নন তাঁহাদিগকেও মূক-বধিরগণের সঙ্কেত-ভাষা শিখান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এই হতভাগ্য নরনারীগণের সঙ্গে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা সহজেই কাজ-কর্ম্ম চালাইয়া লইতে পারেন। তাহা হইলে হতভাগ্যদিগের দুঃখেরও কথঞ্চিৎ লাঘব হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এদেশে মূক-বধিরদিগের ভাষা প্রত্যেক জেলায়ই কি একরূপ? আপনি দেখিতেছি মুখের দ্বারা কোন প্রকার ইঙ্গিত করিতেছেন না—হাতের তালুর দাগগুলিই আপনার ব্যবহৃত ভাষার বর্ণমালা বোধ হইতেছে। সকল মূক কিম্বা বধিরই কি এই ভাষা বুঝিবে?" ইনি বলিলেন "বোধ হয় না। প্রত্যেক জেলারই কিছু কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণতঃ দুই রীতিতে মূক-বধিরগণের ভাষা সৃষ্ট। প্রথমতঃ অধর ও ওষ্ঠের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শব্দের উচ্চারণ বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ হাতের তালুর দাগ দেখিয়া মূক-বধিরেরা মনোভাব বুঝিতে পারে। বলা বাহুল্য উভয় রীতিতেই এক একটা শব্দ বা শব্দাংশ অথবা অক্ষরের জ্ঞান জন্মে। এইগুলি মিলাইয়া অর্থ করিতে হয়। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা আবশ্যক।"

ইহাঁরা থিয়সফি ও মিসেস বেশান্তের কথা পাড়িলেন। বেশান্তের ধর্ম্মমত বড় শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় দেখিয়া ইহাঁরা বিস্মিত। কিন্তু তাঁহার বাগ্মিতায় ইহাঁরা মুগ্ধ। একটা দুঃখের কথা বলিলেন। একটি রমণী ভায়লিন বাজাইতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। দেশ ভরিয়া তাঁহার এই বিদ্যায় পারদর্শিতার যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইনি থিয়সফির গর্ত্তে পড়িয়া বাজনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এজন্য লোকজন সকলেই বড় দুঃখিত এবং থিয়সফির উপর নারাজ।

ইহাঁরা ইটনের নিকটেই বাস করেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ইহাঁদের মুখে শুনিলাম না। এ-সম্বন্ধে র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যাহা বলিয়াছিলেন ইহাঁরাও প্রায় তদ্রূপই বলিলেন।

এই পরিবারের স্ত্রী স্বামী দুই জনকেই রোজগার করিতে হয়—তাহা না হইলে খরচ কুলাইয়া উঠে না। স্বামী সাহিত্য-সংক্রান্ত কর্ম্মে লেখক ও গ্রন্থকারদিগের সাহায্য করেন। ইনি গ্রন্থপ্রকাশ ব্যাপারে গ্রন্থকার-দিগের এজেন্ট বা প্রতিনিধি স্বরূপ সকল কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। স্ত্রী পিয়ানো-শিক্ষক। নিজগৃহে বালিকারা সপ্তাহে দুই তিন দিন আসিয়া শিক্ষা করিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সপ্তাহে একদিন করিয়া ইনি নিজে লণ্ডনে যাইয়া কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেন। আমাকে বাজনা শুনাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছিল। কিন্তু সময়াভাব বলিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

এ-কয়দিন দিবাভাগে অসহ্য গরম পড়িয়াছে, শীতবস্ত্র পরিধান করিয়া পথ চলা কষ্টকর। কলিকাতার সাধারণ রেশমী কোট পরিয়াই চলা-ফেরা করিতেছি।

রেলে দুইধারের লাল মৃত্তিকা দেখিতে দেখিতে লণ্ডনে ফিরিলাম। এখানকার মাটি খানিকটা বিহার প্রদেশের মত। কিন্তু বিহারের মাটি কিছু শুষ্ক—এ অঞ্চল দার্জ্জিলিঙ্গের মত নরম ও ভিজা। এক ইংরাজ ভারতবর্ষে বলিয়াছিলেন "আপনাদের এখানে কোন ফুল দেখিতে পাই না। কিন্তু ইংলণ্ডে ফুলের শোভায় দেশ সৌন্দর্য্যময়।" একথার সার্থকতা বিলাত স্বচক্ষে দেখিয়া এখনও বুঝিতে পারিতেছি না

গাড়ীর ভিতর দেখিলাম একটি ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালক পল্লী হইতে লণ্ডনে আসিতেছে। সঙ্গে তাহার পিতা। বোধ হইল বাল-কের এই প্রথম লণ্ডন দর্শন। রেলপথে ইহার কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য

দেখিয়া বাঙ্গালী বালকের হৃদয়-কথা বুঝিতে পারিলাম। কলিকাতা বা অন্য কোন বড় নগরে পল্লীবাসী বালক প্রথম প্রবেশ করিবার সময়ে কত বিস্ময়ই না অনুভব করে!

জগতে ভারত-সম্বর্দ্ধনা

আজকাল ৪টার পূর্ব্বে ভোর হয় এবং ৮টার পর সন্ধ্যা হয় দেখিতেছি। আলো না জ্বালিয়া দিবাভাগে ১৬ ঘণ্টা কাজ করা যায়। ৮টার সময়ে রাস্তায় দাঁড়াইয়া যে কোন গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব। বিন্দুমাত্র অন্ধকার থাকে না।

আজ ইংলণ্ডের ভারত-শাসন-বিভাগের দুইজন ভারতীয় কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করা গেল। একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেও সাহিত্যালোচনা হইল।

বর্ত্তমান ইংরাজীসাহিত্যে বড় লেখক কেহই নাই এইরূপ ইঁহার মত। ফ্র্যান্সিস টমসন একজন ভাল কবি ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজ-কবির নাম প্রায় অধিকাংশ লোকেই জানে না। তবে নব্য কবিগণের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশ পড়িতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি এদেশে স্থায়ী হইবে মনে করেন? রবীন্দ্র-কাব্যকে যথার্থভাবে বুঝিবার প্রয়াস এখানে আছে কি?" ইনি বলিলেন "প্রথম অবস্থায় ইংরাজ-সমাজে রবীন্দ্র-কাব্যসম্বন্ধে একটা উন্মাদনা আসিয়াছিল। গতবৎসর ঠাকুর মহাশয় যখন এখানে ছিলেন তখন বাস্তবিক পক্ষেই একটা হুজুগ সৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য, তাঁহার বক্তৃতা বা গান শুনিবার জন্য ইংরাজদিগের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। সে আকাঙ্ক্ষা, সে উন্মাদনা লোকদেখান জিনিষ নয়—সত্য সত্যই আন্তরিক। একবৎসরের ভিতর সে উন্মাদনা

চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা বা সমাদর করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পল্লবগ্রাহী এবং ভাসা ভাসা, কেহ কেহ অবশ্য গভীরদৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহ নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সুইডিস কবি ইব্‌সেন এবং রুশ টলষ্টয় বা ডষ্টয়েব্‌স্কি ইংরাজীসাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন বা করিয়াছেন ভারতের রবীন্দ্রনাথ তাহা করিতেছেন বা করিবেন কি?"

কবি উত্তর করিলেন "রুশ বা সুইডিস সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব আছে। ঊনবিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব এই সাহিত্যের আলোচিত বিষয়। উহাতে সেই যুগের আদর্শ ও জীবনযাপন প্রণালীই বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই যথাসময়ে তাহার আদর হইয়াছিল। তাহার পর ইউরোপে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল—নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন তথ্য সংগ্রহ, নূতন কর্ত্তব্যপালন এবং নূতন জীবনযাপনের ফলে নূতন দিকে পাশ্চাত্য-জনগণের দৃষ্টি পড়িতেছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই নব বিকাশমান দৃষ্টিশক্তির উন্মোচনে সাহায্য করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় কোন সমস্যার মীমাংসা আনিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা বা ইউরোপীয়েরা তাঁহার কাব্যে ইব্‌সেন টলষ্টয়ের তত্ত্ব-প্রচার পাইবেন না। জীবনযাপন, কর্ত্তব্যপালন, রাষ্ট্রগঠন, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যজাতিকে কোন আদর্শ দিতে পারেন নাই। নূতন প্রকার সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ এদেশে আদৃত হইতেছেন—নূতন জগতের বার্ত্তাবহ হিসাবেই ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা হইয়া থাকে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের গৌরব। ইনি বিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য মানবকে নূতন চক্ষু প্রদান করিলেন বলা যাইতে পারে।"

ইনি আরও বলিলেন "রবীন্দ্রকাব্য ভবিষ্যতে এদেশে পঠিত না হইতেও পারে। কিন্তু তাঁহার প্রভাব থাকিবেই। ফুলের পাঁপড়ি শুকাইয়া

গেলেও তাহার গন্ধ লুপ্ত হয় না। কাগজের ভিতর অনেক দিন ফুল রাখিয়া দিলে কাগজ গন্ধ টানিয়া লয়। কাগজের কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না—কিন্তু গন্ধ শুঁকিয়া বুঝা যায় কোন সময়ে ফুল ইহার অভ্যন্তরে ছিল। রবীন্দ্র-প্রভাবও সেইরূপ ওজন করা কঠিন হইবে। রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে হয় ত ইংরাজসাহিত্যসেবীরা সমাজজীবনের নূতন তথ্য এবং নূতন তত্ত্ব না পাইতেও পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডের উদীয়মান কবিসম্প্রদায়ের মজ্জার মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। রবীন্দ্রের গন্ধ লইয়া সকলকেই বাহির হইতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা ইংরাজজাতির এবং পাশ্চাত্যসমাজের কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে কি?” ইনি বলিলেন “সাধারণ কোন মাপকাঠির দ্বারা যাহা বিচার করা যায় এরূপ জিনিষ আমাদের দেশে সৃষ্ট হইলেই আমরা জগতের সভায় স্থান পাইব। ক্রীড়া কৌতুক, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদিতে পাশ্চাত্যগণের সমকক্ষ হইয়া ভারতবাসীরা জগতে খানিকটা পরিচিত হইয়াছেন। কারণ এসকল জিনিষ সকলেই সহজে বুঝিতে পারে। একটা বিশ্ব-পরিচিত মাপকাঠির দ্বারা পাশ্চাত্য ও ভারতবাসী উভয়েই পরীক্ষিত হইতেছেন। সেইরূপ কোন সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কলার নিদর্শন দেখিলেও সমগ্র জগৎ পুলকিত হয়। ভারতবাসীদিগের চিত্রশিল্পের সাহায্যে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষকে বুঝিতে ও সম্মান করিতে শিখিতেছে। কারণ এক্ষেত্রেও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিমাপক একটা সর্ব্বজনপরিচিত পরীক্ষাপ্রণালী আছে। যেসকল জিনিষ নিতান্তই স্থানীয় সে সমুদয় অপর জাতির পক্ষে বুঝা কঠিন। জগতের বাজারে বা পরীক্ষালয়ে উহাদের যাচাই হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সেগুলি অতি উচ্চ অঙ্গের হইলেও আধুনিক সভ্যজগতে তাহার সমাদর হইতেই পারে না।

এজন্য যত উপায়ে আমরা জগদ্বাসীর পরীক্ষার বস্তু হইতে পারি জগতে প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে আমাদের ততই সুযোগ সৃষ্ট হইতে থাকিবে! জগতের লোকেরা উন্নতি-অবনতি বিচার করিবার জন্য সাধারণতঃ যে উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে সেই উপায়ে বিচার করিবার যোগ্য বস্তু আমাদের লোকেরা সৃষ্টি করুন। জগতে ভারত-সম্বর্দ্ধনা অতি দ্রুত হইবে। জগতে সম্মান পাইতে হইলে জগতের লোকেরা যাহা বুঝিতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য—ইহা ত স্বাভাবিক।"

আজ সকালে নাপিতেরা কামাইবার সময়ে বলাবলি করিতেছিল বাকিংহাম প্যাল্যাসের নিকট আজ মহাধুম। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম সাফ্রেজিট দলের লোকেরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া স্বয়ং রাজার নিকট হাজির হইবে! ইহারা পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছে। রাস্তার কোন কোন ফুটপাথে দেখিলাম খড়ি দিয়া লেখা রহিয়াছে "আজ সাফ্রেজিটদিগের জয়জয়কার।" ৪টার কিছু পূর্ব্বে বাকিংহাম প্যাল্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম সাফ্রেজিটগণের শোভাযাত্রা বাহির হইবে। তাহার কিছু দেখিলাম না। দেখা গেল রাজপ্রাসাদের ফটকগুলি সবই বন্ধ রহিয়াছে—একসারি পুলিশ প্রহরী ঘর রক্ষা করিতেছে রাস্তার সকল স্থানেই পল্টন দণ্ডায়মান। পরে দেখিতে পাইলাম দুই একজন করিয়া পুরুষ রমণী এবং যুবক পুলিসের সারি ভাঙ্গিয়া প্রাসাদের দরজার কাছে যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। এইরূপ প্রায় ৫০।৬০ জন লোককে ধরিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইল। দর্শকবৃন্দের কোনরূপ সহানুভূতি দেখিলাম না। প্রাসাদের জানালা হইতে রাজপরিবারস্থ লোকেরা রাস্তার দৃশ্য দেখিতেছিলেন। সাফ্রেজিটেরা এইরূপে জেলে যাইয়া আন্দোলন বাঁচাইয়া রাখিতেছেন।

সমাজসংস্কারক বার্ণার্ড শ

এখানে নূতন কোন নাটকের অভিনয় প্রবর্ত্তিত হইলে প্রায় এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারই অভিনয় চলিতে থাকে। পালা পরিবর্ত্তন শীঘ্র শীঘ্র হয় না। আজকাল ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয় হইতেছে—কিন্তু এই গুলির কোনটা একবৎসরাবধি, কোনটা ছয়মাস হইবে, কোনটা ২।৩ মাস হইতে প্রতিদিন অভিনীত হইতেছে।

আজ সন্ধ্যায় বার্ণার্ড্‌শ-প্রণীত পিগ্‌ম্যানিয়ন-নাট্যের অভিনয় দেখিলাম। শ-কবি আধুনিক ইংরাজী লেখক মহলে বোধ হয় শীর্ষস্থানীয়। এই নাটকের নামও শুনিয়াছি। থিয়েটারের প্রধান অভিনেতাও এদেশে সুপ্রসিদ্ধ। কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি সেক্সপীয়ারীয় নাটকের অভিনয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম Twelfth Nightএর অভিনয়ে যতগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা আছে সেইগুলির দৃশ্য তৈল-চিত্রাকারে অথবা ফটোগ্রাফির সাহায্যে গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। পিগ্‌ম্যালিয়ান-নাট্যের প্রধান অভিনেতার কার্য্যই সেই সকল চিত্রে বিশেষভাবে প্রদর্শিত।

বার্ণার্ড্‌শ মামুলি প্রেমকাহিনী পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থে কথঞ্চিৎ নূতন নূতন সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। বিলাতীসমাজে 'জাতিভেদ' যথেষ্ট। এখানে নিম্নশ্রেণীর অধিকার অতি অল্প মাত্র। অবনত জনগণের সামাজিক উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। ইংরাজজাতির এই

সমস্যা শ-কবি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সামান্য একটা দৃশ্যমাত্র তিনি দেখাইয়াছেন। গল্পাংশ বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলেন নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণেরও কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। সামাজিক সমস্যাটাও গভীরভাবে আলোচিত হয় নাই। সমস্যাটার প্রতি দর্শক ও পাঠক-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে মাত্র।

সাধারণ একটা নিম্নজাতীয় ফুলওয়ালীকে "মধ্যবিত্ত শ্রেণী"তে তুলিবার প্রয়াস এই নাট্যে দেখিতে পাইলাম। একদিকে যেমন কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য দৃশ্য-বৈচিত্র্য স্থান-বৈচিত্র্য এবং লোক-বৈচিত্র্য পাইলাম না; তেমনি অপর দিকে গুপ্তপ্রেমের চিত্র, পরপুরুষসংসর্গ, অসংযত চরিত্রের দৃষ্টান্ত, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-বিভ্রাট, ইত্যাদি নাট্যকার-গণের প্রিয় বস্তুসমূহও দেখিতে পাইলাম না। বাস্তবিক পক্ষে প্রেম-কাহিনী সম্পূর্ণরূপেই এই নাটকে প্রত্যাখ্যাত ও বর্জ্জিত হইয়াছে ইহাই শ-কবির বিশেষত্ব। মামুলি হাহুতাশ, বিদ্বেষ, হিংসা, ডাইভোর্স, স্ত্রীবর্জ্জন, বিবাহ ইত্যাদির লেশমাত্র স্পর্শ না করিয়াও কবি একটি উপাদেয় রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন।

এ কথাও বলা আবশ্যক যে, এই গ্রন্থে আলোচনার গভীরতা বা বিস্তৃতি নাই। অতি ক্ষুদ্র কাহিনী, অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, অতি ক্ষুদ্র লোক সমাগম। লেখকের সমাজবিষয়ক চিন্তা ঠিক্ কোন্ দিকে তাহা বুঝা কঠিন। সমাজসংস্কারের জন্য ইংরাজদিগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক তাহাও জানা গেল না। এদিকে কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না গ্রন্থকার তাহা বুঝাইতে চেষ্টাও করেন নাই। তারপর ইঁহার রাষ্ট্রীয় মত কি—বুঝিতে পারিলাম না। সাম্রাজ্য-নীতির প্রভাব সমাজের উপর অধিকন্তু কতখানি তাহার বিশ্লেষণ ইনি করেন নাই। এই মাত্র দেখাইয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে ইংরাজকর্ম্মচারীরা

ইংরাজী-সমাজের আদবকায়দা ভুলিয়া যান। বহুকাল পরে ফিরিয়া আসিলে ইঁহারা স্বদেশের সভ্যতা বুঝিয়া উঠিতে বিব্রত হন।

লেখক হাস্যরসের অবতারণা স্থানে স্থানে করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের রস প্রায়ই নয়। কোন কোন শব্দের মারপ্যাঁচ করিয়া ইনি হাসাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মস্তিষ্কের কসরত ইহাতে কথঞ্চিৎ হয়। তাহার দ্বারা কাষ্ঠহাসি হাসা যায়। এক মুহূর্ত্তের জন্য কথাকাটাকাটি দেখিয়া পুলকিত হওয়া যায়। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে অথবা চরিত্র-বিকাশে এই হাস্য হইতে কোন শিক্ষা পাওয়া যায় না।

মানবজীবনের গভীরতর সমস্যাসমূহের মধ্যে অশেষ দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অসামঞ্জস্য এবং বৈপরীত্য স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে। সেই সকলের পরিচয় পাইলে মানুষ বিস্মিত ও পুলকিত হয়। এই বিস্ময় ও পুলক কেবলমাত্র ক্ষণিক আনন্দ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয় না। তাহার দ্বারা জীবনের উপর একটা সূক্ষ্মপ্রভাব বিস্তৃত হয় এবং চরিত্র গঠিত হইতে থাকে।

মানবজীবনের এইরূপ স্বাভাবিক বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য ইত্যাদি সাহিত্যে দেখান সহজ কথা নয়। এইজন্য উচ্চ অঙ্গের humour বা হাস্যরস আমরা যে সে কাব্যে পাই না। রবীন্দ্রনাথের "আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা" চিত্রে যে বিস্ময় ও পুলক সৃষ্টি হয় তাহা সাধারণ হাল্কা কাব্যে পাওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য সাধারণতঃ আমরা যে সকল সাহিত্য পাঠ করিয়া হাস্য উপভোগ করি সেগুলিতে শব্দের আড়ম্বর, কথাকাটাকাটি ইত্যাদি ভাষার কারচুপি মাত্র দেখিতে পাই। সোজা কথায় ইহাকে ফক্করী, বাচালতা এবং ফাজিলামি বলে। হিউমার বা হাস্যরস ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অন্য জগতের জিনিষ। বার্ণার্ড্ শ প্রণীত সামাজিক কাব্যে সে হিউমার নাই।

এখানকার থিয়েটারে বিনা পয়সায় 'প্রোগ্রাম' পাওয়া যায় না।

একটুকরা কাগজের জন্য ।৴০ পয়সা খরচ করিতে হয়। তাহাতে অভিনীত নাটকের অঙ্ক এবং দৃশ্যসমূহও বিশদরূপে বুঝান থাকে না। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম লেখা থাকে, এবং কোন্ কোন্ নট বা নটী এই সকল ব্যক্তির কার্য্য অভিনয় করিবেন তাঁহাদের নামও লেখা থাকে। অধিকন্তু, দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সময়ে কন্‌সার্ট পার্টি যে সকল সুর বাজাইয়া থাকেন তাহাদের পারিভাষিক নাম অর্থাৎ রাগ, তাল ইত্যাদি বুঝান থাকে। কিন্তু গল্পের সার মর্ম্ম এই প্রোগ্রাম দেখিয়া কিছুই বুঝা যায় না।

"পিগ্‌ম্যালিয়নে"র প্রোগ্রামে এ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"প্রথম অঙ্ক।

রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিট। স্থান—কভেণ্ট উদ্যানের অভ্যন্তরস্থিত গির্জ্জাঘরের বারান্দা।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক।

অধ্যাপকের বিজ্ঞানালয়।

তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্ক।

অধ্যাপক-জননীর বৈঠকখানা—টেম্‌সের কিনারায়।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা প্রথম অঙ্কের পরদিন প্রাতঃকালে; এবং পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা চতুর্থ অঙ্কের পরদিন প্রাতঃকালে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের ভিতর কয়েক মাসের ব্যবধান; এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ভিতরও কয়েক মাসের ব্যবধান।

নাট্যে বর্ণিত ঘটনার কাল—আধুনিক।"

ভারতীয় শিক্ষার কথা

একজন গ্রন্থকার ও অধ্যাপক চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে ইঁহার গৃহে দুই ঘণ্টা কাটাইলাম। ইনি অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। ইনি সেখানকার ভারতীয় ছাত্রগণকে ভালরকম জানেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের নামও শুনিয়াছেন। কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পুনরায় যাইবেন বলিলেন। পণ্ডিতটির নাম বেভান। সম্প্রতি Indian Nationalism নামক পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। ইনি ইউরোপের অন্য কোন দেশের শিক্ষাপ্রণালীর খবর রাখেন না। ফ্রান্সে কোন ধর্ম্মশিক্ষা নাই—এজন্য ঐ সমাজে কুফল ফলিতেছে—এইরূপ ইঁহার মত। ভারতবর্ষেও ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে কুফল ফলিবে ইহাই ইনি অনুমান করেন। ইঁহার মতে বিলাতেও ধর্ম্মশিক্ষার সমস্যা সন্তোষজনকভাবে এখন পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই।

এদেশে ধর্ম্মশিক্ষাপ্রণালী লইয়া প্রধানতঃ তিনপ্রকার মত আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাহার নিজ নিজ মতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রাগণের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করুক। ভারতবর্ষে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এই মতানুসারে কার্য্য করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজসমাজে ধর্ম্মশিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর ভিতর ধর্ম্মের আলোচনা অনাবশ্যক। এই মতানু-সারেই ভারতগবর্মেণ্ট বিদ্যালয় হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

বিলাতে তৃতীয় মত এই যে, গবর্মেণ্ট সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সারসংগ্রহ করিয়া একটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য জাতীয় মতবাদ প্রবর্ত্তন করুন। তাহাতে যেন কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি না থাকিতে পারে। কিন্তু গবমেণ্টের পক্ষে বা কোন পরিচালনা-সমিতির পক্ষে এইরূপ একটা ধর্ম্মপ্রচার করা সম্ভবপর কি? নূতন মত এ অবস্থায় এত সাধারণ ধরণের হইয়া পড়িবে যে কোন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানই তাহাকে হয় ত খ্রীষ্টমত বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিবে না। ভারতবর্ষেও এইরূপ Universal morality ও religion অর্থাৎ সার্ব্বজনীন নীতিজ্ঞান শিখাইবার প্রণালী আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুসমাজের কোন সম্প্রদায়ই এইরূপ একটা কৃত্রিম এবং কাগজে কলমে তৈয়ারী মতবাদকে নিজের করিয়া লইতে স্বীকৃত হয় না।

বিলাতের লোকেরা এই সকল কাবণে আর এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী অবলম্বনের কথা আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়েই সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার ছাত্র গ্রহণ করা যাউক। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষকের নিকট যাইতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষকগণ যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়া তাঁহাদের স্বীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন। কিন্তু এই প্রণালীতে বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এবং শাসন-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। বাহিরের লোকেরা বিদ্যালয়ের ভিতর প্রবেশ করিলে আভ্যন্তরীণ কার্য্যনির্ব্বাহ কিছু বাধা পায়।

কাজেই ইংরাজেরা এখনও ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। অধ্যাপক বলিলেন আগামী বৎসরই বোধ হয় পার্ল্যামেণ্টে এ-সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইবে।

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে ইনি কতকগুলি কথা বলিলেন।

বুঝিতেছি—আজকাল বিলাতের লোকেরা আমাদের মাতৃভাষার বিশেষ পক্ষপাতী হইতেছেন। ইহাঁকেও সেইরূপ দেখিলাম। ইনি বলিলেন—"ইংরাজী কাব্য ভারতবাসীরা পাঠ করে কেন? ইহাতে সময় বৃথা নষ্ট হয়।" আমি বলিলাম "কাব্য হিসাবে এবং শিল্প হিসাবে সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজী কাব্য সত্যভাবে হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত কঠিন নয়। তবে অনেক স্থলেই আমাদের ইহা সহজে উপভোগ করা ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু বিদেশীয় ভাষার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য এবং উহার নিয়মগুলি সহজে বুঝিবার জন্য ভারতবর্ষের নিম্ন-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ইংরাজী কাব্য পাঠ করিয়া সুফল পাইয়া থাকে। ভাষা শিক্ষার পক্ষে কাব্য হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায় না কি?" ইনি বলিলেন, "অত ভাল করিয়া ভারতবাসী ছাত্রের ইংরাজী শিখিবার প্রয়োজন কি? ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী হইতে চেষ্টা করা তাহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। উচ্চ শিক্ষার্থীরা ইংরাজী গদ্য পাঠ করুক। ভারতের নিম্ন বিদ্যালয়ে ইংরাজি গদ্য বা পদ্য কিছুই শিখাইবার আবশ্যক নাই।"

অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। প্রথমতঃ ভারতীয় ছাত্র প্রত্যেক স্থানেই শতাধিক। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ এই দুই নগরে বাস করিয়া থাকেন। এই উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়ায় "য়্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান" চাল প্রবেশ করিতেছে। কাজেই ভারতবর্ষে কত প্রকার আন্দোলন চলিতেছে, কোন্ আন্দোলনের কি উদ্দেশ্য, ভারতীয় অভিভাবক ও জননায়কগণের চরিত্র ইত্যাদি ইহাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। ছাত্রদিগের সঙ্গে যাঁহারা বেশী মেশামেশি করেন তাঁহারা অতি সহজেই সকল কথা বুঝিতে পারেন।

পার্ল্যামেণ্টের 'সবজান্তা' ভারতবন্ধু সভ্যগণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই ভারত-তথ্য ও ভারত-তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার ফলে ভারতবাসীর উপকার হইতেছে কি না সন্দেহ। বেভান জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতবর্ষে যে সকল বিদ্যালয়ে গবর্মেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না তাহাদের ছাত্রেরা গবর্মেণ্ট পরিচালিত বিদ্যালয়াদির ছাত্রগণ অপেক্ষা উন্নত চরিত্র, কর্ম্মতৎপর এবং পরোপকারী বা সমাজসেবক হয় না কি? শুনিয়াছি গবর্মেণ্ট কলেজের ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের সঙ্গে বিশেষ মিশিতে পায় না। কিন্তু লাহোরের দয়ানন্দ য়্যাংগ্লোবেদিক কলেজের ছাত্রেরা কথঞ্চিৎ নূতন আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে। আমার বিশ্বাস ইহারা বেশী স্বদেশসেবক এবং পরোপকারী হয়। আজকাল ত আপনাদের অধিকাংশ জননায়কই স্বার্থপর এবং নিজ নিজ নাম ও প্রশংসার জন্য লালায়িত। লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যথার্থ স্বার্থত্যাগী লোক পাওয়া যায় কি? চরিত্রবান্ শিক্ষকগণের সংস্পর্শে আসিয়া ছাত্রগণের জীবন গঠিত না হইলে আপনাদের জননায়ক-মহলে আন্তরিকতা এবং প্রকৃত স্বদেশহিতৈষণা প্রবেশ করিবে না।"

আমি বলিলাম "আপনি যেরূপ স্বাধীন শিক্ষালয়ের কথা বলিতেছেন সেরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে নাই। অবশ্য যদি প্রাচীন আদর্শের টোল চতুষ্পাঠীর কথা বলেন তাহা অনেকই আছে। সেই সমুদয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণ এক পরিবারভুক্তরূপে জীবন যাপন করেন। কিন্তু আজকাল নব্যমতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই প্রায় এক ধরণের। কোন কোনটার কার্য্য পরিচালনায় কিছু বিশেষত্ব আছে। কেহ গবর্মেণ্টের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন, কেহ বা করেন না। কোথাও বোর্ডিংগৃহের ব্যবস্থায়

ধর্ম্ম-শিক্ষার আয়োজন আছে কোথাও বা নাই। কিন্তু এইটুকু পরিবর্ত্তনে বিদ্যালয়ের ধরণ বা ছাঁচ বদলাইয়া যায় না। গবর্মেণ্ট-পরিচালিত বিদ্যালয়ের যে মূর্ত্তি তাহাই ন্যূনাধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের সকল বিদ্যালয়েরই মূর্ত্তি। ছাত্রেরা সর্ব্বত্র এক আদর্শে, এক ছাঁচে গড়িয়া উঠে। উনিশবিশ করা কঠিন। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র নিতান্ত স্বার্থপর এবং বিলাসী, এবং অপর কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র বিশেষভাবে সমাজসেবক ও পরোপকারী—এরূপ সাধারণ সূত্র প্রচার করা অসম্ভব।

লাহোরের দয়ানন্দ কলেজের ছাত্র এবং গবর্মেণ্ট কলেজের ছাত্র দুই শ্রেণীর ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা কঠিন। মান্দ্রাজের গবর্মেণ্ট কলেজ এবং পাচাপ্পা কলেজ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। মহারাষ্ট্রের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজ এবং ফার্গুসন কলেজ, বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অন্যান্য তথাকথিত স্বাধীন কলেজ—এই দুই প্রকার কলেজের মধ্যে কোন জাতি-গত প্রভেদ নাই। অবশ্য প্রাইভেট কলেজগুলিতে দু একজন হয় ত চরিত্রবান্ ও স্বার্থত্যাগী শিক্ষক কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহারা হয় ত কোন কোন ছাত্রের নূতন নূতন আদর্শ, জীবনের কর্ত্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা সংক্রামিত করিয়া থাকেন। এরূপ অধ্যাপক সরকারী কলেজেও আছেন। কিন্তু মোটের উপর, দুই প্রকার কলেজে কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারি না।

আপনি যেরূপ নূতন শ্রেণীর জন-নায়ক ও সমাজ-সেবক তৈয়ারী করিবার কথা বলিতেছেন তাহার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। সামান্য দুএক বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য সকল বিষয়ে মামুলি সরকারী নিয়মের অধীনতায় থাকিলে সেই সুফল আশা করা যায় না। হরিদ্বারের 'গুরুকুল'কে আমি সেই নূতন ও

প্রকৃত-স্বাধীন ধরণের বিদ্যালয় মনে করি। ইহার ছাত্রগণের চরিত্র অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবার কথা। বোলপুরের বিদ্যালয়ও কিয়ৎপরিমাণে এই নূতন শ্রেণীর অন্তর্গত।"

ইনি বলিলেন, "কিন্তু বোলপুরের ছাত্রদিগকে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ান হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীতে মাত্র কিছু স্বাধীনতা আছে।" আমি বলিলাম "তাহা হইলে যথার্থ স্বাধীন শিক্ষালয় গুরুকুল ছাড়া ভারতবর্ষে একটিও নাই। অধিকন্তু স্বাধীন বিদ্যালয় এদেশে থাকিবে কি করিয়া? অন্ন-সংস্থানের উপায় যে বাঁধা। কতকগুলি সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া সকলেই অগ্রসর হইতে বাধ্য। নূতন প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ কাজেই ঘটিয়া উঠে না। সকলকেই হয় কেরাণী, না হয় উকিল হইতে হইবে। গবর্মেণ্ট শিক্ষার উপর যে ছাপ মারিয়া দেন সেই ছাপ ভিন্ন বিদ্যার অন্য কোন চিহ্ন ভারতবর্ষে স্বীকৃতই হয় না। ইহার জন্য রাষ্ট্রশাসকগণ দায়ী।

সম্পূর্ণ নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী, নূতন 'ছাপ' ইত্যাদি ভারতবর্ষে গত ৭।৮ বৎসরের ভিতর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগেরও কোন যোগ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ যাহাকে কৃতকার্য্যতা বলে সে কৃতকার্য্যতা এই সকল বিদ্যালয়ের ভাগ্যে জুটে নাই। বঙ্গদেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ এবং মান্দ্রাজের আন্ধ্রজাতীয় কলাশালা এই স্বাধীন শিক্ষালয়ের দৃষ্টান্ত। সমস্ত দেশের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও যৎসামান্য সুতরাং ভারতসমাজের উপর ইহাদের প্রভাব সম্প্রতি আলোচনা করা অসাধ্য।"

ইনি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে সিংহলের একটি বিদ্যালয়ের সংবাদ দিলেন। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ফ্রেজারের পুত্র এইখানে একটি

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। ইনি সিংহলী ছাত্রদিগকে খাঁটি স্বদেশীভাবে তৈয়ারী করিতেছেন। তাহাদিগকে সিংহলের ধর্ম্ম, সমাজ, লোকসাহিত্য, শিল্প, সংস্কার ইত্যাদি সকল বস্তুর সংস্পর্শে রাখা হয়। এজন্য ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ, প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ, প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, পল্লীসেবা, পরোপকার ইত্যাদি সকল প্রকার কর্ম্ম ছাত্রগণের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। ছাত্রেরা প্রথম হইতেই সিংহলী আবহাওয়ায় এবং সিংহলী সমাজের অভ্যন্তরে জীবনযাপন করিতে থাকে।

বিলাতের ভারতীয় ছাত্রগণের কথা উঠিল। ইনি বলিলেন "আজকাল ইহারা বড়ই গবর্মেণ্টের বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে। চার পাঁচ বৎসর হইতে ইহাদের উপর গবর্মেণ্টের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ইহাদিগকে চলাফেরা, খরচ পত্র ইত্যাদি সকল কাজ করিতে হয়। এজন্য ইহারা অত্যন্ত বিরক্ত। ইহারা গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগকে গোয়েন্দা-বিভাগ মনে করে। এরূপ বিবেচনা করা ভুল। অবশ্য গোয়েন্দা-বিভাগ ইহাদের গতিবিধি সর্ব্বদা লক্ষ্য করে জানি। কার্জন ওয়াইলির হত্যার পর হইতে গবর্মেণ্ট বাধ্য হইয়া সতর্ক হইয়াছেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ হইতে যাঁহারা অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে গোয়েন্দা-বিভাগের কর্ম্মচারী বিবেচনা করা নিতান্ত অন্যায়।"

আজ অস্কার ওয়াইল্ডের An Ideal Husband বা 'আদর্শ স্বামী' নামক নাট্যের অভিনয় দেখিলাম। এই নাট্য ইংলণ্ডের বাহিরে ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে এবং রুশিয়ায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কবি ওয়াইল্ড্ও ইংরাজসমাজে বিশেষ পরিচিত। বার্ণার্ডশ এবং ওয়াইল্ড্ এই দুই নাট্যকার আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের ধুরন্ধর।

এই অভিনয়ের অঙ্ক ও দৃশ্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিতহইয়াছে :—

"প্রথম অঙ্ক

গ্রভেনার স্কোয়ারে—স্যার রবার্ট বিল্‌টার্ণের ভবন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্যার রবার্টের বৈঠকখানা।

তৃতীয় অঙ্ক

লর্ড গোরিং এর গৃহের বসিবার ঘর।

চতুর্থ অঙ্ক

স্যার রবার্টের বৈঠকখানা।

ঘটনার কাল—আধুনিক। ঘটনার স্থান—লণ্ডন।

নাট্যোল্লিখিত ঘটনা একদিন বুধবার সন্ধ্যাকালে আরব্ধ হইয়া পরবর্ত্তী শুক্রবার সকালে সমাপ্ত।"

এই নাটকে সুপ্রচলিত পাঁচ অঙ্ক নাই। ঘটনার স্থান বৈঠকখানা বা বসিবার ঘর। অন্দরমহল বা "জানানা"র কোন দৃশ্য ইহাতে নাই। পারিবারিক জীবনের চিত্র এখানে দেখান হয় নাই। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনযাত্রা-প্রণালীর তথ্য মাত্র এই কাব্যে আলোচিত হইয়াছে।

আর একটা কথা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। নাটকের ব্যক্তিগণ বড়ঘরের লোক। ইহাঁরা কেহই জনসাধারণ বা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত নন। লর্ড-পরিবারের কাহিনীই এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়। "পিগ্‌ম্যালিয়নে" বার্ণার্ড্‌ শ ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আজ এদেশের উঁচুমহলের রহস্য জানিতে পাইলাম।

স্যার রবার্ট পার্ল্যামেণ্টের একজন নামজাদা সদস্য। ইনি বিলাতের পররাষ্ট্রসচিব। বিদেশীয় রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধিও এই নাটকে স্থান পাইয়াছেন। তিনি ফরাসী রাজদূত। অবশ্য ইহাঁর স্থান অভিনয়ে অতি সামান্য। বিদেশের মধ্যে মিশরের কথা এই গ্রন্থের কেন্দ্র। মিশরের নাইল নদীর উপর ড্যাম-নির্ম্মাণ ব্যাপারে ক্রোড় ক্রোড় টাকা খরচ হইবে। এই কার্য্য সুসাধিত করিবার জন্য ব্যবসায়ীদিগের উৎসাহ সৃষ্টি আবশ্যক। অথচ ইহাতে লাভবান্ হইবার আশাও অত্যল্প। কিন্তু একজন লর্ড-কন্যা এই ব্যাপারে অজস্র টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই তিনি বিবেচনা করিলেন যেন তেন প্রকাবেণ পার্ল্যামেণ্ট সভায় এই ব্যবসায়ের স্বপক্ষে মত প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অন্যান্য ধনীলোকেরা এদিকে ঝুঁকিবে। তখন নাইল-ড্যামকে সফল করিয়া তোলা ইংরাজ ধনীদিগের স্বার্থের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে লর্ডকন্যা স্যার রবার্টকে "হাত" করিবার জন্য আসিয়াছেন। ঘুশ যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই দিতে তিনি স্বীকৃত। স্যার রবার্ট রাজী হইলেন। অথচ তাঁহার পত্নী অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিবেন না—স্বামীকে বিরত করিতে চেষ্টিত হইলেন। এইখানে পারিবারিক সম্বন্ধে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরোধ আরম্ভ হইল। দাম্পত্য প্রেমে এবং রাজনৈতিক পদমর্য্যাদায় দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হইল। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধই "আদর্শ-স্বামী" নাটকের কেন্দ্র। এই দ্বন্দ্ব দেখাইতে যাইয়া কবি বিলাতী রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালী, ইংরাজসমাজের গুপ্তকথা, ইংলণ্ডের ধনী নরনারীর অর্থ-লিপ্সা, চরিত্রহীনতা, চৌর্য্যবৃত্তি, কপটতা ইত্যাদির সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন।

বড়ঘরের চারিটি চরিত্র এই নাট্যে বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। চারিজনই নানাদোষে দোষী। জাল, জুয়াচুরী, অসাধুতা, গুপ্তপ্রেম,

এখানকার ধনীসমাজের স্বভাবসিদ্ধ—এই অভিনয় দেখিলে ইহাই মনে হইবে। রাষ্ট্রীয় জীবনের এই কলঙ্ক নিবারণ করিতে হইলে পারিবারিক জীবনের আদর্শ উচ্চতর হওয়া আবশ্যক—এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কবি ওয়াইল্ড নাট্য রচনা করিয়াছেন বুঝা যাইবে।

সেদিন ইংরাজের জাতিভেদ-সমস্যা দেখিয়াছি। আজ ইঁহাদের পরিবার-সংস্কারের আন্দোলন বুঝিতে পারা গেল! দুইটাতে দেখিলাম সামাজিক কৃত্রিমতাকে, অর্থের গৌরবকে এবং পদমর্য্যাদার অহঙ্কারকে খর্ব্ব করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে মনুষ্যত্বকে স্বভাবিকতা—সরলতাকে এবং ব্যক্তিগত ও পরিবারগত জীবনের উচ্চ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের সর্ব্বত্রই আজকাল এই বিপ্লবের সূচনা দেখা যাইতেছে। ইহারা কি ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে চলিল? এই জন্যই কি ভারতকবির "গীতাঞ্জলি" ইউরোপে সমাদৃত?

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত অক্সফোর্ড

বহির্দ্দৃশ্য

আজ অক্সফোর্ড যাত্রা করিলাম। কেম্ব্রিজ লণ্ডনের যতখানি উত্তরে অক্সফোর্ড ততটা পশ্চিমে। পৌঁছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল।

এই পথে সেদিন উইণ্ডসর ইটনের নিকটবর্ত্তী নগরে আসিয়াছিলাম। আজ এই সকল ছাড়াইয়া চলিলাম। এই অঞ্চলের একটা বড সহরের নাম রীডিং। প্রত্যেক সহরের বাড়ী ঘর লণ্ডনের রীতিতেই গঠিত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লণ্ডন দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম।

দুই পার্শ্বে হরিৎক্ষেত্র, কোথাও চষা জমি, কোথাও বা গবাদি চারণের মাঠ। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। সাধারণ শস্যের জন্য ভূমি যেরূপ প্রস্তুত করা হয় রেল পথের দুই ধারে দেখিলাম ফুলের বাগানও সেইরূপ চাষ করা হইয়াছে। এদিকে কৃষিজাত দ্রব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ মানুষের খাদ্য, দ্বিতীয়তঃ পশু খাদ্য। ভূমি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, স্থানে স্থানে আঠাল রক্তবর্ণ।

চষাজমির সংলগ্ন ফ্যাক্টরী ও কারখানা অনেক দেখিতে পাইলাম। জমির উপর নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন লেখা রহিয়াছে। কারখানা গৃহের

প্রাচীরেও স্বত্বাধিকারীদিগের নাম পাঠ করিলাম। ভারতবর্ষে যে সকল বিলাতী খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধাদি সুপ্রচলিত তাহাদের কারখানা এই সকল স্থানে অবস্থিত বুঝিতে পারা গেল।

অক্সফোর্ড পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে স্থানে স্থানে চালা ঘর দেখিতে পাইলাম। এই সকল ঘরের ছাউনি পশ্চিমবঙ্গের খড়ো ঘরের মত। অবশ্য ইহাতেও চিম্‌নী আছে। পল্লীর দরিদ্র কুটিরসমূহ প্রায়ই জীর্ণ 'খোলা'র ঘরের অনুরূপ। প্রাচীর ইষ্টক নির্ম্মিত।

অক্সফোর্ড দেখিতে কেম্ব্রিজেরই মত। নগরটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লোকালয় দুইভাগে বিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত নগরের শাসনে প্রধান কর্ত্তা। এখানকার ছাত্রগণের জীবনযাপন কেম্ব্রিজের নিয়মেই চলিয়া থাকে। ছাত্রাবাস ইত্যাদি সবই একরূপ। কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ এবং অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধ ইত্যাদিতেও অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে কোন প্রভেদ নাই। দুইই এক ছাঁচে গড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

আজ সন্ধ্যাকালে বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী দেখিতে গেলাম। এই বিখ্যাত গ্রন্থালয়ের নাম বিগত দশ বৎসর হইতে শুনিয়া আসিতেছি। বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে বসিয়া লেখাপড়া করিবার নিয়ম আছে। কিছুকাল হইল এই গ্রন্থাগারকে বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। তাহার জন্য ইহার পশ্চাতেই একটা সুবৃহৎ গোলাকার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐখানে মুদ্রিত গ্রন্থ, প্রাচীন পুঁথি, মৌলিক গবেষণার উপকরণ ইত্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে বড্‌লিয়ান হইতেও গ্রন্থাদি আনিয়া দেওয়া হয়। এই গোলাকার গ্রন্থ ভবনের নাম "র‍্যাডক্লিফ ক্যামেরা"।

অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের পথে চলিতে চলিতে প্রাচীন যুগের আবহাওয়ায় রহিয়াছি মনে হয়। পুরাতন গৃহ—মধ্যযুগের অট্টালিকা গঠনরীতি,

ধর্ম্মমন্দিরের প্রাধান্ত, কলকারখানার অপ্রাচুর্য্য, শিক্ষার্থীদিগের সংখ্যাধিক্য—এই সকল লক্ষণ আধুনিক লণ্ডন বা অন্য কোন বিলাতী জনপদের লক্ষণ নয়। এই সমুদয়ের প্রভাবে একটা পুরাতন জগতের আবেষ্টন সৃষ্ট হইয়াছে।

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য ধর্ম্ম-চর্চ্চাই এই সমুদয় মঠ বা আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল। গৃহগুলি ধর্ম্মপ্রচারক, মঠাধ্যক্ষ, সন্ন্যাসী ইত্যাদির জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ আইন শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। পরে অন্যান্য নূতন বিদ্যা শিখাইবার আয়োজন হইয়াছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা অল্প দিনের কথা। শিল্প-শিক্ষার আয়োজন এখনও করা হয় নাই।

অক্সফোর্ডে দেখিলাম কোন কোন ছাত্র কৃষি শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইবে না—যথাসময়ে একটা সার্টিফিকেট পাইবে মাত্র।

কেম্ব্রিজের মত এখানে স্ত্রীছাত্র গ্রহণ করা হয়। তাহারা সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাও দেয়, কিন্তু তাহাদিগকে উপাধি দেওয়া হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহবিবাদের সময়ে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ই রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপনা প্রণালী

বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের সঙ্গে দেখা হইল। ইহাঁর লাইব্রেরী গৃহে বসিয়া এক ঘণ্টা গল্প করিলাম। চারিদিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সজ্জিত রহিয়াছে।

প্রথমেই ইনি বলিলেন "আমার ভারতেতিহাসের তৃতীয় সংস্করণ আজ বাহির হইয়াছে। প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা বাড়াইয়াছি কিন্তু মূল্য বাড়াই নাই। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। তখনও প্রথম সংস্করণের সমান মূল্যই রাখিয়াছিলাম।" এই বলিয়া কোন্ কোন্ অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদে কতখানি বাড়ান হইয়াছে দেখাইতে লাগিলেন। কতকগুলি নূতন পরিশিষ্ট ও সংযুক্ত হইয়াছে দেখিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বিগত ৩.৪ বৎসরের ভিতর ভারতীয় পণ্ডিতগণের নূতন নূতন অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সে-গুলির ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন কি?" ইনি বলিলেন "প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই ইতিহাস চর্চ্চা বাড়িয়াছে দেখিতে পাইতেছি এইজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত। আর লক্ষ্য করিয়াছি, আমার গ্রন্থাদির সাহায্যে উদীয়মান বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে মতের অনৈক্য থাকিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর, আমার গ্রন্থে একটা কাঠামো খাড়া করিতে পারিয়াছি বলিতে পারি।"

ইনি বলিলেন "দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও ইংরাজী সস্করণ মাসে মাসে পড়িয়াছি। কিন্তু আমার গ্রন্থে ব্যবহার করিতে পারি নাই। নগেনবাবুর

ময়ূরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় জাহাজবিষয়ক গ্রন্থ তৃতীয় সংস্করণের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির গ্রন্থ দুইখানি পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমি বাঙ্গালা বা সংস্কৃত জানি না—আমার প্রতিবেশী ও বন্ধু পার্জিটার সাহেবকে দিয়াছি। হরিদাস পালিতের "গম্ভীরা" হইতেও উপকরণ লইতে পারি নাই। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সম্বন্ধে সম্প্রতি নরেন্দ্র লাহার গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমার তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট লেখা হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন বাঙ্গালী লেখক অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহাও ব্যবহার করিতে পারি নাই। এবার বঙ্গের সেনবংশ সম্বন্ধে নূতন তথ্য কিছু দিতে পারিয়াছি। এ সম্বন্ধে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার তালিকা দেখুন।"

ইহাঁর নিকট শুনিলাম অক্সফোর্ডের "ক্লারেণ্ডন প্রেস্" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের নূতন গ্রন্থ "চন্দ্রগুপ্ত" প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইনি একখানা জার্ম্মাণ মাসিকপত্র দেখাইলেন। নাম The Far East. ইংরাজী ও জার্ম্মাণ ভাষায় ইহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। ইনি বলিলেন "শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন মান্দ্রাজী এই পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ দিয়াছেন। আমিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থাপত্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিয়াছি। আমার History of Fine Art in India and Ceylon গ্রন্থের ইহা পরিশিষ্ট স্বরূপ। দেখিতেছি জার্ম্মাণেরা ইংরাজ অপেক্ষা ভারততত্ত্ব বিষয়ে বেশী আলোচনা করিয়া থাকেন।" কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম—এই সংখ্যায় অবনীন্দ্র ঠাকুরের 'চিত্রের ষড়ঙ্গ' বিষয়ক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণ ভাষায় রাধাকুমুদের Indian Shippingএরও সমালোচনা করা হইয়াছে।

"মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কোন প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু জাপান এবং চীনের শিল্পাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ও সমালোচনা আছে :

এখানকার একজন উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করা গেল যে দুই সপ্তাহ কাল ৮।১০ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপকগণের বক্তৃতা শুনিব। এজন্য গ্রীকসাহিত্য, প্লেটো-তত্ত্ব, ইউরোপের প্রকৃতি-তত্ত্ব, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমালোচনা, ইংলণ্ডের লোক-সাহিত্য ইত্যাদি নানাপ্রকার আলোচ্য বিষয় বাছিয়া লইয়াছি।

আজ দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা দেখিতে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বা বড় কেরাণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানকার অধ্যাপনা প্রণালী বুঝিতে ইচ্ছা করি। কাহার আদেশ আবশ্যক ?" ইনি বলিলেন "জানি না। বোধ হয় অধ্যাপকেরা নিজেই এ সম্বন্ধে কর্ত্তা।" কাজেই কালবিলম্ব না করিয়া অধ্যাপকের বক্তৃতালয়ে উপস্থিত হইলাম

আজ "স্কুল্‌স্"-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ, ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রেরা আসিয়া এই কলেজের বক্তৃতাগৃহে সমবেত হইল। গৃহে প্রায় ৫০ জন ছাত্রের জন্য বসিবার স্থান আছে। ছোট ছোট চেয়ার এবং ছোট টেবিল এই ঘরের আস্‌বাব।

মাত্র ২০ জন শ্রোতা। সকলেই সাধারণ ছাত্র নয়। আমার মত বাহিরের লোকও দুই চারিজন আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্কা রমণীকে দেখিলাম। সাধারণ ছাত্রগণের মধ্যে ছাত্রীও রহিয়াছেন।

ছাত্র ও ছাত্রীরা মামুলি খাতা হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগান মহাশয় একতাড়া নথির মত আল্‌গা পাণ্ডুলিপি লইয়া আসিয়াছেন। এই কাগজগুলি হইতে পাঠ করাই তাঁহার প্রধান

কার্য্য বুঝিতে পারিলাম। স্থানে স্থানে সামান্যমাত্র বুঝাইয়া দিতেছেন। ছাত্রেরা যথাশক্তি 'নোট' লিখিতেছে। ব্যাখ্যা, সমালোচনা, প্রশ্নোত্তর বা কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিল না।

ছাত্রেরা সকলেই 'নোট' লিখিতে সুপটু নয় বোধ হইল। কেহ লিখিতেছে, কেহ লিখিতে পারিতেছে না। কোন ছাত্র প্রথমে নিয়মিত-রূপে বক্তৃতার সার মর্ম্ম লিখিল, পরে আর পারিল না বা পারিতে চেষ্টা করিল না। সকলকেই সমান মনোযোগী দেখা গেল না। কেহ কেহ ঘুমাইয়াও পড়িতেছে।

অধ্যাপক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন—বক্তৃতা নকল করাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন না। ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে যাহা পারে তাহা করিল।

বক্তৃতার বিষয় ছিল—"চরিত্র-বিশ্লেষণ"। চরিত্র বা স্বভাব কাহাকে বলে, কত প্রকার স্বভাব মানুষের থাকিতে পারে, কোন্ কোন্ স্বভাবের কোন্ কোন্ লক্ষণ—ইত্যাদি মনোজগতের এবং সামাজিক জীবনের নানা কথা আলোচিত হইল। এই আলোচনায় অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরিচয় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মতবাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে নিজ বক্তব্যও বলিলেন। শরীর বিজ্ঞানের অনেক কথাও আনুষঙ্গিকভাবে এই বক্তৃতায় স্থান পাইয়াছে। কারণ শারীরিক অভি-ব্যক্তির ভিতর দিয়া অনেক স্বভাব বা চরিত্রের লক্ষণ প্রকটিত হয়।

এই প্রবন্ধ পাঠ শুনিয়া মনে হইতে লাগিল ইহা কোন গ্রন্থের একটা অধ্যায়। মুদ্রিত হইবার যোগ্যরূপে ইহা লিখিত হইয়াছে। প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনেরও বোধ হয় আবশ্যকতা নাই।

এই প্রবন্ধ রচনা করিতে অধ্যাপকের অনেকক্ষণ লাগিয়াছে, ৪০ মিনিট মাত্র বক্তৃতা হইল। কিন্তু ইহার ভিতর এত তথ্য সঞ্চিত

হইয়াছে যে এক সপ্তাহের কমে ইহা রচনা করা দুঃসাধ্য। এই জন্যই সাধারণতঃ অধ্যাপকদিগকে সপ্তাহে কোন বিষয়ে একটার বেশী বক্তৃতা দিতে হয় না।

ছাত্রদিগেরও এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে এবং সম্যক্ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। বোধ হয় গৃহ হইতে পূর্ব্বে পুস্তকাদি পাঠ না করিয়া আসিলে এই বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের কোন উপকার হয় না।

আর এক কথা—অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিয়ম দেখিয়া বক্তৃতা করেন না। দর্শনাধ্যাপক আলোচ্যবিষয়ে যথাসম্ভব সকল প্রকার কথাই বলিলেন। হয় ত এই বক্তৃতার অধিকাংশই ছাত্রগণের পরীক্ষায় কার্য্যোপযোগী না হইতেও পারে। তাহারা পরে টিউটরের সাহায্যে অধ্যাপকীয় বক্তৃতার সার গ্রহণ করিবে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে টিউটরের কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। টিউটরগণের অভিভাবকতাতেই ছাত্রেরা শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্দ্ধারণ করে। তাঁহাদের পরামর্শানুসারেই গ্রন্থাদি পাঠ করে এবং অধ্যাপকগণের বক্তৃতায় উপস্থিত হয়। টিউটরদিগের শাসনেই ছাত্রেরা লেখা পড়ায় মনোযোগী হইয়া থাকে।

উর্ষ্টার কলেজ দেখিলাম। বিশেষ বড় নয়। বাড়ীঘরের চেহারা পুরাতন ধরণের। ভিতরে প্রবেশ করিলে মধ্যযুগের আব্‌হাওয়া বুঝিতে পারা যায়। খিলানের গঠন, দরজা, ফটক, গৃহের ছাদ ইত্যাদি সকল জিনিষেই প্রাচীনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফুল গাছের দ্বারা প্রত্যেক ঘরের জানালাগুলি সাজান রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ বেশ সুরক্ষিত। পশ্চাতেই কেম্ব্রিজের Backs-এর ন্যায় উদ্যান ও কুঞ্জবন। উদ্যানের ভিতর কৃত্রিম সরোবর। সরোবরে রাজহংস ক্রীড়া করিতেছে। শুনিলাম এই পুষ্করিণী এবং রাজহংসমালা

রক্ষা করা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। এজন্য জমিদারীর কিয়দংশ গচ্ছিত আছে। প্রাচীনকালে যখন সন্ন্যাসী ও মঠবাসিগণের জন্য কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন হইতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অক্স্‌ফোর্ড-কেম্ব্রিজের বিদ্যালয়সমূহে এইরূপ নানাপ্রকার 'এণ্ডাউ-মেণ্ট' আছে। কোন কলেজে পায়রা পোষা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ হরিণ পুষিতে বাধ্য। এইরূপে প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হরিণ, ময়ূর, পায়রা, রাজহংস ইত্যাদি জীবের বংশপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল পারম্পর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, জীবজন্তুর সাহায্যে, উদ্যানের তরুলতার সাহায্যে, গৃহাভ্যন্তরস্থিত চিত্র ও মূর্ত্তির সাহায্যে ইংরাজসন্তানের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়া যায়। আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের গভীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়-জীবনের পুষ্টিবিধানে এইরূপ ক্রমবিকশিত সংস্কার-ধারা বিশেষ কার্য্যকরী।

সন্ধ্যাকালে অক্সফোর্ডের বাহিরে বেড়াইতে গেলাম। সহর পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। মাঠে কোন চাষ নাই—গবাদি পশু বিচরণ করিতেছে। এইরূপ গোচারণের মাঠকে বিলাতে Commons বলে। এই কমন্স-প্রান্তরে বেড়া দিয়া চাষ করিবার নিয়ম নাই।

অক্সফোর্ডের এই কমন্স-প্রান্তরের পার্শ্ব দিয়া টেম্‌স্‌ নদী প্রবাহিতা। নদীর বিস্তৃতি অত্যল্প—লণ্ডন অপেক্ষা এখানে অর্দ্ধেক। এইখানে টেম্‌সের উপর একটা ড্যাম নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ফলে টেম্‌সের জল পশ্চিম দিকে উচ্চ রাখা হইয়াছে। সেই অংশে নৌকাবিহারের সুচারু ব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম। প্রায় দুই শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা নদীবক্ষে সাজান রহিয়াছে। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নদীর দুই পার্শ্বে কয়েকটা

ঘর। কোন ঘরে হোটেল, কোন ঘরে নৌকার স্বত্বাধিকারীদিগের কারখানা বা কার্য্যালয় ইত্যাদি। এই সকল নৌকার মাঝী ও স্বত্বাধিকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য। সকল বিষয়েই ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টরূপে স্বীকার করে। বাস্তবিক পক্ষে, অক্স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজ নগরদ্বয়ে সহরবাসী জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন শিরোধার্য্য করিয়া চলে।

আজ এখানকার কমন্স-প্রান্তরে আকাশ-বিমান উড়িবার আয়োজন ছিল। সহর হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা এই উড্ডয়ন দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। নূতন বিস্ময়কর ঘটনায় মানুষ মাত্রেরই ঔৎসুক্য জন্মে।

আমরা একটা খালের ধারে গাছতলায় বসিয়া ঝোঁপের ভিতর জলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এরূপ উদ্ভিদ্‌রাশি-বেষ্টিত জলরেখা বিক্রমপুরে সুপরিচিত। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তরের ভিতর আকাশ-শকট দর্শনার্থ লোক-সমাগম। একদিকে নির্জ্জনতা, অপরদিকে কোলাহল। রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। তথাপি সন্ধ্যার অন্ধকার দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিল না।

প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিলাম। বাহির হইতে নগরের আয়তন দেখিয়া মনে হইল কেম্ব্রিজ অপেক্ষা অক্সফোর্ড বৃহত্তর।

বিলাতের উদীয়মান দার্শনিক

সেদিন ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে পার্জ্জিটার সাহেবের সঙ্গে আপনার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার নিকট একখানা পত্র দিতেছি।" আজ পার্জিটারের সঙ্গে দেখা হইল। ইঁহার গৃহে দেখিলাম বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ রাশীকৃত। পুরাণসমূহ সুরক্ষিত। ইনি স্কন্ধপুরাণের কোন মুদ্রিত সংস্করণ এখনও পান নাই।

ইঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হইল। ইনি বলিলেন "কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি আজকাল বাজে পুস্তক ছাপাইতেছেন কেন? প্রাচীন দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা ও ভাষা ছাপাইয়া অর্থের অপব্যয় করিয়া লাভ কি? তাহার পরিবর্ত্তে প্রাচীন বাঙ্গালার বহু মূল্যবান্ হস্তলিখিত পুঁথি প্রকাশ করিলে উপকার হয়।" আমি বলিলাম "এদিকে 'বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে'র প্রয়াস বিশেষভাবেই আছে।" ইনি বলিলেন "পরিষদের পত্রিকা লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি গৃহে আসিয়া থাকে জানি। কিন্তু কখনও ব্যবহার করি নাই।"

ইঁহার মতে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে গৌরব করিবার অনেক কথাই আছে। সংস্কৃত কাব্যে প্রকৃতি বিষয়ক যে সকল রচনা পাওয়া যায় এরূপ সুন্দর প্রকৃতিসাহিত্য অন্য কোন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। পুরাণ রামায়ণ ইত্যাদিতে প্রকৃতির বর্ণনা সত্য সত্যই চিত্তাকর্ষক। কবিগণ দেশের সৌন্দর্য্যে যথার্থই মুগ্ধ হইতেন।

অক্সফোর্ডের ক্লারেণ্ডন প্রেস ইংলণ্ডের মধ্যে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরাজী সাহিত্য, ইউরোপীয় ভাষানিবদ্ধ গ্রন্থাদি এবং এশি-

য়ার নানা সাহিত্য এই প্রেসে ছাপা হইয়াছে। যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের সহিত গ্রন্থনিচয় সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা যখন কলেজে ছাত্র ছিলাম তখন ক্লারেণ্ডন প্রেসের সংস্করণ পাইলে অন্য কোন গ্রন্থ কিনিতাম না। পরে ক্লারেণ্ডন প্রেসের প্রকাশিত মৌলিক অনুসন্ধান ও গবেষণার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আজ সেই জগদ্বিখ্যাত ক্লারেণ্ডন প্রেসের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

প্রেসের প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা গল্প হইল। ইনি বলিলেন "ভারতবর্ষে অনেক বিলাতী কোম্পানী খুব রোজগার করিয়া থাকে। আমরা এতদিন সাধারণ টেক্সট বুক ছাপিতাম না। উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ প্রকাশই আমাদের কার্য্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের বাজারের উপযুক্ত পুস্তকাদি বাহির করিতাম না। অথচ ওখানে নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থের কাটতি যৎপরোনাস্তি। এই সব বিবেচনা করিয়া আমরা ভারতবর্ষে একটা আড্ডা গাড়িয়াছি। দেখা যাউক লংম্যান্স ম্যাকমিলনের মত আমাদের কারবারও উন্নতি লাভ করে কিনা।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাপাখানার কার্য্য দেখিতে ইচ্ছা করেন কি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কতক্ষণ লাগিবে?" ইনি বলিলেন "সেদিন প্রিন্স অবওয়েল্‌স ইহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল।"

আমাকে আধঘণ্টার মধ্যে সারিতে হইবে। কাজেই তাড়াতাড়ি সকল ঘরের ভিতর দিয়া চলিলাম। সঙ্গে একজন ব্যাখ্যা করিবার জন্য আসিলেন। কম্পোজ করা, মুদ্রণ, বাঁধাই, প্লেট তৈয়ারী করা ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাই সংক্ষেপে বুঝা গেল।

মোটের উপর দেখিতে পাইলাম, হাতের কাজ ছাপাখানায় কিছুই

নাই। এমন কি টাইপ বসাইবার জন্যও হাতে কাজ করিতে হয় না। কলে সকল কার্য্য হইতেছে। 'মনোটাইপ' নামক একপ্রকার যন্ত্র দেখা গেল। সাধারণ টাইপ রাইটিংএর নিয়মে ইহার দ্বারা কাগজের উপর কম্পোজ করা হয়। কাগজে কতকগুলি সূচীছিদ্র পড়ে মাত্র। কোন অক্ষর মুদ্রিত হয় না। কিন্তু পরে এই সূচীছিদ্রসমূহ অন্য এক কলের সাহায্যে অক্ষরে পরিণত হয়।

পুস্তক বাঁধানও কলের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই ঘরে স্ত্রীলোকেরা কার্য্য করে। কাগজ ভাঁজ করিবার জন্য কল। সূত্রের দ্বারা সেলাই করিবার জন্য কল। কাগজ কাটার জন্য কল। মলাট লাগাইবার জন্য কল। মলাটের উপর সীলমোহর ইত্যাদি লাগাইবার জন্য কল। মানুষের কাজ কেবল জিনিষগুলি কলের ভিতর যথাস্থানে বসান। তাহা বসাইতেও বেশী কষ্ট নাই।

ক্লারেণ্ডন প্রেস দেখিতে দেখিতে মনে হইতে লাগিল একটা বিজ্ঞান-মিউজিয়ামের ভিতর রহিয়াছি। প্রত্যেকটা গৃহই একটা ল্যাবরেটরী বা বিজ্ঞানশালা। শিল্পবিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, রসায়নিক পরীক্ষাগৃহ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানালয় ইত্যাদি দেখিলে যেরূপ বিস্ময় জন্মে বা শিক্ষালাভ হয় এই ছাপাখানায় ঠিক সেরূপ হইল। বলা বাহুল্য, বহু কলের কার্য্যপ্রণালীই বুঝিতে পারিলাম না।

এইরূপ ছাপাখানার কার্য্য বুঝা এবং সুচারুরূপে চালান উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যার প্রয়োজন। কুলীমজুরদিগেরও কলকারখানার কাজ কর্ম্মে পটুত্ব থাকা আবশ্যক। দুইজন একজন লোক এই মুদ্রণ বিদ্যা শিখিয়া গেলে ভারতবর্ষে এরূপ ছাপাখানা স্থাপন করিতে পারিবে না। অল্লাধিক পরিমাণে বহুলোকের এই অভিজ্ঞতা না থাকিলে এরূপ জটিল কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব।

আজ ১২টার সময়ে "লিঙ্কল্‌ন্" কলেজে অধ্যাপক মোবালির বক্তৃতা। যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখি ছাত্রসংখ্যা সেদিনকার মতই, বোধ হয় কিছু বেশী। মোটের উপর ৩০ জন। কতকগুলি বড় বড় টেবিলের দুইধারে বেঞ্চ। ছাত্রেরা অধ্যাপকের দিকে মুখ রাখিয়া অথবা পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিয়াছে।

ঘরটা গির্জ্জার প্রধান গৃহ বা "নেভে"র মত। দেওয়ালে নানা লোকের চিত্র ঝুলান। ইঁহারা কলেজের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা। সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক হবেসের (Hobbes) মতবাদ আজ আলোচিত হইতেছিল। পূর্ব্বে আরও দুই একদিন এবিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। আজ হব্‌স্-নীতি শেষ করা হইল।

অধ্যাপক ম্যাকডুগালের দর্শন-অধ্যাপনায় এক রীতি দেখিয়াছি। আজ অন্য প্রকার দেখিতেছি। মোবার্লি বিশেষ কিছু লিখিয়া আনেন নাই। দু একটা কাগজের টুকরায় কিছু সঙ্কেত লইয়া আসিয়াছেন মাত্র। সঙ্গে ২।৪ খানা পুস্তকও রহিয়াছে। এই সঙ্কেতগুলি দেখিয়া মোবালি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন। টেবিলের উপর তাঁহার পুস্তকাবলী ও সঙ্কেতসমূহ রাখা হইয়াছে। এক একটা আলোচ্য বিষয় বুঝাইতে যাইয়া টেবিল হইতে ছাত্রগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। সেই বিষয়টা বুঝান হইয়া গেলে পুনরায় টেবিলে যাইয়া পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়ের সঙ্কেত দেখিতেছেন। এইরূপে নোট দেখিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য একবার সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আর একবার পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া মোবার্লির অভ্যাস।

মোটের উপর ইনি বক্তৃতা সরস করিয়া তুলিতে পারিলেন না। বারে বারে আসা যাওয়া করিতে করিতে সুর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তাহার উপর, মাঝে মাঝে গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক নজির দেখাইতে গিয়াও ইনি

রসভঙ্গ করিতেছিলেন। কিন্তু দার্শনিক ম্যাক্‌ডুগাল একখানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে একটা অধ্যায় ধীরে ধীরে পাঠ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইতে ছাত্রেরা সকলে বেশী বুঝিতে পারিয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু শুনিয়া একটা সুসম্বদ্ধ চিন্তারাশির পরিচয় পাইয়াছিলাম।

বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মোবালির নিকট তাঁহার ক্লাশে বসিবার অনুমতি লইয়াছিলাম। বক্তৃতার শেষে ইনি আমাকে একদিন সন্ধ্যা-কালে চা পানের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বলিলেন "ইতিহাসবিভাগের প্রধান অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন কি? আমি ত সামান্য শিক্ষক মাত্র। তাঁহার নিকট অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।"

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রোফেসার" বা অধ্যাপকপদ অতি উচ্চ। বিশেষ অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট প্রবীণ বিশেষজ্ঞ না হইলে কেহ অধ্যাপক হইতে পারেন না। সাধারণতঃ সকলেই "টিউটর" বা শিক্ষক মাত্র। এই টিউটরেরাই অনেক স্থলে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। বক্তৃতার বিষয় এবং আলোচনা-প্রণালী তাঁহাদের উপরওয়ালা অধ্যাপকগণের সঙ্গে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া রাখিতে হয়। অধ্যাপকদিগের পরামর্শ অনু-সারে বক্তৃতা দেওয়া হইয়া থাকে।

সেদিন ম্যাক্‌ডুগাল যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে তাঁহার বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। অবিচারিত বা অমনোনীত বক্তৃতা দিতে কেহই অধিকারী নন।

আজ বিকালে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল তাঁহার ল্যাবরেটরীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার টিচেনারের মত ম্যাক্‌ডুগাল মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র শরীর-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কাজেই শরীর শাস্ত্রবিষয়ক অনুসন্ধানগৃহ মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় নিতান্ত আবশ্যক।

ম্যাক্‌ডুগাল ইতিমধ্যে এই নূতন ধরণের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েক-

খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার Body and Mind, Physiological Psychology এবং Social Psychology গ্রন্থত্রয় প্রসিদ্ধ। ইহাঁর একখানা গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন। ইহাঁর বিজ্ঞানালয়ে বসিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা গল্প করিলাম। মনোবিজ্ঞান, দর্শন, হিন্দু অধ্যাত্মবিদ্যা, যোগ, শিক্ষাপ্রণালী ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হইল।

ইনি বিলাতী শিক্ষা প্রণালীর কয়েকটা অসম্পূর্ণতার কথা বলিলেন। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের নিম্ন ও মধ্যবিদ্যালয়ে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার অত্যধিক দৌরাত্ম্যে গণিত, ভূগোল, ইতিহাসাদি শিক্ষা চাপা পড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে যেমন ১০ ১২ বৎসরকাল প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাই শিখান হয়, এখানেও সেইরূপ বিদেশীয় ভাষা শিখাইতে সময়ের অপব্যয় করা হয়। অথচ জগতের অন্যান্যবিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে ছাত্রেরা শিখে না। বিগত ১৫।২০ বৎসরের ভিতর বিলাতে শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা বিজ্ঞান, কৃষি বা শিল্প শিক্ষা করে না। সাধারণতঃ এই আধুনিক বিষয়গুলি কোন সরকারী বিদ্যালয়ে শিখান হয় না। কেম্ব্রিজের 'পার্স' বিদ্যালয়ের মত কতকগুলি বে-সরকারী বিদ্যালয়ে এই সকল নূতন নূতন বিদ্যা শিখান হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, এখানকার সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত বে-সরকারী বিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও অন্ধের মত সেই প্রণালীই অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কোন বাঁধা পথে চলিবার জন্য কেহই বাধ্য করেন না। অথচ ইহাঁরা মামুলি পথ ছাড়িয়া নূতন নূতন শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে নিশ্চেষ্ট। ফলতঃ সমস্ত বিলাতে শিক্ষা-পদ্ধতি একঘেয়ে একটানাভাবে চলে। কোন বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের চিহ্ন সাধারণতঃ দেখা যায় না।

চতুর্থতঃ বিলাতে জাতিভেদ খুব বেশী। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এই জাতিভেদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতির জন্য স্থাপিত। এক শ্রেণীর লোকেরা অপর শ্রেণীর লোকদিগের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে সন্তান পাঠাইতে পারে না। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ ইত্যাদি ভেদজ্ঞান বিলাতের মধ্যবিদ্যালয়ে যত বেশী অত বেশী আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

ম্যাক্‌ডুগাল সাহেব ভারতীয় শিক্ষাসংস্কারের বর্ত্তমান লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। মেকলের আমল হইতে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সভ্যতা ভারতসমাজের উপর চাপাইবার প্রয়াস চলিয়াছে। তাহা আজ-কাল বন্ধ হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম "পাশ্চাত্য সভ্যতা আমরা বর্জ্জন করিতে চাহিনা। স্বাধীন ভাবে, সহজ ভাবে, স্বাভাবিক ভাবে ইহা গ্রহণ করিতেই আমরা প্রয়াসী। ব্যবসায়ের ভিতর দিয়া, লোকজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ আয়ত্ত করিতে চাহি। যতটুকু গ্রহণীয় তাহা আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইব। সুতরাং মেকলের প্রয়াসের সম্পূর্ণ বিরোধী আমরা নহি। কিন্তু হজম করিতে পারি বা না পারি, জোর করিয়া আমাদের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছিল। তাহা আমরা পছন্দ করি না।"

স্বাধীনভাবে ও সহজে পাশ্চত্য সভ্যতা গ্রহণ করিবার উপায় আলো-চিত হইল। মাতৃভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন শিখাইবার প্রণালী অবলম্বিত হইলেই একটা প্রধান সুযোগ ঘটে। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের মাতৃভাষায় এরূপ গ্রন্থ বেশী আছে কি?" আমি বলিলাম "সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায়ই বা কত খানা আছে? জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ ব্যতীত

আপনাদের অধ্যাপকেরা ছাত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা দিতে পারিতেন কি? আমরাও ভারতবর্ষে সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ অনুবাদ করাইতেছি।"

দার্শনিক বলিলেন "সুধু মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হইলেই কি আপনাদের সমাজোপযোগী শিক্ষা বিস্তার হইবে? আমি ত মনে করি যে, ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, কলা ও সাহিত্য শিখাইয়া প্রথমেই ছাত্রের চরিত্র গঠিত করা আবশ্যক। তাহার পর অন্য দেশীয় বিদ্যা প্রচার করা যাইতে পারে।" আমি বলিলাম "ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজকাল এই ধরণের শিক্ষা সংস্কারই চাহিতেছে। গবর্ণমেণ্টও ক্রমশঃ ইহা বুঝিতে বাধ্য হইতেছেন "

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আজকাল আপনাদের দর্শনালোচনার ফলে মনোবিজ্ঞান সাধারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে না কি?" ইনি বলিলেন "উনবিংশশতাব্দীর শেষ ভাগে বাস্তবিকই মনোবিজ্ঞান শরীর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বিপরীত দিকে মনোবিজ্ঞানের গতি। আমার বিশ্বাস মনোবিজ্ঞানে পদার্থ বিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে—হওয়া ভালই। অথচ মনোবিজ্ঞান খাঁটি জড়বিজ্ঞানে পরিণত হইয়া পড়িবে না। আমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্।"

এই সকল কথার পর আমরা ইহাঁর ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করিলাম। সামান্য ৩।৪টি মাত্র কুঠরী। সর্ব্বসমেত ৭।৮টি যন্ত্র—এগুলি বিশেষ জটিল বা বৃহদাকার নয়। প্রত্যেকটির নিকটে লইয়া যাইয়া ইনি ইহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। এগুলির সাহায্যে ক্লান্তি, মনোযোগ, দৃষ্টিশক্তি, স্মরণশক্তি ইত্যাদি নানাবিধ মনোবৃত্তি ও শারীরিক বৃত্তির পরীক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই সকল যন্ত্র ও ঘর দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন "আমার এই বিজ্ঞানালয় কিছুই না। আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতি ধরণের। আমার ছাত্রসংখ্যাও অত্যল্প। মাত্র চারিজন। তাহাদিগকেও বৃত্তি দিতে হয়। দুইটি ছাত্রীও এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছে।"

একজন রমণীর সঙ্গে ল্যাবরেটরীতে আলাপ হইল। ইনি একজন শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনাই ইহাঁর প্রধান কার্য্য।

ম্যাকডুগালের নাম অক্সফোর্ডে বেশ বাড়িতেছে। শীঘ্রই ইনি দার্শনিক মহলে প্রসিদ্ধ হইবেন বিশ্বাস হইতেছে। ইহাঁকে দেখিলেই একজন ভাবুক চিন্তাশক্তি-সম্পন্ন স্বাধীনকর্ম্মতৎপর লোক বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হইল সমাজবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞান অতিদূর ভবিষ্যতে ইহাঁর গবেষণার দ্বারা প্রভূত উন্নতিলাভ করিবে। ইনি হিন্দু সাহিত্য ও দর্শনের কিছুই জানেন না, জানিতে উৎসুক। এ বিষয়ে কয়েকখানা গ্রন্থ ইহাঁকে উপহার দিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলাম।

চলিয়া আসিতেছি এমন সময় ইনি বলিলেন "আগামী রবিবার রাত্রি ৯ টার সময়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপককে আমাদের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপকগণ দার্শনিক সভায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। একটা প্রবন্ধ পঠিত ও সমালোচিত হইবে। আপনি আসিলে এখানকার সম্মিলন ও আলোচনা-প্রণালী বুঝিতে পারিবেন।" আমি বলিলাম "নৈশ পোষাক আমার নাই। সাধারণ পোষাকে যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আসিতে পারি।" ইনি বলিলেন "আমি দর্শন বিভাগের কর্ত্তাকে বলিয়া রাখিব। আমি যদি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারি তিনি আপনাকে লইয়া বসাইবেন।"

আজকাল অক্সফোর্ডের উৎসব-সপ্তাহ চলিতেছে। ছাত্র, শিক্ষক,

অধ্যাপক, কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই নানা প্রকার সম্মিলন, ভোজ, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদিতে ব্যস্ত। কলেজে কলেজে বিবিধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এই সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ম্যাক্‌ডুগাল বলিলেন "আজ কাল আমি এত ব্যস্ত যে, সেদিন ইচ্ছা স্বত্ত্বেও ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতায় আসিতে পারি নাই। আমার এই ল্যাবরেটরীতেই বসু মহাশয় তাঁহার নূতন আবিষ্কারগুলি ব্যাখ্যা করিলেন অথচ আমি উপস্থিত হইতে পারিলাম না। অন্যান্য অধ্যাপকেরা সকলেই তাঁহার অনুসন্ধানসমূহ বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচনা করিতেছেন।"

এ কয়দিন টেম্‌সে প্রত্যহ বাঁহিচ খেলা হইতেছে। প্রত্যেক কলেজের নাবিকদল নদীর উপর নৌচালন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত। আজ সন্ধ্যার সময়ে ঘাটে উপস্থিত হইলাম। কাল টেম্‌সের যে ভাগে গিয়াছিলাম আজ তাহার নিম্নদিকে গেলাম। এই অংশের টেম্‌সকে 'আইসিস' বলে। আইসিসের উপরেই নৌচালন-বিদ্যা পরীক্ষিত হয়।

দেখিলাম ঘাটে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রই অনুপস্থিত কিনা সন্দেহ। বোধ হইল যেন সমগ্র অক্সফোর্ড নগরের সাধারণ অধিবাসীরাও এখানে সমবেত। কেবল তাহাই নহে। ইংলণ্ডের অন্যান্য নগর হইতেও এই বাঁহিচ দেখিবার জন্য বহু দর্শক আসিয়াছেন।

নদী নিতান্তই সঙ্কীর্ণ—নর্ম্মদার মত। চারিখানা সরু নৌকা একসঙ্গে বাহিয়া যাওয়া কঠিন। অথচ নৌকাগুলি এত সরু যে এক জনের বেশী লোক মধ্যস্থলে বসিয়া দাঁড় বাহিতে পারে না। প্রত্যেক নৌকায় ৮ জন দাঁড়ী বা মাঝি এবং একজন পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া উৎসাহদাতার কার্য্য করিতেছে। নদীর ধারে একদিকে উদ্যান ও ক্রীড়াক্ষেত্র। অপর কূলে প্রত্যেক কলেজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গৃহ ও 'বজরা'। এই সকল বজরা ও

গৃহের উপর বিভিন্ন কলেজের পতাকা উড়িতেছে। গৃহের ছাদ ও প্রাচীর এবং বজরার সকল স্থান কলেজের ছাত্রে পরিপূর্ণ। ছাত্রদিগের সঙ্গে তাহাদের দর্শক-বন্ধুও বহু আসিয়াছেন।

নদী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কাজেই পাশাপাশি নৌকা চালান যাইতে পারে না। এই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পরাজয় পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে বিচিত্র রীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। দশ বার খানা নৌকা পরে পরে সাজান থাকে। ছাড়িবার সময়ে যে কোন দুই খানা নৌকার ভিতর সমপরিমাণ দূরত্ব রক্ষা করা হয়। বাহিতে বাহিতে যে নৌকা সম্মুখের নৌকাকে স্পর্শ করিতে পারিবে তৎক্ষণাৎ তাহার জয় ঘোষিত হইবে।

বাঙ্গালাদেশে, এমন কি কাশীতেও, বিজয়াদশমীর দিন এবং অন্যান্য উৎসবকালেও এইরূপ নৌবিহার ও নৌচালন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধুম দেখা যায়। দশহরা পূজায় বাঁইচ-উৎসব বোধ হয় প্রত্যেক জেলায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অক্সফোর্ডের উৎসাহ, আনন্দ, জীবনবত্তা ও প্রতিযোগিতা দেখিয়া আমাদের বাঁহিচের কথাই মনে পড়িল। এদেশের লোকেরা এই সকল উৎসবকে জাতীয় জীবনের অন্যতম পরিপুষ্টির কারণ বিবেচনা করিয়া থাকে। যেখানে সেখানে এই সমুদয়ের বড়াই করিয়া থাকে। ভারতসমাজেও এইরূপ বাঁহিচ উৎসবে জাতীয় চরিত্র অজ্ঞাতসারে কম গঠিত হয় না। কিন্তু আমরা জ্ঞাতসারে এগুলির সার্থকতা ও উপকারিতা বুঝি না বা বুঝাইতে চেষ্টা করি না। এমন কি, কেহ এগুলির যথার্থ মূল্য প্রচার করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে অপদস্থ করিতেও প্রবৃত্ত হই। মনে হয় ইনি অনর্থক ফেনাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন! যাহা হউক, ভারতবাসীর মতিগতি দেশের মাটির দিকে ফিরিয়াছে। তাই মাঝি, মাল্লা, ছুতার মিস্ত্রী ইত্যাদির জীবনের দিকে নজর পড়িয়াছে। রামলীলা, ভরতবিলাপ, গম্ভীরা, বাঁহিচ, গাজন, বাউল ইত্যাদি এখন আদৃত হইতেছে।

আমাদের 'বাহিচ' সাহিত্যও কি কম? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ লোকসাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় "Folk Literature in England." আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও বিষহরির গান, সারি গান, ভাটিয়াল গান, ইত্যাদি শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কোন দিন পরিগণিত হইবে না কি?

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এই জনস্রোতের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনুভব করিলাম আমরা দশহরায় যে ধর্ম্মজীবন ও সমাজজীবনের বিকাশ সাধন করিয়া থাকি এখানকার জনগণ বিদ্যালয়-সম্পর্কিত নৌবিহার উৎসবে সেইরূপ ধর্ম্মজীবন ও সমাজজীবনের পুষ্টিসাধন করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, এই উৎসব ইহাদের বিবেচনায় অতি মূল্যবান। ধর্ম্মজীবনেও উৎসাহ ইহা অপেক্ষা আর বেশী হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। সত্য কথা, বিশ্ববিদ্যালয়কে এখানকার লোকেরা ধর্ম্মমন্দিররূপেই দেখিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এখানে জাতীয় জীবনের মূল প্রস্রবণ। এই সমুদয় কেন্দ্র হইতেই বিলাতের বড় বড় জাতীয় আন্দোলনসমূহ পুষ্ট হইয়াছে। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে যত শক্তি ও যত ব্যক্তি ইংরাজ সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহাদের সমস্তই এই বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইংলণ্ডের অনন্যসাধারণ জনগণের জীবন-কাহিনী এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ, সকলই এখানে সুপরিচিত। কর্ম্ম-বীর ও চিন্তাবীর এবং ধর্ম্মবীরগণের মূর্ত্তি ও চিত্র সমুদয়ই এই সকল বিদ্যামন্দিরে সযত্নে রক্ষিত। তাঁহাদের দৃষ্টি ও স্মৃতি এড়াইয়া এক মুহূর্ত্তও জীবন যাপন করা অসম্ভব। প্রাচীন গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া কেহ কি কখনও নীচ ও জঘন্য আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইতে পারে?

রাষ্ট্রনীতি

আজ "নিউকলেজে" অধ্যাপক বার্কারের বক্তৃতা শুনিলাম। ইনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। আজকার আলোচ্য বিষয় ইংলণ্ডের "দলভেদ" এবং পার্ল্যামেণ্টের "বড় মহল"।

ছাত্রসংখ্যা অন্যান্য দিনের প্রায় দ্বিগুণ দেখিতে পাওয়া গেল। বক্তৃতাগৃহও অন্যান্য দিনের গৃহ অপেক্ষা বৃহৎ। লম্বা লম্বা টেবিলের দুই ধারে বেঞ্চ। ছাত্রেরা অধ্যাপকের দিকে মুখ বা পশ্চাদ্ভাগ রাখিয়া বসিল।

বক্তা প্রথমেই বলিলেন তাঁহার মত শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ১৯০৭ সালে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ১৯১০ সালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাও আবার ১৯১২ সালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ যাহা প্রচার করিতেছেন তাহাও পূর্ব্বেকার মতবাদ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র।

ইনি ছাত্রগণকে শ্রুতলিপি লিখাইয়া গেলেন মনে হইল। ছাত্রেরা ইঁহার সকল কথা নকল করিয়া লইল। কথাগুলি আলোচনা করিবার প্রণালীতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে বুঝিতে পারিলাম।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সাধারণ ব্যবসায় স্বরূপ। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কার্য্য সফল করিবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেন রাষ্ট্র-বীরেরাও সেই পন্থাই অবলম্বন করেন। বিজ্ঞাপন প্রচার ব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ। সেইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার রাষ্ট্রীয় জীবনেরও প্রধান লক্ষণ। বড় বড় নামজাদা· ধুরন্ধরদিগকে "দলপতি" করিতে পারিলে কার্য্যতালিকা

সুপ্রচারিত হইতে পারে। এই জন্য প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়কগণের নামে দলের মত গঠিত করা হয়।

একদল যখন রাষ্ট্রে প্রাধান্য লাভ করেন অন্য দল তখন নিশ্চেষ্ট থাকেন কিন্তু নিতান্ত হতাশ হইয়া রাষ্ট্রকর্ম্ম ত্যাগ করেন না। অপর পক্ষ বাহির হইতে প্রধান পক্ষের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়া থাকেন। বিলাতী রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহাই নিয়ম। কিন্তু ফরাসী বা জার্ম্মাণেরা এরূপ দলবিভাগ এবং দলপতির শাসন বা দলে দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন পছন্দ করে না। ঐ সকল দেশে দল ভেদ "Party-System" নাই। উহাদের যখন যে দল প্রধান হয় সেই দলই দেশে একমাত্র কর্ত্তা থাকে। তাহাদের কার্য্য সমালোচনা করিবার জন্য অপর পক্ষ রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখা দেয় না।

ইংলণ্ডের রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস্ একজন চিকিৎসক। ইনি অক্স-ফোর্ড হইতে ৫ মাইল দূরে এক পল্লীতে বাস করেন। টেলরিয়ান বিল্ডিংস নামক মিউজিয়াম এবং ভাষাশিক্ষালয়ে ব্রিজেসের সঙ্গে দেখা করা গেল। বৃদ্ধ বয়স, অথচ শক্ত শরীর। পোষাক পরিচ্ছদের কোন পারিপাট্য নাই। অতিশয় সাদাসিধা ধরণের লোক। সর্ব্বদা আনন্দে উৎফুল্ল। কোন কায়দা কানুনের বেশী ধার ধারেন না মনে হইল।

খানিকক্ষণ ধরিয়া সাহিত্যবিষয়ক গল্পের পর কবি আমাকে ক্রাইষ্ট-চার্চ্চ কলেজ দেখাইতে লইয়া গেলেন। ইহাই অক্সফোর্ডের সর্ব্ববৃহৎ বিদ্যালয়। এখানকার প্রাঙ্গণ অতি সুবিস্তৃত। কাইরোর মস্‌জিদ, কবর ইত্যাদি যেরূপ দেখায় এখানকার কলেজগুলি ঠিক সেই রকম। প্রাঙ্গণ, প্রাচীর ইত্যাদি দেখিলে মুসলমানী শিল্পের আভাষ পাওয়া যায়।

ক্রাইষ্ট-চার্চ্চের ভোজনালয় খুব বড়। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল চিত্র আছে। এই চিত্রসমূহে বিলাতের প্রসিদ্ধ লোকের প্রতি-

মূর্ত্তি অঙ্কিত। ভোজনালয়ের ভিতরকার ছাদ, ভোজনালয়ে উঠিবার সিঁড়িগৃহ, ভিতরকার ছাদের খিলান, এই সবের দিকে কবি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। বলিলেন—"গথিক-রীতি যখন ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে তখন ফ্রান্সে অলঙ্কার ও বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু ইংলণ্ডে তখন সংযত গঠন-শিল্পে জনগণের দৃষ্টি পড়িল। ক্রাইষ্ট-চার্চ্চের এই অংশ অতি পুরাতন।"

ক্রাইষ্ট-চার্চ্চের সংলগ্নই "কর্পাসক্রিষ্টি" কলেজ। উষ্টার হইতেও এ বিদ্যালয় ক্ষুদ্রতর। কবি এই কলেজের ছাত্র। এজন্য ক্রাইষ্ট-চার্চ্চ হইতে 'কর্পাসে' লইয়া গেলেন। ইহার খুটি নাটি বুঝাইয়া দিলেন। এমন কি, কলেজের রান্নাঘরে যাইয়া এক সঙ্গে ৫০টা জিনিষ ভাজিবার প্রণালীও দেখাইয়া দিলেন।

বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ব্রিজেস্ রবিবাবুর নাম ২।৪ বার করিলেন। অক্সফোর্ডে লণ্ডনে ব্রিজেস্ রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।

বিলাতের কৃষিকার্য্য

আজ অক্সফোর্ড নগরের বাহিরে পল্লীজীবন দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনসীমা অতিক্রম করিলাম। পরে অক্সফোর্ড নগরও পশ্চাতে রাখিলাম। পদব্রজে ২।৩ মাইল দক্ষিণদিকে যাইতে যাইতে অক্সফোর্ড জেলা ছাড়াইয়া নূতন এক জেলায় পদার্পণ করিলাম। মধ্যে টেম্‌স পার হইয়াছি। অক্সফোর্ড নগর টেম্‌সের উত্তরে অবস্থিত। দক্ষিণে বার্কশায়র জেলার বট্‌লি গ্রাম। এই পল্লী একটা অসমতল ভূমির উপর অবস্থিত। উপত্যকা ও ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমাবেশে ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী।

রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে দুইধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষের পল্লীপথসমূহও প্রায় এইরূপ। ক্ষেত, বাগান এবং গোচারণের মাঠও আমাদের দুই পার্শ্বে বিরাজমান। শূকরের 'বাথান' স্থানে স্থানে দেখিলাম, দুর্গন্ধ পাইয়া তাহার অস্তিত্ব বুঝা গেল। বাগানের জঙ্গলে এবং বেড়ার গাছপালায় বটলি-পল্লী অনেকটা বঙ্গভূমির পল্লীগ্রামের অনুরূপ হইয়াছে। পাখীর ডাক বেশ ঘন ঘন শুনা যাইতে লাগিল। "পীর্ডইট" পক্ষীই প্রধান। ইহার ডাক হইতে নামকরণ হইয়াছে। মোরগশালা হইতেও আমাদের মুসলমান-পল্লীর সুপরিচিত ডাক শুনিতে পাইলাম। লোকজনের যাতায়াত খুব অল্প। বাড়ীঘর সবই সাধারণ লালটালির ছাদযুক্ত—মাঝে মাঝে দু একখানা বঙ্গদেশীয় 'খড়ো' ঘর দেখা গেল।

রাস্তা হইতে অনতিদূর দক্ষিণে অনুচ্চ পাহাড় দেখিতে পাইলাম। তাহার উপর শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ও উদ্যান। তাহার মধ্যে মধ্যে দু এক-খানা কৃষকগৃহ অবস্থিত। আমরা এইরূপ এক পার্ব্বত্য কৃষিক্ষেত্রেই চলিয়াছি।

ক্ষেত্রস্বামী তাঁহার বাগান, আবাদ, মাঠ, পশুশালা, পক্ষিপালন, চাষের যন্ত্র, হাতিয়ার, শূকর-খানা, মৌমাছির চাক ইত্যাদি সবই যত্নের সহিত দেখাইয়া দিলেন। আমি অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সঙ্গে ইঁহার নিকট আসিয়াছি। এই ছাত্র নিজামের প্রজা—হাইদ্রাবাদের অধিবাসী। ইনি ৪ বৎসর হইতে এখানে কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছেন। অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যা শিখান হয়, যথাসময়ে ছাত্রদিগের পরীক্ষাও করা হয়, কিন্তু কোন ডিগ্রি বা উপাধি দেওয়া হয় না। একটা সার্টিফিকেট মাত্র দিবার নিয়ম আছে। এই শিক্ষা পাইতে হইলে মাসিক ৩০০, ৩৫০, টাকা খরচ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যা শিখান হয় বটে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্র, উদ্যান বা বনভূমি বিদ্যালয়ের অধীনে বা পরিচালনায় একটিও নাই। কাজেই কার্য্যকরী শিক্ষা দান এখানে হয় না। কিন্তু এই ছাত্র তাঁহার অধ্যাপকের সাহায্যে বর্টলি-পল্লীর এই কৃষকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছে। দেখিলাম কৃষকপরিবারের সঙ্গে হায়দ্রাবাদী মুসলমান যুবকের সত্য সত্যই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। ক্ষেত্রস্বামী ২ ঘণ্টা খরচ করিয়া আমাকে তাঁহার সকল কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেন।

আলুর ক্ষেতে দেখিলাম—দুই তিন দিন হইল রাত্রে হঠাৎ তুষার পাত হওয়ায় সমস্ত উদ্ভিদ্‌গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মে মাসের এই ঋতুতে সাধারণতঃ তুষার পাত হয় না। বিশ বৎসরের মধ্যে কৃষকেরা এরূপ আকস্মিক ঘটনা দেখে নাই। কিন্তু এবার তাহাদের অশেষ ক্ষতি

হইল। তুষার পাতের ফলে উদ্ভিদের পত্রগুলি পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ, মলিন ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়।

সার দিবার নিয়ম সম্বন্ধে ইনি বলিলেন, “আমি বাজার হইতে কিনিয়া কখনও রাসায়নিক সার জমিতে দিই না। দু-একবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে খরচ বড় বেশী পড়ে। আমি মাত্র ২০০ বিঘা ভূমি চাষ করিয়া থাকি। এত অল্প-বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে বাজারের বৈজ্ঞানিক সার দিলে লাভবান্ হওয়া যায় না। আমি সার গৃহেই প্রস্তুত করি। আমার মোরগশালা, গোশালা, অশ্বশালা ইত্যাদিতে যে সকল বিষ্ঠা জমে সেই গুলির সদ্ব্যবহার করিলেই আমার কার্য্য চলিয়া যায়। কখন কখন কিছু রাসায়নিক পদার্থও মাটির সঙ্গে মিলাইয়া দিই।”

আলুর ক্ষেত দেখিয়া কৃত্রিম মৌচাক দেখিলাম। প্রায় দুই হস্ত উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৮।১০ টা চাক ইনি তৈয়ারি করিয়াছেন। ইহার ভিতর মধুমক্ষিকার প্রবেশ পথও আছে। ইঁহার পক্ষিশালায় মুরগী ও হাঁস এই দুই জীবই প্রধান। ইহাদের জন্য ছোট বড় নানা প্রকার বিচরণক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। শাবকদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেখা গেল।

একটা ক্ষুদ্র ফল-বাগান দেখিলাম। ইহাতে নাস্‌পাতি ও আপেল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। ফুলের বাগানও ভূমির এক অংশে অবস্থিত। সবই আয়ের পথ—কেবলমাত্র বিলাস বা সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য কিছুই নয়। দুএকটা ‘হট হাউস্’ বা গরম গৃহও দেখিলাম। এই গৃহের এক কোণে উনন আছে। তাহার ভিতর আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হয়। চিম্‌নী ও নলের সাহায্যে গৃহের সর্ব্বত্র উত্তাপ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ছাদ কাচের তৈয়ারী।

গোচারণ ও অশ্বচারণের মাঠ অত্যন্ত বৃহৎ। ইনি বলিলেন, “আমরা সাধারণতঃ $\frac{২}{৩}$ অংশ জমি এই জন্য ফেলিয়া রাখি। মাত্র $\frac{১}{৩}$

অংশে চাষ, আবাদ, বাগান ইত্যাদি প্রস্তুত করি। আমার ৬০০ বিঘা জমি। তাহার মধ্যে ৪০০ বিঘায় পশুর জন্য ঘাস জন্মান হয়।”

এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ২।৩ প্রকার উদ্ভিদ আপনা আপনি জন্মে। ইংরাজী সাহিত্যে এই সকল উদ্ভিদের পরিচয় পাইয়াছি। ‘বাটার-কাপ’ পুষ্প ক্ষুদ্র পীতবর্ণ। ‘ডেজি’ ক্ষুদ্রতর শ্বেতবর্ণ। উভয়ের ভিতরেই রেণুমণ্ডল পুষ্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বাটার-কাপ পুষ্প তিক্ত রসযুক্ত—এজন্য ইহা পশুখাদ্য নয়। কিন্তু ভূমির উপর বহুদূর পর্য্যন্ত এই পীতবর্ণ ফুলের বিকাশ দেখিতে পাইলাম। রেলপথেও রাস্তার দুই ধারে এইরূপ সুবিস্তৃত পীতক্ষেত্র বিলাতের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি।

পশুপালনের নিয়ম শুনিলাম। ১২টি গাভী দোহন করিবার জন্য এখানকার কৃষকেরা একজন গোয়ালা নিযুক্ত করেন। ২০টি গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের কার্য্যে ২ জন সেবক নিযুক্ত হয়।

এই সকল ভূমিতে বেড়াইতে বেড়াইতে নিম্নস্থান হইতে পাহাড়ের পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া শিরোদেশে উঠিয়াছি। অবশ্য ভূমি এমন গড়ান যে সমতল ভূমিতেই রহিয়াছি মনে হইতেছিল। কিন্তু উর্দ্ধ স্থানে উঠিয়া দেখিলাম আমাদের উত্তরে অক্সফোর্ড নগর পূর্ব্বে পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। নগরের রক্তবর্ণ গৃহ-ছাদগুলি এবং চিম্‌নী-সমূহ হরিদ্বর্ণ আবেষ্টনের ভিতর দূর হইতে সুন্দর দেখাইতেছে। কলেজগুলির চূড়া এবং মন্দির-সমূহের শিরোভাগও সকলের উর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উপত্যকা ও পাহাড়। সর্ব্বত্রই কৃষি-ক্ষেত্র।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “বিলাতে শুনিয়াছি বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী অবলম্বিত হয়। কিন্তু কল কারখানা, যন্ত্র হাতিয়ার, ষ্টীম-এঞ্জিন কলের ধূম

ইত্যাদি ত আপনার এই ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি না।" ইনি বলিলেন, "আমার এই ছোট ক্ষেতে ঐ সকল বড় বড় কারবারের কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিলে লাভ হইবে কেন? তবে পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য কতকগুলি ছোট ছোট কল আমরা সকলেই কিনিয়া থাকি। আজকাল এদেশে মজুর পাওয়া বড়ই কঠিন। কাজেই সেই সকল কলের সাহায্যে বহুলোকের কাজ অল্প সময়ের ভিতর সমাধা করিয়া ফেলি। মাটি গুঁড়া করা, বীজ ছড়ান, ঘাস কাটা, পশু খাদ্য চূর্ণ করা, মাল উর্দ্ধে তোলা বা নিম্নে ফেলা ইত্যাদি অনেক পরিশ্রম-সাপেক্ষ কাজ সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বৎসরে কোন কলের দ্বারা ২ দিন, কোন কলের দ্বারা ৪দিন মাত্র কাজ করি। সারা বৎসর কলগুলি পড়িয়া থাকে। কোন কলের মূল্য ২০০৲ টাকা, কোন কলের মূল্য ৬০০৲ ইত্যাদি। এত খরচ করিয়া কল ক্রয় করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ তাহা না হইলে এক বিঘা জমিও চাষ করিয়া উঠিতে পারিব না। মজুর এদেশে পাওয়া যায় না।"

কৃষিক্ষেত্রে বেড়াইতেছি এমন সময়ে দেখিলাম আমাদের মাথার উপরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটা এরোপ্লেন বা আকাশযান উড়িতেছে। সেদিন সন্ধ্যাকালে 'কমন্'-প্রান্তরে এইরূপ একটা যানের উড্ডয়ন দেখিয়াছি। আজ দূর হইতে সেই প্রান্তরের উর্দ্ধভাগেই অপর কোন যানের উড্ডয়ন দেখিতে পাইলাম। খানিকক্ষণ আকাশে উড়িয়া যান নিম্নে নামিল। দেখিলাম তাহার পর সাধারণ ট্রাইসাইকেল বা মোটরকারের মত মাঠের উপর দিয়া চলিল। ইহার তিনটা চাকা—সম্মুখে দুইখানা, পশ্চাতে একখানা।

অক্সফোর্ডের এই কমন্-প্রান্তর লণ্ডন হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা আকাশ-যান-চারীদিগের একটা প্রধান ষ্টেসন। কৃষক

বলিলেন, "লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ড পর্য্যন্ত আসিতে এত বড় খোলা মাঠ আর নাই। এজন্য বিলাতের সমরবিভাগ এই স্থানকে একটা ষ্টেসন বিবেচনা করিয়াছেন। যাঁহারা এই যান-ব্যবহারে দক্ষতার সার্টিফিকেট চাহেন তাঁহাদিগকে লণ্ডনের ষ্টেসন ছাড়িয়া এখানে আসিতে হয়। তাহার পর এখান হইতে পেট্রল লইয়া পুনরায় লণ্ডনে উপস্থিত হইতে হয়। বিনা কষ্টে এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিলে আকাশ-বিচরণের প্রশংসা পত্র পাওয়া যায়। এই যাতায়াতে সর্ব্বসমেত প্রায় এক ঘণ্টা মাত্র লাগে।"

কৃষিক্ষেত্র হইতে পশুশালায় আসিলাম। গোয়ালঘর ভারতবর্ষেরই মত। খড়কুটা গোমূত্র বিষ্ঠা ইত্যাদিতে ঘরের ভিতর অনেকটা ময়লা জমিয়াছে। এখানে কলে দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা দেখিলাম। কিছুদিন হইল এই কৃষক কলের সাহায্যে দোহন বন্ধ করিয়াছেন।

দোহনশালার এক কোণে একটা ক্ষুদ্র এঞ্জিন। তাহার সঙ্গে একটা লম্বা নল সংলগ্ন। এই নলের সঙ্গে গাভীর বাঁটের যোগ স্থাপিত হয়। এঞ্জিন চলিতে থাকিলে নল হইতে বায়ু সরিয়া আসে। তাহার ফলে গাভীর স্তনে টান পড়ে, তখন স্বতঃই দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। পূর্ব্বে কখনও এইরূপ বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধ-দোহন দেখি নাই।

এখান হইতে কতকগুলি কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত কল দেখিবার জন্য কয়েকটা কুটিরে প্রবেশ করিলাম। সর্ব্বসমেত প্রায় ২৫টা কল কৃষকের আসবাবের অন্তর্গত বুঝা গেল। বীজ বপন করিবার জন্য এক প্রকার কল আছে। তাহার দ্বারা শ্রেণীবদ্ধভাবে বীজ ছড়ান হয়। এক প্রকার কল দেখিলাম, তাহার দ্বারা সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ঘাসের স্তূপ প্রস্তুত করা হয়। লোকের পরিশ্রম প্রয়োজন হয় না।

চাষাবাদ পশুপালন ইত্যাদির খরচ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। কৃষক

বলিলেন, "প্রায় ৬০৲ টাকায় একবিঘা জমির চাষ হয়। আমার ৬০০ বিঘা জমিতে সর্ব্বসমেত ৮ জন লোক নিযুক্ত করিয়া থাকি। ৩ জন কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত। ২ জন পশুপালনে নিযুক্ত। অবশিষ্ট ৩ জন সহরে দুগ্ধ জোগাইয়া থাকে। আমি নিজেই অনেক সময়ে খাটিয়া থাকি। তাহা ছাড়া পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান সর্ব্বদা করিতে হয়। অল্পমাত্র লোক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহার কারণ, কতকগুলি মূল্যবান্ যন্ত্রের সাহায্যে বেশী কাজ কম সময়ে সম্পন্ন করি।

গোয়ালারা রাত্রি ৪॥ টার সময়ে দুগ্ধ দোহন করিতে আসে। মজুরেরা সর্ব্বসমেত দিনে ৮॥ ঘণ্টা খাটে। প্রায় ১॥০ টাকা করিয়া প্রত্যেককে দৈনিক বেতন দিতে হয়।"

'লিঙ্কল্নের' অধ্যাপক মোবালির গৃহে আজ চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল। কলেজের একটি কামরায় ইনি বাস করেন। যাইয়া দেখিলাম—ঘর ভরা পুস্তক। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থ বেশী দেখি নাই। গত ৫।৭ বৎসরের ভিতর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ৮।১০ খানা অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাসালোচনার জন্য এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের পর ইংলণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর কে? আজকাল কাহার প্রভাব আপনারা অনুভব করিতেছেন?" ইনি বলিলেন, "বোধ হয় দার্শনিক গ্রীণ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রেও তাঁহার চিন্তাপ্রণালী বিশেষ সমাদৃত হইত। আজ কালকার লর্ড হল্ডেন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এবং স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার চিন্তাপ্রণালী দার্শনিক ও অধ্যাপকগণের

মহলে অনুসৃত হইতেছে। গ্রীণ দলপুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইতেন না। তাঁহার রচনাও বিশেষ সুললিত ছিল না। তিনি লোক জনের সঙ্গে বেশী মিশিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেও উৎসাহী হন নাই। তথাপি তাঁহার দর্শনবাদ নব্য ইংরাজের দর্শনবাদ হইয়াছে। আজ কাল আমরা গ্রীণের যুগে আছি বলিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষ হইতে আমরা গ্রীণের এত বেশী প্রভাব ধরিতে অসমর্থ। গ্রীণের ক্ষমতা অবশ্য সুবিদিত। কিন্তু এক্ষণে যে ইংলণ্ডে গ্রীণের যুগ চলিতেছে ততটা বুঝিতে পারি নাই। বরং আমরা সিজুইককে হার্ব্বার্টস্পেন্সারের পরবর্ত্তী ইংরাজ চিন্তাবীর বিবেচনা করিয়া থাকি। তাঁহার প্রভাব ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চরিত্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি দর্শনশাস্ত্রের সকল বিভাগেই লক্ষ্য করা যায়।"

মোবার্লি বলিলেন, "সিজুইক্ একজন চিন্তাবীর ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার নানাবিষয়িণী রচনা দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ প্রভাবশালী বিবেচনা করিবার কারণও যথেষ্ট আছে। কিন্তু গ্রীণে ও সিজুইকে আকাশ পাতাল পার্থক্য। সিজুইক্ ইংরাজজাতিকে নূতন কিছু দান করেন নাই। তিনি পুরাতন যাহা কিছু ছিল সেইগুলিকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। সিজুইক্ না থাকিলে আমরা কোন অংশে দরিদ্র হইতাম না। কিন্তু গ্রীণ নূতন আলোক আনিয়াছেন, নূতন তথ্য দিয়াছেন, নূতন আলোচনাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রীণের দর্শন-বাদ হার্ব্বাট স্পেন্সারীয় যুগের দর্শনবাদ হইতে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য সিজুইকে পাইব না সিজুইক 'সমালোচক' বা ভাষ্যকার মাত্র—গ্রীণ আবিষ্কারক ও যুগপ্রবর্ত্তক।"

এই কথা বলিতে বলিতে মোবার্লি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রভেদ আলোচনা করিলেন। ইনি বলিলেন "গ্রীণকে

অক্সফোর্ডের প্রাণস্বরূপ এবং অক্সফোর্ড-আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ বলিতে পারি। সিজুইককে ঠিক সেইরূপ কেম্ব্রিজাত্মার বাণীমূর্ত্তি বিবেচনা করিতে পারি। দুইএর দর্শনবাদে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। অক্সফোর্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রাচীন দর্শন বিষয়ক। সেই শিক্ষায় কেবলমাত্র পুরাতন সাহিত্যই আলোচিত হয় না। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে কাব্য, নাট্য, দর্শন যাহা কিছু আছে সবই শিখান হয়। অধিকন্তু দর্শনের আলোচনায় মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান যুগের চিন্তাবীরগণের মতবাদও বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ দর্শনের আলোচনাকারীরা ধনবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানও অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষায় ছাত্রের সর্ব্বমুখিনী প্রতিভা বিকশিত হয়। কোন এক দিকে চিন্তার গতি প্রেরিত হয় না। যে সকল ছাত্র এই বিভাগে ভর্ত্তি হয় তাহাদের সম্মানই বেশী। অক্সফোর্ড বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ বিশ্বগ্রাসী প্রাচীন সাহিত্যবিভাগের জন্যই বিখ্যাত। কিন্তু কেম্ব্রিজে এত বিস্তৃত ও গভীর বিভাগ একটিও নাই। কেম্ব্রিজে প্রাচীন সাহিত্য শিখান হয় বটে। কিন্তু আমরা এখানে যেমন দর্শন, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি সকল শাস্ত্র গ্রীক সাহিত্যের সকল বিভাগের সঙ্গেই শিক্ষা দিয়া থাকি, কেম্ব্রিজে তাহা করা হয় না। কেম্ব্রিজের ঐ বিভাগ যথেষ্ট ক্ষুদ্র। আমাদের বিবেচনায় চিন্তারাজ্যের সকল শক্তির পরিচয় না পাইলে কেহ যথার্থ শিক্ষিত হয় না। এজন্য অক্সফোর্ডের প্রাচীন বিভাগের ছাত্রেরা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী বেশ সরল সরল ভাবে নানাক্ষেত্রে ধাবিত হয়। বোধ হয় এই জন্যই ইংলণ্ডের বড় বড় অন্দোলন অক্সেফোর্ডে সৃষ্ট হইয়াছে। কেম্ব্রিজে সেইগুলি সমালোচিত হইয়া শৃঙ্খলীকৃত হইয়াছে। অক্সফোর্ড নূতন আলোক আনয়ন করে, কেম্বিজ তাহা বিকিরণ করে। অক্সফোর্ড স্রষ্টা—কেম্ব্রিজ সমালোচক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গ্রীসের পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের মধ্যে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রধান কে?" ইনি বলিলেন, "তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় আজ কাল আমাদের এখন কোন একজন দার্শনিক সম্রাট নাই। বোধ হয় এক্ষণে কোন একটা বিশেষ মতবাদ ইংরাজ সমাজে সর্ব্বপ্রধান নয়। আজকাল নানাদিকে চিন্তার গতি প্রধাবিত; আমরা কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি। কোন একটা লক্ষণ অন্য সকল লক্ষণকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে কিনা বলিতে পারি না। কার্পাসক্রিষ্টি কলেজের অধ্যাপক শিলার এখানে প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌মতত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার প্রভাব মন্দ নয়। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগালও নূতন দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি মনোবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ গতি নূতন পথে চালিত করিতেছেন। এইরূপ আরও কয়েকটা লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথচ ইহাদের কোনটাই একমেবাদ্বিতীয়ং নহে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইংলণ্ডের আধুনিক দর্শনবাদের কোন কোন গ্রন্থ ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে কি?" ইনি বলিতে পারিলেন না। তাহার পর ইংলণ্ডের চিন্তারাজ্যে বিদেশীয় দার্শনিকগণের প্রভাব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। নাট্যকার বার্ণার্ডশ-য়ের গ্রন্থে জার্ম্মাণ দার্শনিক 'নিটসের' (Nietzsche) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ওয়েল্‌সের (Wells) রচনায় রুশ ঔপন্যাসিক দস্তয়েবস্কির চিন্তাপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য আধুনিক ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বেও আমরা ইঁহার নাম জানিতাম না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক জেম্‌স্‌ তাঁহার প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্‌ বুঝাইতে আসিয়া বার্গসোঁর নাম বহুবার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলেই অক্সফোর্ডে বার্গসোঁ-দর্শন প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে বার্গসোঁর গ্রন্থ দুই একখানা করিয়া প্রায় সবই ইংরাজীতে

অনূদিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বার্গসোঁ স্বয়ংই অক্সফোর্ডে নিজ মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয় তিনি এডিনবারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতেছেন। বার্গসোঁ যে অধ্যাত্মবাদ ও ভাবুকতা আনিয়াছেন তাহা নব্য ইউরোপের পক্ষে নূতন। এই নূতন দিকে ইউরোপীয় চিন্তা ধাবিত হইবে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বাধীনভাবে সেইদিকেই অগ্রসর হইয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমেরিকা হইতে ইংরাজ-সভ্যতা কখনও কোন প্রভাব লাভ করিয়াছে কি ?" ইনি বলিলেন "পূর্ব্বে এমার্সনের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। এমার্সনের পর উল্লেখযোগ্য কাহাকেও পাই না। কবি হুইট্‌ম্যান ইংলণ্ডে আদৃত হইতেন। সম্প্রতি প্যাগ্‌ম্যাটিজম্‌-প্রবর্ত্তক জেম্‌স্ ইংরাজ দার্শনিকগণকে প্রভাবান্বিত করিতেছেন। কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, আমেরিকা ইংরাজসমাজকে বিশেষ কিছু দান করে নাই। আমরা আমেরিকার কথা না ভাবিয়াই জীবনধারণ করিয়া থাকি।"

ইংলণ্ডে বিশ্বশক্তির প্রভাব আলোচনা উপলক্ষ্যে অধ্যাপক মোবার্লি আরও বলিলেন, "জার্ম্মাণ অয়কেন ও নিট্‌সে ফরাসী মেটারলিঙ্ক ও বার্গসোঁ, ইত্যাদি চিন্তাবীরগণ সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অতীন্দ্রিয় জগতের বার্ত্তা আনিয়াছেন—সকলেই ভাবুকতা, আদর্শবাদ ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক। ইংলণ্ডেও এই চিন্তাপ্রণালী প্রবেশ করিতেছে। সেদিন আপনাদের ঠাকুরও এই চিন্তাস্রোত পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। গত বৎসর ঠাকুরের কাব্য মাসিকপত্রে প্রায়ই আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চিন্তামণ্ডলে এক্ষণে অধ্যাত্মতত্ত্বের যুগ চলিবে।"

প্লেটোতত্ত্ব ও হিন্দুদর্শন

আজ দুই জন অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিলাম। প্রথমতঃ অধ্যাপক রিচার্ডসের অধ্যাপনা দেখিলাম। 'অল্‌সোল্‌স্‌' কলেজের এক ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার বক্তৃতা হইল। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২০ জন। বক্তৃতার বিষয় আন্তর্জ্জাতিক আইনের এক অধ্যায়। ১৯০৮।৯ সালে লণ্ডনের রাষ্ট্র-সম্মিলনে কতকগুলি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য অনুষ্ঠান-পত্র তৈয়ারী করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সমুদ্র-সংগ্রাম, সমুদ্র-বাণিজ্য, বন্দর-অবরোধ, জাহাজ-গ্রেপ্তার, জাহাজ খানাতল্লাস ইত্যাদি নানাবিষয়ে কতকগুলি নিয়ম সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এই নিয়মগুলি অধ্যাপক রিচার্ডস বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছেন। ছাত্রগণ সকলেই সেই অনুষ্ঠান পত্র এক একখানা করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

রিচার্ডস দেখাইয়া বলিলেন, এই নিয়মসমূহের অনেকগুলি অতি পুরাতন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী সংগ্রামের কাল (১৭৫৬-৬৩) হইতে সেইগুলির প্রস্তাব চলিতেছে। কতকগুলি সর্ত্ত অতি জটিল ও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সেগুলি পুনরায় আলোচনা করা আবশ্যক। আগামী হেগ-সম্মিলনে সেগুলি নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র-সংগ্রাম ও যুদ্ধজাহাজ সম্বন্ধে বহু কথা লণ্ডন সম্মিলনে আদৌ আলোচিত হয় নাই। আলোচিত হইয়া থাকিলে সেগুলির কোন মীমাংসা হয় নাই। এ বিষয়েও পুনরায় আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রিচার্ডস্ সাহেব পূর্ব্বে পত্র দ্বারা তাঁহার ক্লাশে আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে আলাপ হইল। ইহাঁর নির্দ্দিষ্ট কুটুম্ব স্যার হারকোর্ট বাট্লার ভারতের শিক্ষা-সচিব। ইনি নিজেও ভারতবর্ষের অনেক সংবাদ রাখেন। ভারতীয় আইন ঘটিত কয়েকটা মোকর্দ্দমা তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। ইনি বলিলেন, "প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির নিয়ম অনুসারে আমাকে স্ত্রীধনবিষয়ক হিন্দু আইন আলোচনা করিতে হইয়াছিল। হিন্দু সাহিত্যের পরিচয় আমাব ঐ পর্য্যন্ত।" হিন্দুস্থানী উপকথা, প্রবাদ, প্রবচন, ইত্যাদি জানিবার জন্যও ইহাঁকে বেশ উৎসুক বোধ হইল।

রিচার্ডসের নিকট হইতে এখানকার প্রসিদ্ধ দর্শনাধ্যাপক ষ্টুয়ার্টের বক্তৃতালয়ে গমন করিলাম। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে ইনি বক্তৃতা দিয়া থাকেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র ঘর। প্রায় ২৫ জন ছাত্র। অনেকেই বোধ হয় গ্রাজুয়েট। দুএকজন ছাত্রীও আছেন। প্লেটো-তত্ত্ব আজিকার আলোচ্য বিষয়।

প্রবীণ অধ্যাপক বক্তৃতা লিখিয়া আনিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে বক্তৃতা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম কয়েক দিনের কথাগুলি মনে না রাখিলে এই বক্তৃতা বিশদরূপে বুঝা যাইবে না। যাহা হউক, আমার অত দেখিলে চলিবে কেন? অল্পকালের ভিতর যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এজন্য ষ্টুয়ার্টের দর্শনালোচনায় উপস্থিত হইলাম।

অধ্যাপক এক নিঃশ্বাসে বক্তৃতা পাঠ করিয়া গেলেন। বুঝান বা ব্যাখ্যা করা ইহাঁর নিয়ম নয়। প্রবন্ধ সুললিত ভাষায় লেখা হইয়াছে দেখিলাম। বৃদ্ধ বেশ মধুর কণ্ঠেই পাঠও করিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা বেশী বুঝিল কি না জানি না।

আজকার বক্তৃতায় ইনি প্লেটো-তত্ত্বের প্রাচীন উত্তরাধিকারী প্লোটি-নাসের দর্শনবাদ বুঝাইতেছেন। প্লোটিনাসের সঙ্গে প্রথমে আধুনিক ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁর তুলনা করা হইল। বুঝিলাম ৫।৭ বৎসরের ভিতরেই বার্গসোঁ অক্সফোর্ডে বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রবর্গকে নূতনতম অধ্যাত্মতত্ত্বের সংবাদ না দিয়া সুখী হইতে পারেন নাই।

তাহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ দার্শনিক লাইবনিজের প্লেটোতত্ত্ব বা আদর্শবাদের সঙ্গে প্লোটিনাসের ভাবুকতার তুলনা সাধিত হইল। লাইবনিজকে লইয়া অধ্যাপক অনেকক্ষণ কাটাইলেন।

মোটের উপর প্লেটো-তত্ত্বের প্রাচীন রূপ হইতে আধুনিক কালের রূপ পর্য্যন্ত সকল রূপই ছাত্রগণের সম্মুখে প্রকাশ করা হইল। এই বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিলাম ষ্টুয়ার্ট কি হিন্দু অধ্যাত্মবাদ ও ভাবুকতার সংবাদ রাখেন না? দুনিয়ার ভাবুকতা যে বক্তৃতায় আলোচিত হইল সেই বক্তৃতায় কি হিন্দু দর্শনবাদের ও অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন স্থান থাকিতে পারে না? বিশ্বের চিন্তারাজ্যে হিন্দুমত কবে প্রবেশ করিবে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা কবে এইরূপ প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট জগতের দর্শনসাহিত্যে হিন্দু দর্শনের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে শিখিবে?

অধ্যাপক ষ্টুয়ার্ট আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের শিক্ষক ছিলেন। ঘোষের নাম করিয়া ইনি বলিলেন যে, সে ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সংস্কৃত সাহিত্য কিছু জানেন কি?" ইনি উত্তর করিলেন—"ম্যাক্স মুলারের Sacred Books of the East seriesএ যেটুকু অনুবাদ আছে তাহার খবর রাখি। আর কিছু জানি না। সেই

গ্রন্থমালা ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কয়খানাই বা হিন্দুগ্রন্থের অনুবাদ আছে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্লোটিনাসের ভাবুকতা ও প্লেটোতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া হিন্দু-অধ্যাত্মতত্ত্বের কিছু তথ্য দিলেন না কেন ?" ইনি বলিলেন, "প্রাচীনকালে হিন্দুদর্শন ইউরোপীয় চিন্তার উপর বিশেষ প্রভাবই বিস্তার করিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ডারের পরবর্ত্তী গ্রীক রাজবংশের আসনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণ্ডলে কর্ম্ম ও ভাবের আদান প্রদান ও বিনিময় যথেষ্ট সাধিত হইত। দুই জগতেই এক প্রকার চিন্তার আবেষ্টন বর্ত্তমান ছিল। প্লোটোতত্ত্বের উপর হিন্দুর প্রভাব পড়িয়াছিল। প্লোটিনাস স্বয়ং প্রাচ্য জগতেই বাসও করিতেন, প্লোটিনাসে হিন্দু দর্শনাবাদ নিশ্চয়ই আছে জানি কিন্তু হিন্দুতত্ত্ব আমি কখনই আলোচনা করি নাই। কাজেই এ বিষয়ে আমার কথা বলা অসম্ভব।"

আমি ভাবিলাম ভারতীয় পণ্ডিতেরা স্বদেশীয় দর্শন সাহিত্যকে আধুনিক পণ্ডিত সম্মিলনের বোধগম্যরূপে প্রচার না করিতে থাকিলে বিশ্বচিন্তার ইতিহাসে হিন্দু চিন্তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে কি করিয়া ? অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মত প্রসিদ্ধ বিদ্যা-কেন্দ্রে হিন্দু সাহিত্য প্রচারের সুব্যবস্থা থাকিলেই এখানকার দার্শনিকগণ ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মতবাদসমূহ গ্রহণ বা বর্জ্জন, এবং অন্ততঃ সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালীর ক্ষেত্র এখানে যথেষ্ট। কিন্তু ভারত-তত্ত্ব এখনও সেই প্রণালীর গণ্ডীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই দেখিতে পাইতেছি।

রাজকবি ব্রিজেস্

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা শিক্ষক-বিদ্যালয় আছে। তাহার অধ্যক্ষ কীটিং আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইলাম "আমি গোমাংস ও শূকর মাংস বর্জ্জন করিয়া থাকি। কাজেই অন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" দেড়টার সময়ে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। কর্ত্তা ঘরে ছিলেন না। তাঁহার পত্নী আসিয়া গল্প করিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন "আমার স্বামীর নিকট নানাদেশের লোক আসিয়া শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করে। আমেরিকা, জার্ম্মাণি, জাপান ইত্যাদি বহু স্থান হইতে শিক্ষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপকগণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। আমার দেবর ভারতবর্ষে চাকরী করেন। বোম্বাই প্রদেশের কৃষি-বিভাগের তিনি একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার এই পুত্রটি বিলাতের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতেছে।" কীটিঙ্গের ভ্রাতা ভারতবর্ষের কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী একথা শুনিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি কি Rural Economy in the Bombay Deccan গ্রন্থের প্রণেতা?" ইনি বলিলেন "হাঁ কিন্তু সে বই বিলাতে বেশী বিক্রী হয় না। তাহা আমরা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের অনেক কথা শিখিয়াছি।"

ইতিমধ্যে অধ্যাপক আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন শিক্ষয়িত্রীও ছিলেন। সকলে মিলিয়া ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলাম। অধ্যাপক-পত্নী প্রথমেই বলিলেন "কোন ভাবনা নাই। গোমাংস ও শূকরের মাংস আজ বর্জ্জন করিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে খাইতে বসুন।"

খাইতে বসিয়া নানা গল্প হইল। অধ্যাপক বলিলেন "সম্প্রতি ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় ভারতীয় সঙ্গীত ইংরাজেরাও উপভোগ করিতে পারিবেন। বিলাতী সঙ্গীত হইতে ভারতীয় সঙ্গীত নিতান্তই স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। তথাপি ভারতীয় সঙ্গীতের মাধুরী ইংরাজী কানেও ধরিতে পারা অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ রাস্তার কুলীমজুরদিগের গান শুনিয়া ইংরাজেরা ভারতীয় সঙ্গীতকলা নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রন্থকার বিশেষ চেষ্টা করিয়া আপনাদের পাকা ওস্তাদগণের বিদ্যা বুঝিতে যত্ন লইয়াছেন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার এক্ষণে যথেষ্ট সমাদর করেন।" এই সঙ্গে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার এবং জাতীয় শিক্ষার কথা উঠিল। অধ্যাপক বিবেচনা করেন "মেকলে প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি ভারতবর্ষে ক্ষতিকর। জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় কলা, জাতীয় দর্শন ও সাহিত্য এবং মাতৃভাষা ও স্বদেশের ইতিহাস, শিল্প ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ না করিলে ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতি হইতে পারে না।" সেদিন লণ্ডনে গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারও এইরূপই বলিয়াছিলেন। দার্শনিক ম্যাকডুগালেরও এইরূপ মত।

কীটিঙ্গ কয়েকখানা শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেগুলি পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম। ইতিহাস শিখাইবার নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কথাবার্ত্তা হইল।

অধ্যাপক বলিলেন "এখানকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সকল বিষয়ে ভাল, এরূপ কোনটার নাম করা কঠিন। কোন প্রতিষ্ঠানে একজন লোক প্রসিদ্ধ। কোন বিদ্যালয়ে হয় ত একটি মাত্র বিষয় ভাল শিখান হয় ইত্যাদি।

উচ্চ আদর্শশীল শিক্ষক বড় বেশী নাই। আমি ইংলণ্ডের অনেক

বিদ্যালয়েরই ঘরের কথা জানি। প্রায় বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই নিম্ন বা মধ্য শ্রেণীর অন্তর্গত। ভাল ভাল লোক ইংলণ্ডের বাহিরে চাকরী করিতে চলিয়া যায়। সুডান, মিশর, ইত্যাদি দেশে আজকাল বহু উচ্চশ্রেণীর লোক কর্ম্ম করিতেছে। স্বদেশে শিক্ষকগণের বেতন বড় অল্প। অথচ খাওয়া পরার খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজেই যোগ্য লোকেরা কেহই দেশে থাকিতে চাহে না। সুতরাং ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে উপযুক্ত শিক্ষক বেশী দেখিতে পাইবেন না।

আমাদের এত বড় সাম্রাজ্য চালান সহজ কথা নয়। এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের উপযুক্ত লোক অনেক আছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা আমাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অভাব ও প্রয়োজনের অনুরূপ কি না বলিতে পারি না। ইংরাজ জাতি কতদিন বহুসংখ্যক লোক জোগাইতে পারিবে? স্পেনের সাম্রাজ্যও এত বিস্তৃত হইয়াছিল। উপযুক্ত লোকের অভাবে স্পেন তাহার সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের এখন সেইরূপ লোক-সমস্যা উপস্থিত!"

সেদিন ম্যাকৃডুগাল বিলাতী শিক্ষাসংসারে জাতিভেদের কথা বলিয়াছিলেন। কীটিঙ্গও সেই কথায় সায় দিলেন। ইনি বলিলেন "আমাদের দেশে লোকের আয় অনুসারে শ্রেণী বা জাতি বিভাগ হইয়া থাকে। পরিবারের মান সম্ভ্রম আয়ের উপর নির্ভর করে। বিলাতের বিদ্যালয়-গুলিও ঠিক সেই হিসাবে উচ্চ নীচ শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত। কতকগুলি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের খরচ যৎপরোনাস্তি। সেই সকল বিদ্যালয়ে আমাদের অত্যল্প লোক তাঁহাদের সন্তানসন্ততি পাঠাইতে সমর্থ। সুতরাং সেগুলি এক জাতির অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি বিদ্যালয়ে খরচ পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা কম কিন্তু তাহা বহন করিবার ক্ষমতাও বহু পরিবারের নাই। কাজেই বহু পরিবার এই সকল বিদ্যালয়ে সন্তান

পাঠাইতে পারে না। এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হিসাবে বিদ্যালয়গুলি নিম্ন নিম্ন শ্রেণী বা জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। সর্ব্বনিম্ন বিদ্যালয়ে জনসাধারণ তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষিত করে। সুতরাং বিদ্যালয়ের নাম শুনিলেই ছাত্রের আর্থিক অবস্থা আমরা সহজে বুঝিয়া লইতে পারি। ধনী পরিবারের সন্তানেরা মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র বা নির্ধন পরিবারের সন্তানগণের সঙ্গে কখনই মিশিতে পায় না। বিলাতী শিক্ষাসংস্কারের ইহা একটা প্রধান তথ্য।"

এখান হইতে ৩ টার সময়ে বাহির হইয়া চিল্‌স্‌ওয়েল পল্লীর দিকে যাত্রা করিলাম। অক্সফোর্ড হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে এই পল্লী অবস্থিত। সেদিন বট্‌লিগ্রামের গোশালা ও কৃষিক্ষেত্র দেখিতে যে পথে গিয়াছিলাম, আজ সেই পথেই চলিলাম। খানিকটা এক পথে যাইয়া পরে নিতান্ত গ্রাম্যপথ ধরিলাম। বালকেরা ছিপ ফেলিয়া খালে মাছ ধরিতেছে। বঙ্গের খড়ো ঘর মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতেছি! বনজঙ্গল, মাঠের আলি, গাড়ীর চাকার দাগ, উচ্চনীচ কর্দ্দমাক্ত পথ, গোবিষ্ঠাময় প্রান্তরভূমি, কৃষিক্ষেত্র, ও এলম্‌তরু দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত পৃষ্ঠে উঠিলাম। বহু বেড়া ডিঙ্গাইয়া ক্ষেত আবাদ ও বাগান অতিক্রম করিতে হইল। ইংলণ্ডে আছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। নূতন নূতন পাখীর ডাক এবং অপরিচিত গাছপালা ভিন্ন নূতন দেশের অন্য কোন পরিচয় নাই। ভারতীয় পল্লীর মৃত্তিকাগন্ধ এবং বনজঙ্গলের শ্যামল শোভা অনুভব করিতে করিতে বিদেশীয় আবহাওয়ার কথা ভুলিয়া গেলাম।

প্রায় একঘণ্টা চলিয়া রাজকবি ব্রিজেসের গৃহে উপস্থিত হইলাম। ব্রিজেসের পত্নী এখনও পীড়িতা। কবি প্রথমেই বলিলেন "আমার স্ত্রী আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। মাপ করিবেন। আমার কন্যা আপনাদিগকে চা পান করাইবেন।" কবির সঙ্গে দেখা করিবার

জন্য ঠিক এই সময়ে সার্ভিয়ার একজন যুবক উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চা পান করা গেল। নানাবিধ গল্প করিতে করিতে কবি তাঁহার সঙ্গীতালয়, গ্রন্থশালা, ফুলবাগান, ফলবাগান, সব্জীবাগান ইত্যাদি দেখাইলেন। কবির গৃহ পর্ব্বতপৃষ্ঠের অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। ইহার নিকটে কোন বাড়ী ঘর নাই। কবির পরিবার ব্যতীত এ অঞ্চলে অন্য কোন লোকজনের বসতি দেখিলাম না। গৃহের বাগানের এক অংশ হইতে সমগ্র অক্সফোর্ড নগরের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন বট্‌লিপল্লীর কৃষিক্ষেত্র হইতে যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা হইতে এখানকার দৃশ্য অধিকতর সুন্দর। কবির কন্যা বলিলেন "এখানে অক্সফোর্ডের চূড়া ও ছাদগুলিই দেখিতে পাই। নিম্নভাগের দৃশ্য চোখে পড়ে না। গাছপালার ভিতর হইতে নগরের ঊর্দ্ধভাগ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, নগরের গির্জ্জা ও কলেজসমূহের ঘড়িবাজার শব্দও শুনিতে পাই। আমরা নিতান্তই রম্য প্রাকৃতিক নিকেতনে বাস করিতেছি।"

সার্ভযুবক ভিয়েনা ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়াছে। এক বৎসরকাল বিলাতে থাকিবে। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের সাহিত্য বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছে। রুশ, জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজীভাষা বেশ জানে। বয়স ২৬ বৎসর।

আজ রাত্রি নয়টার সময়ে দার্শনিক-সম্মিলনের অধিবেশন হইল। নিউকলেজের দ্বারসমীপে অধ্যাপক মোবালি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সম্মিলন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। ক্ষুদ্র ঘর—২৫খানা চেয়ার ঘেঁশাঘেঁশি করিয়া সাজান। সর্ব্বসমেত ২০জন লোক উপস্থিত। সকলেই নৈশ-ভোজনের পর ভোজন-পোষাকে আসিয়াছেন। ধূমপান অনবরত চলিতেছে।

অধ্যাপক শিলারের সঙ্গে পরিচয় হইল। ইনি বিলাতের প্র্যাগ্‌-ম্যাটিজ্‌মতত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক। ম্যাক্‌ডুগাল এবং শিলার ইহাঁরা দুইজন অক্সফোর্ডে নব্য দর্শনের প্রবর্ত্তন করিতেছেন। শিলার আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভুদত্ত শাস্ত্রীর নাম করিলেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানাধ্যাপক বার্কার তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। আলোচ্য বিষয় Discredited State অর্থাৎ অবমানিত রাষ্ট্র। আজকালকার ইংরাজ যুবকেরা রাষ্ট্রশাসন সম্মান করিতে চাহে না। যুবকমহলের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক প্রবন্ধ লিখিতে ব্রতী হইয়াছেন। রাষ্ট্রকে সম্মান করিবার প্রয়োজন আছে কি না, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্র কাহাকে বলে, রাষ্ট্রের ন্যায় সমিতি, সমাজ, ক্লব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা কতটা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ আন্দোলন স্পষ্ট হইতে পারে—এই সকল বিষয় বিচারিত হইয়াছে। অধ্যাপক বিষয়টা বেশ পাণ্ডিত্যের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। চিরপরিচিত কথার অবতারণা করেন নাই। নূতন সমস্যা—নূতন তথ্য এবং নূতন সিদ্ধান্তের প্রয়াস দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

প্রবন্ধ পাঠের পর ৫ মিনিট জলপানের জন্য বিশ্রাম হইল। পরে আলোচনা আরম্ভ হইল। দার্শনিকগণ একে একে মহা তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রবন্ধের অবান্তরাংশ লইয়াই সমালোচনা বেশী হইল। দশ বার জন অধ্যাপক সমালোচনায় যোগ দিলেন। ইহাঁরা যতদিক হইতে প্রশ্নটা দেখিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম সে সকল দিক প্রবন্ধলেখক স্পর্শও করেন নাই। উত্তর দিবার সময়ে বার্কার তাহা স্বীকার করিলেন। মোটের উপর দেখা গেল, এইরূপ দশ বার জন পাকা লোকের সমালোচনা লাভ করিবার সুযোগ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়! এই আব্‌হাওয়ায় গ্রন্থ-প্রকাশ অনেকটা নিখুঁত হইবারই সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য

আজ হইতে ইংরাজদিগের একটা বড় উৎসব আরম্ভ হইল। "হুইটসান্‌ডে" উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র কার্য্য হইতে অবকাশ। এক সপ্তাহকাল সকলে নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করে। আফিস, কারখানা, দোকান ইত্যাদি সবই বন্ধ। পার্লামেণ্টের কাজও এখন বন্ধ। এক সপ্তাহের জন্য পার্লামেণ্ট বন্ধ থাকিবে বলিয়া র‍্যাম্‌সে-ম্যাক্‌ডোল্যাণ্ড কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, এক্ষণে তাঁহারা ছুটির কাজ সারিয়া রাখিতেছেন। অক্সফোর্ডেও দেখিতেছি ব্যাঙ্ক দোকান ইত্যাদি কিছুই খোলা নাই।

এই সর্ব্বময় অবকাশের কালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি নাই। রবিবার ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ হয় না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা নিয়মে কয়েকটা বড় বড় অবকাশ-কাল আছে। তাহা ছাড়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকেরা উৎসবাদির জন্য স্বতন্ত্র অবকাশ ভোগ করেন না।

আজ "লোকসাহিত্য" সম্বন্ধে অধ্যাপক টিড্ডির বক্তৃতা শুনিলাম। ট্রিনিটি কলেজে টিড্ডির বক্তৃতা-গৃহ। বেশ বড় ঘর, প্রায় ১৫০ জন ছাত্র। স্ত্রী ছাত্রই ৳ অংশ। সকলেই সাধারণ ছাত্র বলিয়া বোধ হইল না। অনেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। মফঃস্বল হইতে তাঁহারা ইংরাজী লোক-সাহিত্য, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা শিখিয়া যাইয়া নিম্ন ও মধ্য পাঠশালার ছাত্র ও ছাত্রী-দিগকে শিক্ষা দিবেন। ফলতঃ জাতীয় লোকসাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের

সর্ব্বোচ্চশ্রেণী হইতে পল্লীর পাঠশালা পর্য্যন্ত শিক্ষাসমাজের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

অধ্যাপক টিডি আজকার বক্তৃতায় সপ্তদশ শতাব্দীর কতকগুলি ছড়া ও কাহিনী আলোচনা করিলেন। সেই সমুদয়ের পাঠোদ্ধার, পাঠের বিভিন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে দু এক কথা বলিয়া তাহাদের ব্যাখ্যায় সময় বেশী দিলেন। তৎকালীন সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে মিলাইয়া ছড়াগুলির অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। জেলা ভেদে একই ছড়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে, তাহা তিনি বেশ বুঝাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন যুগেও একই কাহিনী ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখা দেয়—সে কথাও বলিলেন। মধ্যযুগের "মির্যাকল" সাহিত্য এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক নাট্যগুলি যুগে যুগে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ—লোকরুচি, জনগণের সামাজিক অবস্থা এবং শিল্প ও কলা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা।

বক্তৃতান্তে অধ্যাপককে বলিলাম "আমি আপনার বক্তৃতায় আসিবার অনুমতি পাইয়া বিশেষ কৃতার্থ হইয়াছি। বক্তৃতাও অতিশয় চমৎকার বোধ হইল। এই ধরণের আলোচনা ভারতবর্ষেও আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে নানা প্রবাদপ্রবচন কাহিনী ও উপকথা সংগৃহীত হইতেছে। এই সমুদয় তথ্য ব্যবহার করিয়া আমরা ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছি।" ইনি বলিলেন "বিলাতে এই আন্দোলন নিতান্তই নূতন। এতদিন এখানে মধ্যযুগেরও সাহিত্য সংগ্রহ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয় শিক্ষা দিবারও কোন আয়োজন ছিল না।"

ট্রিনিটি কলেজ হইতে স্কুলস-বিদ্যালয়ে আসিলাম। রাস্তায় দেখিলাম কয়েকজন লোক বহুরূপী সাজ পরিয়া নাচগান করিতেছে। রাস্তার

দুইধারে লোক জমিয়া গিয়াছে। ইহারা উৎসব পর্ব্ব উপলক্ষে এইরূপ নাচিয়া গাহিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। বিলাতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরল নয়—ভিক্ষুক সংখ্যাও কম নয়। প্রতিদিনই ভিখারী দেখিতে পাই। তাহারা এক পেনী, আধ পেনী ইত্যাদি মাগিয়া লয়। অন্ততঃ কিছু পাইবার জন্য রাস্তার লোকজনকে বিরক্ত করে। তাহা ছাড়া গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া ভিক্ষাগ্রহণ করা এখানে অতি সাধারণ দৃশ্য। পূর্ব্বে ভাবিতাম ভারতবর্ষের ভিক্ষুকসম্প্রদায় ও ভিক্ষাবৃত্তি ইংলণ্ডে নাই। এক্ষণে দেখিলাম, দুই দেশেই ভিখারী আছে। ভিক্ষা করিবার নিয়মও দুই স্থানেই একরূপ। বিলাতের ভিখারীরা বাক্সের ভিতরস্থিত বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া থাকে। আমাদের ভিক্ষুক ভিক্ষুকীরা বেহালা, বাঁশী বা একতারা ও করতাল বাজায়। এই যা প্রভেদ।

স্কুল্‌স্‌-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক স্মিথের দর্শনাধ্যাপনা দেখিলাম। একজন মাত্র ছাত্র—সেও বোধ হয় গ্র্যাজুয়েট। সর্ব্বসমেত সাতজন লোক উপস্থিত—তাহার মধ্যে আমি একজন। অন্যান্য বিভাগের তিন জন অধ্যাপকও শ্রোতা। স্মিথ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গেলেন। প্রবন্ধে অতি উচ্চ অঙ্গের দার্শনিক অনুসন্ধানের ফল সন্নিবেশিত হইয়াছে—সাধারণ ছাত্রেরা ইহাতে প্রয়োজনীয় কিছু পাইবে না। কটমট দার্শনিক পারিভাষিক শব্দে বক্তৃতা পরিপূর্ণ। 'জাতি' 'শ্রেণী' 'গণ' ইত্যাদি কাহাকে বলে সেই বিষয়েই আজ আলোচনা হইল।

আজ এক বক্তৃতায় শ্রোতা দেখিলাম ১৫০, অপর বক্তৃতায় দেখিলাম ১। ইহা হইতে বক্তাদিগের আলোচ্যবিষয় এবং ছাত্রগণের প্রয়োজনীয় বিষয়ের ধারণা সহজেই করিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ উদ্দেশ্য এবং কার্য্যতালিকাও কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করা গেল।

সন্ধ্যাকালে মডলিন (Magdalene) কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ওয়েবের গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল। চারওয়েল নদীর উপর তাঁহার গৃহ। এই গৃহে পূর্ব্বে একটা কল ছিল। স্রোতস্বতী ঘরের নিম্নভাগ দিয়া প্রবাহিত। ইহার ফুলবাগানের পার্শ্বেই নদীর প্রপাত—জল-পতনের ঝরঝর শব্দ সর্ব্বদা প্রীতিদান করে। নদীকে বাগানের একটা খাত বা জলযুক্ত নর্দ্দমা বলিলেও কোন দোষ হইবে না।

এই জলপ্রপাতের মধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অধ্যাপকপত্নী ও অধ্যাপকের সঙ্গে প্রায় ১॥ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হইল। আমি বলিলাম "অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শনের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এখনও এখানকার দার্শনিকেরা হিন্দুতত্ত্ব কিছুই জানেন না। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।" ওয়েব বলিলেন "কিছুকাল পূর্ব্বে দার্শনিকমহলে একটা হুজুগ উঠিয়াছিল যে, গ্রীকদর্শনবাদ অনেকটা হিন্দু দর্শনবাদের উত্তরাধিকারী। এক্ষণে সে হুজুগ আর নাই।" আমি বলিলাম "হিন্দুদর্শন গ্রীকদর্শনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কি না, তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। কে কাহার নিকট ঋণী—ইহা ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালীর দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু ইহাই ত বিদ্যারাজ্যের একমাত্র আলোচনাপ্রণালী নয়! কে আগে কে পরে, কে নকল করিয়াছে, কে সৃষ্টি করিয়াছে, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়াও অন্য প্রকার সমস্যার মীমাংসা করা যাইতে পারে। চীনাদর্শন, হিন্দুদর্শন, মুসলমানদর্শন, গ্রীকদর্শন, আধুনিক জার্ম্মাণদর্শন—ইত্যাদি জগতের সকল প্রকার দর্শনই দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইতে উদ্ভুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মানবাদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। এই আদর্শসমূহ ও এই মতবাদসমূহ তুলনা করিয়া দেখা বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ত্তব্য নহে কি? পরস্পরের সাম্য ও বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করা দর্শনালোচনার অন্যতম প্রধান

অঙ্গ নহে কি ? সেই তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগস্থল স্বরূপই হিন্দুদর্শনের বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্তালয়ে বক্তৃতা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।”

নৃতত্ত্ব

আজ সকালে 'এক্‌সিটার' কলেজ দেখা গেল। অধ্যাপক ম্যারেট এই কলেজের অন্যতম শিক্ষকপদে নিযুক্ত। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। এই বৎসর হইতে তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ 'লোক-সাহিত্য'-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইঁহার সঙ্গে ভারতীয় লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইল। ইনি বলিলেন "ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সন্নিকটে শ্রীযুক্ত হড্‌সন্ বাস করেন। তিনি ভারতীয় লোক-সাহিত্য ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী। ইনি রয়েল য্যান্‌থ্রপলজিক্যাল সমিতির সম্পাদক। এই সমিতির অন্যান্য সভ্যেরা বলেন যে, হজসনের হুজুগে পড়িয়া তাঁহারা ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি আলোচনা করিবার সুযোগ পান না। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে ভারতীয় লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইবেন।"

ম্যারেট্ সাহেব সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে জগতের ভিন্ন ভিন্ন লোকরুচি, লোকমত, লোক-সাহিত্য, লোকশিল্প ইত্যাদি আলোচনা করিয়া থাকেন। ইনি তুলনামূলক 'লোকসাহিত্য-বিজ্ঞানের' প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট। এই বিজ্ঞানের দ্বারা মানবাত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব এবং তাহার ক্রমবিকাশের কাহিনী বুঝিতে পারা যাইবে।

ইনি সম্প্রতি লণ্ডনের লোকসাহিত্য-পরিষদে সভাপতির আসন হইতে একটা বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। নাম "Folklore and Psychology" বা "লোকসাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান"।

তাহার একখণ্ড আমাকে উপহার দিয়া বলিলেন "আমি এই বিশাল বিদ্যাক্ষেত্রের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিতেছি। সম্প্রতি আমি অষ্ট্রেলিয়ায় যাইব। আমার ভ্রাতা সোমালিদেশে সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম করেন; তাঁহার সাহায্যে অনেকগুলি কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছি। ভারতীয় লোকসাহিত্যের কিছু কিছু আমাদের "Folklore" নামক ত্রৈমাসিক পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, দীনেশ সেন এবং হরিদাস পালিতের কথা বলিলাম। ম্যারেট সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"To be a folklorist worthy of the name you must first have undergone instruction amongst the folk, must have become one of them in wordly and in the spirit." অর্থাৎ জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে না পারিলে লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক হওয়া অসাধ্য। তাহাদের ভাষার কথা কহিয়া তাহাদের জীবনের সঙ্গী না হইলে লোক-সাহিত্য সংগ্রহে সফলতা লাভ হইবে না। "আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিলে মনে হয় পালিত মহাশয় বিশ বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক ম্যারেটের আদর্শ অনুসারেই জীবন যাপন করিয়াছেন।

'লোকসাহিত্য-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে ম্যারেটের মত উল্লেখযোগ্য। প্রথমে নিজজেলার জনসাধারণের উৎসব আমোদ নৃত্য গীত বুঝা কর্ত্তব্য। পরিচিত রীতি নীতিগুলি বুঝিবার পর দেশের প্রাচীন অনুষ্ঠানের মর্ম্মকথা বুঝিবার জন্য যত্ন লওয়া উচিত। এইরূপে সমগ্র জাতির অন্তঃকরণ সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা জন্মিবে, তাহার পর দূরদেশীয় জনগণের অন্তঃকরণ ও হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক. তখন অসভ্য বর্ব্বর আদিম জাতিপুঞ্জের মনোভাব বুঝিতে প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব আমোদ আলোচনা

করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির ও মানবাত্মার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মানবাত্মার এইরূপ বিভিন্ন আকৃতিসমূহ তখন তুলনা করিবার সুযোগ ঘটিবে। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে লোকসাহিত্যের ভিতর জনগণের জীবনযাপন, লক্ষ্য আদর্শ, সুখ দুঃখ এক কথায় মানুষের অন্তর্জ্জগৎ বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

গ্রীক-অধ্যাপক গিলবার্ট মারে

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ইউরোপীয় দর্শন, কলা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদির চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। আজকাল এখানকার অধ্যাপক গিল্‌বার্ট মারে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি গ্রীকভাষা ও সাহিত্যে প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মকথা বুঝিতে ও বুঝাইতে স্বকীয় অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইনি একধারে কবি, সমালোচক, ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় জীবনের মধ্যে ইনি ডুবিয়া আছেন।

ইঁহার পত্নী আজ বিকালে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিলেন। এদেশে প্রথম আলাপ প্রায়ই চা-পানের নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্যে ঘটিয়া থাকে।

আলেক্‌জান্দারের পরবর্ত্তী গ্রীকরাজগণের যুগে ভারতবর্ষে ও পাশ্চাত্যজগতে কতটা সম্বন্ধ ছিল এ বিষয়ে ইঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসরের প্রাচ্য পাশ্চাত্য সম্মিলনের বৃত্তান্ত ইঁহার নিকট শুনিতে চাহিলাম। ইঁহার বিশ্বাস "গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে ভাববিনিময় ও কর্ম্মবিনিময় বড় বেশী হয় নাই। আলেক্‌জাণ্ডার স্বয়ং এসিয়াবাসীর সঙ্গে ইউরোপীয়দিগের মিলন ঘটাইতে যথেষ্ট প্রয়াসীই ছিলেন। কিন্তু চিন্তা ও কর্ম্মের আদান প্রদান অতি সামান্যমাত্র সাধিত হইয়াছিল। অন্ততঃ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় মূর্ত্তিগঠনবিষয়ক বিদ্যা গ্রীস হইতে কিয়ৎপরিমাণে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের কথা গ্রীকমহলে বিশেষ পরিচিতই ছিল। ভারতবর্ষ পণ্ডিতমণীষিগণের

জন্মভূমি বলিয়া গ্রীকদিগের ধারণা ছিল। প্রাচীন গ্রীকেরা তাঁহাদের সকল দার্শনিক ও পণ্ডিতদিগের জীবনবৃত্তান্তে ভারতভ্রমণ ঘটনা উল্লেখ করিতেন। কতজন গ্রীকমণীষী হিন্দুস্থানের আব্‌হাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়া স্বদেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রীকেরা সকলেই বিশ্বাস করিত যে ভারতবর্ষ হইতে বিদ্যা আহরণ করিয়া তাহাদের মণীষিগণ জ্ঞানী হইয়াছেন। এইরূপ কিংবদন্তী, লোকমত এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের অভ্যন্তরে কতটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলা কঠিন। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, গ্রীকেরা ভারতবাসীকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়াই চলিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আলেকজাণ্ড্রিয়ার গ্রন্থশালা ও সংগ্রহালয়ে নানাদেশীয় তথ্যই সঞ্চিত হইয়াছিল শুনিতে পাই। সেই সমুদয়ের সাহায্যেই না কি তুলনামূলক আলোচনা প্রণালী অবলম্বনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই কেন্দ্রে কি ভারততত্ত্ব প্রবিষ্ট হয় নাই?" মারে বলিলেন "বোধ হয় না। আলেকজাণ্ড্রিয়ায় প্রধানতঃ গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন সমূহই সংগৃহীত হইয়াছিল।"

ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এক ভাষা ও এক লিপি বিষয়েই গল্প চলিতে লাগিল। পরে ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর-কবি শুনিতে পাই বঙ্গদেশের সর্ব্বপরিচিত। এরূপ প্রচার কিরূপে সাধিত হইল?" আমি বলিলাম "বাঙ্গালাদেশে এক ভাষা, এক লিপি ও এক সাহিত্য। এই সমুদয়ের সাহায্যে বিগত একশত বৎসর হইতে জনগণের ভিতরে এক আদর্শ, এক চিন্তা এক লক্ষ্য বিশেষ-রূপেই সংক্রামিত হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই এক কথা ভাবিতে সমর্থ। সাধারণ কলেজ বিদ্যালয়ের সাহায্য ব্যতীতও অন্যান্য উপায়ে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার বাড়িয়াছে। সংবাদ পত্র আমাদের দেশে

লোকশিক্ষার প্রধান উপায়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিজ্ঞান আমাদের মাতৃভাষার জন্য যাহা করিয়াছেন, সংবাদপত্র তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী কার্য্য করিয়াছে বলিতে পারে। তাহা ছাড়া গ্রন্থশালা, পাঠাগার, প্রীতি-সম্মিলন, উৎসব-সঙ্গীত, যাত্রা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদির সাহায্যেও বঙ্গভাষা এক সাহিত্যের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—আমাদের ভিখারীরাও গান গাহিয়া সহরের কথা পল্লীতে লইয়া গিয়াছে এবং পল্লীর কথা সহরকে শুনাইয়াছে। এইরূপে বৈষ্ণব পদাবলী, প্রসাদী সঙ্গীত সবই সমগ্র বঙ্গের সকল শ্রেণীর লোকের সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ আবেষ্টনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন, গত শতাব্দীতে আমাদের যে কয়জন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ধুরন্ধর জন্মিয়াছেন তাঁহাদের রচনা বঙ্গদেশের কোন অঞ্চলেই অনাদৃত নয়। কাজেই বিদ্যালয়ের ছাত্র, পাঠশালার গুরু মহাশয়, নৌকার মাঝি, রাস্তার ভিক্ষুক সকলেই বঙ্গসাহিত্যের প্রসিদ্ধ গীতিগুলি গাহিয়া থাকে। তাহারা হয় ত গীতরচয়িতার নামও শুনে নাই। কিন্তু মুখে মুখে গানগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে।"

মারে বলিলেন "দেখিতেছি আপনাদের দেশে উৎসব আমোদ নৃত্য গীত শোভাযাত্রা কথকতা ইত্যাদির প্রভাব কম নয়?" আমি বলিলাম "বোধ হয় মধ্যযুগে, এমন কি দেড়শত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যত ছিল তাহা অপেক্ষা কম। কিন্তু মোটের উপর কম বলা যায় না। এখনও সারিগান, ভাটিয়ালগান, গাজন, পদ্মাপূজা, ব্রতকথা, ভাসান, বাঁহিচ-সাহিত্য ইত্যাদির দ্বারা আমাদের জনগণের মত সৃষ্ট হয় এবং চরিত্র গঠিত হয়।"

মারে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রদেশে প্রদেশে ভাষা বিভিন্ন। ধর্ম্ম হিসাবেও কি ভারতবর্ষে ভাষা বিভিন্ন নয়? বঙ্গের মুসলমানেরা কোন্ ভাষায় কথা কহে ও গান গাহে?" আমি বলিলাম "একটা দৃষ্টান্তেই

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাতেই সঙ্গীত-চর্চ্চা হয় সত্য। কিন্তু অনেক স্থলেই আমাদের ওস্তাদেরা যুক্তপ্রদেশবাসী। ওস্তাদেরা হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় গান গাহেন। বহু ওস্তাদ আবার মুসলমান। অথচ বাঙ্গালী হিন্দুরা এই উর্দ্দু বা হিন্দী ভাষাভাষী মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞগণের শিষ্য। এমন কি বাঙ্গালীরা হিন্দী ওস্তাদের কসরত শিখিতেই বিশেষ চেষ্টিত।" মাহে বলিলেন "তাহা হইলে আপনাদের দেশে সুকুমার শিল্প-কলা, সঙ্গীতবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্যে জাতীয় ঐক্য অনেকটা পুষ্ট হয়!" আমি বলিলাম "কেবল তাহাই নয়। সঙ্গীতবিদ্যার সাহায্যে আমাদের দেশে একপ্রকার ডিমক্রেসি বা সামাজিক সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দরিদ্র নিঃস্ব সঙ্গীতজ্ঞগণকে আমাদের ধনী জমিদার বা সম্ভ্রান্ত লোকেরা যারপর নাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। একবার তাঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ধনী নির্ধন প্রভেদ বা উচ্চ নীচ ভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়।"

অক্‌সফোর্ডে সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্য

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ম্যাকডোলেন সাহেবের সঙ্গে পার্জিটার সাহেব আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ম্যাক-ডোলেন প্রণীত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" সকলেই পাঠ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে বিশেষ কিছুই নাই। তাহার পরিশিষ্ট অধ্যায়ে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তাহার সঙ্গে প্রধানতঃ এই বিষয়েই কথা বলা গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি ঐ পরিশিষ্টে যে সকল তথ্য বিবৃত করিয়াছেন তাহা ছাড়া আর কোন উপকরণ নূতন সংগৃহীত হইয়াছে কি? বিশেষতঃ, আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তীকাল হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসরে গ্রীক ও হিন্দুসভ্যতার সংমিশ্রণ ও বিনিময় কতটা সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত করিয়া-ছেন কি? আমি এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাহি।"

ম্যাকডোলেন বলিলেন "আমি নূতন কোন তথ্য দিতে অসমর্থ। আমার ভাণ্ডার ফুরাইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার একজন পণ্ডিত ইংরাজীতে ঐ বিষয়ে চর্চ্চা করিয়াছেন শুনিতে পাই। আর একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত জার্ম্মাণ ভাষায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু এসব আমি এখনও দেখি নাই।"

আমি বলিলাম "দার্শনিক ষ্টুয়ার্ট প্লোটিনাসের প্লেটোতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া ইহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহার অসামর্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। গ্রীক ইতিহাসের ধুরন্ধর অধ্যাপক মারেও তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মানবসভ্যতার ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" ম্যাকডোনেল হাসিয়া বলিলেন "দেখিতেছি তাহাই। আপনি একটা কাজ করুন। আমাদের আরবী সাহিত্য ও দর্শনের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মারগোলিয়থের নিকট যান। আমি তাঁহাকে আপনার জন্য পত্র দিতেছি। তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যসংমিশ্রণের একটা নূতন দিক আপনার নিকট উন্মুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালাও জানেন।"

মারগোলিয়থের নিকট আসিলাম। ইনি বলিলেন, "গ্রীক সাহিত্য হইতে যত উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, বোধ হয় তাহার বিশ্লেষণ সমস্তই হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে নূতন কোন তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। এখন হিন্দু-সাহিত্যের নানা বিভাগ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিতে করিতে যদি নূতন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলেই এই ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারিবে নতুবা নয়। আরবী সাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া কঠিন। আরবেরা স্বীকার করেন, তাঁহারা তিনটি জিনিষ হিন্দুস্থান হইতে লইয়াছেন। প্রথমতঃ দশমিক সংখ্যাপ্রকরণ, দ্বিতীয়তঃ হিতোপদেশ, তৃতীয় চেস্ খেলা। তাহা ছাড়া আর কোন ঋণ ইহাঁরা স্বীকার করেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ অল্‌রশিদের আমলে আরবেরা দর্শনালোচনায় একটা অধ্যাত্মবাদ ও ভাবুকতা প্রচার করিতেছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দু বৈদান্তিকমতের কোনরূপ সাদৃশ্য

বা সংযোগ আছে কি ?" মারগোলিয়থ বলিলেন "না। এই যুগের আরব-আধ্যাত্মিকতা এবং হিন্দু-আধ্যাত্মিকতা দুই সম্পূর্ণ বস্তু। হিন্দু ভাবুকতার সৃষ্টি হইয়াছে অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া। আরব দার্শনিকেরা এরূপ অন্তর্মুখী হইয়া চিৎক্ষেত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিতেন না। তাঁহারা বুঝিতেন যে, আল্লা ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা মায়াবাদের প্রবর্ত্তক। সংসার ও স্থূলজগতের অতিরিক্ত আর একটা জগতের অস্তিত্ব তাঁহাদের চিন্তারাজ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। সেই জগতই সত্য দৃশ্যমান জগৎ অলীক। এই মায়াতত্ত্ব হইতেই হিন্দুর ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ।"

মারগোলিয়থ গ্রীক ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিতেছেন। ইহাঁর মতে "দুই ভাষার শব্দতত্ত্ব একরূপ ব্যাকরণঘটিত সাদৃশ্যও কিছু আছে। কিন্তু মৌলিক ভিত্তি একরূপ হইলেও তাহার উপরকার বিকাশ দুই ভিন্ন রীতিতে সাধিত হইয়াছে।"

অক্সফোর্ডের ধন-বিজ্ঞানাধ্যাপক এজ্‌ওয়ার্থের সঙ্গে আজ সন্ধ্যাকালে আলাপ হইল। ইনি অল্‌সোল্‌স কলেজের গৃহে বাস করেন। কেম্ব্রিজের মার্শ্যাল ও ক্যানিংহাম, এডিনবারার নিকলসন এবং অক্স-ফোর্ডের এজ্‌ওয়ার্থ বিলাতী ধনবিজ্ঞান মহলে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে মার্শ্যাল এবং এজোয়ার্থই বিজ্ঞতম এবং প্রবীণতম।

এজ্‌ওয়ার্থ ভারতীয় বৈষয়িক তথ্য সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার সময় ও উৎসাহ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বয়সও অত্যধিক হইয়াছে; সুতরাং নূতন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি আর নাই।

রোমেনিয়ান ছাত্র

পার্জ্জিটারের সঙ্গে আর একবার দেখা হইল। ইনি পুরাণ লইয়া ব্যস্ত। ইতিমধ্যে নানা প্রবন্ধ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণের মতে ভারতেতিহাস কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ ইতিমধ্যেই বাহির হইয়াছে। ইনি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত কয়েকটা প্রবন্ধ আমাকে উপহার দিলেন।

ইনি পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি সম্বন্ধে বড়ই উৎসাহী। ইনি সেইগুলি মুদ্রিত করাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি কেবলমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থই প্রচার করিতেছেন দেখিয়া ইনি দুঃখিত। পার্জ্জিটার বলিলেন, "সংস্কৃত গ্রন্থাবলীরও ভাল ভাল পুঁথি ইঁহারা আজকাল বাহির করিতেছেন না! কতকগুলি ভাষ্যমাত্র প্রচার করিয়া লাভ কি? তাহা ছাড়া বাঙ্গালা পুঁথির দিকে জোর দিলে ইঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধই হইতে পারে।" আমি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ইত্যাদি কার্য্যের উল্লেখ করিলাম। ইনি এ-গুলির বেশী খবর রাখেন না; কেবলমাত্র দীনেশ বাবুর সুখ্যাতি করিলেন। তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ইংরাজী সংস্করণ খানা আলমারী হইতে বাহির করিয়া বলিলেন "ইহাতে খানিকটা ফেনান আছে সত্য। কিন্তু ইহা অতি উপাদেয় গ্রন্থ।" আমি বলিলাম "দীনেশ বাবু এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনাবলী হইতে কিয়ৎ পরিমাণ প্রকাশ করিতে নিযুক্ত আছেন।" ইহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইলেন।

তারপর আর একবার ভিন্সেণ্ট স্মিথের সঙ্গে দেখা হইল। ইঁহার নিকট একজন ইংরাজ "অর্থ শাস্ত্রে"র আলোচনা করিতেছিলেন। এই ব্যক্তি লক্ষ্ণৌ কলেজের অধ্যাপক। দেখিলাম ভিন্সেণ্ট স্মিথ অধ্যাপককে উপদেশ দিবার সময়ে নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রণীত নূতন গ্রন্থ দেখাইয়া দিলেন।

আজ বিকালে চা-পানের সময়ে কাব্য আলোচনা হইল। সার্ভিয়া ও রোমেনিয়া দেশের দুই জন লোকের সঙ্গে চা-পান করা হইতেছিল। সঙ্গে একজন ভারতীয় মুসলমান কবিও ছিলেন। তাঁহার উর্দু কবিতা শুনিলাম। পরে রোমেনিয়াবাসী তাঁহাদের প্রকৃতিবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র কবিতা আবৃত্তি করিলেন। ইনি বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্সফোর্ডে নৃতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন। এই বিজ্ঞানে ইঁহার যৎপরোনাস্তি উৎসাহ দেখিলাম। ইনি রবিবাবুর ইংরাজী 'সাধনা'-গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ রুমেনিয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সাধনার অধ্যাত্মতত্ত্ব আপনার ভাল লাগিল কেন?" ইনি বলিলেন "মাত্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে ব্যক্তির সঙ্গে সমগ্রের সম্বন্ধ যেরূপ বুঝান হইয়াছে পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের রচনায় তাহা পাই নাই। কোন কোন দার্শনিক ব্যক্তির প্রাধান্য প্রচার করিয়াছেন। কেহবা বিশ্বের ও নিখিলের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রের গ্রন্থে বুঝিলাম হিন্দুরা এই দুয়ের সামঞ্জস্য দেখিয়াছেন। হিন্দুর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই বিশ্বের, সমগ্র নিখিলের বিকাশ হয়। এই ধারণা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন।"

রোমেনিয়ার ছাত্রকে অধ্যাপক ম্যারেটের উপযুক্ত শিষ্য বুঝিতে পারিলাম। ইনি বিজ্ঞান হিসাবে নৃতত্ত্বের আলোচনা চাহেন। এজন্য ভারতবর্ষের উৎসব আমোদ, সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, পূজা, ব্রতানুষ্ঠান, রীতিনীতি ইত্যাদির সঙ্কলন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

ইনি বলিলেন "এগুলির সংগ্রহ, গল্প আখ্যায়িকা, উপকথা হিসাবে হইলে চলিবে না। তাহার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। কিন্তু মানবের চরিত্র, মানবেতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়, মানবাত্মার ক্রমিক অভিব্যক্তি বুঝিবার জন্য এই সকল তথ্য সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের উপকরণ পাওয়া গেলে পাশ্চাত্য সমাজের উপকরণের সঙ্গে তুলনা-সাধন সহজ হইয়া পড়িবে। তখন সমাজ-বিজ্ঞান রচনার কাল উপস্থিত হইবে।" আমি ভারতবর্ষে এইরূপ তথ্য সংগ্রহের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। ইনি বলিলেন "দেখিতেছি, ভারতবাসীরাও এই সকল কার্য্যের আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন। অথচ এই সকল সংবাদ ইউরোপে বসিয়া আমরা পাই না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

কেম্ব্রিজে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ

অক্সফোর্ড হইতে সোজাপথে কেম্ব্রিজে আসিলাম। বার দিনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি অল্পমাত্রই বুঝা গেল।

এখানকার প্রথম কথা—অধ্যাপকগণের পাণ্ডিত্য। ইহাঁরা এক একজন এক এক বিষয় লইয়া জীবন কাটাইতেছেন। প্রায় সকলেই বিশেষজ্ঞ. বিশেষজ্ঞ হইবার দিকে ইহাঁদের ঝোঁক এত বেশী যে, নিজ নিজ বিভাগের যে সকল পণ্ডিতগণ কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাদিগকে ছাড়া ইহাঁরা অন্যান্য লোকের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময়ে জানেন না। যাহা হউক এতগুলি বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ পণ্ডিতের সম্মিলনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার একটা জীবন্ত উৎসে পরিণত হইয়াছে।

এরূপ বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা অর্থসাপেক্ষ। অধ্যাপকেরা সপ্তাহে সপ্তাহে একটা বা দুইটা বক্তৃতা পাঠ করেন। দিনরাত বসিয়া ইহাঁরা যে সকল গবেষণা করিতেছেন সেই সমুদয় গবেষণা গ্রন্থাকারে প্রচার করা ইহাঁদের কার্য্য। সেই সকল গ্রন্থের এক একটা অধ্যায় এক একদিন পাঠ করা হয়। ছাত্রেরা এই সকল বক্তৃতা হইতে কোন উপকার পায় কিনা তাহা

ইহাঁরা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। ছাত্রদিগের সঙ্গে ইহাঁদের মৌলিক অনুসন্ধানের কোন সম্বন্ধই নাই বলা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় যেন অধ্যাপকগণের জন্যই স্থাপিত হইয়াছে।

ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কয়েকজন নিম্নপদস্থ শিক্ষক প্রত্যেকে দশ বার জন ছাত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন এই শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে প্রশ্নপত্র দেন এবং পুস্তকাদি পাঠ বিষয়ে সাহায্য করেন। ছাত্রেরা প্রধানতঃ এই সকল শিক্ষকের সাহায্যেই যাহা কিছু শিক্ষা করে।

ফলতঃ ছাত্রদিগের অধ্যাপনা এক নিয়মে চলিতে থাকে, এবং অধ্যাপকগণের গবেষণা অন্য নিয়মে চলিতে থাকে। এই দ্বিবিধ কার্য্য চালাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট অর্থ ব্যয়। প্রথমতঃ অধ্যাপক-গণের মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য আর্থিক বিষয়ে যথাসম্ভব নিরুদ্বেগ করিয়া রাখা হয়। তাঁহারা অন্নচিন্তা না করিয়া নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে ডুবিয়া থাকিতে সুযোগ পান। ইহারই নাম "সংরক্ষণ নীতি"। অপর দিকে, ছাত্রগণের জন্য বহু সাহায্যকারী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়। তাঁহাদের বেতনও কম নয়। অধিকন্তু ল্যাবরেটরী, মিউজিয়ম্, লাইব্রেরী ইত্যাদির সরঞ্জাম খরচ অত্যধিক।

তার পর রেসিডেন্স্যাল প্রথার কথা বিচার্য্য। এ বিষয়ে কড়াকড়ি যথেষ্ট। ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা কঠোর শাসনে থাকিতে হয়। সামান্য দোষে কলেজ হইতে বিতাড়িত হইবার নিয়ম আছে।

এইরূপ জীবন যাপন করিয়া বিলাতী ছাত্রেরা তাহাদের ভবিষ্যৎ পার্ল্যামেণ্ট-জীবন, সামাজিক জীবন ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু হিন্দুরা যাহাকে অন্তর্মুখী ধর্ম্মশিক্ষা বলে তাহার কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। অধ্যাপকে ছাত্রে অথবা শিক্ষকে ছাত্রে হৃদয়ের সম্বন্ধ

এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই এই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দুর জাতীয় গুরুগৃহের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। এখানকার সমাজের যে আবহাওয়া তাহার সঙ্গে এইরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যথেষ্ট খাপ খাইয়াছে। সুতরাং বিলাতী ছাত্রের চরিত্র বিলাতী ধরণে সুগঠিতই হইতে পারে।

কিন্তু ভারতীয় ছাত্রের এখানে সে হিসাবে কোন লাভই হয় না। ভারতীয় ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে এখানকার জীবন যাপনের কোন সংযোগ নাই। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণজীবনের আস্বাদ পাইতে হইলে বহু অর্থব্যয় আবশ্যক। তাহা না হইলে মিলিয়া মিশিয়া সকলের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবাসীর তত টাকা কৈ?

কেম্ব্রিজে পৌঁছিয়াই দার্শনিক শীলমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। শুনিলাম, অক্সফোর্ডের ন্যায় কেম্ব্রিজেও জগদীশচন্দ্র এবার দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছেন। কেম্ব্রিজের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকেই বসুমহাশয়ের বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ইঁহার পরীক্ষাগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এক্সপেরিমেণ্টসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন সন্দেহ আর নাই। যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে বসুমহাশয় তাঁহার পরীক্ষা দেখাইলেন সেগুলি ভারতবর্ষে প্রস্তুত। এই যন্ত্রগুলির কার্য্যোপযোগিতা দেখিয়া ইঁহারা বিশেষ পুলকিত। বিজ্ঞান-সেবীরা সকলেই বসু মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

শীল মহাশয়কে অক্সফোর্ডের সংবাদ দেওয়া গেল। বলিলাম "হিন্দুদর্শনের কোন স্থান ওখানকার পণ্ডিত মহলে দেখিতে পাইলাম না। ভারতবর্ষে কোন দর্শনবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ঘুরিলেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া গ্রীক ও হিন্দুজাতিদ্বয়ের মধ্যে আলেক্জাণ্ডারের পরবর্ত্তী

যুগ হইতে কতকটা ভাব বিনিময় হইয়াছিল তাহার আলোচনায় অক্সফোর্ডের সকলে ফেল মারিয়াছেন"।

শীলমহাশয় বলিলেন "ফেল মারিবার কথা। কারণ গ্রীক সাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। সংস্কৃতেও বোধ হয় প্রমাণ পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ ভারত ও গ্রীসের মধ্যবর্ত্তী জনপদেই তাহার সাক্ষ্য অন্বেষণ করিতে হইবে। ভারতের উত্তর পশ্চিমে ব্যাক্ট্রিয়া পার্থিয়া ইত্যাদি রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের সঙ্গে একদিকে সীরিয়া, অপর দিকে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। এসিয়ামাইনর, সীরিয়া প্রভৃতি দেশে পার্থিয়ার প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। এদিকে পার্থিয়ার জনপদে ভারতের বৌদ্ধসাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পার্থিয়ার ভিতর দিয়া এসিয়ামাইনরকে ভারতবর্ষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। পার্থিয়ার ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে সীরিয়া জনপদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই দুইটী নূতন ভাষায় পারদর্শী না হইলে ভারত ও মধ্যবর্ত্তী জনপদের জীবনযাপন-প্রণালী অবগত হওয়া যাইবে না। অধিকন্তু ভারতের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য এবং গ্রীসের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য থাকাও প্রয়োজন। এতগুলি ভাষার অধিকারী না হইলে আলেক্‌জাণ্ডারের পর হইতে পাঁচশত বৎসর কালের ব্যবসায় সাহিত্য, ধর্ম্মমত ইত্যাদির পরিবর্ত্তন, বিপ্লব ও সংমিশ্রণ বুঝিতে পারা যাইবে না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতগুলি ভাষা কেহই জানেন না। ভারতবাসীদের মধ্যেও কেহ জানেন না। অথচ এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে বহু মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যাইবে। যদি কোন ভারতবর্ষের ছাত্র স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতসাহিত্য ও হিন্দুদর্শন

শিক্ষা করিয়া অক্সফোর্ডে গ্রীকদর্শন-বিভাগে শিক্ষালাভ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই অজ্ঞাত অন্ধকারময় বিদ্যার গণ্ডীতে আলোক বিকীরণ করিবার সম্ভাবনা হইবে। অবশ্য অক্সফোর্ডের বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া তাহাকে পার্থিয়া ও সীরিয়া জনপদের ভাষা ও সাহিত্য আলোচন করিতে হইবে।”

পরে অন্যান্য বিষয়ে কথা হইতে হইতে গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সম্প্রতি একজন জাপানী এবং একজন আমেরিকান্ পণ্ডিত মিলিত হইয়া জাপানীদিগের গণিতচর্চ্চার ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানীদের সঙ্গে চীনাদের ভাষা বিনিময় বিশেষরূপেই হইত। জাপানীরা গণিত শাস্ত্রের কয়েকটা বিষয় চীনের পণ্ডিত সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে হল্যাণ্ডের সঙ্গে জাপানীদের সংশ্রব আবদ্ধ হয়। কোন কোন জাপানী পণ্ডিত হল্যাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে শিখিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানী ও ইউরোপীয় সংমিশ্রণ সাধিত হইতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানীরা ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত গ্রীক অক্ষর “পাই” এর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা ওলন্দাজগণের নিকট গ্রহণ করা নয়। তখনও ইউরোপের কেহ এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হন নাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানীরা যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উদ্ভাবনীশক্তি বেশী, কি গ্রহণ করিবার শক্তি বেশী—এ সমস্যা মীমাংসা করা কঠিন। মোটের উপর বলা যায় যে, আধুনিক ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের ন্যায় জাপানীরাও জগতের সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গণিত-চর্চ্চা করিয়াছেন। গণিতচর্চ্চা হিসাবে জাপানীরা নগণ্য জাতি নহেন।

শীলমহাশয় বলিলেন, "চীনা ও জাপানী ভাষা বিনিময়ের যুগে ভারতপ্রভাবের কথা মনে রাখিতে হইবে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের চিন্তাপ্রণালীই চীন দেশে অনুসৃত হইত। চীনের নিকট জাপানী যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষেরই আবিষ্কৃত সম্পত্তি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানীরা "পাই" এর মূল্য আবিষ্কার করিলেন দেখা যাইতেছে। এ সময়ে ইউরোপে সে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। পরন্তু ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের একখানা সংস্কৃত গ্রন্থে 'পাই" এর যে মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছে সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানী গ্রন্থেও ঠিক সেই মূল্যই নির্দ্ধারিত দেখিতে পাইতেছি। অথচ, ঐতিহাসিকদ্বয় এই আবিষ্কারের মূল অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এদিকে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসেও আমরা ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী যুগের বহু কথাই জানি না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি গণিতচর্চ্চা করিয়াছিলেন কি না তাহার যথার্থ বিবরণ এখনও সঙ্কলিত হয় নাই। এই যুগে দক্ষিণভারতে নানা বিদ্যার অনুশীলন হইতেছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ভারতীয় গণিত গ্রন্থখানা দক্ষিণ ভারতেই লিখিত হইয়াছিল। কাজেই জাপানী গণিতকারের আবিষ্কারের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। সেই যুগে চীনের সঙ্গে প্রাচ্যভারতের, বিশেষতঃ দাক্ষি-ণাত্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানিতে হইবে। পাঠানেরা যখন আর্য্যাবর্ত্ত দখল করিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্যে সৈন্য পাঠাইতেছিল ঠিক সেই যুগের হিন্দুজাতির বিদ্যানুশীলন এবং শিক্ষাপদ্ধতিসম্বন্ধে এক্ষণে অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়গত, ধৰ্ম্মগত ও সাহিত্যগত আদান প্রদান কতটা ছিল তাহাও নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।"

ভারতীয় ছাত্র

ম্যাণ্ডার্সন আসাম প্রদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। এক্ষণে পেন্‌শন্‌ পাইতেছেন এবং কেম্ব্রিজের সিবিল-সার্ভিস পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা শিখাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আমাকে বাঙ্গালা ভাষায় একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন।

ম্যাণ্ডার্সন আজ নানা গল্প করিলেন—স্কট্‌ল্যাণ্ডের কথা, আসামের কথা, বিক্রমপুরের কথা, ফোর্ট উইলিয়ামের কথা। ইঁহার জন্ম ফোর্ট উইলিয়ামে—ইঁহার ঠাকুরদাদা টাউনহল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি নানা কাহিনী ইঁহার নিকট শুনিলাম।

ইঁহার মতে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা স্বদেশেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে সুফল ফলিবে। তাহাদের বিলাতে আসিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা নিতান্ত ভালছেলে তাহারা উচ্চতম জ্ঞানলাভের জন্য বিলাতে আসিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু সাধারণ ধরণের ছাত্রেরা ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য এখানে আসে। এখানে আসিয়া তাহারা মাঝারি গোছের শিক্ষালাভও করে না। বরং এখানে প্রলোভন এত বেশী যে ইহারা চরিত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। ম্যাণ্ডার্সন বলেন ভারতবর্ষে কয়েকটা বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে ভারতীয় ছাত্রের বিদেশে আসিবার প্রয়োজন হইবে না।

আজকাল বিলাতের নানা স্থানে ভারতীয় ছাত্রের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। ম্যাণ্ডার্সনের যুক্তি সেই চেষ্টারই একটা

লক্ষণ। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে, বিলাতী লোকেরা ভারতীয় যুবক সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। লণ্ডনে এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। অক্স্‌ফোর্ডে এই ভাব বুঝা গিয়াছে। স্যাণ্ডার্স্‌ন স্পষ্ট ভাবেই এ কথা বলিলেন। যুক্তি এক এক জনের এক এক প্রকার। কেহ বলেন "আমি ইহাদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করিতাম—আমি হতাশ হইয়াছি।" কেহ বলেন "ইহারা ইংরাজদের সঙ্গে মিশিতে চাহে না তবে এখানে আসে কেন?" কেহ বলেন "এখানে না পাঠাইয়া বিলাত হইতে ইংরাজ অধ্যাপক ভারতবর্ষে আমদানী করাই শ্রেয়স্কর। তাহাতে খরচ কম হইবে, লাভ বেশী হইবে।" ইত্যাদি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা

লীস্-বিদ্যালয় বড় লোকের ছেলেদের জন্য। শুনিলাম এখানে তিনটি ভারতীয় ছাত্রও আছে। অধ্যক্ষ বার্বার বলিলেন "বেশী হিন্দুস্থানী ছাত্র জুটিলে তাহারা নিজের মধ্যে দল পাকাইয়া ফেলিবে, বিলাতী ছাত্রের সঙ্গে মিশিতে চাহিবে না।" ছেলেদের চিত্রাঙ্কন দেখিলাম। ক্লাশে একটি চীনা বালককেও দেখা গেল।

এখানে প্রত্যেক বালকের মাসিক খরচ প্রায় ১৫০৲। সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে বোর্ডিংগৃহে বাস করিতে হয়। শয়নাগারের নাম ডর্ম্মিটরী। প্রত্যেক ডর্ম্মিটরীতে ১৬ খানা খাট বিছান রহিয়াছে। প্রত্যেক খাটের পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র পায়খানা। সুতরাং হলের ভিতরে ১৬টা খাট এবং ১৬টা পায়খানা। ইহার ভিতর জিনিষ পত্র রাখিবার অথবা লেখাপড়া করিবার নিয়ম নাই। তাহার মধ্যে স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল ডর্ম্মিটরীর শাসনকর্ত্তাস্বরূপ একজন ছাত্র নিযুক্ত হন। তাঁহার নাম প্রেফেক্ট। এই প্রেফেক্টই ছাত্রগণের চরিত্রগঠন, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি সকল বিষয়ের জন্য দায়ী। দায়িত্ববোধ বাল্যকাল হইতেই বিলাতের ছাত্রেরা শিখিতে পায়। বার্বার বলিলেন "এই ছাত্র নায়কই আমাদের বিলাতী বিদ্যালয়ের বিশেষ অঙ্গ। ইহার জন্যও আমাদের গৌরব।"

আমি বুঝিলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেমন "টিউটর" বা নিম্ন পদস্থ শিক্ষকগণ প্রধান, পাঠশালায় বা নিম্নবিদ্যালয়ে সেইরূপ "প্রেফেক্ট" বা ছাত্র

নায়ক প্রধান। বিশ্ববিদ্যালয়ের "অধ্যাপকগণ" বক্তৃতা পাঠ করেন মাত্র। তাঁহাদের সঙ্গে ছাত্রদিগের শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। সেইরূপ নিম্ন-বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু বালকগণের জীবনগঠন করেন ছাত্রনায়ক। এক একটি বিদ্যালয় এই-রূপে যথার্থ স্বায়ত্ত্বশাসন-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান।

লীস্‌বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ সুবিস্তৃত। হকি, ক্রিকেট, ফুটবল, ইত্যাদি নানা প্রকার খেলার উপযুক্ত ময়দান আছে। সাইকেলচড়া অভ্যাস করার জন্য মাঠের ভিতরদিয়া রাস্তা আছে। বন্দুকের গুলি ছোঁড়া এবং হাতের লক্ষ্য ঠিক করা শিখিবার জন্য ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া একটা বড় ঘরের ভিতর গভীর জলাশয় দেখিলাম। এই জলাশয়ে নদীর জল আসিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার মধ্যে পঞ্চাশ জন বালক এক সঙ্গে স্নান করিতে পারে। সাঁতার দিতে শিক্ষা করা এখানকার ছাত্রদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জলে ডুবিয়া গেলে কিরূপে লোককে রক্ষা করিতে হয় তাহাও ছাত্রেরা শিক্ষা করে। এই সকল বিষয়ে ছাত্রগণকে বিশেষ মনোযোগী করা হয়। এতদ্ব্যতীত একটা ব্যায়াম-গৃহও দেখিলাম। তাহাতে সাধারণ জিম্‌নাষ্টিক্‌সের সরঞ্জাম রহিয়াছে।

পরীক্ষার চাপ এখানে বড় বেশী নাই। এমন কি সর্ব্বোচ্চশ্রেণী ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়েও কোন ছাত্রকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। যে সকল ছাত্র অক্‌সফোর্ড, কেম্ব্রিজ্‌ বা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে চাহে তাহাদের জন্য সেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা লওয়া হয়। সাধারণতঃ ১৫।২০ জন ছাত্র প্রতিবৎসর এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া থাকে।

লীস্‌বিদ্যালয়ে ১৪ হইতে ১৯ বৎসর বয়স্ক বালকগণকে গ্রহণ করা হয়। ইহার পূর্ব্বে তাহারা নিম্নতম পাঠশালায় শিখিয়া আসে। সর্ব্বোচ্চ-

শ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান আছে। কেহ বিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ শিক্ষা করে। কেহ গণিতবিভাগে বিশেষ শিক্ষা করে ইত্যাদি। কিন্তু ভর্ত্তি হইবার পর কিয়ৎকাল সকলেই সকল বিষয় শিক্ষা করে।

ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেখিলাম। ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক পরীক্ষা হইতেছে। এক সঙ্গে ১৫।২০ জন তাহার কার্য্য করিতে পারে। আমি ১০ জন ছাত্র দেখিলাম। তাহারা প্রত্যেকে পুস্তক দেখিয়া রাসায়নিক একস্‌পেরিমেণ্ট করিতেছে। সাধারণতঃ সপ্তাহে তিনঘণ্টা এরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরী এবং প্রাণ-বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষাগৃহও দেখা গেল। প্রত্যেক গৃহে বৈজ্ঞানিক চিত্র দেখিতে পাইলাম। এতদ্ব্যতীত একটা ক্ষুদ্র মিউ-জিয়ামও দেখিলাম। ইহার এক একটা আল্‌মারী এক একজন ছাত্রের তত্ত্বাবধানে থাকে। নানা প্রকার ভৌগোলিক, জীববিষয়ক ও উদ্ভিদ্-বিষয়ক পদার্থ এই ক্ষুদ্রগৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, ও অস্ত্র এই মিউজিয়ামে রহিয়াছে।

আজকাল এই বিদ্যালয়ে ১৫০ ছাত্র। শিক্ষক ১৭ জন। বার্বার বলিলেন "১৭ জন শিক্ষক থাকিলে সাধারণতঃ ২০০ জন ছাত্রের কার্য্য চালান যায়।" ছাত্রেরা দিনে ৮ ঘণ্টা খাটে। কোন ঘণ্টা ৫০ মিনিটে পূর্ণ, কোন ঘণ্টা ৬০ মিনিটে। শিক্ষকগণ সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা কার্য্য করেন। ইঁহাদের সময়াভাব যথেষ্ট। কাজেই গ্রন্থলিখন ইঁহাদের দ্বারা হয় না। কাহারও কাহারও সখের সাহিত্য-চর্চ্চা আছে। একজন আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের প্রাচীন "স্তাগা" নামক গাথা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ক রচনায় কেহ হাত দেন নাই।

বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার ভিতরেই একটা গির্জ্জাগৃহ। বার্বার বলি-লেন, "এই গৃহের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। বিশেষতঃ বেঞ্চগুলির

পার্শ্বস্থিত নক্‌সা ও চিত্রসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এগুলি বিদ্যালয়ের একজন কর্ত্তা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন।"

গির্জ্জার প্রাচীরে কতকগুলি জানালা দেখিলাম। মধ্যযুগের রীতিতে জানালাগুলির কাচের উপর নানা রংয়ের চিত্র অঙ্কিত। সর্ব্বসমেত প্রায় ২৫।৩০টা জানালা রহিয়াছে। চিত্রগুলিতে বাইবেলের সকল বৃত্তান্ত বিবৃত। যীশুর জন্ম হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত সকল অবস্থাই চিত্রিত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইরূপে কাচ-চিত্রন কি বর্ত্তমান যুগেও চলিয়া থাকে? প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টানেরা এইরূপ মূর্ত্তি-চিত্রনের বিরোধী নহে কি?" তিনি বলিলেন, "মধ্যযুগের সংস্কার-আন্দোলনের সময়ে অবশ্য দুই দিকেই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সংস্কারকেরা এইরূপ সচিত্র জানালাগুলি ভাঙ্গিয়া দিত। কিন্তু এখন সেরূপ দৌরাত্ম্য আর নাই। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের গির্জ্জাতেও সচিত্র জানালা লাগান হয়। এইরূপ জানালা এখনও বিলাতেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বিলাতে এই শিল্প বর্ত্তমানকাল-পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। তবে এখনকার শিল্পীরা প্রাচীন কালের ন্যায় ওস্তাদ কি না জানি না। মধ্যযুগের সচিত্র কাচগুলি এখনও উজ্জ্বল দেখিতে পাই কিন্তু আমাদের এই নবনির্ম্মিত গির্জ্জাগৃহের আধুনিক জানালাগুলির চিত্র-সমূহ কতদিন উজ্জ্বল থাকিবে তাহা ভবিষ্যতের লোকেরা বলিবে।"

বার্বারের সঙ্গে চলিতে চলিতে একটা গৃহে আসিলাম। উহা একটা বৃহৎ হল। ইহার প্রাচীরে ৩।৪টা বড় বড় বোর্ড ঝোলান। তাহাতে অনেক লোকের নাম লিখিত। জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম "ঐ সকল ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ গৌরবসূচক স্থান লাভ করিয়াছেন। ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যতে উন্নত হন, তাঁহাদের

সকলের নামই লিখিয়া রাখা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেই সকল নাম দেখিয়া উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষা করে।"

লীস্ বিদ্যালয় হইতে কিংস্ কলেজে আসিলাম। অধ্যাপক ডিকিন্‌সন এই সময়ে আসিতে লিখিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন হইল চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকাও লিখিয়াছেন। ইঁহার মতে "জগতের ভিতর একমাত্র ভারতবর্ষই ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। কারণ ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত। জাপান ও চীনের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ভাবাবলম্বী। জাপানী ও চীনাজনগণ জগৎকে যে ভাবে দেখে, ইউরোপের জনগণ প্রায় সেই চোখেই দেখিয়া থাকে। ইহারা সকলে বাস্তব জীবন, সাংসারিকতা ও স্থূল পদার্থের দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু ভারতবাসীর দৃষ্টি অন্য দিকে। ইহারা অতীন্দ্রিয়ের কথা বেশী ভাবে। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রভেদ। প্রকৃত প্রস্তাবে চীন ও জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্গত। একমাত্র ভারতবর্ষই প্রাচ্য!" দেখা যাইতেছে বিলাতের পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষকে এশিয়ার ভিতর "এক ঘরে" করিয়া রাখিতে চাহেন।

আজ কুমার স্বামী মহাশয় ডিকিন্‌সনের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিবেন। ডিকিন্‌সন্ আমাকেও আহার করিতে বলিলেন। আমার অন্যত্র বন্দোবস্ত ছিল। কাজেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

কুমার স্বামী কাল কেম্ব্রিজে আসিয়াছেন। কাল রাত্রে এখানকার "ভারতীয় মজলিসে" একটা বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় "ভারতীয় চিত্রকলায় আধ্যাত্মিকতা"। এই প্রবন্ধ বেলজিয়ম হইতে প্রকাশিত "আইসিস" পত্রিকায় প্রকাশিতব্য রচনার কিয়দংশ। আইসিসের এই সংখ্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ

থাকিবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারতোঁ মহাশয় আমাকে একটা প্রবন্ধ দিতে বলিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য দেওয়া হয় নাই। অধ্যাপক শীল মহাশয় বোধ হয় ভারতীয় যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন।

ডিকিন্‌সনও য়্যাণ্ডার্সনের ন্যায় কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রগণ সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। ইহাঁর মতেও ভারতবাসীর উচ্চশিক্ষা ভারতবর্ষেই সম্পন্ন হওয়াই অত্যাবশ্যক। তাহাদের বিদেশে না আসাই ভাল।

অধ্যাপক রাউস সেবার বলিয়াছিলেন, "পুনরায় এখানে আসিলে আমাদের বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-প্রণালী দেখিতে পারিবেন।" কাজেই পার্স বিদ্যালয়ে আজ আবার গেলাম। রাউস্, গ্রীক ও ল্যাটিন নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এদিকে ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ৪ টার পরে বিদ্যালয়ের ছুটী। কাজেই এক ঘণ্টার ভিতর কাজ সারিয়া লইলাম।

এখানকার ভূগোল শিক্ষা-প্রণালী দেখিলাম। নিম্নশ্রেণীতে ইংলণ্ডের ভূতত্ত্ব শিখান হইতেছে। গৃহের প্রাচীরে নানা মানচিত্র ঝোলান রহিয়াছে। গৃহের ভিতরেই একটা ক্ষুদ্র আলমারীতে কতকগুলি ভূগোল গ্রন্থ, শিক্ষা-প্রণালী-বিষয়ক গ্রন্থ ও ভ্রমণকাহিনী। তাহা ছাড়া ম্যাজিক লণ্ঠন, এবং নানাবিধ দর্শনীয় বস্তুও কতকগুলি বাক্সের ভিতর দেখিতে পাইলাম। ছাত্রগণের বয়স ১০।১২ বৎসর মাত্র। প্রায় ৩০ জন এক সঙ্গে বসিয়াছে। ইংলণ্ডের ভূমি ক্রমশঃ নামিয়াছে কি উঠিয়াছে এই নানা যুক্তি প্রদর্শন করা হইল। ছাত্রগণকে ভূতত্ত্ববিষয়ক মানচিত্র দেখান হইল। তাহা ছাড়া কতকগুলি ফসিল প্রস্তর ও অন্যান্য জিনিষ দেখান হইল। মাঝে মাঝে দুই চারিটা প্রশ্ন করাও হইল। পরে শিক্ষক মহাশয় নোট লিখাইয়া দিলেন।

বিদায় লইতেছি এমন সময় শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষা দিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে কতকগুলি ম্যাপ দেওয়া হয়। সেই সকল মানচিত্রের মধ্যে কোনটাতে প্রাকৃতিক বিভাগ বুঝান থাকে, কোনটাতে উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা ও বিবরণ দেওয়া থাকে। কোনটাতে লোকের ধর্ম্ম, সংখ্যা, ভাষা ইত্যাদি বিবৃত থাকে ইত্যাদি। এই মানচিত্রগুলি দেখিতে দেখিতেই ছাত্রেরা নিজে সেই সকল দেশের ভূগোল শিখিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের কাহিনী পাঠ করান হয়। এজন্য ছাত্রেরা বিখ্যাত পর্য্যটকগণের রচনা পড়িয়া থাকে। এই উপায়ে ছাত্রেরা নিজেই ভূগোল শিখিতে অভ্যস্ত হয়। কোন ভূগোলবিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয় না।

এই কথা বলিতে বলিতে ঘণ্টা বাজিয়া গেল। নিম্নশ্রেণীর বালকেরা গৃহ হইতে চলিয়া গেল—উচ্চ শ্রেণীর বয়স্ক ছাত্রেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি বাহির হইয়া আসিলাম। দর্শকগণের গৃহে আসিবার পথে চিত্রাঙ্কন গৃহ পার হইতে হয়। এই গৃহের প্রাচীরেও দেখিলাম লীস্-বিদ্যালয়ের ন্যায় এখানকার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের নাম লিখিত রহিয়াছে। বিলাতের সকল বিদ্যালয়েই এইরূপ ছাত্রগণের আজন্ম সম্বন্ধ রক্ষা করা হইয়া থাকে।

বিলাতী সমাজের বৈচিত্র্য

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসব-সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। অক্সফোর্ডের মত এখানেও আজকাল আমোদ প্রমোদ, বাইচ ক্রীড়া কৌতুক ইত্যাদির ধুম পড়িয়াছে। পরীক্ষা সব শেষ হইয়া গেল। এক সপ্তাহের ভিতরই গ্রীষ্মাবকাশ সুরু হইবে। অধ্যাপকগণের বক্তৃতা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার নমুনা পাওয়া গেল না। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ঘরে যাইয়া আলোচনা করিতেছি মাত্র।

আজ লীস্ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্র লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছে। আজকাল সেই পরীক্ষা এই বিদ্যালয় গৃহেই হইতেছে। একজন প্রবীণ অধ্যাপক পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কেম্ব্রিজে আসিয়াছেন। ইনি এবং আর একজন রমণীও আমার ন্যায় নিমন্ত্রিত। ইহাঁদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে আহারে বসা গেল।

লীস্ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ একজন পাদ্রী। আহারে বসিবার পূর্ব্বে এক সেকেণ্ড কাল সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। ইনি টেবিলের এক কোণে মাথা নত করিয়া ভগবানের নাম করিলেন।

অধ্যক্ষের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-গৃহে কোন উৎসব ছিল কি? রাস্তায় লোকের এত ভিড় দেখিলাম কেন?" বার্বার বলিলেন "আজ রাজকুমার ডিউক অব্ কনটকে অনারারী উপাধি প্রদান করা হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক জমিয়াছিল। কেবলমাত্র কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই ভিড়? তাহা নয়। ষ্টেশন হইতে এক

বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ইংরাজ জাতির রাজভক্তি সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন।

বার্বারের মত প্রাচ্য জাতীয় লোকজন অপেক্ষা ইংরাজেরা রাজভক্ত কম নয়। ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, এখানকার পার্লামেণ্টই জগতের অন্যান্য দেশীয় গণ সভার মাতৃস্থানীয় সত্য। তথাপি এদেশ হইতে রাজভক্তি ও উচ্ছাস এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখানকার লোকেরা রাজা রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির প্রতি নিতান্তই অনুরক্ত। ইংরাজদিগের এই বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া বিদেশীয়েরা বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা প্রজাতন্ত্র শাসনের জন্মদাতা এবং আবিষ্কারক—অথচ আমরাই আবার চূড়ান্ত রাজভক্ত। ডিউক অব্ কনট্ বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কথায় উত্তর দিয়াছেন তাহাও বিচিত্র। রাজকুমার বলিয়াছেন 'সস্তায় ডিগ্রী পাওয়া যায় সত্য—কিন্তু সস্তায় জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। আমি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা লাভ করিলাম বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-রাজ্যে কোন রাজপথ আছে কি ?' কুমারের এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা স্তম্ভিত।"

খাওয়া দাওয়ার পর রমণীদ্বয় বৈঠকখানায় বসিতে গেলেন। আমরা বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। পাদ্রী সাহেব এবং পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ধূমপানে মন দিলেন। খানিকক্ষণ পরে ইংরাজচরিত্র সম্বন্ধে আবার কথা উঠিল। বার্বার বলিলেন "আমাদের সমাজ একবারে দুইবারে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের জীবনযাত্রা কোন সরল সহজ নিয়মে সাধিত হয় না। আমরা নিয়ম কানুন পছন্দই করি না। কোন বাঁধা পথে আমাদের কেহ চলিতে চাহে না। আমাদের মধ্যে অসংখ্য মতভেদ, প্রণালী ভেদ, এবং নানা বৈচিত্র্য, জটিলতা ও পরস্পর বিরোধভাব বর্ত্তমান। এক এক জেলায় আমাদের এক এক নিয়ম।

ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় চালাইয়া থাকি। হয়ত এক স্থানে আমরা যে নিয়মে কাজ করিতেছি অপর স্থানে ঠিক তাহার বিপরীত নিয়মেও কাজ করিয়া থাকি।"

আমি বলিলাম "বৈজ্‌হট্ আপনাদের শাসন-প্রণালীকে এইরূপ বৈচিত্র্যময়, জটিলতাপূর্ণ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ লক্ষণশীল ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। পুরাতন ক্রমবিকাশ জাতি মাত্রেরই এই অবস্থা। আমাদের হিন্দু সমাজও ঠিক সেইরূপ নানা বৈচিত্র্যের আধার। যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতে করিতে এই সমাজ আজকাল একটা বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। কোন এক নিয়ম বা সূত্র আওড়াইয়া এই সমাজের বিরাট জীবন স্পন্দন বুঝান অসম্ভব। কিন্তু শিশু জাতিসমূহের কার্য্যকলাপে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, নিয়মাধীনতা বেশী দেখা যায়। তাহারা কাটিয়া ছাঁটিয়া অসামঞ্জস্যসমূহ ও বৈপরীত্যগুলি দূরীভূত করিতে সমর্থ এবং সচেষ্ট।"

বহুকালের বিকাশফলে কত বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়, এই সম্বন্ধে কথা চলিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অথচ পুরাতন অবস্থা চলিয়া গেলেও অনুষ্ঠান-গুলি লুপ্ত হয় না। নূতন নূতন ভাব এবং কর্ম্মশক্তির আবেষ্টনেও পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি থাকিয়া যায়। ইংরাজ জাতির শাসন প্রণালীতে এবং হিন্দুর সামাজিক জীবনে তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বার্বার বলিলেন, "আপনারা আমাদের 'পাব্লিক স্কুল' 'গ্রামার স্কুল' 'কাউণ্টি স্কুল' ইত্যাদি শব্দে কি বুঝেন জানি না। আমরা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। তাহা না জানিলে

কেবলমাত্র নাম শুনিয়া ইহাদের কার্য্যপ্রণালী বা আদর্শ বুঝান বড় কঠিন। এক নামে নানা প্রকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চলিতেছে! কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা ঠিক এইরূপ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের নিয়ম মানিয়া চলিতে পারি না। সেখানে আমরা যথাসম্ভব এক আদর্শে সকল বিদ্যালয় চালাইতে চেষ্টা করি। আপনাদের জেলা-শাসকেরা ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। অথচ স্বদেশে তাঁহারা সকলেই স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য এবং বিভিন্নতার পৃষ্ঠপোষক।”

রসায়ন-মন্দির

সেদিন য্যাণ্ডার্সন সাহেব কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের রসায়নাধ্যাপক পোপ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আজ রাসায়নিক বিজ্ঞানালয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। ইনি আমাদের বাঙ্গালোরের টেক্‌নিক্যাল ও বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সংবাদ রাখেন দেখিতে পাইলাম। সেখানে ভাল কাজ হইতেছে না একথাও ইনি শুনিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্রের কথাও ইনি বলিলেন।

ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে কিছু কথা হইল। পরে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া ইনি ল্যাবরেটরীর সকল গৃহ ও সরঞ্জাম দেখাইলেন। ইনি বহু বড় রাসায়নিক ল্যাবরেটরির পক্ষপাতী নন। বিজ্ঞানজগতে আজকাল প্রতিবৎসর নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র পুরাতন প্রথাগুলি বর্জ্জন আবশ্যক হইয়া পড়ে। খুব বেশী খরচ পত্র করিয়া বিজ্ঞানালয় প্রস্তুত করিলে লাভ নাই। কারণ অল্পকালের ভিতর সেগুলির প্রয়োজনীয়তা কমিয়া আসে। ফলতঃ অপব্যয়ের সীমা থাকে না। এজন্য ছোট ছোট রাসায়নিক পরীক্ষা-গৃহ প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য।

কেম্ব্রিজের রসায়ন-গৃহে আজকাল সর্ব্বসমেত ৭০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। এক সঙ্গে ২০০ জন ছাত্র ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে পারে। বিজ্ঞানগৃহ প্রস্তুত করিতে ৯০০,০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল এবং মোটের উপর ৩০০,০০০৲ টাকার মালমসলা উপকরণ ইত্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে। ছোট বড় ৮।১০টা বক্তৃতাগৃহ দেখিলাম। সর্ব্ব-বৃহৎ

গৃহে ২০০ ছাত্র বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে পারে। মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য ছোট ছোট কতকগুলি পরীক্ষাগৃহও আছে। আজকাল ৩০ জন উপাধিধারী ছাত্র স্বাধীন গবেষণা করিতেছেন। ইহাঁদের অনেকেই বার্ষিক ২৫০০ টাকা বৃত্তি পান। উচ্চতমবিভাগে ভারতীয় ছাত্র এক-জনও নাই।

অধ্যাপক পোপের সঙ্গে ২০ জন ছোট বড় অধ্যাপক এই বিদ্যা-লয়ে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক সহকারীও আছেন।

অধ্যাপক হ্যাডন ও সামাজিক তথ্যসংগ্রহ

কেম্ব্রিজে সম্প্রতি নৃতত্ত্ব-বিদ্যার উপাধি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানকার অধ্যাপক হ্যাডন এবং অধ্যাপক রিভার্স বিলাতের নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশকালে পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া থাকেন। অক্সফোর্ডে দেখিয়াছি ম্যারেট অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এখানে রিভার্স ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। হ্যাডনও শীঘ্রই নিউগিনী, বোর্নিও ইত্যাদি দেশে যাইবেন।

রিভার্স ভারতের টোডাজাতি সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হ্যাডন কখনও ভারতবর্ষে যান নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহার গ্রন্থাগারে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়ের মুণ্ডা-জাতির বিবরণ দেখিলাম।

হ্যাডন বলিলেন "অশিক্ষিত এবং অসভ্য জাতিসমূহ শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতার আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। ইহারা খৃষ্টান প্রচারকগণের কার্য্যফলে সভ্যজাতিপুঞ্জের চালচলন শিখিতেছে। প্রকৃত অসভ্য জাতি আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। শিক্ষা ও সভ্যতার কোন সংস্পর্শে না আসিয়া মানবজাতি কিরূপ অবস্থায় জীবনযাপন করে তাহা বুঝিবার সুযোগ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিল। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভাবে অসভ্যমণ্ডলে সভ্যতার প্রভাব

ছড়াইয়া যাইতেছে। কাজেই নৃতত্ত্ব-ব্যবসায়ীদিগের আলোচনার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় আমাদিগের সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। এখন যদি আমরা দেশবিদেশে অভিযান না পাঠাই তাহা হইলে অসভ্য অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতির বৃত্তান্ত আর পাইব না। অনতি-দূর ভবিষ্যতে খাঁটি বর্ব্বর সমাজ একটাও থাকিবে কিনা সন্দেহ। অসভ্যেরা যে পরিমাণে সভ্য হইতেছে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা-কারী পণ্ডিতগণের কর্ম্মক্ষেত্র ততই অসুবিধাজনক এবং কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই কারণে আমরা যে যেখানে আছি সকলেই বনজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ খুঁজিয়া লইতেছি। আজকালকার সুযোগ-গুলি ব্যবহার না করিলে সমাজ-বিজ্ঞানের যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।

নৃতত্ত্ববিষয়ক তথ্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। হ্যাডন বলিলেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংগ্রাহকেরা এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন না। যে যাহা শুনিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন। কোন একজাতির মধ্যে বেশীদিন বাস করিতে তাঁহারা চেষ্টিত হইতেন না। অল্প সময়ের ভিতর অনেকগুলি জাতির বাহ্য আচার বা আকার দেখিয়া তাঁহারা বড় শীঘ্র কোন একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা এক্ষণে এই আলোচনা-প্রণালীর বিরোধী। অধ্যাপক রিভার্স এবং আমি নিজে তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। এমন কি, বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সাধারণ সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই এইরূপ আমাদের মত। আমরা বিস্তীর্ণক্ষেত্রের আলোচনা ইচ্ছা করি না। কোন এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমাদের পর্য্যবেক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া থাকি। সেই গণ্ডীর ভিতরকার এবং সকলের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্ম এবং তাহাদের ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য যত্ন লইয়া থাকি। সেই

ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য বুঝিতে যাইয়া তাহাদের জীবনগঠন ও সমাজচিত্র সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি সাধারণ নিয়মও আবিষ্কার করিতে পারি। কিন্তু এগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত না করিয়া অন্যান্য জাতির কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচ্য জাতির তুলনাসাধনে প্রবৃত্ত হই না।"

হ্যাডনের মতে, অনেক সময়ে একপ্রকার রীতি দুই সমাজে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মূলমন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে তুলনা করিলে ভুল হইবে মাত্র। ভাসা ভাসা সাম্য নিরীক্ষণ করিয়া নিয়ম প্রচার করিতে গেলে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে না। অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নৃতত্ত্ববিদেরা এই সকল ভাসা ভাসা সাম্যগুলিই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সেইগুলি হইতে "সামান্য ধর্ম্ম" প্রচার করিতে যত্নবান্ হইতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা গভীরভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণই করিতেন না। ফলতঃ, তাঁহাদের গ্রন্থগুলি এক্ষণে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। তাঁহাদের বর্ণনার উপর নির্ভর করা একেবারেই চলে না। তাঁহারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি সত্য কি না তাহা এক্ষণে পরীক্ষা না করিয়া কোন পণ্ডিত গ্রহণ করিতে পারেন না। বাস্তবিক পক্ষে, এক্ষণে নূতন করিয়া সেই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে।

সম্প্রতি ফ্রেজার একখানা বিরাট গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার চির-জীবনের অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম The Golden Bough. ইহা নৃতত্ত্ববিষয়ক বিশ্বকোষস্বরূপ। কিন্তু হ্যাডন বলিলেন, "ফ্রেজারকে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংগৃহীত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ফলে গ্রন্থে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে।" আজকাল সতর্কতার সহিত বহু তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। তাহার ফলে ফ্রেজারের বিরাট গ্রন্থে সন্নিবেশিত মতসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে।"

হ্যাডন অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দিলেন। প্রথমযুগের নৃতত্ত্ববিদেরা অষ্ট্রেলিয়ার প্রদেশসমূহে একই প্রকার ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-জীবন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজকালকার নূতন পর্য্যবেক্ষণে বুঝা যাইতেছে অষ্ট্রেলিয়ায় বৈচিত্র্য বড় কম নাই। অষ্ট্রেলিয়ার জনগণের বসতিও একবারে বা দুইবারে সম্পূর্ণ হয় নাই। নানাকালে নানাস্থান হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় জনসমাগম হইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিবেচনা করেন যে, জগতের সকল জাতিই কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে?" ইনি বলিলেন, "না, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ক্রমবিকাশ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে সাধিত হইতেছে। কোন একজাতি অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ নিয়মে বিকাশ লাভ করিতেছে দেখিয়া তাহাকে সেই সমুদয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। ক্রমবিকাশের রীতি দেশকাল ভেদে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রীতির পার্থক্য কোন দিনেই সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে না। জাতিপুঞ্জের ক্রমবিকাশের ধারায় চিরকালই আমরা বৈচিত্র্য দেখিতে পাইব। ইহার মধ্যে কোন একটি রীতিকে আদর্শ বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। কোন একটি প্রণালীকে অন্যান্য জাতির মাপকাঠি বিবেচনা করিলে অন্যায় হইবে। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র উপায়ে স্বতন্ত্র মাপকাঠিতে পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে সকল সমাজকে সাধারণতঃ অসভ্য বা বর্ব্বর বলা হয় তাহারা সত্য সত্যই অনেক সময়ে বর্ব্বর নয়। তাহাদের মধ্যে সভ্যতা, মনুষ্যত্ব, ধর্ম্মজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা হয়ত প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান। কিন্তু লোকেরা নিজেদের পরিচিত মাপকাঠি এবং আদর্শের হিসাবে অন্যান্য জাতিকে বুঝিতে যাইয়া কাহাকেও অসভ্য কাহাকেও বা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

যাহাদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলা হইতেছে তাহারা যে আজকালকার তথাকথিত সভ্যজাতিসমূহের ন্যায়ই গড়িয়া উঠিবে একথা কে বলিতে পারে? মনে করুন, ইউরোপীয় সভ্যতা বিগত ২৫০০ বৎসরে নানা ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির সমাবেশে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই আকারের ক্রমবিকাশের পথে বিচিত্র অবস্থা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই সকল অবস্থা কি অন্যান্য স্থানের জনসমাজের পক্ষেও খাটিবে তাহা নয়। অন্যান্য জনপদের নরনারীগণ বিভিন্ন আবেষ্টনের ভিতর বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিতেছে। তাহাদের ক্রমবিকাশের কোন কোন অধ্যায়ের দুই একটা ঘটনা হয় ত ইউরোপীয় ক্রমবিকাশের কোন কোন অধ্যায়ের দুই একটা ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া দুইএর ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে কোন এক সূত্র বা একই ধারা দেখিতে গেলে মহাভ্রান্তিতে পতিত হইতে হইবে। ভাসা ভাসা সাম্য দেখিয়া দুই জনসমাজের জীবনযাত্রার ছাঁচকে একরূপ বিবেচনা করা কদাচ বিজ্ঞানসম্মত নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার লিখিত দুইটা প্রবন্ধ পাঠ করিতে দিলেন। একটীর নাম "The Soul of the Red Indian." এই প্রবন্ধে হ্যাডন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমেরিকার লোহিতজাতির হৃদয়-কথা বুঝিতে প্রয়াসী হইলে জানা যাইবে যে, তাহারা নিতান্তই ধর্ম্মহীন ও দুশ্চরিত্র জাতি নয়। তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম না পাইয়াও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মাত্মা। সুতরাং জোর করিয়া তাহাদের উপর একটা নূতন ধর্ম্ম চাপাইবার প্রয়োজন নাই। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া কর্ম্ম করেন। তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম "Ethics among Primitive Peoples."

এই প্রবন্ধেও হ্যাডন তাঁহার প্রিয় মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তথা-কথিত অসভ্য জাতিকে নীতিহীন বিবেচনা করা বিজ্ঞানসম্মত নয়—এই প্রবন্ধের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাদিগকে খ্রীষ্টানগণের পরিচিত মাপকাঠিতে বিচার করা অন্যায়। হ্যাডন বলেন "In attempting to understand the laws which govern the conduct of primitive peoples, western standard of morality must be entirely set aside, lest one fall into error of past generation who proclaimed the savage to be an immoral or even unmoral being."

হ্যাডন বলেন, "এমন কি শিশুহত্যার প্রথাও নিতান্ত বর্ব্বরতা বা অমানুষিকতার পরিচয় নয়। আমাদের পরিচিত ইউরোপীয় বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ সমাজে হয়ত ইহা নিতান্তই ঘৃণ্য। তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি; কিন্তু জগতের বহুস্থান পড়িয়া রহিয়াছে যেগুলি এখনও এখানকার মত রাষ্ট্রাধীন হইতে পারে নাই। সে সকল স্থানে খাদ্যাভাব যথেষ্ট—লোকেরাও জীবনসংগ্রমে অস্থির। সেই সমাজে শিশুহত্যা প্রথা কি নিতান্তই অন্যায়? বরং তাহাদের বিচারে উহাই দয়াদাক্ষিণ্যের সাক্ষী।

সেইরূপ লিঙ্গপূজার কথাও ধরা যাউক। ইহা কি সত্য সত্যই বীভৎস? মনে করুন, কোন জাতির মধ্যে ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। তাহারা ইঙ্গিতে আকারে মনোভাব প্রকাশ করে। অথবা বর্ণমালার পরিবর্ত্তে চিত্রাদির সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহে। তাহারা সৃষ্টি-কর্ত্তা সৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য যে চিত্র আঁকিবে তাহাকে নীতিহীনতার বা অশ্লীলতার পরিচয়স্বরূপ গ্রহণ করিব কেন? আমরা সাহিত্যে যাহাকে 'সৃষ্টিশক্তি' বলি তাহার চিত্র অঁকিয়া তাহাই বুঝাই-তেছে মাত্র। আজ আমরা সাহিত্যের অধিকারী হইয়া চিত্র-

ভাষা বর্জ্জন করিয়াছি বলিয়াই কি চরিত্র হিসাবে উন্নত হইয়া পড়িলাম?”

তাহার পর নিগ্রোজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা উঠিল। হ্যাডন বলেন, “এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু বলিয়া ফেলা কঠিন। আজকাল সকলেই নিগ্রোবীর বুকার ওয়াশিংটনের দৃষ্টান্ত দেন।* বুকারের ন্যায় আরও কয়েকজন মনস্বী নিগ্রো আছেন সত্য; কিন্তু ইঁহাদের ভিতর নিগ্রোরক্ত বেশী কি সভ্য খ্রীষ্টানের রক্ত বেশী তাহা বিচার করা অসম্ভব। কাজেই আজকালকার নিগ্রো জননায়কগণকে দেখিয়া খাঁটি নিগ্রো সমাজের ভবিষ্যৎ বিচার করা বিজ্ঞানসম্মত কি না সন্দেহ।”

তিন বৎসর হইল, লণ্ডনে বিশ্বমানবপরিষদের সভা আহুত হইয়াছিল। তাহাতে হ্যাডন একজন ধুরন্ধর ছিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, “দুইজন চারিজন শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতাঙ্গ ও পীতাঙ্গ লোকের আলাপ পরিচয়ে কি জাতিগত প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে? জগতের প্রত্যেক জাতিই অপরাপর জাতিকে ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে। জাতিমাত্রেরই এই স্বভাব। বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গেরা বড়ই অহঙ্কারী অন্য রংয়ের লোকজনকে ইহারা মানুষের মধ্যে গণ্য করিতে চাহে না। এই স্বাভাবিক বিরোধ ও বিদ্বেষের আবহাওয়া কাটাইয়া উঠা কি সম্ভবপর? তবে এইরূপ সভাসম্মিলনে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুবিধা সৃষ্ট হয়। আমি অন্ততঃ এই কারণে এইরূপ বিশ্বমানবপরিষদের সম্মিলন পছন্দ করি।”

চলিয়া আসিতেছি এমন সময়ে ইনি একখানা স্বপ্রণীত গ্রন্থ উপহার দিলেন এবং একদিন নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে একজন নৃতত্ত্ববিৎ তথ্য সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইবে। হ্যাডন বলিয়া দিলেন, “কলেজে ভোজ বটে, কিন্তু নৈশ পোষাক আপনার না থাকিলেও আপত্তি নাই।”

শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিবেচনা করেন যে ইউরোপে প্রাচ্য সভ্যতার একটা তরঙ্গ আসিয়াছে ?" ইনি বলিলেন, "মোটেই না। আজকাল কোন কোন লেখক বা শিল্পী প্রাচ্য জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন বটে। প্রাচ্যের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের কোন অঙ্গই গঠিত বা পরিবর্ত্তিত বা কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিতও হয় না। আমাদের সমাজজীবনের উপর নূতন আদর্শের প্রভাব বিস্তার অতিশয় দুঃসাধ্য।"

ভারতীয় ইতিহাসের স্বদেশী ও বিদেশী উদ্ধারকর্ত্তা

অধ্যাপক র‍্যাপসন্ কেম্ব্রিজে ভারতীয় বিদ্যার ধুরন্ধর। ইনি এখানকার সংস্কৃত শিক্ষক। সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পাদনের ভার ইঁহার উপর পড়িয়াছে ইঁহার গৃহে যাইয়া দেখি চারিদিকে ভারতবর্ষ-বিষয়ক গ্রন্থ। ইনি সংকলিত ইতিহাস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রুফ ইত্যাদি দেখিতেছেন।

র‍্যাপসন্ বলিলেন, "আমি বড়ই ব্যস্ত আছি। ঐ দেখুন এক বাক্স-ভরা প্রুফ। বারজন লোকে মিলিয়া গ্রন্থ লেখা হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে মতের অমিল অনেকের আছে। এ গুলির ভিতর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আমাকে গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গ্যালি প্রুফগুলি দেখিতে পারি কি ?" ইনি বলিলেন, "মাপ করিবেন। এখনও পুরাপুরি সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই। এ অবস্থায় দেখান অসম্ভব।"

যাহা হউক, ইনি একখানা স্বপ্রণীত গ্রন্থ উপহার দিলেন। এই পুস্তক পাঠ করিলেই ইঁহার ভারত-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বুঝা যায়। সঙ্কলিত গ্রন্থে যে সকল মত প্রচার করিবেন তাহার আভাস এই গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। অক্সফোর্ডে ভিন্সেণ্ট স্মিথের গৃহে র‍্যাপসনের Ancient India দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম নিজের আবিষ্কৃত নূতন কোন তথ্য ইহাতে নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা ও রাষ্ট্র ইত্যাদি

সম্বন্ধে তাঁহার মত ও ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্যই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ এক দেশ নয়। ভারতীয় সমাজের ঐক্য ও সামঞ্জস্য নাই, হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ শক্তিশালী নয়—ইত্যাদি তত্ত্ব এই গ্রন্থের সার কথা।

সেদিন ডিকিন্সন এশিয়া সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন র‍্যাপ্সনের এই গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেই কথাই দেখিতে পাইতেছি। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের সঙ্গে আলাপ করিলে বুঝা যায় যে ইহাঁরা প্রথম হইতেই এশিয়ার জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে একটা মত স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কতকগুলি সিদ্ধান্ত ইহাঁরা সপ্রমাণ করিবেন এই ভাবিয়াই ইহাঁরা প্রাচ্য সভ্যতার বিশ্লেষণে নিযুক্ত। অথচ ইহাঁরাই আবার আমাদের স্বদেশী ঐতিহাসিকগণের উপর যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক ইত্যাদি দোষ আরোপ করেন!

অক্সফোর্ডের পার্জ্জিটার এবং এখানে র‍্যাপ্সন দুইজনেই বলেন "ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চ্চা আরব্ধ হইতেছে। কাজও মন্দ হয় নাই দেখিতেছি। কিন্তু প্রায় সবই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। স্বদেশকে জোর করিয়া বড় প্রমাণিত করা আজকালকার ভারতীয় লোকদের স্বভাব হইয়া পড়িতেছে!"

প্রাচীন ভারতের গৌরবসূচক কোন তথ্য প্রচার করিলেই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশিত হয়! যে সকল ঘটনার দ্বারা ভারতবাসীর অপদার্থতা, অকর্ম্মণ্যতা, চরিত্রহীনতা, রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতা ইত্যাদি প্রমাণিত হয় সেগুলির বিবরণ বেশী দিতে পারিলেই এখানকার ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে ভারতীয় লেখকেরা বাস্তবিকই পক্ষপাতদোষহীন। আমাদের যে সকল লেখক কতকগুলি নানা প্রকার তথ্য ও সংবাদ মাত্র প্রদান করেন; ইহাঁরা তাঁহাদিগকে আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই তথ্যগুলি কোন জাতীয় জীবনগঠনের উপকরণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গেলেই

তাঁহাদের রচনা বিলাতী পণ্ডিতগণের অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। অথবা আমাদের যে সকল লেখক প্রাচীন ভারতীয় জনগণের সংসারে অস্পৃহা এবং কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রচার করিয়া হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতার সাক্ষ্য দেন তাঁহাদের প্রতিও এই সকল পণ্ডিতেরা বড় সন্তুষ্ট। কিন্তু কর্ম্ম-জগতে ভারতবাসীর প্রভাব ছিল এরূপ কোন তথ্য প্রচারিত হইলেই লেখক ইঁহাদের মতে অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন স্থিরীকৃত হন!

বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতবাসীদিগের দ্বারাই নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। আজকাল নূতন নূতন ঐতিহাসিক দেশে দেখা দিয়াছেন। তাঁহাদের ইতিহাসচর্চ্চাই আমাদের স্বদেশীয় ইতিহাস রচনার ভিত্তি স্থাপন করিবে। এই 'জাতীয়' প্রয়াস বিলাতী প্রয়াস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতে থাকিবে। বিলাতী ভারতেতিহাস অবশ্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশীয় লোকের ইতিহাসালোচনাই জাতীয় চরিত্র গঠিত করিবে।

যেরূপ দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের ইতিহাস এখন হইতে দুই ধরণে লেখা হইবে। বিলাতী লেখকগণের রচনায় একপ্রকার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে—স্বদেশী লেখকগণের রচনায় অন্য প্রকার ব্যাখ্যা প্রচারিত হইবে। বিলাতীরা স্বদেশীয় লেখকগণের রচনা হইতে প্রায়ই কোন প্রমাণ গ্রহণ করিবেন না। ইঁহারা এখনও গ্রহণ করেন না। স্বদেশীয় লেখক-গণ বিদেশীয় গ্রন্থকার হইতে প্রমাণ গ্রহণত করিবেনই না, করিলেও ব্যাখ্যা স্বাধীনভাবে করিবেন। প্রধানতঃ বিদেশীয়দিগের ভুল সিদ্ধান্ত-গুলি খণ্ডন করাই ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের কর্ত্তব্য হইবে।

এখানকার একজন চিকিৎসাধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল। কাল ইঁহার সঙ্গে এক গাড়ীতে লণ্ডন হইতে আসিয়াছি। ইঁহার নাম উডহেড্। ইনি ইংলণ্ডের হাসপাতালাদি পরিদর্শন কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন।

ইঁহার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণবিজ্ঞান, কৃষি, ভ্রূণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক ল্যাবরেটরীগুলি দেখিতে পাইলাম। এ সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রগণকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রি দিবার নিয়ম নাই। কিন্তু ইহারা ডিপ্লোমা পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় উপাধিধারী গ্র্যাজুয়েট এই সকল বিভাগে মৌলিক অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০ ছাত্র আছে শুনিলাম।

ল্যাবরেটরীগুলির ভিতর যাইয়া দেখি দেশের অর্থ ও স্বাস্থ্য পুষ্ট করিবার জন্যই এই সকল বিদ্যার প্রচার হইতেছে। অধ্যাপক, ছাত্র সকলেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতেছেন। পুঁথিগত বিদ্যা পুঁথিতেই পর্য্যবসিত হইতে পায় না। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে কৃষকেরা বীজ শস্য ইত্যাদি এই সকল পরীক্ষাগারে পাঠাইয়া থাকে। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা বিনা পয়সায় সেইগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য বলিয়া দেন। তদনুসারে ব্যবসায়ীরা কর্ম্ম করেন। জেলাগুলির মধ্যে যতপ্রকার মৃত্তিকা আছে তাহাদের রাসায়নিক পরীক্ষা হইয়া রহিয়াছে। সেই পরীক্ষার ফল অনুসারে কৃষি-কর্ম্ম চালাইবার জন্য চাষীদিগকে যথাবিধি পরামর্শ দেওয়া হয়।

কেম্ব্রিজে কৃষিশিক্ষা হয় তাহাই জানিতাম না। এখন দেখিলাম কেবল কৃষিশিক্ষা নয় কৃষিকর্ম্মে সাহায্য করাই বিশ্ববিদ্যালয়েব অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃষিজীবী-সমাজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয় স্বকীয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন।

. সন্ধ্যাকালে দর্শনাধ্যাপক ম্যাক টাগার্টের সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তিন মাস মাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস বা দর্শন সম্বন্ধে ইনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। ইনি বলিলেন,— "বিলাতের লোকেরা দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। .এজন্য এখানকার

দর্শনবিভাগে বেশী টাকা পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের আলোচনা ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতেই পায় না। টাকার অভাবে দর্শন-বিষয়ক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ও এখানে আলোচিত হয় না।”

জীব-তত্ত্ব ও কৃষি-বিজ্ঞান

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগদ্বয়ে সবিশেষ উন্নত। এই হিসাবে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের নিকট হতপ্রভ। অক্সফোর্ডে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির চর্চ্চাই অধিক হইয়া থাকে।

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিও বোধ হয় কিছু স্বতন্ত্র। কেম্ব্রিজের অধ্যাপকেরা আলোচ্য ক্ষেত্রের গণ্ডী অতিশয় সঙ্কুচিত করিয়া লইতে ভালবাসেন। সকল আলোচনায়ই এখানে গণিতের মাপ জোক লাগান হয়। অধ্যাপক মার্শ্যানের ধনবিজ্ঞানে গণিতের প্রভাব যথেষ্ট পাইয়াছি। অক্সফোর্ডের পণ্ডিতেরা আলোচ্য ক্ষেত্রের বিস্তার সাধন করিয়া বড় বড় সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী। অক্সফোর্ড সৃষ্টি করে, কেম্ব্রিজ সৃষ্ট বস্তুগুলিকে প্রণালীবদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত করে। অক্সফোর্ড ভাবুকতার প্রস্রবণ, নব নব চিন্তাশক্তি ও নূতন নূতন তত্ত্বের প্রবর্ত্তক। কেম্ব্রিজ ভাবসমূহের আকার প্রদান করে, এইগুলিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলে।

অক্সফোর্ডের অধ্যাপকেরা স্বাধীন চিন্তার আদর বেশী করেন। তাঁহারা অন্যের মতগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টিত থাকেন না। কিন্তু কেম্ব্রিজওয়ালারা ভাল ভাল পাঠ্যপুস্তক ও টেক্সটবুক প্রণয়ন করেন। কেম্ব্রিজে নানাপ্রকার ভাষ্য, সঙ্কলন, বিশ্বকোষ ও ইতিহাস গ্রন্থ বাহির হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেম্ব্রিজ হইতেই বাহির হইতেছে।

কাল কেম্ব্রিজের কতকগুলি বিজ্ঞানশালা ও ল্যাবরেটরী দেখিয়াছি। দেশের সকল প্রকার অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক, ছাত্র

ও গবেষণাকারী ব্যক্তিগণ কৃষিবিভাগে, স্বাস্থ্যবিভাগে, রসায়নবিভাগে ও জীব বিভাগে কি কি কার্য্য করিতেছেন তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সহরের ভিতর পরীক্ষাগারগুলিকে বিশেষরূপে বিস্তৃত করিবার যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায় নাই। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সহরের বাহিরে এই সকল ল্যাবরেটরীর জের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আজ সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে এই জেরগুলি দেখিতে গেলাম।

সহরের সীমা পার হইয়া আবাদ ভূমির ভিতর আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানের একটা বাগানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সমগ্র উদ্যানটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। পাঁচ বৎসর হইতে এই বাগানের কার্য্য চলিতেছে। তিন চারি বিভাগের ল্যাবরেটরী এখানে আছে। রোগতত্ত্ব, প্রাণ-বিজ্ঞান, পশুচিকিৎসা ইত্যাদি জীবজন্তু বিষয়ক পরীক্ষাই প্রধাণতঃ হইয়া থাকে। এই সকল বিভাগে কর্ত্তা সহরের ল্যাবরেটরীগুলির কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। সহরের কর্ত্তারাই এই সমুদয়ের তত্ত্বাবধান করেন। খরচপত্র প্রত্যেক বিভাগ হইতে নিষ্পন্ন হয়।

কৃষিকর্ম্মে যতপ্রকার পশুঘটিত কার্য্য হয় সেই সকল কার্য্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য এই উদ্যান ল্যাবরেটরীর সৃষ্টি। গো, মহিষ, ঘোড়া, শূকর, ছাগল, কুকুর, মেষ, বানর, খরগোশ ইত্যাদি নানাজাতীয় জন্তু এখানে রক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, বিকাশ, খাদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, রোগ, আরোগ্য ইত্যাদি সকল প্রকার তথ্য সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করা হয়। কত পরিমাণ ও কোন প্রকার খাদ্যে শরীরের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং মূত্র বিষ্ঠার গুণ পরিবর্ত্তিত হয় এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। খাসী করা জন্তুর আকৃতি সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রীত করা হয়। এই সকল

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য নানাপ্রকার গৃহ, পশুশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাসায়নিক ল্যাবরেটরীও প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেইখানে খাদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, দুগ্ধ, লালা ইত্যাদির গুণ বিচার করা হয়।

পশুদিগের রোগপরীক্ষার জন্যও কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলাম। যক্ষ্মারোগে ফুস্‌ফুস্, অণ্ডকোষ ইত্যাদির আকৃতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যক্ষ্মারোগের প্রভাব কোন্ কোন্ জন্তুর উপর কিরূপ হয় তাহারও বিচার করা হয়। এজন্য কোন কোন জন্তুর ভিতর যক্ষ্মা রোগের বীজ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন জন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেবল বাহ্য অবস্থাই পরি-বর্ত্তিত হয়, তাহা নহে। অন্তরাকৃতিও যথেষ্ট বদলাইয়া যায়।

যক্ষ্মারোগে জীবশরীরের ভিতরকার অঙ্গগুলি কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটা বিশেষ রাসায়নিক গৃহ আছে। এই গৃহে কয়েকজন অধ্যাপক সর্ব্বদা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তাঁহারা যক্ষ্মার বীজগুলি পাত্রে পুষিয়া রাখিয়াছেন। গো-যক্ষ্মার বীজ ও মানব যক্ষ্মার বীজ দুই প্রকার বীজই রক্ষিত হইয়াছে। এই বীজগুলি ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিলে কিরূপ দেখায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কেবল তাহাই নহে। কতকগুলি রঙ্গিন চিত্রের সাহায্যে এই যক্ষ্মাবীজের ক্রমিক বিস্তারও সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।

এই উদ্যান-ল্যাবরেটরীতে যে সকল জিনিষ দেখিলাম পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এখানকার কর্ত্তারা বলিলেন বিলাতে এই বিষয়ক পরীক্ষালয় বেশী নাই। যতগুলি আছে তাহাদের মধ্যে কেম্ব্রিজের এই স্থান সর্ব্ববৃহতের মধ্যে অন্যতম।

কৃষিকর্ম্মের আনুষঙ্গিক জীবতত্ত্ববিষয়ক পরীক্ষা-গৃহ দেখিবার পর খাঁটী কৃষিকর্ম্ম দেখিবার জন্য দুই তিন মাইল দূরে আসিলাম। এখানে

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিভূমি। অক্সফোর্ডে দেখিয়াছি কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন হইতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোন আবাদ বা কৃষিক্ষেত্র বা পশুশালা নাই। কেম্ব্রিজে কৃষিশিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুব্যবস্থাই করা হইয়াছে। অক্সফোর্ডের কৃষিছাত্রেরা রাসায়নিক পরীক্ষা মাত্র শিক্ষা করে। চাষ দেখিবার জন্য তাহাদিগকে সমীপবর্ত্তী কৃষকগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া লইতে হয়। কিন্তু কেম্ব্রিজে ল্যাবরেটরী ইত্যাদি ত আছেই। সেখানে ছাত্রেরা শিক্ষা করে, এবং দেশের কৃষক-সম্প্রদায়কে মৃত্তিকা, বীজ, শস্য, সার ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিনামূল্যে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করা হয়। অধিকন্তু সহরের বাহিরে দুই স্থানে দুই প্রকার পরীক্ষা আছে। প্রথম পরীক্ষালয় জীবজন্তু বিষয়ক, দ্বিতীয়টি উদ্ভিদ সম্বন্ধীয়।

এই দ্বিতীয় পরীক্ষাস্থলে প্রায় ৭৫০ বিঘা জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। এখানে কৃষিবিষয়ক উন্নতিবিধানের জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা হয়। বিলাতের চাষীরা একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় একফুট গভীরভাবে জমি চাষ করিত। পরে রাসায়নিক সার প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এজন্য তাহারা অল্প গভীরভাবে চাষ সুরু করে। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে সার প্রয়োগ করিলেই জমির উর্ব্বরাশক্তি যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়ান যায় না। সুতরাং পুনরায় গভীর চাষ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। গভীর চাষ ও অগভীর চাষের প্রভেদ এবং দুইপ্রকার কর্ষণের ফল দেখাইবার জন্য কয়েক বিঘা জমি এইখানে রক্ষিত হইয়াছে। শুনিলাম এই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে বিলাতের নানা স্থান হইতে প্রায় ১০০০ কৃষক এই আবাদ দেখিতে আসিবে। তাহাদিগকে দেখাইয়া বুঝাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক নিযুক্ত আছে।

সারের উপকারিতাও এই স্থানে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পাশাপাশি

দুই টুকরা ভূমিতে একটাতে সার দেওয়া হয়, অপরটিতে কোন প্রকার সার দেওয়া হয় না। তার পর দুইটিতেই সমভাবে বীজবপনাদি করা হয়। ফলের তারতম্য দেখিয়া অবশেষে সারের উপকারিতা বুঝা যায়। আমি প্রদর্শক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "এরূপ সামান্য পরীক্ষা কি কৃষকেরা নিজেই করিয়া লইতে পারে না?" ইনি উত্তর করিলেন, "কৃষকেরা না হয় দুইটা একটা পরীক্ষা করিল। আমরা যে একসঙ্গে বহুস্থলে পরীক্ষা করিতেছি! এতদ্ব্যতীত কৃষকেরা পরীক্ষার ফল বুঝিবার জন্য বেশীকাল অপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদা লাভালাভ এবং অন্নবস্ত্রের কথা ভাবিতে বাধ্য। কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় অন্নবস্ত্রের চিন্তা করিতে বাধ্য হই না। নিরুদ্বেগে ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া আমরা নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছি—নানাপ্রকাব ফলের তুলনা সাধন করিতেছি। ক্রমশঃ একটা বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতেছে।"

এই সঙ্গে মেণ্ডেলিজ্‌ম্‌-তত্ত্বের কথা উঠিল। প্রদর্শক বলিলেন "এই স্থানে দো-আঁশলা পশু ও উদ্ভিদের প্রকৃতি ও আকৃতি পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। সকলে জানেন যে, রক্ত সংমিশ্রণে ও বীজ সংমিশ্রণে এবং 'কলম' করা জীবিত বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সাধনের কোন নিয়ম বা সূত্র আছে কি না তাহা পরীক্ষা করা কি দুএক বৎসর বা দুএক জনের কার্য্য? এজন্য বহু জীবজন্তুর প্রয়োজন, বহু বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন। আমরা ইতিমধ্যে গোধূম সম্বন্ধে কিছু ফল পাইয়াছি। মেষ সম্বন্ধে দেখিয়াছি যে, ইহাদের শিংগুলি ছোট ও লুপ্ত হইয়া যায় কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না তাহা বলা কঠিন।"

কৃষিক্ষেত্রের নানা স্থানে ঘুরিয়া কোথাও বিশেষ বৈজ্ঞানিক কল-

কারখানা দেখিতে পাইলাম না। প্রদর্শক বলিলেন, "কলকারখানায় প্রয়োগ সাধারণতঃ ছোট খাট কৃষিভূমিতে করা হয় না। অন্ততঃ ১৫০ বিঘার অপেক্ষা ছোট আবাদে মূল্যবান্ যন্ত্র বা কল ব্যবহার করিলে খরচ পোষায় না। আমাদের কৃষি-বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। আমরা লাভালাভের কথা ভাবি না। শিক্ষা বিস্তারের জন্য খরচ পত্র করিয়া থাকি, তথাপি সামান্য দুই চারিটা যন্ত্র মাত্র আমরা রাখিয়াছি।"

এখানকার গোশালাও দেখিলাম। দুগ্ধ দোহন করিবার জন্য কলের ব্যবহার করা হয় না। প্রদর্শক বলিলেন "কল ব্যবহার করিলে তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য অত্যধিক সময় লাগে। তাহা অপেক্ষা গোয়ালারা হাতে দুহিলে কম সময়ে বেশী কার্য্য হয়।"

সংবাদ পাইলাম উদ্যান ল্যাবরেটরীতে এবং কৃষি ভূমিতে অনুসন্ধান কার্য্য করিবার জন্য বহু ছাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকে। কোন বৃত্তি বিলাতের গবর্ণমেণ্ট দেন। কোন বৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি আলগা বৃত্তি আছে। কৃষিবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য সেই সকল সাহায্য ইংরাজ ছাত্রেরা পাইয়া থাকে। প্রত্যেক বৃত্তির মূল্য বার্ষিক ২৫০০৲।

ধন-বিজ্ঞান ও অধ্যাপক কানিংহাম

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্শ্যাল এবং অধ্যাপক কানিংহাম বিলাতের প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিৎ। ইঁহারা দুই জনেই এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কানিংহাম মধ্যে মধ্যে লণ্ডনের ধন-বিজ্ঞান শিক্ষালয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন—মার্শ্যাল তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া ফেলিতে নিযুক্ত।

আমি যেদিন কেম্ব্রিজ পৌঁছিলাম সেই দিনই দুর্ভাগ্যক্রমে মার্শ্যাল কেম্ব্রিজ ছাড়িয়া গেলেন। কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না। কানিংহামও প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকেন। আজ কিন্তু কেম্ব্রিজেই আছেন।

কানিংহাম একজন পাদ্রী। ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতা প্রদান করা ইঁহার প্রধান কার্য্য। এই বিভাগে ইঁহার পদও অতি উন্নত। সম্প্রতি খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দুইখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এক খানায় ধন-বিজ্ঞানের উপর খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব বিবৃত হইয়াছে। আর এক খানায় সাধারণ চিন্তাপ্রণালী ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে খৃষ্টীয় মতের প্রভাব আলোচিত হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাসে ইনি খৃষ্টধর্ম্মের আর একদিক বুঝাইবার জন্য আমেরিকার বোষ্টন নগরে যাইবেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি লোয়েল-ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে কানিংহামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সপ্তাহে দুইদিন করিয়া ইঁহার বক্তৃতা হইবে—

সর্ব্বসমেত আটটা বক্তৃতা দিতে হইবে। নীতিবিজ্ঞানের ইতিহাসে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব এই বক্তৃতাবলীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

কানিংহামকে ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস লেখকরূপেই জানিতাম। ইংলণ্ডের শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যের ধারা সম্বন্ধে লিখিয়া ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ধনবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া ইনি এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তাহাও সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চীন জাপান ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইনি কোন আলোচনা এখনও করেন নাই। ইনি বলিলেন "ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে আমি একবার ভারতবর্ষে গিয়াছিলাম। প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে আমার পর্য্যটন আবদ্ধ ছিল। প্রাচ্য-ভারতের মধ্যে কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছি। সেই পর্য্যটনে ভারতবর্ষসম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। তাহার পর ভারতীয় বৈষয়িক তথ্যাদি সঙ্কলন বা সমালোচনাও কখন করি নাই। মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত কয়েক খানা বৈষয়িক বিবরণী সম্বন্ধীয় 'ব্লুবুক' দেখিয়াছি, সেগুলি মনে হয় যথেষ্ট যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের সহিতই সঙ্কলিত হইয়াছে। আজকাল বোধ হয় স্যার থিয়োডোর মরিসন্ ভারতের বৈষয়িক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। চীন, জাপান বা পারস্য ইত্যাদি দেশের আর্থিক অবস্থা আমার জানা নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর সকল দেশেই ক্রমশঃ এক ছাঁচের কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিবে? আধুনিক ইউরোপের বৈষয়িক জীবন ও বৈষয়িক আদর্শ কি জগতের সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিবে?" ইনি বলিলেন, "প্রাচ্য-জগতের কথা আমি বেশী জানি না। ওদেশের ভবিষ্যৎ বৈষয়িক গতি কোন্ দিকে তাহা ইঙ্গিত করা আমার পক্ষে কঠিন। তবে এ কথাও সত্য যে,

পাশ্চাত্য জাতির বৈষয়িক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচ্য-জাতিরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। গ্রহণ না করিলে তাহাদের চলিবে না, আর গ্রহণ না করিতে চেষ্টা করিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অবশ্য তথাপি জগতের সর্ব্বত্র এক রীতির বৈষয়িক পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত কোন দিনই হইবে না। জগতে এ বিষয়ে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকিবেই। শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন এক এক সমাজে এক এক আকারে হইবে। কোন সমাজে শ্রমবিভাগনীতি বেশী প্রবর্ত্তিত হইবে, কোথাও বা কিছু কম প্রবর্ত্তিত হইবে। কোথাও হয়ত শিল্পের ও ব্যবসায়ের দুএক বিভাগে এই নীতির প্রভাব বেশী দেখিব, অন্য বিভাগে কম দেখিব ইত্যাদি। সেইরূপ কলকারখানা যন্ত্র হাতিয়ার বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তনও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে দেখিতে পাইব। কোন স্থানে কৃষিকর্ম্মে এই সমুদয়ের প্রয়োগ নাও দেখিতে পারি, কোন দেশে হয়ত কৃষিকর্ম্মেও এই সমুদয় কৃত্রিম অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন অত্যধিক দেখিব। কোন সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি বিনা যন্ত্রের সহায্যে চলিতে থাকিবে। আবার কোথাও বা এইগুলির ভিতর সামান্য ধরণের কল-যন্ত্রের প্রচলন হইবে। ফলতঃ এই সমুদয়ের পরিমাণ ও আকারের বিভিন্নতা অনুসারে দেশে দেশে বৈষয়িক জীবন-পদ্ধতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় পুষ্ট হইতে থাকিবে।

আজকাল রুশিয়ার বৈষয়িক জীবনের নানাবিধ নূতন নূতন দৃশ্য দেখা যায়। ওদেশে পুরাতন জীবনধারার ভিতরে আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনের নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃষিকর্ম্মে, শিল্পকর্ম্মে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে।

এই সকল পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে রুশিয়ার আর্থিক অবস্থা ও বৈষয়িক পদ্ধতি যে আকার ধারণ করিবে তাহা হয় ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও আমেরিকার জীবন-ধারা হইতে কথঞ্চিৎ সতন্ত্র থাকিবে। আধুনিক ইউরোপ বা নব্য পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিলে আমরা সাধারণতঃ এই চারিটা দেশের কথা ভাবিয়া থাকি। নব্য রুশিয়া অনেক বিষয়েই এই নব্য পাশ্চাত্য হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্ আকার গ্রহণ করিবে এই রূপই আমার বিশ্বাস।

তার পর এই চারিটা দেশের কথাই ধরা যাউক। ইহাদিগকে নব্য পাশ্চাত্যের নিদর্শন বলিয়াছি। সুতরাং চারিদেশেই এক ছাঁচের বৈষয়িক জীবন চলিতেছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সত্য সত্যই কি এই চারিদেশে এক প্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই? এই চারি দেশের মানব চরিত্র কথঞ্চিৎ বিভিন্ন নয় কি? ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির লোকেরা রাষ্ট্রশাসন বেশী পছন্দ করে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অপেক্ষা ইহারা রাষ্ট্রসাহায্যের উপর বেশী নির্ভর করিতে চাহে। ইহাদের কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওর্‌র্যান্স, শ্রমজীবি সম্প্রদায়, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে গবর্মেণ্টের শাসন, পর্য্যবেক্ষণ, সাহায্য ও "সংরক্ষণ" অত্যধিক। আমরা—ইংরাজেরা এই শাসন, পর্য্যবেক্ষণ, সাহায্য ও সংরক্ষণের ঘোরতর বিরোধী। আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে আমাদের অভিভাবক, কোন বিষয়েই করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিতান্ত পক্ষপাতী। আমাদের কোন বৈষয়িক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করা আমরা নিন্দনীয় ও অপমানসূচক মনে করি। আমেরিকায় এই স্বাধীনতার চূড়ান্ত দেখিতে পাইবেন। আমরা রাষ্ট্রকে কোন বৈষয়িক অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে দিই না সত্য কিন্তু ইহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমে-

রিকাবাসীরা এ বিষয়ে চরমপন্থী। তাহাদের স্বভাব অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ। সকল বিষয়ে স্ব স্ব প্রধান মত ও কার্য্য আমেরিকার বৈষয়িক জীবনের লক্ষণ। কাজেই জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকা এই চারি দেশে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বৈষয়িক পদ্ধতি নাই। বৈষয়িক অনুষ্ঠানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"

ট্রিনিটি কলেজে কানিংহাম বাস করেন। তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখা করিয়াছিলাম। আজ সন্ধ্যাকালে ক্রাইষ্টস্ কলজে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া গেল। অধ্যাপকগণ আমার ন্যায় আরও পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ কবিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ১৬ জন হইলাম। প্রথমে মনে ভাবিয়া ছিলাম এই কয়জন মাত্র এক ঘরে বসিয়া আহাব করিব। পরে দেখিলাম একটা বড় ভোজনালয়ে যাইতে হইল। সেখানে প্রায় দুইশত ছাত্র ভোজনের জন্য উপস্থিত। ছাত্রদের বসিবাব টেবিল ও বেঞ্চগুলি মেজের উপর অবস্থিত। অধ্যাপক ও অন্যান্যদিগের টেবিল ও চেয়ার একটা উচ্চতর মঞ্চের উপর। আমরা সেই মঞ্চে উঠিয়া যথা-স্থানে বসিলাম। পবে একজন পাদ্রী আসিয়া মঞ্চের এক কোণে দাঁড়াইলেন। ছাত্র অধ্যাপক সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পাদ্রী ল্যাটিনে "আচমন" পাঠ করিলেন। পরে আহারে বসা গেল। আজ রবিবাব এজন্য গোমাংস ও শূকরের মাংস নাই। আমাকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় অধ্যাপক হ্যাডন এই ভরসা দিয়া ছিলেন।

ডনদিগের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষের সম্মান খুব বেশী। ক্রাইষ্টস্ কলেজের অধ্যক্ষ বা "মাষ্টার" অতিশয় প্রবীণ। ডনেরা সকলেই ইঁহার খাতির করিয়া চলিতেছেন দেখিলাম। অষ্ট্রেলিয়ার একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি অধ্যাপক হ্যাডন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। হ্যাডন তাঁহার পুত্রকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। ইনি আফ্রিকার

ইউগাণ্ডায় কর্ম্ম করেন। ইউগ্যাণ্ডা বিলাতের উপনিবেশ-সচিবের অধীনে শাসিত হয়। এতদ্ব্যতীত একজন ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীও এক টেবিলে খাইতে বসিয়াছেন। ইহাঁদের সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

অধ্যাপক রোজ আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপক। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের যুগ ইহাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে ইনি গ্রন্থ রচনাও করিয়াছে। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষা-প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিলেন। ইনি বলেন, "বৎসরান্তে একটা পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ঠিক নয়। বহু ভাল ছেলে এরূপ পরীক্ষায় সুফল দেখাইতে পারে না। আমি অনেক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা কোন হিসাবেই নিকৃষ্ট নয়। দৈনিক পাঠ-চর্চ্চা তাহারা ভালরূপই করিয়া থাকে জানি। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার সময়ে তাহাদের মাথা গুলাইয়া যায়। যদি প্রতিদিনকার পাঠের মূল্য অনুসারে বাৎসরিক ফল নিরূপিত হইত অথবা শিক্ষকগণের মতামত গৃহীত হইত, তাহা হইলে ছাত্রদিগের দুশ্চিন্তা ও ভয় থাকিত না। কিন্তু এক্ষণে ভাল ছেলেদের সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন-ভাবে জীবন কাটাইতে হয়। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া তাহাদের জীবনের সাধ। কিন্তু হয়ত দৈবক্রমে তাহা না হইতেও পারে। অথচ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।"

ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কথা উঠিবামাত্র অন্যান্য ডনেরা বলিলেন, "এ একটা বিষম সমস্যা। আমরা অনেক ছাত্রের সঙ্গে সরল ভাবে মিশিয়া দেখিয়াছি, তাহারা কেহই কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে পঠদ্দশা অতিবাহিত করে না। ডিগ্রি লাভের পর তাহারা যে কি করিবে কেহই জানে না।" অধ্যাপক রোজ বলিলেন "এ সমস্যা কেবল

আমাদের ইংলণ্ডের নয়। আজকাল জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, ইটালী ইত্যাদি সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিবৎসর হাজার হাজার উপাধিধারী গ্র্যাজুয়েট উদ্গীরণ করিতেছে, ইহাদের অন্নসংস্থানের উপায় কোন দেশেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীঘ্রই পৃথিবীতে মহা অনর্থের উৎপত্তি হইবে মনে হইতেছে।"

আমাদের আহার শেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই ছাত্রদের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহারা কখন উঠিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। পরে আমরাও ভোজনালয় ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় চলিলাম। যাইবার সময়ে হ্যাডন দেয়ালের দিকে তাকাইতে বলিলেন। দেখিলাম রমণীমূর্ত্তি। হ্যাডন বলিলেন, "উনি রাণী মার্গারেট্। সপ্তম হেনরীর মাতা। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাত্রী।"

বৈঠকখানায় টেবিলে বসিয়া সুরাপান আরম্ভ হইল। মাত্রা বেশী নয়। "মাষ্টার" সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার পরে অন্যান্য সকলে পান করিলেন। পান করিবার সময়ে সকলে রাজার নাম উল্লেখ করিলেন। অধ্যাপক রোজ বলিলেন, "আহারের পর রাজার মঙ্গল কামনা করা আমাদের এই কলেজের নিয়ম। বহুকাল হইতে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। ক্রাইষ্টস্ কলেজের অধ্যাপকেরা রাজার 'স্বাস্থ্য' প্রতিদিনই 'পান' করেন।"

রোজের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ সম্বন্ধে কিছু কথা হইল। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্যার হেন্‌রী মেইনের ভারতবিষয়ক আলোচনার ফলসমূহ কি এক্ষণে পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "ম্যাক্‌সমুলার ও মেইনের আমলে ভারতবর্ষের সাহিত্যে ধর্ম্মভাবই প্রধান এইরূপ জানা ছিল। ক্রমশঃ হিন্দুর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শাসনপ্রণালী, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, চিত্রকলা,

সামরিকজীবন ইত্যাদি সমস্ত জগতের নানা তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে। সেই সকল আলোচনার ফলে পুরাতন মতগুলি পরিবর্ত্তিত হইতেছে।"

খানিকক্ষণ পরে রোজ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে বলিলেন "আমি সঙ্গীতচর্চ্চা বড় ভালবাসী। আজ বাহিরে গীতবাদ্যের আয়োজন আছে। আমাকে শীঘ্রই সেখানে যাইতে হইবে।"

এ দিকে বৃদ্ধ "মাষ্টার" ইউগ্যাণ্ডা ও ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারীদ্বয়ের নিকট তাঁহাদের শাসনপ্রণালী ও শাসিত দেশ সম্বন্ধে গল্প শুনিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য দুই জনেই এই কলেজের পুরাতন ছাত্র সুতরাং বৃদ্ধের আদরণীয়। এইরূপ কত শত শাসনকর্ত্তা এই সব কলেজ হইতে বাহির হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব নানাস্থানে কর্ম্ম করিতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

রবার্ট ব্রুসের স্বজাতি

প্রাচীন ইংলণ্ডের জীবন-কেন্দ্র

আজ সকালে এডিনবারা যাত্রা করিলাম। কেম্ব্রিজ হইতে দশ ঘণ্টার পথ। প্রথমে এলিনগরে গাড়ী বদলাইতে হইল। এই নগর কেম্ব্রিজের অতি নিকটে। প্রাচীন কালে যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছিল তখন এলির ধর্ম্মমন্দির বিশেষ প্রতাপশালী ছিল। প্রাচীন কেম্ব্রিজে এলির প্রভাব যথেষ্ট।

সোজা উত্তরে চলিতেছি। পথে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। খোলা মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। চাষ ও আবাদ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা গেল। পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, খাল, বন, জঙ্গল ইত্যাদি দৃশ্যের যৎপরোনাস্তি অভাব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে পথ তত রমণীয় নয়। লিঙ্কলন্ ও ডন্‌ক্যাষ্টার দুইটা বড় সহর পার হইয়া গেলাম।

প্রায় ১ টার সময়ে ইয়র্কে পৌঁছিলাম। আজকাল ইয়র্ক একটা শিল্পকেন্দ্র। প্রাচীন ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইয়র্ক বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরাজী সাহিত্য, সভ্যতা ও শিক্ষার প্রথম যুগ ইয়র্ক কেন্দ্রে অতিবাহিত হইয়াছে। ইয়র্কের পণ্ডিতেরাই ইংরাজজাতিকে প্রথম অবস্থায় শিক্ষিত

দীক্ষিত করিয়াছেন। ইয়র্কের সঙ্গে সেই সময়ে ফ্রান্সের এবং ইউরোপের ভাব বিনিময় হইত। ইয়র্ক ইউরোপীয় সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিত। ইয়র্কের একজন পণ্ডিত য়্যাল্‌কুইন অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রান্স-নরপতি শার্লেম্যানের শিক্ষাসচিব ছিলেন। ফলতঃ কেম্ব্রিজের প্রথম অবস্থায় ইয়র্কের প্রভাব দেখিতে পাই।

ইয়র্ক ছাড়াইয়া ডারহাম নগরে আসিলাম। গাড়ী হইতে পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত গির্জ্জাঘর দেখা গেল। গির্জ্জাগৃহের নির্ম্মাণ ও অবস্থান অতীব সুন্দর ও বিচিত্র ভাবোদ্দীপক। বিলাতের সুরম্য অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ডারহামের ধর্ম্মমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বোধ হইল। ডারহামে একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী নিউকাস্‌লে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমেই একটা উচ্চ সেতু পার হইলাম। টাইন নদীর উপরে এই সেতু। গাড়ীতে বসিয়া দেখা গেল নগরের কারখানাসমূহের কলের ধূমে চারিদিক অন্ধকার। এতগুলি চিম্‌নী এপর্য্যন্ত কোন নগরেই দেখি নাই। নগরও ছোট খাট বোধ হইল না। রেলপথের দুই ধারেই নগর বিস্তৃত হইয়াছে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ নিউকাসলের তুলনায় পল্লীগ্রাম মাত্র। অবশ্য লণ্ডনে এত মহাল্লা আছে যে তাহার সঙ্গে নিউকাস্‌লের তুলনা করা কঠিন। কিন্তু কল কারখানা, চিমণী, ধূম, শিল্প ও ব্যবসায় হিসাবে নিউকাস্‌লের সঙ্গে লণ্ডনের শিল্প-মহাল্লার সাদৃশ্য আছে। নিউকাস্‌লে কয়লার কার্য্য বেশী।

এইবার ইংলণ্ডের সীমা পার হইয়া স্কটল্যাণ্ডে পড়িলাম। এইখান হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য কিছু বদলাইতে লাগিল। খানিক পরে ডাহিনদিকে সমুদ্র দেখা গেল। নীলসিন্ধু প্রথমে কিছু দূরে, ক্রমশঃ অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইল। স্থানে স্থানে সমুদ্রের কূল দিয়াই রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

এডিনবারায় ছয়টার সময়ে পৌঁছিলাম। তখনও উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সূর্য্য দেখা গেল। আহারের পর রাস্তায় বাহির হইলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ—লণ্ডনে এরূপ রাস্তা বেশী নাই মনে হইল। ঘরগুলিও প্রাসাদতুল্য এবং একধরণের। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি দেখিলে লণ্ডনের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু লোকের গতিবিধি বেশী নয়—গাড়ী ঘোড়া মটরকার, ট্রাম, ট্যাক্সি কম চলে। লণ্ডনেব পঞ্চাশভাগের একভাগও বোধ হয় এখানে কর্ম্মপ্রবণতা ও চলাফেরা নাই। অধিকন্তু কলকারখানা ফ্যাক্টরী, চিম্‌নী ইত্যাদিও প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি না। অনেকটা নির্জ্জনতা ও শান্তি উপভোগ করিতেছি।

এডিনবারার গৌরব

এ কয়দিন লেখাপড়ার আবহাওয়ায় বাস করিতেছিলাম। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের রাস্তায় বাহির হইলেই শিক্ষার্থী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। বাড়ীঘরের মধ্যে হয় ছাত্রাবাস না হয় কলেজ ও ধর্ম্মমন্দির। দোকান হোটেল ইত্যাদিও প্রধানতঃ বিদ্যা-পুরীর অধিবাসীদিগের অভাব মোচনের অনুরূপ।

এডিনবারা একটা ছাত্র নগর মাত্র নয়। ইহা একটা রাষ্ট্র-কেন্দ্র। অবশ্য কোন স্বাধীন রাজ্যের প্রধানকেন্দ্র এখানে নাই। এডিনবারা-কেন্দ্রের উপরওয়ালাদিগের আফিসসমূহ সবই লণ্ডনে। স্কটল্যাণ্ডের এই রাজধানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম নগর মাত্র। এই হিসাবে কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদির সঙ্গে ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে। লণ্ডনের হট্টগোল এখানে দেখিতে পাইতেছি না। এই নগরীর প্রাসাদসমূহ দেখিলে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের পরিচয় পাই। অধিকন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনের মধ্যে মানবশক্তি এক কৃত্রিম-সৌন্দর্য্যের আকর নির্ম্মাণ করিয়াছে বুঝিতে পারিতেছি তথাপি এডিনবারায় বসিয়া কর্ম্ম-তৎপর রাষ্ট্রকেন্দ্রের আভাষ পাই না।

এডিনবারার প্রধান উদ্যান ও প্রান্তরের দক্ষিণদিকে বাস করিতেছি। এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনপদে সর্ব্বত্র শান্তিপ্রিয়তার চিত্র অঙ্কিত। ময়দান পার হইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে লোকজন বেশী দেখিতে পাই বটে, কিন্তু শিল্প কারখানার কল ও চিম্‌নী চোখে পড়ে না; ব্যবসায়ীদিগের কোলাহলও শুনিতে পাই না। এই বিরাট নগরীর নিস্তব্ধতা বাস্তবিকই

চিত্তে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চার করে। পর্ব্বতের সমান উচ্চ গৃহগুলিই যেন আমার একমাত্র সঙ্গী ও প্রতিবেশী মনে হইতেছে।

এডিনবারার এই অংশ অতি নূতন। বিগত একশত হইতে দেড়শত বৎসরের ভিতর এই অঞ্চলের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, লণ্ডনের আধুনিক শোভাসম্পদ এবং ধনৈশ্বর্য্যও নিতান্তই নূতন। সেই মহানগরীর সৌন্দর্য্য ও গৌরব ঊনবিংশ-শতাব্দীর ভিতরেই প্রধানতঃ সৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ জাতির যথার্থ সাম্রাজ্য ভোগ যতদিনের কথা, লণ্ডনের ঐশ্বর্য্যও ততদিনের কথা। আজকালকার প্রশস্ত রাজপথ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীঘর দেখিয়া অষ্টাদশ-শতাব্দীর লণ্ডন বা এডিনবারার চিত্র কল্পনা করা অসম্ভব। অষ্টাদশ-শতাব্দীর লণ্ডন কিরূপ ছিল তাহা ক্লাইবের বিবরণে জানিতে পারা যায়। ক্লাইব তখনকার মুর্শিদাবাদকে লণ্ডন অপেক্ষা সম্পদশালী এবং সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও বিস্তীর্ণ বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১০০।১৫০ বৎসরে জগতের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়!

এডিনবারার নূতন ও পুরাতন অংশ উভয়ই ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। এই নগরের হ্রদ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, কুয়াশা, রাস্তাঘাট, গলি, গির্জ্জা, বাজার, হাট, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকলই উচ্চ সাহিত্যে অমর রহিয়াছে। গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যেই তাহার পরিচয় পাই। যাঁহারা স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এডিনবারার অলিগলি সুপরিচিত। কেবল তাহাই নহে। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান ধুরন্ধরেরা স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা এডিনবারাতেই বাস করিতেন। এডিনবারার সাহিত্য-সমাজ ও ক্লাবসমূহই তৎকালে বিশেষ প্রতাপশালী ছিল। ইংরাজ জাতির

প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম, ধনবিজ্ঞানের জন্মদাতা য়্যাডাম স্মিথ, ঐতিহাসিক রবার্টসন্, কবিবর বার্ণস্, চিন্তাবীর কার্লাইল সকলেই স্কট্‌ল্যাণ্ডের সন্তান। এডিনবারা তাঁহাদের বাল্যভূমি অথবা কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। কাজেই ইংরাজী সাহিত্যে এডিনবারা চিরজীবী হইয়াছে—জগতের ইতিহাসেও এডিনবারার চিন্তাকেন্দ্র অমর থাকিবে।

ক্ষুদ্র আকারে গ্রন্থ লিখিয়া জ্ঞানবিস্তারের আয়োজন ইংলণ্ডে অনেক দেখা যাইতেছে। বহুপ্রকার 'গ্রন্থমালা'র প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অল্পকথায় ছোট ছোট পুস্তিকা পাঠ করিয়া কাজের লোকেরা নানাবিধ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিতেছে। এই সকল গ্রন্থমালা কেবল মাত্র অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বা কৃষিজীবী ও শিল্পীজনগণের জন্যই লিখিত হয় না। উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও এই সকল গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন কথা শিখিতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা গ্রন্থগুলি লিখান হয়। Englishmen of Letters Series, Universal Library Series, Home University Library Series, People's Books Series, Wisdom of the East Series, Foreign Statesmen Series ইত্যাদি নানাবিধ গ্রন্থমালা প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরজীবন সম্বন্ধেও একশ্রেণীর পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বিখ্যাত নগরসমূহের ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। পাঠকগণ অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবারা ইত্যাদি নগরের পরিচয় ইহা হইতে সহজেই পাইতে পারেন। ভারতবর্ষে আজকাল সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ভারতীয় নগর-কথা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থমালা প্রচারিত হইবার সময় এখনও আসে নাই কি? নালন্দা, তক্ষশীলা, মাদুরা, পুণা, পুরী, কামাখ্যা, গৌড়, কাশী, হরিদ্বার, লাহোর ইত্যাদি নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস-পুস্তক বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী ও অন্যান্য ভাষায় এক্ষণে লেখা

যাইতে পারে না কি? বিদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমাদের দেশীয় সাহিত্যের এই অভাবের কথা অতি প্রবল ভাবেই মনে পড়িতেছে।

শিক্ষাপ্রচারের সুযোগ

স্কটল্যাণ্ডের স্বদেশী তথ্যবিষয়ক মিউজিয়াম একবৎসরের জন্য বন্ধ রহিয়াছে। এই সংগ্রহালয়ের দ্রব্যসমূহ নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। কাজেই এক নিঃশ্বাসে গোটা স্কটল্যাণ্ডের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া লইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

এই স্বদেশী সংগ্রহালয় ব্যতীত এডিনবারায় আর একটি সংগ্রহালয় আছে। তাহার নাম রয়েল স্কটিস মিউজিয়াম। লণ্ডনের সংগ্রহালয়গুলি দেখিবার পর এই গৃহের দ্রব্যসমূহ চোখে উঠে না! কিন্তু এখানকার জীবতত্ত্ব বিষয়ক নিদর্শনগুলি মোটের উপর বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া জগতের নানাস্থানের দুই চারিটা করিয়া পদার্থ সংগৃহীত রহিয়াছে। ইউরোপের বিখ্যাত অট্টালিকা-সমূহের নকলে ছোট ছোট খেলানা-গৃহ অথবা অঙ্কিত চিত্রও কতকগুলি দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষের জিনিষপত্র অতি অল্প মাত্র। কলিকাতা মিউজিয়ামের মধ্যে সকলেই বঙ্গদেশীয় বাজারের নক্সা দেখিয়াছেন। সেই নক্সার অনুকরণে লণ্ডনের সংগ্রহালয়ে একটা বাজার দেখিয়াছি। এডিনবারায়ও তাহার একটা নকল দেখিলাম।

ঘরগুলির ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল। লেখা আছে যে, মাঝে মাঝে সংগ্রহালয়ের বিভিন্ন নিদর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সেই সকল বক্তৃতা বুঝাইয়া দিবার জন্য ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্য লওয়া হয়। জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এই সকল বক্তৃতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। শ্রোতাদিগের নিকট কোন মূল্য লওয়া হয় না।

একটা বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় পৃথিবীতে নৌ-বিদ্যার ইতিহাস। জগতের কোন্ কোন্ জাতি কবে কোথায় কি ভাবে সমুদ্র-পোত ব্যবহার করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত এই বক্তৃতায় প্রচার করা হয়। প্রাচীন রোম, ভেনিস, হল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের সমুদ্র-বাণিজ্য ও নৌযুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হয়। সেই যুগে জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার কি রীতি ছিল তাহাও বুঝান হয়। পরে কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আধুনিক বাষ্পচালিত অর্ণবযানের ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহার আলোচনা হইয়া থাকে। স্পেনের যুদ্ধ-জাহাজ, নেপোলিয়ানের যুদ্ধ-জাহাজ, নেলসনের নৌকৌশল এবং বর্ত্তমান জাহাজ নির্ম্মাণ সকলই দেখান হয়।

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কলকারখানা-বিষয়ক-গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহার ভিতর নানাযুগের নানাপ্রকার নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির নক্সা রক্ষিত হইয়াছে। চীনা, রোমীয়, ইতালীয়, ওলন্দাজ, স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতির প্রাচীন নৌশিল্পের নমুনা একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার পর আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জাহাজ সংক্রান্ত যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয়ও পাওয়া গেল। একখানা গোটা জাহাজের ক্ষুদ্র নমুনা মধ্যভাগে কাটিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা দেখিলে জাহাজনির্ম্মাণের কারিগরি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কলকারখানার ঘরে রেলওয়ে, ষ্টীমএঞ্জিন, বেলুন, বিমান, আলোক-গৃহ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সকলপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত পদার্থের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরটা বিশেষ বৃহৎ নয়। অথচ তাহার ভিতরেই আধুনিক ইউরোপের প্রধান গৌরবগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থের দ্বারাই বর্ত্তমান যুগে সকল প্রকার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। বিগত একশত

বৎসরের ভিতর যে সকল আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কারের ফলে নব্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এক সঙ্গে তাহার নমুনা আজ প্রথম দেখিলাম।

এডিনবারায় আসিয়া অবধি কাগজপত্রে চীনা পদার্থের প্রদর্শনীর কথা শুনিতেছি। আজ মিউজিয়ামে এইগুলি দেখিতে পাইলাম। এই পদার্থসমূহের প্রতি দর্শকগণের দৃষ্টি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করা হইতেছে। প্রাচীন চীনের পোষাক পরিচ্ছদ, সাজ সজ্জা, বাদ্য যন্ত্র, এনামেল পাত্র ইত্যাদি দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। তবে স্কটল্যাণ্ডের লোকের পক্ষে এ সমুদয় কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত আধুনিক চীনা চিত্রকলার কতকগুলি নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গাছ পাতা, জীব জন্তু ইত্যাদির চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক চিত্রে রংয়ের খেলা অতি সুন্দর। প্রাকৃতিক পদার্থের অঙ্কনে চীনাদের দক্ষতা বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া কতকগুলি সামরিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রও সংগৃহীত হইয়াছে।

একস্থানে দেখিলাম পাঁচ ছয়খানা চিত্র সাজাইয়া একটা ধর্ম্মমন্দিরের মত গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। চিত্রগুলির ব্যাখ্যাও একটা বিজ্ঞাপন পত্রে লিখিত রহিয়াছে। পাঠ করিয়া বুঝা গেল চীনেরা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে এই চিত্রগুলি তাহারই পরিচায়ক। হিন্দুগণের "পিতৃ-পূজা," তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ইত্যাদির সঙ্গে চীনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ভক্তির সাদৃশ্য যথেষ্ট। স্কটল্যাণ্ডের নরনারীগণ অবশ্য এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির তত্ত্ব কিছুই বুঝে না। এই কারণে তাহাদের জন্য এই পূজাতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ এ সম্বন্ধে একবৃন্তের তিন ফুল। প্রায় একই আদর্শে এবং একই প্রণালীতে এই তিন জাতি

পিতামহদিগের পূজা করিয়া থাকে। এশিয়ার ঐক্য ইহা হইতে কিছু বুঝা যাইবে।

আজ একবার এখানকার একটা বড় বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেক স্থলে এডিনবারার বিদ্যালয়গুলির ব্যয় প্রাচীন দানের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। এই বিদ্যালয়টির পরিচালনা হেরিয়টের সম্পত্তির উপর নির্ভর করে। মধ্যযুগের অনেক মুদী, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ধনীলোকেরা শিক্ষার জন্য সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেন। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ধনদানের জন্য এডিনবারার লোকেরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবল পাঠশালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও এইরূপ দানের উপর চলিয়া থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত দানবীর ধনকুবের কার্ণেগি এডিনবারার সন্তান। এডিনবারাতেও তাঁহার দানে অনেক বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

হেরিয়টবিদ্যালয় আমাদের ভারতবর্ষে প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ের ন্যায় পরিচালিত হয়। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে বাস করে না। এক একবার ঘণ্টা শেষ হইলে হুড়াহুড়ি করিয়া ছেলেরা যাতায়াত করে। দল বাঁধিয়া আড্ডা দেওয়া ছাত্রমাত্রেরই স্বভাব। কেবল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। ছেলেরা যে যেখানে ইচ্ছা সেইখানে বাস করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে অথবা অধীন কোন ছাত্রাবাস নাই। অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট হোটেলে বা ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য তিনটা করিয়া কামরা রাখা ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু এডিনবারার ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে একঘরের মধ্যেই খাওয়া শোওয়া সবই করিতে পারে। এমন কি, একঘরের ভিতরেই ২।৩ জন থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন

আপত্তি হইবে না। এই কারণে দরিদ্র ছাত্রেরা মাসিক ৮০।১০০৲ টাকায় এডিনবারায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে। কিন্তু অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্ব্রিজে ৩০০৲ টাকার কমে খরচ কুলান অসম্ভব।

স্কটল্যাণ্ডের দরিদ্র পরিবারসমূহের বালক বালিকাদিগের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ আয়োজন আছে। ছেলেদের জুতা জামা, কাপড় চোপড় না থাকিলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে সেইগুলি দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহারা গৃহে উপযুক্ত আহার্য্য পায় কি না সে বিষয়েও যথোচিত অনুসন্ধান করা হয়। প্রয়োজন হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে খাওয়ান হইয়া থাকে। পিতামাতারা ছেলেদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকিলে বিদ্যালয়ের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। মোটের উপর এডিনবারা সহরটা একটি বৃহৎ শিক্ষালয় স্বরূপ—অভিভাবকগণের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইবার জন্য রাষ্ট্রীয় অভিভাবক সর্ব্বদা সজাগ রহিয়াছেন। খানিকটা প্রাচীন স্পার্টার আদর্শ এখানে অবলম্বিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

এ কয়দিন ময়দানে বেড়াইতেছি। সর্ব্বদা এখানে অসংখ্য বালক বালিকা লাফালাফি, মারামারি, খেলাধূলা করে। ছেলেরা ময়দানে না আসিলে বিদ্যালয় হইতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। অভিভাবকগণও ছেলেদের ক্রীড়া কৌতুকে উৎসাহ দিতে বাধ্য।

এডিনবারায় শিক্ষাবিস্তারের যেরূপ প্রয়াস দেখিতেছি অন্য কোন নগরে এরূপ দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। এই সহরে প্রায় তিনলক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ৩০০০ লোক শিক্ষক ও অধ্যাপক অথবা শিক্ষাবিভাগের কেরাণী ও কর্ম্মচারী।

সুকুমার শিল্প ও কৃষিকার্য্য

এডিনবারার প্রসিদ্ধ 'প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে'র উপর স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি সুন্দর কারুকার্য্য পূর্ণ গৃহমধ্যে সন্নিবেশিত। এইরূপ স্মৃতিভবন লণ্ডনের য্যালবার্ট মেমরিয়্যাল।

স্কট-ভবনের পার্শ্বেই স্কটিশ য্যাক্যাডেমীর গৃহ। আজ কাল এখানে একটা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। প্রতিবৎসরই এইরূপ প্রদর্শনী খোলা হইয়া থাকে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের চিত্রকর, ভাস্কর এবং বাস্তুশিল্পীরা বৎসরে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন সেইগুলি এখানে দেখান হয়। স্কট্‌ল্যাণ্ডের গুণীদিগের কার্য্যই সাধারণতঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে বিদেশীয় শিল্পিগণের শিল্প-চর্চ্চাও প্রদর্শিত হয়। এবার বেলজিয়ামের কোন কোন নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তর ও পিত্তলের নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মূর্ত্তিগুলির ভিতর প্রাণবত্তার বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটাতেই স্থপতির ক্ষমতা পরিস্ফুট। চিত্রগুলির মধ্যে অঙ্কননৈপুণ্য, বর্ণসমাবেশ এবং বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা ব্যক্তিবিশেষের আকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। কোন চিত্রের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না। দেখিলেই বুঝা যায়। ফটোগ্রাফী এবং এইরূপ চিত্রশিল্পে কোন প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই চিত্রসমূহেও অঙ্কিত ব্যক্তির মনোভাব এবং হৃদয়ের কথা অনেকটা বুঝিতে পারি। দাঁড়াইবার বা বসিবার ভঙ্গী, মুখমণ্ডলের প্রভাব, চক্ষুর শক্তি ইত্যাদি অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এতগুলি কারিগরের এতগুলি কার্য্য

দেখিয়া আমাদের ভারতীয় শিল্পিকুলের অপ্রাচুর্য্যের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এখানে কল্পনাশক্তির বেশী পরিচয় নাই।

এখানকার সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ত্তাদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। স্কট্‌ল্যাণ্ডের কৃষি বিলাতের কৃষি হইতে কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র। এখানকার জলবায়ু এবং মৃত্তিকার উপাদান কথঞ্চিৎ পৃথক্। কিন্তু বিলাতের মত স্কট্‌ল্যাণ্ডেও কৃষকগণকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়। দেশীয় কৃষিকার্য্যেব উন্নতি সাধন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এজন্য কৃষককুলের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সংযোগও ঘনিষ্ঠভাবে হইয়া থাকে।

আজকাল ছোট ছোট কৃষিভূমির প্রবর্ত্তন করিতে সকল দেশেই প্রয়াস দেখা যাইতেছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডে এ বিষয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চলিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের কৃষকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যের উন্নতি সাধন করান হইতেছে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট পরিদর্শক, পরীক্ষক, পরামর্শদাতা, ইত্যাদি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে ক্ষুদ্র কৃষিভূমি বিষয়ক কয়েকখানা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইংরাজেরা এ বিষয়ে নিজে লিখিতেছেন এবং অন্যান্য সাহিত্য হইতেও অনুবাদ করিতেছেন।

কৃষি-বিভাগের গ্রন্থশালায়ও এগুলি দেখিলাম। ইহাদের নাম—Land and Labour—Lessons from Belgium. By Seebohm Rowntree এবং Large and Small Holdings. By Hermann Levy. দ্বিতীয়টি জার্ম্মাণ হইতে অনুবাদ। এতদ্ব্যতীত Rural Denmark নামক গ্রন্থের কথা অনেকেই জানেন।

ইউরোপে আজকাল আন্দোলন চলিতেছে—সহর বনাম পল্লী। সেইরূপ আর এক আন্দোলন বৃহৎ কারবার বনাম ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান। এই দুই আন্দোলন আবার পরস্পর সম্বদ্ধ। পল্লী ও ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের

জয়লাভ হইলে ভারতীয় বৈষয়িক আদর্শের দিকে পাশ্চাত্য জগৎ অগ্রসর হইতে থাকে। অধিকন্তু, পারিবারিক জীবনের প্রতিও ইহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং অন্ততঃ চিন্তারাজ্যে অধ্যাত্মবাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য সভ্যতাই কি জগতে স্থায়ী হইয়া যাইবে?

হেরিয়ট বিদ্যালয় ও দুর্গ

কেম্ব্রিজের লীস্-বিদ্যালয়ে দেখিয়াছিলাম ছাত্রদিগকে সন্তরণ-কৌশল শিখাইবার জন্য একটা গৃহের ভিতর গভীর সরোবর প্রস্তুত করা হইয়াছে। সাঁতার কাটিতে শিক্ষা করা ইংরাজসমাজের সর্ব্বত্রই শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের উপায়স্বরূপ বিবেচিত হয়। এডিনবারার প্রসিদ্ধ হেরিয়ট-বিদ্যালয়েও সন্তরণ শিক্ষার আয়োজন আছে। লোক জলে ডুবিয়া গেলে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপায়ও শিখান হয়। চীৎসাঁতার, ডুব-সাঁতার, বুক-সাঁতার ইত্যাদি নানা প্রকার সাঁতার অভ্যাস করান হইয়া থাকে। দম রাখিবার ক্ষমতা পুষ্ট করিবার জন্যও বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

হেরিয়ট-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ১৮।১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে। অনেকে অতদিন লেখাপড়ায় কাটাইতে পারে না। তাহারা ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত তাহারা মন্দ শিক্ষালাভ করে না। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, অঙ্কন, সূত্রধরের কর্ম্ম, কর্ম্মকারের কার্য্য, ইত্যাদি বিদ্যা ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা করে। তাহার উপর ধনবিজ্ঞান এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈষয়িক জ্ঞান লাভও ইহাদের হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সাধারণ সাহিত্য, গণিত, ভূগোল এবং ইতিহাস শিখিতে হয়। মোটের উপর ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রেরা নানা ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত বিদ্যার অধিকারী হইয়া উঠে। এই বয়সেই তাহারা যোগ্য ওস্তাদগণের সাগ্‌রেতী করিতে পারে।

আর যাহারা ১৮।১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ করিতে পারে তাহারা সকল বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারীদিগের সমান বিদ্যা অর্জ্জন করে। প্রত্যেক বিজ্ঞানের মোটামোটি নিয়মগুলি তাহারা হাতে কলমে শিখিয়া থাকে। অধ্যাপকের বক্তৃতা বা পুস্তকের লেখা মাত্রের উপর তাহারা নির্ভর করে না। প্রত্যেক বিষয় তাহারা নিজ হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখে। এজন্য ল্যাবরেটরীর অতি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিলাম। প্রত্যেক শিক্ষকের সঙ্গে ১৬ জন ছাত্র কার্য্য করে। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্থান আছে। এই বিদ্যালয়ে যত বড় ও যতগুলি বিজ্ঞান-গৃহ দেখিতে পাইলাম আমাদের অনেক কলেজেও সেরূপ ল্যাবরেটরী নাই! তার পর ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা ব্যতীত অন্য প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালীও তাহারা শিক্ষা করে। বিজ্ঞানে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা মাত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক ছাত্রেরা Statics, Dynamics, তাপ, আলোক ইত্যাদি পদার্থ-বিজ্ঞানের তথ্য বিষয়ক অঙ্ক কষিতেছে। রসায়নের পরীক্ষালয়ে দেখা গেল কেহ কৃষি তত্ত্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কেহ চিকিৎসাবিদ্যার আনুষঙ্গিক রসায়ন শিখিতেছে। কেহ বা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে।

হেরিয়ট-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা লেখা পড়া শেষ করিয়া নানা পথে অগ্রসর হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য চেষ্টা না করিলেও তাহারা বিবিধ উপায়ে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াও এখানকার বিদ্যালাভের পর ২।৩ বৎসর খাটিয়া কেহ কেহ ভারতীয় সিবিল সার্ভিস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এখানে যতটা বিদ্যা শিক্ষা করা হয় তাহার ফলে কৃষিকলেজে অথবা চিকিৎসা-কলেজে প্রবেশ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

আজকাল এখানে ১২০০ ছাত্র। তাহাদের জন্য ৬৪ জন শিক্ষক। প্রত্যেক শিক্ষকই এম্, এ, বা এম্, এস্, সি ডিগ্রীধারী। বিজ্ঞান শিখাইবার জন্যই ১৫ জন নিযুক্ত আছেন।

বিজ্ঞানালয়ে ছাত্রদের কার্য্য দেখিয়া শিল্পশালায় প্রবেশ করিলাম। শিল্পশালায় ৪ জন শিক্ষক। প্রথমে কাঠের কারখানা দেখিলাম। শিক্ষক বলিলেন "আপনি ভারতবর্ষের লোক হইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডের শিল্প কি দেখিবেন? আপনাদের কারুকার্য্য যে অতি উচ্চ শ্রেণীর!" আমি বলিলাম "সূত্রধরের কর্ম্ম শিখাইবার প্রণালীটা বুঝিতে চাহি।" কারখানার স্থানে যাইয়া ছেলেদের হাতের তৈয়ারী কাজ দেখিলাম। ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বয়সে কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করিতে হয় শিক্ষক মহাশয় ধারাবাহিকরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তারপর একটা প্রদর্শনী-গৃহে গেলাম। সেখানে কতকগুলি ভাল ভাল কাজ সংগৃহীত রহিয়াছে। এইগুলি দেখাইতে দেখাইতে শিক্ষক বলিলেন "এই জিনিষটি আপনাদের দেশের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট তৈয়ারী করিয়াছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কি রকম?" ইনি বলিলেন, "আজ সে ভারতবর্ষে সিবিলিয়ান। বাল্যাবস্থায় সে এই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিত। আমাদের নিয়মে সকল ছাত্রকেই ছুতারমিস্ত্রীর কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। এ নিয়মটা খারাপ কি? নিজ ঘরের ছোট খাট কাজ নিজেই সারিয়া লওয়া কি মন্দ? আমার এক ছাত্র খুব বড়লোক। তাহার মোটরকার আছে। মোটরকারের মেরামতী কাজ সে নিজ হাতেই করিয়া থাকে। আমি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'তুমি ইহা কোথায় শিখিলে?' সে বলিল 'আপনার নিকট যাহা

শিখিয়াছিলাম তাহার ফলেই এ যোগ্যতা লাভ করিয়াছি।' কি বলেন, মহাশয়, আমাদের নিয়মটা ভাল নয় কি?"

ছেলেদের অন্নসংস্থানের পথ বাহির করিয়া দেওয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা নিজেদের কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেশের নানা স্থানে আফিস, কারখানা, কারবার, ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত লোকজনের সঙ্গে চিঠি পত্র লিখিয়া থাকেন। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত চাকুরী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবকেরা এজন্য বিদ্যালয়ের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।

এডিনবারা সহরের নানা অঞ্চল দেখিতেছি। যে পাড়ায় রহিয়াছি সে পাড়া আধুনিক এডিনবারার নূতনতম অংশ। এখানে বসিয়া আসল এডিনবারার কিছুই বুঝা যায় না। এডিনবারার সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের লাহোর, দিল্লী, কাশী অথবা মিশরের কাইরো ইত্যাদি নগরের চিত্র মনে আনিতে হইবে। এডিনবারা ইহাদের ন্যায়ই প্রাচীন— অবশ্য সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে এডিনবারার জন্ম হয় নাই একথা মনে রাখা আবশ্যক। কিন্তু সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এডিন-বারা যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে আমাদের দিল্লী লাহোরও সেইভাবেই বিকাশলাভ করিয়াছে। যুগে যুগে অসংখ্য সংগ্রাম ও রক্তপাতের কাহিনী এই সকল নগরের ইতিহাস। নানাধরণের প্রাচীনগঠন, নানা কৌশলের গৃহনির্ম্মাণ বিচিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়স্থাপনের ইতিবৃত্ত এই সকল রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের অভ্যন্তরে লুকায়িত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অশান্তি, বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটি এডিনবারার মানবজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এইভাবে অন্ততঃ ৬০০ বৎসর কাটিয়াছে। নগরের বাহ্য আকৃতি ইহার ফলে কম

নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি, অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় গৃহনির্ম্মাণ, প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এই প্রভাবই খ্যাপন করিতেছে।

সেই পুরাতন ও মধ্যযুগের নগরের পার্শ্বে আধুনিক নগর গঠিত হইয়াছে। দুই নগরে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ট্রামে একদিক্ হইতে আর এক দিকে যাইতে থাকিলেই দুয়ের প্রভেদ বুঝা যায়। একদিকে রাজপ্রাসাদ অপর দিকে দরিদ্রের কুটির। অথচ এই কুটিরগুলিই প্রাচীন-কালে রাজপ্রাসাদ ছিল। কাশীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ গৃহ দেখিয়া আমরা চমকাইয়া যাই। কিন্তু এডিন্‌বারার আলোকবিহীন নরককুণ্ডসদৃশ মহাল্লাগুলি না দেখিলে মধ্যযুগের যথার্থ বৈষয়িক অবস্থা বুঝা যায় না।

ইউরোপের মধ্যযুগে যেরূপ দুর্গ নির্ম্মিত হইত ভারতবর্ষেও সেই ধরণের দুর্গ নির্ম্মিত হইত মনে হইতেছে। এখানকার প্রাচীনতম নগরের প্রধান অংশই ছিল পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত 'কাস্‌ল্‌' বা দুর্গ। এই কাস্‌ল্‌ আমাদের চুণার, সিংহগড়, চিতোর ইত্যাদি পার্ব্বত্য দুর্গেরই অনুরূপ। যদি এডিনবারার দুর্গে স্কচজাতীয় লোক না দেখিতাম তাহা হইলে আমি একটি ভারতীয় দুর্গের ভিতরেই আছি বিশ্বাস করিতে কোনরূপ আপত্তি থাকিত না। ইংরাজেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ফোর্ট উই-লিয়ম প্রস্তুত করিবার সময়ে আকবরের এলাহাবাদ দুর্গের নকল করিয়া-ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা দুর্গনির্ম্মাণ-বিদ্যায় ভারতবাসী অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অগ্রগামী ছিলেন না। এডিনবারার দুর্গ এবং প্রাচীন নগর নির্ম্মাণের রীতি দেখিয়া মধ্যযুগের সভ্যতায় এসিয়া ও ইউরোপের ঐক্য ও সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেছি।

প্রাচীন যুদ্ধনীতির হিসাবে এডিনবারা অতি সুরক্ষিত নগর ছিল। চারিদিকে পর্ব্বত প্রাচীর—মধ্যস্থলেও পর্ব্বতকেন্দ্র—তাহার উপর দুর্গ।

এই দুর্গের চারিধারে জনগণের বাস। পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে সমুদ্র ও বন্দর। দুর্গের নিম্নে কৃষিভূমি। ফলতঃ কৃষি, বাণিজ্য ও আত্মরক্ষার সুযোগ এডিনবারা নগরীকে প্রকৃতি স্বয়ংই দান করিয়াছিলেন। রাজস্থানের উদয়পুরও ঠিক এইরূপ সুরক্ষিত ছিল।

নগর নির্ম্মাণের বিদ্যায় হিন্দুজাতি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পঞ্চদশষোড়শশতাব্দীতে বাঙ্গালী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কৃষিজীবী, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর জনগণের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া সেই নগরের গৃহ-বিন্যাস এবং পথসন্নিবেশের রীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্বাস্থ্য এবং আলোক বায়ু ইত্যাদির চলাচলের সম্বন্ধেও হিন্দু বাস্তুশিল্পিগণ চিন্তা করিতেন। আজকাল ইউরোপে সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনাকারী পণ্ডিতগণ নগর-নির্ম্মাণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়াছেন। হিন্দুজাতি বহুকাল হইতেই নগরতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছে। তাহার বাস্তুশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্রগুলির কয়েক অধ্যায় আজকালকার "Civico"বিজ্ঞান বা Town-Planning-কলার অনুরূপ। কিন্তু অনেক ভারতবাসীই বোধ হয় একথা না জানিয়া পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকতায় মুগ্ধ!

ব্যারাক-জীবন

নব্য এডিনবারার নূতনতম অংশে বাস করিয়া আধুনিক সভ্যতা ও সমাজজীবনের চরমসীমা দেখিতেছি। কলিকাতার ১০।১২।১৫ খানা Writers' Buildings বা হাবড়া রেলওয়ে-ষ্টেশন ইত্যাদি একত্রিত করিলে লম্বা চৌড়ায় এবং উচ্চতায় যেরূপ বাড়ী হয় সেইরূপ বাড়ী ঘর এডিনবারার এই অঞ্চলে নির্ম্মিত হইয়াছে। চুঁচুড়ার ব্যারাক্‌গুলি যত লম্বা তাহার দশগুণ বারগুণ লম্বা এখানকার প্রত্যেক ভবন—উচ্চতায় তিনগুণ। অবশ্য বাহ্য-সৌন্দর্য্য ঐ ব্যারাক্‌গুলি অপেক্ষা এখানে বেশী। এখানকার লোকজন এইরূপ ব্যারাক্‌জীবনই যাপন করিয়া থাকে।

এই প্রকাণ্ড মালগুদামের ভিতর দুই তিনটা কুঠুরী ভাড়া বা ক্রয় করিয়া পাশ্চাত্যেরা বাস করিতেছে। নিজের নিজের ঐ ঘর কয়খানার পার্শ্বে, উর্দ্ধে বা নিম্নে কাহারা বাস করে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় না। প্রতিবেশী বলিয়া কোন শব্দ এখানে নাই। তার পর এই ব্যারাকের মানবজীবন অতি বিচিত্র। স্ত্রীস্বামীতে মিলিয়া একটি পরিবার গঠিত। কাহারও বা দুই একটি শিশু সন্তান আছে—কাহারও বা নাই। সন্তানের জন্ম ইহাঁরা পছন্দ করেন না! ইহারা দোকানে হোটেলে খাবার কিনিয়া খায়—ঘরে রান্না করিবার অভ্যাস অল্প। অনেক স্থলেই একটি রমণী মাত্রেই পরিবার—কোথাও বা একজন মাত্র পুরুষই কামরার অধিবাসী। এই একজন দুইজন লোকে এদেশের পরিবার! পরিবারে পরিবারে প্রভেদ ইটের প্রাচীর দ্বারা সাধিত হয়।

"হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া !

* * *

ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট।"

ভারতের কুটিরে গোশালা হইতে তুলশী গাছ পর্য্যন্ত, শালগ্রাম শিলা হইতে খুড়তুত ভাইয়ের মাস্‌তুত ভাই পর্য্যন্ত বাস করে। সুতরাং পরিবারের মধ্যে বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য, জীবনবত্তা, সরলতা আছে। পশুসেবা, তরুসেবা, মানবসেবা, দেবসেবা স্বভাবতঃই হইতে থাকে। হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মেই প্রকৃতিপূজা স্থান পাইয়াছে।

এজন্যই এদেশের লোকেরা কথায় কথায় মুক্ত আলো, মুক্ত বায়ু, মুক্ত আকাশের জন্য লালায়িত হয়। ইহাদের সাধারণজীবন নিতান্তই অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাহাদের গৃহে প্রাঙ্গণ নাই—যাহারা আকাশ দেখিতে পায় না, যাহাদের পরিবারের স্বাভাবিক জীবনবিকাশের মধ্যে প্রকৃতির কোন স্থান নাই, যাহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা "বদ্ধ, অন্ধকার" তাহারা প্রকৃতির জন্য, পল্লীর জন্য, স্বাভাবিকতার জন্য মাঝে মাঝে বিপ্লবসাধন করিতে উদ্যত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিপূজা, রুশোর প্রকৃতিপূজা, ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃতিপূজা, অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবনযাপনের তীব্র প্রতিবাদ। ভারতবাসীর প্রকৃতিপূজা স্বভাবসিদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ, নৈসর্গিক—নিত্যনৈমিত্তিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্যেরা আজকাল লম্বা গলা করিয়া ভারতবাসীকে মুক্ত-আলো, মুক্ত-বায়ু ও মুক্ত-আকাশের মহিমা শিখাইতে আসিয়াছে! আর আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদিগের নিকট বুলি আওড়াইয়া বলিতে শিখিতেছি "ইউরোপের নিকট Out-door games গ্রহণ কর—পাশ্চাত্যের love of Nature সমাদর কর।" আত্মবিস্মৃতি আর কাহাকে বলে !

দেখিতেছি, ইউরোপীয়েরা আজ কাল Back to the Land, Back to Nature, Back to Village, Back to Cottage, Back to Family ইত্যাদি মন্ত্র জপিতে জপিতে ক্রমশঃ ভারতীয় আদর্শেরই সম্মুখীন হইতেছে। ইহারা এতদিনকার কৃত্রিমজীবনের দৈন্য কষ্ট দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া যথার্থ স্বাভাবিক মানবজীবনের দিকে ফিরিতেছে। সেই স্বাভাবিক স্বাধীন সরল প্রেমময় মানবজীবনের সমাজ ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যিনি বলিতে পারেন "Have I not reason to lament what man has made of man" তিনি ভারতের সেই পল্লীসভ্যতা এবং কুটিরজীবনকেই আদর করিতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের চিত্ত সম্মোহিত হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্যের সাময়িক বিজয় ও গৌরব দেখিয়া ভারতবাসী মত্ত হস্তীর ন্যায় "পাষাণ কায়া"র দিকে ছুটিয়াছিল। এখন আবার মায়ের কোলে ছুটিতেছে—কারণ ইউরোপ নিজেই সেই পাষাণ কায়ার "বিরাট মুঠিতলে" চাপা পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে। এই জন্যই এক্ষণে ভারতবাসী

"সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভাল।"—

এই তত্ত্ব মনে রাখিয়া জগতের নবযুগ প্রবর্ত্তনে পথপ্রদর্শক হইয়াছে।

কেবল এডিনবারা কেন, ইংলণ্ডের যত সহর দেখিলাম সর্ব্বত্রই এই ব্যারাক্‌জীবন এবং প্রায়ই "নাইক ভালবাসা, নাইক খেলা।" তাহার উপর, দুঃখ দারিদ্র্য ও কষ্টই কি এখানে কম? পয়সাওয়ালা লোক যে কয়জন আছেন তাঁহাদের কথা না ধরিলাম। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার এখানে সীমা নাই। সামান্য ধরণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এখানে যৎপরোনাস্তি অর্থব্যয় করিতে হয়। অত অর্থব্যয় করা কয়জন ইংরাজের

পক্ষে সম্ভবপর? প্রায় সকলেই বিনা স্নানে চিরজীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। হাতের দশ আঙ্গুল এবং চোখ মুখ কাণ ব্যতীত অন্য অঙ্গ জল দিয়া পরিষ্কার করা খুব অল্প সংখ্যক ইংরাজের কপালেই জুটে। কেন না জলের খরচ এখানে অত্যধিক। জল গরম করিবার জন্য কয়লার মূল্য বড় কম নয়। কাপড় চোপড় ধোয়ান জন্মের মধ্যে একটা কর্ম্ম স্বরূপ! কাজেই অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্নভাবে থাকা ইংরাজের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। নিতান্ত ধনী লোক না হইলে ভারতবাসীর আদর্শে পরিষ্কার থাকা পাশ্চাত্যজাতির পক্ষে অসম্ভব। তারপর রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই লেখা আছে "ফুটপাথে থুথু ফেলিবেন না— রাস্তায় থুথু ফেলিবেন না।" নূতন লোক আসিলে মনে করিবে "এ দেশের লোকেরা কতই না স্বাস্থ্যের জন্য যত্ন করেন!" ব্যাপার কি? থুথু ফেলিতে হইবে রুমালের মধ্যে—সেই রুমাল রাখিতে হইবে প্যাণ্ট বা কোটের পকেটে—অথচ এদেশে প্যাণ্ট বা কোট কখনই ধোপার বাড়ী পাঠান হয় না। সুতরাং থুথুর বীজ বা ব্যাসিলাইগুলি নিজের পরিচ্ছদের ভিতর সংক্রামিত হইতে থাকুক।

এ দেশের একটা প্রবাদ আছে "Cleanliness is next unto godliness" পাদ্রীরা একথা বেশী বলেন। আমাদের ইংরাজ অধ্যাপকেরাও ভারতবাসীকে যেখানে সেখানে যখন তখন এই কথা শুনাইয়া থাকেন। কারণ আর কিছুই নয়। যাহারা স্বভাবতঃ এবং দারিদ্র্যবশতঃ চিরজীবন অপরিষ্কার থাকিতে বাধ্য তাহাদের নিকট পরিষ্কার থাকাই দেবত্বের সমান হইয়া পড়িয়াছে। অথচ ভারতবাসীর বিবেচনায় পরিষ্কার থাকা অতি সামান্য মানবতার লক্ষণ মাত্র— ইহা আমাদের পক্ষে এত সহজ ও স্বাভাবিক যে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করাই প্রয়োজন হয় না। আমরা যাহা জন্মাবধি প্রাকৃতিক সুযোগে

ভোগ করিয়া থাকি এই দেশের লোকেরা তাহা কষ্ট কল্পনা করিয়া জীবনের চরম আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহারা যাহাকে দেবত্ব মনে করে আমরা তাহাকে পশুজীবনের ভিত্তিমাত্র বিবেচনা করি। ভারতবাসী যাহাকে দেবত্ব বিবেচনা করে তাহারা তাহা কল্পনা করিবে কোথা হইতে ?

আমরা নদ নদী জলবায়ু আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে এক হইয়া জীবন ধারণ করি। এ সমুদয়ের জন্য আমাদের কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য কলাপে স্বাধীনতা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যপূর্ণত বিরাজমান। সামান্য শরীরিক ধর্ম্ম পালন করা বিশেষ কোন উচ্চ অঙ্গের কার্য্য বিবেচনা করা আমরা বালকোচিত ভাবিয়া থাকি। স্নানাহার, উঠা-বসা, চলাফেরা এসব "সামান্যমেতৎ পশুভিঃ।" এগুলি মানুষের পশুধর্ম্ম-মাত্র। এগুলির উপরে উঠিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্মজীবনের সাধনা। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা এই পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই গলদঘর্ম্ম হইয়া যায়। জীবন-সংগ্রামের জন্য সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেই তাহাদের সকল প্রয়াস। তাহাদের সভ্যতার গোড়ার কথাই এই। পাশ্চাত্যসমাজে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা না বুঝিলে তাহাদের আধ্যাত্মিকতার অভাব বুঝা যাইবে না।

স্বভাবতঃ ইহারা বদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে জীবন যাপন করে। এজন্য আজকাল আইনের দ্বারা জোর করিয়া ছাত্রশিক্ষক অভিভাবকগণকে খোলা মাঠে বেড়াইতে বাধ্য করা হয়। তার পর স্নান করিবার অভ্যাস ইহাদের জন্মে না বলিয়া সরকার হইতে নগরের স্থানে স্থানে বৃহৎ "বাথ" স্নানাগার নির্ম্মাণ করা হয়। তাহাতে বিনা পয়সায় লোকেরা স্নান করিবার সুবিধা পায় কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে স্নানাগারের সংখ্যা কিছুই না। সুতরাং স্নানের দ্বারা পরিষ্কার হইবার বাসনা অনেকের মধ্যেই

জাগে না। যাহারও বা কিছু জাগে তাহার বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় না। কাজেই Cleanliness is next unto godliness—মন্ত্র পাশ্চাত্য জনগণের একটা আদার্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত রহিয়া যাইতেছে।

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ্

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজের কথা আমরা ভগিনী নিবেদিতার কাছে প্রথম শুনিয়াছিলাম। ইনি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডের শিক্ষাসংসারে বিশেষ প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান এবং প্রাণ-বিজ্ঞান ইঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সকল বিজ্ঞানের নিয়ম সমাজ-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি নগর-বিজ্ঞান বা "Civics" এর চর্চ্চায় নিযুক্ত।

ইনি আজ মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এডিনবারার প্রাচীন গিরিদুর্গের পার্শ্বেই ইঁহার গৃহ। এই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন কুঠরী হইতে সমগ্র এডিনবারা নগরীর পুরাতন ও আধুনিক অঞ্চল এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এক সঙ্গে দেখা যায়।

যথাসময়ে ইঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখা হইবামাত্র ইনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া থাকি। কাজেই সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ, নগর, পল্লী ইত্যাদি সকল বস্তুই প্রকৃতির নিয়মানুসারে বুঝিতে চেষ্টা করিতে ভালবাসি। আমার বিবেচনায় নগর ও পল্লীগুলি নরনারীর মৌচাক মাত্র। যে কারণে মধুমক্ষিকারা চাক প্রস্তুত করে মানুষেরাও সেই কারণে 'বসতি' প্রস্তুত করে। এই বসতিগুলির বৃদ্ধি, বিকাশ ও লয় মৌচাকের ইতিবৃত্তের অনুরূপ।" এই কথা বলিতে বলিতে ইনি আমাকে কতকগুলি প্রাচীন নগরের সমসাময়িক চিত্র দেখাইলেন। জয়পুরের অম্বর প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে অযোধ্যা, পাটলিপুত্র ইত্যাদি নগরের এইরূপ চিত্র দেখিয়াছি।

কাইরোর মুসলমানী সংগ্রহালয়ে ও মক্কা এবং মদিনা নগরদ্বয়ের এইরূপ চিত্র দেখিয়াছি। কাশী প্রভৃতি নগরের এইরূপ পটও আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইনি এই চিত্রগুলি দেখাইয়া প্রত্যেকটার বিবরণ বুঝাইতে লাগিলেন। কোনটা মাড্রিডনগরের চিত্র, কোনটা আমষ্টার্ডামনগরের চিত্র। কোনটা অক্সফোর্ডের চিত্র, কোনটা বা ফরাসী-নগরের চিত্র। স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ইত্যাদি নানাদেশের কতিপয় নগরের পট এইরূপে একসঙ্গে দেখিতে পাইলাম। অধ্যাপক গেডিজ এইগুলির তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। এই আলোচনার ফলেই নগর-বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রণীত হইবে। যতদুর জানি মনে হয়, গেডিজের পূর্ব্বে এ বিষয়ে কেহ হাত দেন নাই। অবশ্য নগরের রাষ্ট্রজীবন, শিল্প-জীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা গ্রন্থই লিখিত হইয়াছে। ফ্রেডরিক হ্যারিসন, ফ্রীম্যান এবং গ্রীণ নগর সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গেডিজের আলোচ্য বিষয় নগরনির্ম্মাণের রীতি। নগরের ভিতর গৃহনির্ম্মাণ, পথ সমাবেশ, প্রাচীরসংস্থান, দুর্গ-প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়গঠন ও মন্দিরস্থাপন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে বোধ হয় গেডিজই প্রথম আলোচনা করিতেছেন।

এই মানচিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন যুগের। প্রত্যেক চিত্রে গৃহ, দুর্গ, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, বিদ্যালয়, প্রাচীর, মন্দির ইত্যাদি সকল জিনিষই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমষ্টার্ডামের বন্দরে বহুসংখ্যক নৌকা এবং অর্ণব-পোতও চিত্রিত দেখিলাম। সকলগুলি এক সঙ্গে দেখিলে যুগে যুগে গঠনকৌশলের বিভিন্নতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একই নগর যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও অনুপাতের গৃহ, উদ্যান এবং দুর্গের আশ্রয়দাতা হইয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই-গুলির রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক কারণ এবং প্রভাব বুঝিবার সাহায্য

হয়। মোটের উপর, নগর-গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয় মানবসভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম দিক্ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ নগর-বিজ্ঞান সভ্যতা-বিজ্ঞানেরই নূতন এক অধ্যায়।

গেডিজ বলিলেন, "এডিনবারা সহর নগরবিজ্ঞান-আলোচনাকারী-দিগের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রথমতঃ এখানে প্রাচীন অবস্থা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। প্রাচীনের পার্শ্বেই নবীন গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক যুগের শৃঙ্খলা, ও বিশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কারু কার্য্য এবং কদর্য্যতা ও সৌষ্ঠবহীনতা এক সঙ্গে এই নগরে দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এডিনবারা নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়, আবার লণ্ডনের মত একটা বিশাল জনপদও নয়। নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলে নগরজীবনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য এখানে থাকিত না। অথচ বৃহৎ মহাদেশ বিশেষ হইলেও এডিনবারাকে নগর বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে হইত।"

তাড়াহুড়া করিয়া নগর নির্ম্মিত হইলে সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হয়। মধ্যযুগে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীনকালের নগরে গৃহ, পথ, উদ্যান—সকল বস্তুই বেশ সামঞ্জস্য সহকারে সন্নিবেশিত হইত। হঠাৎ যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবে অজস্র অর্থব্যয়ে নগরবেষ্টনী প্রাচীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইল, তখন বাড়ী ঘর রাস্তাঘাট ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রাচীন সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য ধ্বংস করা হইল। এদিকে নগরের ভিতরেও ঘেঁসা ঘেঁসি, স্থানাভাব, সঙ্কীর্ণ গলি, বহুতলবিশিষ্ট ঘর, অপরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি প্রভাব আসিয়া পড়িল। রণসজ্জার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া নগরের অধিবাসীরা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইল।

আজকালও সৌন্দর্য্যহীনতা এবং অসামঞ্জস্যের অনেক সাক্ষ্য পাইবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এডিনবারায় এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই যুগে জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট-প্রবর্ত্তিত দর্শনবাদের প্রভাবে এক

গোষ্ঠীভুক্ত বৈচিত্র্যহীন লম্বা লম্বা ভবন নির্ম্মিত হইতেছিল। সেই সমুদয়ের ভিতর ঐক্য পাইবেন, সামঞ্জস্য পাইবেন, বৈচিত্র্যের হানি পাইবেন—কিন্তু ব্যক্তিত্ব পাইবেন না। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা পাইবেন না। যাহাহউক তাহাতেও একপ্রকার সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছিল কারণ তাহাতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীনতা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার পর রেল আসিয়া জুটিল—এবং রেলের আনুষঙ্গিক নানাপ্রকার শিল্পের জন্য কল কারখানা, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির আমদানী হইল। এইগুলি রেলপথের সন্নিকটেই পুরাতন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া বিকট মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈচিত্র্য হীনতার মধ্যে বৈচিত্র্য আসিয়াছে বটে; কিন্তু এ কিরূপ বৈচিত্র্য? এ যে রাক্ষসের পরপীড়নশীল ব্যক্তিত্ব—এ যে উৎকট নিয়মহীনতার তাণ্ডব! এই অবস্থায়ই এডিনবারা এখনও রহিয়াছে। এই অবস্থায়ই আধুনিক ইউরোপের বড় বড় নগরগুলিকে দেখিতে পাইবেন।"

এইরূপ আলোচনা হইতেছে এমন সময়ে গেডিজের একজন শিষ্য ও ভক্ত উপস্থিত হইলেন। ইনি শ্রমজীবিকুলের অধিকার ঘোষণাকারী "ফেবিয়ান"-সম্প্রদায়ের সভ্য—তাঁহাদের একজন পাণ্ডা। তিনজনে আহারে বসিলাম। সেই সুরে গল্প চলিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখিতেছি, নগরবিজ্ঞান আলোচনার ফলে আপনি মধ্যযুগের মহিমা ও গৌরবের পক্ষপাতী হইতেছেন। আপনি কি স্যার ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় মধ্যযুগকে ফিরাইতে চাহেন? পাশ্চাত্য সমাজের সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবিয়াছেন? ভবিষ্যতে এ দেশের নগর বা পল্লী কোন্ আদর্শে গঠিত হইবে?" গেডিজ্ বলিলেন, "পারিলে, মধ্যযুগই ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টিত হইতাম। কিন্তু মধ্যযুগের সমর ও রণসজ্জা চাহি না। মধ্যযুগের মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, জাতিবিদ্বেষ এবং ঐক্যের অভাব চাহি না। আমার মনে

হয় মধ্যযুগের জার্ম্মাণ সমাজ যেরূপ ছিল আগামী যুগে পাশ্চাত্য সমাজ সেইদিকে যাইবে। জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে সভ্যতার বৈচিত্র্য থাকিবে—শাসনের বিভিন্নতা থাকিবে, শিল্পের ও কৃষির পার্থক্য থাকিবে। অথচ দেশ ভরিয়া (এবং এমন কি স্বদেশের বাহিরেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে) আদর্শের ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিজ্ঞানের ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইবে—যুদ্ধবিগ্রহ অপসৃত হইবে, যুক্ত-রাষ্ট্র সংগঠিত হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারিত হইবে। আমি প্রদেশ মাত্রের শিক্ষা, সভ্যতা ও শিল্পের স্বাতন্ত্র্য চাহি। প্রত্যেক region বা জনপদের ভিন্ন ভিন্ন বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যজীবন এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি—এইরূপই আমার মত। এই জনপদ গত (regional) স্বাধীনতা খর্ব্ব না করিয়া মানব ভবিষ্যৎ সভ্যতা গঠন করিবে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি কি আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন, পল্লী-সভ্যতা এবং বৈচিত্র্যপ্রিয়তা চাহেন? কেন না, সময়ে সময়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রবলভাবে না থাকিলেও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চিরকালই সমাজ ও সভ্যতার আদর্শে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য ছিল—অথচ প্রদেশে প্রদেশে, জনপদে জনপদে, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বাণিজ্য, শাসন, শিক্ষা, ইত্যাদি সকলবিষয়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্যও রক্ষিত হইত।" ইনি বলিলেন, "এইরূপ ঐক্যযুক্ত বৈচিত্র্য চাহি সত্য কিন্তু জার্ম্মাণি ও ভারতের দুই দেশেই রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম অত্যধিক ছিল। তাহা চাহি না।"

গেডিজের মতানুসারে আজকালকার রাষ্ট্রীয় ঐক্য বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। প্রত্যেক দেশে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতাকেন্দ্র এবং মানব-মৌচাক প্রস্তুত হইবে। অথচ এই মৌচাকগুলি পরস্পর সখ্যসূত্রে

আবদ্ধ থাকিবে। এই সখ্যসূত্রের নানা আকার দেখা যাইবে—(১) বিদ্যাজগতে বিজ্ঞানের প্রভাব সকল জাতিকে অর্থাৎ মানব-মৌচাককে একীকৃত করিবে। জগতের যে কোন স্থানের মানবমাত্রই বিজ্ঞানের ফলভোগ করিবে। (২) রাষ্ট্র-জীবনে Federation বা 'যুক্ত-শাসন'-প্রণালী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও জনপদে জনপদে বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে। International Tribunals বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়গুলি সেই ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিতেছে। (৩) ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত সন্ধিপত্র বা Zollverins এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিতে অভ্যস্ত হইবে। এইরূপ ঐক্য প্রবর্ত্তনের প্রভাবে জগতের নানা কেন্দ্রে নানাপ্রকার শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির বিকাশ হইতে থাকিবে।

খাওয়া দাওয়ার পর 'ফেবিয়ান' সমিতির যুবক সভ্য লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। গেডিজের সঙ্গে আমি চিড়িয়াখানায় আসিলাম। সহর হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে এই জুলজিক্যাল উদ্যান। এক বৎসর মাত্র এই উদ্যান তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই উদ্যান গঠনে গেডিজের হাত ছিল। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই উদ্যানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন জন্তু রক্ষা করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু পশুগণকে যথাসম্ভব প্রাকৃতিক অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল স্থান এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে গেডিজ বলিলেন "কেমন, মহাশয়, আমি নগর-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় পারদর্শী কি না? এই উদ্যানের জানোয়ারগুলির দিকে আমার দৃষ্টি বেশী নাই। ইহাদের আবাসস্থান, ইহাদের স্বভাব ও অভাব, ইহাদের প্রাকৃতিক ভবন ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেই আমি ভালবাসি। এই জন্য এই বাগান প্রস্তুত করিবার সময়ে পরামর্শ দিতে আমি স্বীকৃত হইয়াছিলাম।"

চিড়িয়াখানায় পঁচিশজন পুরুষ ও রমণীর সঙ্গে দেখা হইল। ইহাঁরা অধ্যাপক গেডিজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গেডিজ আজ ইহাঁদিগকে বাগানের জানোয়ারগুলি দেখাইবেন কথা ছিল। বাগানটা একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত। এখান হইতে এডিনবারা সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া পুষ্করিণী, গহ্বর, বন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে জন্তু যেরূপ স্থানে থাকিতে অভ্যস্ত তাহাকে সেইরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে। লোহার খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহাই এখানকার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষ হইতে একটি শিশু হস্তী আনা হইয়াছে। চিড়িয়াখানা সম্পূর্ণ হইতে এখনও ৫।৭ বৎসর লাগিবে।

জীবজন্তুগুলি দেখা হইয়া গেলে আমরা চা-পানের জন্য হোটেলে আসিলাম। চা-পানের পর আমাদের সঙ্গিগণের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া গেডিজকে ধন্যবাদ দিলেন। ইনি বলিলেন, "আমাদের এই পদার্থবিজ্ঞান-সমিতি অধ্যাপক গেডিজের নিকট অত্যন্ত ঋণী। ইনিই এই সমিতির জন্মদাতা। ইহাঁর পরামর্শেই আমরা দেশের তরুলতা, জীবজন্তু, নদ নদী বন উপবন এবং কৃষিক্ষেত্র, শিল্পকারখানা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য এই সমিতি গঠন করিয়াছি। তাঁহার নিকট আমি আপনাদের সম্পাদকভাবে সর্ব্বদাই সাহায্য পাইয়া থাকি। আজ আবার তিনিই আমাদের নায়ক হইয়া তাঁহার আদর্শানুসারে প্রবর্ত্তিত এই প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। ভবিষ্যতে ইহা কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে তাহাও জানিতে পারিলাম। ইনি না থাকিলে এত কথা বুঝিতে পারিতাম না। ইহাঁর অনুগ্রহে আমরা কেবলমাত্র জীবজন্তুগুলি দেখিলাম না সঙ্গে সঙ্গে একটি জুলজিক্যাল উদ্যান প্রস্তুত করিবার প্রণালীও শিখিয়া লইলাম। ইনি ৩ ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে কাটাইলেন এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য।"

এই ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর গেডিজ দাঁড়াইয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "আমাদের এডিনবারা এতদিন মরা জিনিসের অনুসন্ধানালয় ছিল। অস্থি কঙ্কাল, শবদেহ, ইত্যাদির আলোচনায়ই আমাদের নগর প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ জীবনের আলোচনায় আমরা মনোনিবেশ করিতেছি। সম্প্রতি ফরাসী পণ্ডিত বার্গসোঁ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় আমরা নূতন দিক হইতে জীবনকে চিনিতে শিখিয়াছি।

আজ এই জীবজন্তুর সংগ্রহালয়ে আপনারা উপস্থিত। এই বাগানে আজকাল প্রত্যহ ২০০।৩০০ নরনারী উপস্থিত হইয়া থাকেন। জীবনতত্ত্ব বুঝিবার জন্য স্কটল্যাণ্ডবাসীদিগের এই আগ্রহের কোন গভীর অর্থ নাই কি? আমার বিশ্বাস, আমরা অস্থিকঙ্কাল, ইটকাঠ, কলকব্জা ইত্যাদি ছাড়িয়া জীবনবত্তার কথা, এবং জীবনীশক্তির গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে যত্নবান্ হইয়াছি।"

সমাজ-তত্ত্ব

সর্ব্বসমেত তিনটি উচ্চস্থান হইতে এডিনবারার দৃশ্য দেখিলাম। সেদিন রাত্রিকালে কাস্‌ল-পর্ব্বতের সমীপস্থ কলটন্ পাহাড় হইতে নগরের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশগুলি দেখিয়াছি। উর্দ্ধ হইতে নগরের আলোকমালা পৃথিবীর তারকারাজির ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। কাল চিড়িয়াখানার পাহাড় হইতে নগরের পশ্চিম অঞ্চল এবং সন্নিহিত কৃষিভূমি মাত্র দেখিয়াছি। আজ নগরের সীমা ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলাম। সেখানে এক পর্ব্বত পৃষ্ঠে উঠিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত নগরের অর্দ্ধাংশ দেখা গেল। অপরার্দ্ধ কাস্‌ল এবং কলটন্ পাহাড়ের উত্তরদিকে। সে অংশ এখান হইতে দেখা গেল না। মোটের উপর বুঝিতে পারিলাম, মধ্যযুগের যুদ্ধরীতি বিবেচনা করিলে এডিনবারা অত্যন্ত সুরক্ষিত নগর ছিল। তিন দিকে পর্ব্বতপ্রাচীর একদিকে ফোর্থসাগর মধ্যস্থলেও পর্ব্বত তাহার উপরই দুর্গ ও নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কেন্দ্র-নগরের চারি পার্শ্বে কৃষিভূমি ছিল। এখন সেখানে নূতন নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

আজ গেডিজের বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল। আরও দুই তিনজন লোক উপস্থিত ছিলেন। একজন চিকিৎসক। ইনি প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতেছেন। ইনি বলিলেন "গ্রীকেরা যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছিল, দেখিতেছি, আমরাও প্রায় সেই সকল বিষয়ই এখনও আলোচনা করিতেছি। আমাদের নব্য এবং নব্যতর পণ্ডিতেরা যে সকল তত্ত্ব

প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, বুঝিতেছি, সেই সকল তত্ত্ব গ্রীকেরা বহু পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছিলেন। আমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্যালেনের গ্রন্থ গ্রীক হইতে অনুবাদ করিতেছি। তাহাতে অনেক আধুনিক মত দেখিতে পাইয়াছি। এজন্য অনুবাদকার্য্যে আমার আগ্রহ বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্যালেনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানিতে পারিলে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা বুঝিতে পারা যাইবে।"

একজন রমণীও চা-পান করিতেছিলেন। ইনি গেডিজের নগর-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিতেছেন। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইনি ভূগোল-বিজ্ঞান শিখিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে গেডিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইঁহার সঙ্গেই কর্ম্ম করেন। গেডিজের পুত্র, কন্যা এবং পত্নীও ইঁহার বন্ধু।

আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া গেডিজ আমাকে তাঁহার ইতিহাস-বিজ্ঞানের সারকথা বুঝাইলেন। মধ্যযুগের প্রথম অবস্থা হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা কিরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশসাধন করিয়াছে তাহার বিবরণ প্রদান করিলেন। গেডিজ সকল জিনিষই চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া থাকেন। কাগজ পেন্সিলের সাহায্য না লইয়া ইনি কোন তথ্য প্রকাশ করেন না। কথা বলিতে বলিতে ছয় সাতখানা চিঠির কাগজে ছবি আঁকা হইয়া গেল। সভ্যতাবিকাশের ধারা বুঝাইবার জন্য এইরূপ ব্যাখ্যাপ্রণালী নিতান্তই কার্য্যকরী।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসবিষয়ে আলোচনা হইয়া গেলে পর জগতের বিবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা হইল। ইনি ফরাসী দার্শনিক কম্‌তের নিয়মে বিজ্ঞানসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানগুলিকে বিক্ষিপ্তভাবে না দেখিয়া ইনি পরস্পর সাপেক্ষভাবে বিবেচনা করেন। ইনি বৈজ্ঞানিক মহলে শ্রমবিভাগনীতির বিশেষ

পক্ষপাতী নন। ইঁহার মতে কোন বিদ্যার আলোচনাকালে অন্যান্য বিদ্যা ভুলিয়া থাকা উচিত নয়।

বিজ্ঞানসমূহের পরস্পরসাপেক্ষতা সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি বক্তৃতায় বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"This multifarious division of labour, with its corresponding specialisms, arose to promote civilisation, and to further the productivity of each individual life; yet now it overpowers the individual, and is more than threatening the community. * * * * The advancing sciences are coming to realise their manifold connections, their profound and intimate unity: the art no longer content with the separate pursuit of technical perfection, are striving towards harmony; and this, with widening aims, of expression and of citizenship. This humanising and reunion of the Sciences, this kindred orchestration and application of the arts, are now seen as the essential problem and movement of our time."

পাশ্চাত্য জগতে এক্ষণে একটা বিরাট বিপ্লব চলিতেছে। ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা এবং ভবিষ্যৎগতিসম্বন্ধে গেডিজ তাঁহার Sex নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The essential transition is that in progress within the Industrial Age itself, that between its initial lower phase and the incipient higher one—is a word, from the past century of paleotechnic industry, mechanical,

militant, mometary, to the opening one, that of a neo-technic civilisation, founded upon more skilled and scientific industries and arts, and aiming towards truer peace than any which can be guaranteed by armour ; and towards these ends sustained alike by synthetic intelligence and by creative Idealism. On one side is the present dominant Civilisation—of Coal and steam, of machinery and cheap products, of expanding markets and widening empires—themselves groaning under ever increasing armaments, torn by fiscal disputes, and ruled by the financiers' assumed omnipotence. * * * Even the 'progress' of which it has boasted so much is too little to be estimated in quality of life, however easily in quantity. * * * wherever any words be said of progress in quality of civilisation and of life towards its ideals, then there is silence ; or if that will not answer, a very tumult of utilitarians and paleotects crying out with one voice 'Away with these Utopions !'

Yet the advance quietly making in our own generation, since Ruskin was thus hooted out of Economics is that his prophecies of the final social economy we here call neo-technic are actually coming to pass. * * * The practical Utopians are already at work, and even drafting, as here, their historic estimate of the receding

futilitarians. * * * This central antithesis of paleotechnic, and neotechnic, thus involves the passage from the predominant mechanocentric thought and philosophy of industrial man to the originative, bio-centric instinct aud inspiration of domestic woman. Thus, in a word, we find ourselves meeting Bergson upon a fresh path.

কৃষি-শিক্ষা ও শিল্প-কলেজ

য়্যাণ্ড্রু কার্ণেজি স্কটল্যাণ্ডবাসী দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য ১৫০০,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে মহসিনের প্রদত্ত ধনভাণ্ডার হইতে মুসলমান ছাত্রেরা যেরূপ প্রতিপালিত হয়, স্কটল্যাণ্ডেও সেইরূপ অধিকাংশ বিদ্যার্থীই এই ধনভাণ্ডার হইতে কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সাহায্য পাইয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষার জন্য এরূপ সুবিধা অন্য কোন সমাজে নাই। এখানকার নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধেও দরিদ্র পরিবারের কোন বাধা ঘটে না। বাস্তবিক পক্ষে, স্কটল্যাণ্ডের গবর্মেণ্ট এবং ধনী মহাজনেরা দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি সুবর্ণ মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যেরূপ আগ্রহ, ইংলণ্ডে সেরূপ নাই।

কেবল তাহাই নহে। দেশীয় কৃষকগণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্যও স্কটল্যাণ্ডে যারপর নাই প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। কৃষিক্ষেত্র, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে এখানকার গবর্মেণ্টের এবং শিক্ষাবিভাগের যত্ন অত্যন্ত বেশী। ইংলণ্ডে কৃষির জন্য দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু এত বেশী বোধ হয় নাই।

কৃষিকর্ম্মের জন্য স্কটল্যাণ্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবার্ডিন নগর হইতে উত্তর কৃষিবিভাগ, গ্লাস্‌গো হইতে পশ্চিম কৃষি-বিভাগ এবং এডিনবারা হইতে পূর্ব্ব কৃষি-বিভাগ পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিন কেন্দ্রে স্থানীয় সুবিধা অসুবিধা এবং সুযোগ দুর্য্যোগ বিবেচনা করিয়া কৃষকগণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া কৃষি কলেজ ত আছেই। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রের অন্তর্গত জেলায় জেলায়

বিভিন্ন পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে কৃষি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা কৃষকগণের সঙ্গে মিলিয়া উন্নত কৃষিপ্রণালীর পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কৃষিজীবিগণকে বক্তৃতা দ্বারা নূতন নূতন সারের কথা, বীজের কথা, কলম করিবার কথা, গভীর চাষের কথা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বুঝান হইয়া থাকে। এই সকল কৃষকের সন্তানগণকে মফঃস্বল হইতে কেন্দ্রের বড় কলেজে পাঠাইয়া শিক্ষিত করাও হয়। ফলতঃ পণ্ডিতে ও কৃষকে সর্ব্বদা সংযোগ দেখা যায়, এবং কৃষিবিষয়ক নূতন জ্ঞান দেশের সর্ব্বত্রই অতি অল্পকালের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। বিগত ১৪।১৫ বৎসর হইতে এই প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে।

এডিনবারা কেন্দ্রের কৃষিকলেজ দেখিলাম। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, পরীক্ষা-গৃহ, অনুসন্ধানালয় সবই এখনও ক্ষুদ্র—কিন্তু বিস্তৃত করা হইতেছে। মেণ্ডেল-তত্ত্বের নিয়মানুসারে মেষ জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের ফল পরীক্ষা করা হইতেছে। কেম্ব্রিজেও ইহা দেখিয়াছিলাম। এখনও ফল বুঝা যাইতেছে না। যব উদ্ভিদের ও কলম করার ফল এবং সংমিশ্রণের প্রভাব পরীক্ষা করা হইতেছে। অধ্যাপক মহাশয় সংগ্রহালয়ে লইয়া যাইয়া সেগুলি দেখাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইংলণ্ডে আমেরিকার লুথার বার্বাঙ্কের আশ্চর্য্যজনক কৃষি-প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে কি? বার্বাঙ্ক নব নব জাতীয় উদ্ভিদ সৃষ্টি করিতেছেন। আপনারা তাঁহার নিয়ম অনুসরণ করিয়া কোন ফল পাইয়াছেন কি?" একজন অধ্যাপক বলিলেন, "মহাশয়, আমরা আমেরিকান্‌দের কথা বিশ্বাস করি না। আমি বার্বাঙ্কের New Creations বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া কালিফর্ণিয়ায় তাঁহার কৃষিভূমি দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু বার্বাঙ্ক সেগুলি দেখাইতে সম্মত হইলেন না!"

কলেজের সম্পাদকের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হইল। ইনি বলিলেন "কৃষিকর্ম্মে কলের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃহৎ কৃষি-ভূমিতে কলের সাহায্য লইলে সুবিধাই হয়। বেশী লোক নিযুক্ত করিতে হয় না। কাজেই অনেক লোক কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। স্বদেশে কর্ম্ম না পাইয়া লোকেরা অষ্ট্রেলিয়া, ক্যান্যাডা, ইত্যাদি উপনিবেশে চলিয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসরে এত লোক দেশত্যাগ করিয়াছে যে, কোন কোন জেলায় প্রায় শতকরা ২৫ জন লোক কম দেখা গিয়াছে। এই অবস্থা অতীব শোচনীয়। গবর্মেণ্ট বাধ্য হইয়া জনগণের দেশত্যাগ বন্ধ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে দেশের ভিতর কাজের সন্ধান করিয়া দিতেও বাধ্য হইয়াছেন। নূতন কাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিভূমি ও পশুপালনের কর্ম্ম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট এক্ষণে কৃষির কতিপয় ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনে উৎসাহ দিতেছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এই বলিলেন যে, স্বাভাবিক ভাবে লোকেরা বড় বড় অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাতে কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইত্যাদির প্রচলন বাড়িতেছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট আইন করিয়া ছোট ছোট কারবারও তৈয়ারী করিতেছেন! বড় বড় কারবারের সঙ্গে ছোট কারবারগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে পারিবে কি? স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে এই কৃত্রিম অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইবে না কি?"

ইনি বলিলেন, "কতকগুলি কারবার আছে যাহাতে ক্ষুদ্র আয়োজন এক্ষণে অসম্ভব। গোধূম, যব, শস্য, ইত্যাদি পদার্থের চাষ আজকাল বৃহৎ ক্ষেত্রেই হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে এই সমুদয়ের আবাদ করিয়া সুফল পাওয়া যাইবে না। গবর্মেণ্ট তাহা চেষ্টাও করেন না। কিন্তু পশুপালন, গো-দোহন, ডিম্বের চাষ, শাক সব্জী, ফুলফল ইত্যাদি কতকগুলি কারবারে বড় অনুষ্ঠান প্রয়োগ করা কঠিন। করিলে লাভও

হয় না। এই সমুদয় কার্য্যে মালিকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তিই বিশেষ কার্য্যকরী। এই সকল ক্ষেত্রে চাকর লাগাইয়া কাজ করিলে সুফল পাওয়া যায় না। কারণ কর্ত্তার চোখ সর্ব্বদা এইদিকে রাখা আবশ্যক। কাজেই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান এই সকল কৃষি-কর্ম্মে টিকিয়া যাইবে। সুতরাং ক্ষুদ্রে বৃহতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন আশঙ্কা নাই। বৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র কৃষির অনুষ্ঠান সতেজে চলিতে পারে।”

এইরূপে বিশেষ চেষ্টা করিয়া স্কটল্যাণ্ডে Small Holdings রক্ষা করা হইতেছে। তাহার ফলে দেশত্যাগী জনগণের সংখ্যাও কিছু কমিয়াছে।

এই কৃষিকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়। গবর্মেণ্টের টাকায় ইহা পরিচালিত হয়। কিন্তু গবর্মেণ্টের শাসন-বিভাগের সঙ্গে অথবা শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। কলেজের জন্য স্বতন্ত্র পরি-চালক সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কৃষিশিক্ষাও দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-ছাত্রেরা ডিগ্রী-লাভ করে। সুতরাং ইহার অধীনে কৃষিবিষয়ক ল্যাবরেটরী, অনুসন্ধানালয় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যা-লয় এবং এই কৃষিকলেজ অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উভয়ের কিছু লাভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা মাত্র ল্যাবরেটরী ভাল করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে—আবার কলেজে অন্য কতকগুলি ভাল করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উপায়ে উভয়ের একই ল্যাবরেটরী তৈয়ারী করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কলেজের ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। অপর কলেজের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে কাজ করে।

এই সুবিধা এডিনবারার শিল্প-কলেজেও দেখা যায়। এখানকার হেরিয়ট-ওয়াট শিল্প-কলেজ সুপ্রসিদ্ধ। ইহাতে মুদ্রন, পুস্তক বাঁধাই, কাগজপ্রস্তুতকরণ, ঔষধপ্রস্তুতকরণ, খনিজ পদার্থ পরীক্ষাকরণ ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম শিখান হয়। এতদ্ব্যতীত মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। এদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনেও এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার কোন কোন বিভাগ শিখান হয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হেরিয়ট-ওয়াট কলেজের একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে কারখানা ও ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করিবার খরচ উভয়েরই যথেষ্ট বাঁচিয়া গিয়াছে।

এই কলেজে রাত্রে প্রায় ২৫০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করে: দিবাভাগে ইহারা ছাপাখানায়, ডাক্তার খানায় অথবা অন্য কোন দোকানে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। রাত্রিকালে নূতন নূতন বিদ্যা শিখিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির পথ প্রস্তুত করে। কেহ ব্যবসায় শিখে, কেহ ছাপাখানার দু এক বিভাগের কাজ শিখে, কেহ বই বাঁধাইতে শিখে, কেহ রাসায়নিক কর্ম্মে অভ্যস্ত হয় ইত্যাদি। দিবাভাগে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ২৫০।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অনেকক্ষণ ধরিয়া কারখানা ও ল্যাবরেটরীগুলি দেখাইলেন। পূর্ব্বে খনিজ-বিদ্যাবিষয়ক এঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারখানা কখনও দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যা এখনও শিখান হয় না। খনির ভিতরে বায়ু প্রবেশ সম্বন্ধে কয়েকজন ছাত্র শিক্ষা করিতেছিল। ইহা বুঝাইবার যন্ত্রটা দেখিলাম।

মেক্যানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাবিষয়ক কারখানায় একটা নূতন নিয়ম দেখা গেল। প্রিন্সিপ্যাল বলিলেন, "বড় বড় কলগুলি অনেক সময়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরান আবশ্যক হয়।

কিন্তু সাধারণ ল্যাবরেটরীতে সেগুলি সরাইবার স্থবিধা থাকে না—মেজের সঙ্গে কলগুলি গাঁথা থাকে। আমরা একটা নূতন নিয়ম করিয়াছি। মেজেতে রেল পাতা আছে। তাহার উপর বসাইয়া যেরূপ ইচ্ছা কলগুলি ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি।”

এখানকার কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতেও দুই একটা নূতন নিয়ম দেখিতে পাইলাম ঘরের দূষিত বায়ু তাড়াইবার জন্য টেবিলের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে একটা করিয়া আবৃত ছিদ্র আছে। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরকার বড় নলের যোগ আছে। তাহাতে সর্ব্বদা কল ঘুরিতে থাকে। তাহার ফলে হাওয়া নলের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়।

কারখানা ও ল্যাবরেটরীর সকল বিভাগ দেখিয়া অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁহার কামরায় ফিরিয়া আসিলাম। অধ্যক্ষ বলিলেন, “মহাশয় লোহা লক্কড় সাজ সরঞ্জাম ত দেখিলেন। আমরা এই সমুদয়ের যথাসম্ভব উচ্চশ্রেণীর আয়োজনই করিয়াছি—ছাত্রদিগকেও সাধ্যমত উন্নত শিক্ষা দিয়া থাকি। কিন্তু এই শিক্ষার ফলে দেশের কোন প্রকার মঙ্গল হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আমাদের সমাজ ও পরিবার ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছে। কেবল মাত্র টাকা রোজগার করিতে পারিলেই কি সুখী হওয়া যায়? আমাদের মনুষ্যত্বই যে লোপ পাইতেছে। কল কারখানার প্রভাবে মানুষ স্বকীয় শিল্পজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যানুভূতি ভুলিয়া যাইতেছে। আজকাল শ্রমজীবিগণকে কোন কলের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় মাত্র। নিজ হাতে কোন কাজ করিতে হয় না—বুদ্ধি খাটাইয়া কোন সমস্যা পূরণ করিতে হয় না। কলের দাস স্বরূপ মানুষেরা নির্জ্জীব-ভাবে কারখানার মধ্যে কাজ করে। কলগুলি মানুষের কর্ম্মে সাহায্য করে না—মানুষই কলের কেনা চাকর। এমন কারবার নাই যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব লুপ্ত না হইতেছে। কল কারখানা

সকল শিল্পকেই প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। সূত্রধরের কার্য্য এবং ইট তৈয়ারী করা ব্যতীত অন্য কোন শিল্পে হাতের কাজ এবং কলাজ্ঞান দেখাইবার অবসর সম্প্রতি পাওয়া যাইবে না। অন্য সকল বিভাগে মানুষ জীবনহীন যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর ফ্যাক্টরীর কুলীগণের চিত্র কল্পনা করুন। আপনি কখনও লীড্‌স্, ম্যাঞ্চেষ্টার বা বার্মিংহামে গিয়াছেন কি? এই সকল স্থানে গেলে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবেন না। কারখানা-গুলি দেখিবেন। তাহা হইলে আমার কথা বুঝিতে পারিবেন। মানবের জীবন কত নিস্পন্দ অসার পাশবিক ও ঘৃণিত হইতে পারে তাহা নিজ চোখে দেখিতে পারিবেন। মালগুদামের মালগুলি যে অব-স্থায় থাকে অথবা কারখানার কল ও যন্ত্রগুলি যে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে ফ্যাক্টরীর মজুরেরা ঠিক সেই ভাবে জীবনধারণ করে। আকাশে ঘন কৃষ্ণ ধূমরাশির আবরণ নিম্নে যোজনবিস্তৃত লম্বা লম্বা কুলীগৃহ, তাহার মধ্যে নরনারীগণের আবাসস্থল। জানোয়ারেরাও ইহা অপেক্ষা স্বাধীন-ভাবে স্বচ্ছন্দভাবে সুখে জীবনযাপন করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আজকাল নাকি ইংলণ্ডে এই কলকারখানাপ্লাবিত শিল্পজীবনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে? ছোটখাট কুটির-শিল্প প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ চলিতেছে? ফ্যাক্টরীর পরিবর্ত্তে পরিবারগত শিল্পপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে?" ইনি হাসিয়া বলিলেন, "কিরূপ জানেন? যেমন সখ করিয়া বড় ঘরের মেয়েরা নিজ হাতে ফিতা বা জ্যাকেট তৈয়ারী করেন সেইরূপ! তাহার দ্বারা তাঁহারা নিজ অভাব মোচন করিতেছেন সে কথা ভাবেন না। বৈঠকখানায় পোষাকী আস্‌বাব স্বরূপ সেগুলি রাখিয়া থাকেন মাত্র। ইংরাজ-সমাজেও আজকাল কোথাও বা কুটির প্রতিষ্ঠা হইতেছে—কোন কোন স্থানে

স্ত্রীস্বামী পরিবার বদ্ধ হইয়া ছোট ছোট শিল্পের আয়োজন করিতেছে—কোথাও বা বিশাল ফ্যাক্টরীর পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রায়তন ফ্যাক্টরী তৈয়ারী হইতেছে। আমার মতে কয়েকজন লেখা পড়া জানা লোক হয়ত সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্নও হইয়াছেন। কাগজে পত্রে ঘোরতর আন্দোলনও চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত শিল্প ও ব্যবসায়ের সংসারে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। এই সকল নূতন প্রয়াসের কোন প্রভাব দেশের আর্থিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বড় বড় কারবারের লক্ষপতি কার্য্যাধ্যক্ষেরা মাঝে মাঝে পল্লীতে যাইয়া এই নূতন প্রয়াসের অনুষ্ঠানগুলি দেখিয়া আসেন। ফিরিবার সময়ে মুচ্‌কি হাসিয়া নিজেদের অজেয়তাবিষয়ে আশান্বিত হন। মহাশয়, এই নূতন প্রয়াসগুলি ছেলে খেলা মাত্র।

যাহা হউক, আমরা নূতন আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি, পুরাতন প্রথার অসম্পূর্ণতাগুলি ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাপান, চীন ও ভারতবর্ষে আমাদের বর্জ্জনীয় দোষসমূহেরই অনুকরণে আরব্ধ হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, আমরা যেগুলি ছাড়িয়া দিই প্রাচ্যেরা সেইগুলি গ্রহণ করে!”

নগর-পর্য্যবেক্ষণালয়

সেদিন রাত্রে কল্টন পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া এডিনবারার আলোকমালা দেখিয়াছিলাম। আজ দিবাভাগে এখান হইতে ফোর্থ উপসাগর দেখিতে পাইলাম। কল্টন পাহাড় কাস্‌ল পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকে এবং কিছু উত্তরে অবস্থিত। এখান হইতে নগরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল অংশই দেখা যায়।

এই পাহাড়ে কয়েকটা দেখিবার জিনিষ আছে। প্রথমতঃ, নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ, দ্বিতীয়তঃ নেলসন মনুমেণ্ট। লণ্ডনে যে ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ার এবং তাহার মধ্যে বিরাট স্তম্ভ প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই ঘটনার জন্যই এখানে এই উচ্চ স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সম্মুখে লিখিত আছে—"স্কটল্যাণ্ডবাসী নেল্‌সনের জন্য শোকপ্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন নাই। যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে সেজন্যও তাঁহারা এই মনুমেণ্ট প্রস্তুত করেন নাই। প্রয়োজন হইলে দেশবাসিগণ নেলসনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে—এই আশায়ই টাওয়ার নির্ম্মিত হইল।"

এই পাহাড়ে আর একটা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্কটল্যাণ্ডে সকল বিষয়ই গ্রীক আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা হইত। এডিনবারাকে উত্তর ইউরোপের এথেন্স নগরে পরিণত করা তখনকার লোকের লক্ষ্য ছিল। সেই যুগের সাহিত্য, দর্শন, কলা ইত্যাদি সকল বিষয়ে 'ক্লাসিক'-রীতি প্রবর্ত্তিত হইত। সেই আন্দোলনের প্রভাবে

এথেন্সের "য়্যাক্রোপোলিস" ভবনের ন্যায় এই পাহাড়ে একটা বিরাট অট্টালিকার নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। তাহার ১৫টি মাত্র স্তম্ভ বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করা হয় নাই। ইতিমধ্যে স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রাদুর্ভাব হয় এবং শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, ক্লাসিক রীতির বিরুদ্ধে ঘোরতর বিপ্লব ও আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লবের নাম "রোমাণ্টিক"। গ্রীক যুগের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লববাদীরা মধ্যযুগের ধরণ ও রীতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার প্রভাব গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্যার ওয়াল্টার স্কটের পরামর্শে এডিনবারার জেলখানা প্রস্তুত করিবার সময়ে মধ্যযুগের গথিক-রীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। কণ্টন পাহাড়ের পাদদেশেই এই গৃহ অবস্থিত। এক্ষণে ইহা দেখিলে মধ্যযুগের দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ স্বরূপ মনে হয়।

কণ্টন পাহাড় হইতে কাস্‌ল পাহাড়ে আসিলাম। কাসলের প্রাঙ্গণের পাদদেশেই অধ্যাপক গেডিজের "নগর-বিজ্ঞান"-আলয় অবস্থিত। গেডিজ তাঁহার চিরজীবনের অর্জ্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ সমস্তই এই বিজ্ঞানালয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন। গেডিজ এখনও বেশী গ্রন্থ লিখেন নাই। ইহাঁর প্রকাশিত পুস্তক অল্পমাত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাঁর চিন্তার ফল বহু লোকই পাইয়াছেন। ইহাঁর সঙ্গে আলোচনা করিয়া অনেকেই 'মানুষ' হইয়াছেন। আমাদের অধ্যাপক শীলের কথা মনে পড়ে।

এই নগর বিজ্ঞানালয়ের নাম "আউট্‌লুক টাওয়ার" পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ। নগরের ভূতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিবৃত্ত এবং সমাজ-জীবনের ধারা বুঝিবার জন্য এই ভবন নির্ম্মিত। ইহার ভিতরে প্রাচীন ও আধুনিক স্কটল্যাণ্ডের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই

সংগ্রহালয়কে "ভৌগোলিক মিউজিয়াম", "ঐতিহাসিক চিত্রশালা" রূপে বর্ণনা করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে, সাধারণ লোক ইহার ভিতর আসিলে কোন বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইতিহাস সম্বন্ধীয় এবং ভূগোল বিষয়ক ল্যাবরেটরী বিবেচনা করিবে।

প্রথমে তেতালার ছাদের উপর গেলাম। সেদিন গেডিজের গৃহে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তিনি এখানে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে আয়র্ল্যাণ্ডের একজন ব্যক্তিও দর্শক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুইটি রমণীও দেখিতে আসিয়াছেন।

তেতালার ছাদের দেয়ালে এডিনবারার ভূতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সমীপবর্ত্তী পাহাড়ের মৃত্তিকা-বিন্যাস যেরূপ ঠিক সেইরূপ প্রস্তর-বিন্যাসের দ্বারা প্রাচীর প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রাচীরের স্তর-গুলি দেখিলে এডিনবারার পাহাড়গুলির ভূতত্ত্ব বুঝা যায়।

এখান হইতে উচ্চতম গোলঘরের উপর উঠিলাম। ক্ষুদ্র গৃহ ছাদ সবুজাকৃতি—তাহার কেন্দ্রস্থলে ছিদ্র—ছিদ্রের উপর একখানা লেন্স বসান আছে। সেই লেন্সকে দড়ির সাহায্যে ঘুরান ফিরান যায়। এদিকে গৃহের ভিতর একখানা গোলাকৃতি টেবিল ঝুলিতেছে, ইহাকে উঠান নামান যায়। আমাদের প্রদর্শক লেন্সটা ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নগরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব টেবিলের উপর পড়িতে লাগিল। এই গৃহে দাঁড়াইয়া সমস্ত নগরের মৃত্তিকা, পর্ব্বত, উপসাগর, রাস্তাঘাট, ট্রাম, মোটরকার, রেলপথ, বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহ, দুর্গ, লোকের গতায়াত, কলের ধূম, তরুলতা, পশুপক্ষী সবই দেখিতে পাইলাম। কেবল তাহাই নহে—লেন্সের ভিতর দিয়া প্রতিবিম্বিত হইবার ফলে বস্তুগুলি অতি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত দেখাইতেছে। শুনিলাম

অনেক চিত্রকর আসিয়া এখান হইতে নগরের বিভিন্ন অঞ্চলের শোভা বুঝিয়া যান। এই গৃহের নাম "ক্যামেরা", এরূপ ক্যামেরা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ক্যামেরা হইতে নামিবার সময়ে গোল গৃহের চারিধারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া নগরের সকল অংশ দেখিয়া লইলাম।

ক্যামেরার নিম্নতলে ভূগোল শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি বুঝান হইয়াছে। ভূগোল কেবলমাত্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতের বিবরণ নয়। গেডিজ ভূগোল বিদ্যাকে অতি বিস্তৃতভাবে দেখিয়া থাকেন। আকাশতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব সকলই ভূগোলের অন্তর্গত। এই গৃহে সংক্ষিপ্তরূপে সকল বিষয়ই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য সংগ্রহ অতি সামান্য ধরণের—মোটের উপর, আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে পারা গেল।

তাহার নিম্নতলস্থ গৃহে এডিনবারা নগরের সকল প্রকার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। চিত্র, ম্যাপ, ফটোগ্রাফ, মডেল, ইত্যাদির সাহায্যে নগরের সৃষ্টি, ঠিকানা ও ইতিহাস বুঝা গেল। পৃথিবীর মধ্যে কি উপায়ে কখন এডিনবারা মানববসতির উপযুক্ত হইল, তাহার পূর্ব্বে কি ছিল, পরে কখন কোথায় পল্লী গঠিত হইল, পল্লী কিরূপে নগরে পরিণত হইল, তাহার পর নগরের দুর্গ, প্রাসাদ মন্দির বিদ্যালয় কেন কোথায় কি রীতিতে প্রস্তুত করা হইল—এই সকল কথাই এই গৃহের প্রদর্শিত বস্তুর কাহিনী। এডিনবারা গৃহের ন্যায় স্কটল্যাণ্ড-গৃহও এইরূপ গঠিত। প্রাচীন স্কাণ্ডিনাভিয়া ও কেল্টিক এবং আইরিশ জাতিসমূহ হইতে স্কট জাতীয় লোকেরা কিরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছে, চিত্রের সাহায্যে সেই সমুদয় বুঝিতে পারিলাম। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মানচিত্র দেখা গেল—যুগে যুগে স্কটল্যাণ্ড জগতের সভ্যতাধারার কোন্ কোন্ অংশে অবস্থিত ছিল সেগুলি মানচিত্র হইতে সহজেই বুঝা যায়।

ইতিমধ্যে গেডিজ আসিলেন। গেডিজের গৃহ এখান হইতে এক মিনিটের পথ। গেডিজ তাঁহার পরিকল্পিত গৃহের খুঁটিনাটি সকল বুঝাইতে লাগিলেন। কোন্ চিত্রের কি অর্থ, এবং কেনই বা তাহা অমুক স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অনেক কথা বুঝিয়া লইলাম। পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তায় যে সকল তথ্য শুনিয়াছি সেগুলি আজ ইহাঁর সংগ্রহালয়ের চিত্র, পুস্তক, ফটোগ্রাফ এবং ম্যাপ দেখিয়া স্পষ্টভাবে বুঝা গেল।

গেডিজ দার্শনিক কম্‌তের শিষ্য। ইনি ফরাসী পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। ইহাঁর মতে ফরাসী জাতির সংশ্রবে থাকিয়াই স্কটল্যাণ্ডের সভ্যতা গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন-কালের রাজরাজড়া হইতে রাণী মেরী, ধর্ম্মপ্রচারক নক্‌স্, দার্শনিক কার্লাইল এবং ঔপন্যাসিক স্কট পর্য্যন্ত সকলেই মুখ্যতঃ অথবা গৌণতঃ ফরাসী প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই কথা গেডিজের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই। যাহাহউক, কম্‌তের "ইতিহাস-বিজ্ঞান" এবং "বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ" গেডিজের চিন্তারাজ্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁর "আউটলুক টাওয়ার" গঠনে ভূগোল-বিদ্যায় "বিজ্ঞানের পরস্পর-সাপেক্ষতা" বিশদরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কোন বিদ্যাই যে অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইতে পারে না, এই ভৌগলিক সংগ্রহালয়ে গেডিজ তাহা বুঝাইয়াছেন।

ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায়ও গেডিজ কম্‌তের পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। অবশ্য নূতন চর্চ্চার ফলে ইনি কতকগুলি নূতন দিকে তথ্যরাশি সাজাইয়া গুছাইয়া মত প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁর চিন্তার "কাঠামো" ইংরাজ পণ্ডিত ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসন সম্পাদিত কম্‌তের New Calendar of Great men বা "মহাপুরুষ পঞ্জীর" আদর্শে গঠিত। এই আউটলুক টাওয়ার-গৃহে মানবসভ্যতার ইতিহাস-ধারা চার্ট

ও মানচিত্রের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। চিত্রগুলি দেখিলে বুঝা যায় কম্‌তের আদর্শ ইনি কতখানি গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহাঁর স্বাতন্ত্র্য তাহাও ধরিতে পারা যায়। New Calendar of Great men-গ্রন্থে বীরবর্গের জীবনকথাই বিবৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভূমিকার ভিতর জনসাধারণ এবং সভ্যতাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গেডিজের চর্চ্চায় এই প্রবাহের বিবরণই বিশেষ-রূপে পাইতেছি। ইনি বীরপুরুষগণের নাম বেশী উল্লেখ করেন না।

অদ্য বিকালে অধ্যাপক নিকল্‌সনের সঙ্গে দেখা হইল। ইনি ধন-বিজ্ঞান মহলে প্রসিদ্ধ। ইনি বলিলেন, "ভারতীয় ধনবিজ্ঞান অথবা সাধারণ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিলেই চলে। তবে ওখানকার মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিছুকাল পূর্ব্বে ভূমির কর বিষয়েও চর্চ্চা করিয়াছিলাম। গবর্মেণ্টের প্রকাশিত কাগজ-পত্র ব্যতীত আমি বিশেষ কিছু জানি না। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র গ্রন্থও দেখিয়াছি।" অক্‌স্‌ফোর্ডের এজ্‌ওয়ার্থ, কেম্ব্রিজের কানিংহাম এবং এডিনবারার নিকল্‌সন তিনজনই এক গোত্রের লোক!

জীবন-বিকাশের নিয়ম

আজ অধ্যাপক গেডিজের সঙ্গে ডাণ্ডি ও সেণ্টয়্যাণ্ড্রুজ নগরদ্বয় দেখিতে গেলাম। ঐ দুই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ইনি আজ পরীক্ষা করিবেন। পথে দুইটি দেখিবার জিনিষ পাওয়া গেল। প্রথমতঃ এডিনবারার নিকট ফোর্থ উপসাগরের (এখানে ফোর্থ বলে) উপরকার সেতু। ইহা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার এক বিরাট নিদর্শন। দ্বিতীয়টিও সেতু, ইহা ডাণ্ডির নিকট নদীর উপর বিস্তৃত। গেডিজ রেলপথের দুই-ধারের পাহাড় মৃত্তিকা ঘরবাড়ী ইত্যাদি দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন।

ডাণ্ডি নগরের লোকসংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু বিস্তারে নগর বেশ বৃহৎ—নদীর ধারে পর্ব্বত গাত্রে নগর অনেকদূর পর্য্যন্ত লম্বমান। সেতু হইতে নগর খানিকটা সোপানের মত দেখায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষাবিভাগেই সময় কাটান গেল। কয়েক-জন অস্থিবিদ্যাবিৎ শরীরতত্ত্ববিৎ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হইল। ল্যাবরেটরীগুলিও দেখিলাম। গেডিজ সংক্ষেপে নিম্ন-পদস্থ অধ্যাপকগণকে পরীক্ষাপ্রণালী বুঝাইয়া দিয়া আমাকে উদ্যান দেখাইতে লাগিলেন। উদ্যান-রচনায় তিনি কি নিয়মে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ইহাঁর মতে উদ্যানরচনা এবং নগরগঠন এক-জাতীয় কার্য্য। দুই কার্য্যেই এক আদর্শ, এক রীতি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

জীবনের বিকাশ, জীবিত অবস্থার লক্ষণ, জীবজন্তুর সুখ দুঃখ, প্রাণী-মাত্রের স্বাস্থ্য ও শক্তি এই সকল তত্ত্ব মনে না রাখিলে নগর রচনা এবং

উদ্যান রচনা সুফল প্রদান করে না। লোহা লক্কড়, ইট কাঠ, কল কব্জা ইত্যাদির সমাবেশ-প্রথা স্বতন্ত্র। সে প্রথা এই সকল জীবন্ত বস্তুর সন্নিবেশ-কার্য্যে প্রয়োগ করা অনুচিত। সে প্রথা এঞ্জিনচালিত কারখানায় বেশ সুফল প্রদান করিতে পারে।

প্রকৃতি বৈচিত্র্য ভালবাসে—নানা প্রকার বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করে। জগতে কত উদ্ভিদের উৎপত্তি দেখিতে পাই—নরনারীর বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই! স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিলে পৃথিবীতে অসংখ্য চরিত্রের বিকাশ সাধিত হইবে। একের সঙ্গে অপরের সাদৃশ্য হয় ত নাও দেখিতে পারি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমরা যখন একটা কৃত্রিম আবাস প্রস্তুত করিতে বসিয়াছি তখন তাহার জন্য কোন্ পথে চলিব? কলকারখানার নিয়ম অনুসরণ করিব? না প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করিব? প্রথম নিয়মে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, ঐক্য, সৌসাদৃশ্য ইত্যাদি পাইব; দ্বিতীয় নিয়মে বৈচিত্র্য, অসামঞ্জস্য, অনৈক্য এবং বৈসাদৃশ্য পাইব। যদি একমাত্র বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, তাহা হইলে শৃঙ্খলা আনিতে পারি, কিন্তু তাহাতে প্রাণের অভাব, স্বাভাবিকতার অভাব, স্বাধীনতার অভাব আসিতে পারে। আবার যদি স্বভাবের উপর নির্ভর করি তাহা হইলে আগাছা পরগাছা জঞ্জাল অসংখ্য জুটিতে পারে,—উদ্যান জঙ্গলে পরিণত হইবে, নগর জনগণের হট্টগোলে পরিণত হইবে। কাজেই মালীকে দুই নিয়মই মানিয়া চলিতে হয়—কোন একদিকে ঝুঁকিলে দোষ থাকিয়া যায়। রাষ্ট্রাধিপকেও নগর গঠনের সময়ে শাসনের শৃঙ্খলা এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা দুই-ই রক্ষা করিতে হয়।

গেডিজ এই উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাগানের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে এক একটা জিনিষ দেখাইয়া নগর ও পল্লীর (অর্থাৎ মানবীয় মৌচাকের)

নানা দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। লোকালয়ের অভ্যন্তরস্থিত নর্দ্দমা, গলি, জঞ্জাল, আস্তাকুড়, বিলাসস্থান ইত্যাদির দৃষ্টান্ত বাগানের নানা গাছ পাতা রাস্তা ইত্যাদি হইতে পাওয়া গেল। গেডিজ মানব-সমাজের জীবনকে উদ্ভিদ্ সমাজের জীবনের অনুরূপ সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার নগর-বিজ্ঞান এবং বাগান-বিজ্ঞান দু-ই প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়মে অনুশাসিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগ হইতে নিকটবর্ত্তী একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভিতর গেলাম। এই বিদ্যালয়ের সম্পর্কে একটা ক্ষুদ্র বাগান প্রস্তুত করা হইবে। বিদ্যালয়ের মাষ্টারেরা গেডিজের নিকট পরামর্শ চাহেন। বাগানের মালী, কয়েকজন শিক্ষক এবং আমরা দুইজনে জমির উপর উপস্থিত হইলাম। নিতান্তই ক্ষুদ্র স্থান অথচ তাহাতেই একটা উদ্যান তৈয়ারী হইবে। ছাত্রেরা উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য এই উদ্যানে তরুলতার পরিচয় পাইবে—এই উদ্দেশ্যেই উদ্যান রচনা করা হইতেছে। কোথায় কোন্ গাছ বসিবে, কোথায় একটা চৌবাচ্চা কাটা হইবে, কোথায় খানিকটা ঝোপ রাখা হইবে, কোথায় একটা অনুচ্চ পাহাড় তৈয়ারী করিতে হইবে ইত্যাদি নানা কথা আলোচিত হইল। বাগানের চারিদিকে যে সকল বাড়ীঘর ও রাস্তা রহিয়াছে সেই সব বুঝিয়া শুনিয়া উদ্যানের আকৃতি স্থির করা হইল। কোন্ দিকে সূর্য্যের আলোক ও তাপ বেশী, কোন্ দিক হইতে বাতাস বেশী আসে তাহাও বিশেষরূপে বুঝিবার পর উদ্ভিদ্ সমাবেশের প্রণালী নির্দ্ধারিত করা হইল। বাগানের সৌন্দর্য্য উদ্ভিদের বৈচিত্র্য এবং বিদ্যালয়ের কার্য্যোপযোগিতা কোন দিকই অবিচারিত রহিল না।

সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ নগর

ডাণ্ডি হইতে সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ্ আসিলাম। রেলে আধ ঘণ্টা লাগিল। টে-নদীর সেতু পার হইয়া ডাণ্ডির অপর পার দিয়া গাড়ীর পথ। গাড়ী হইতে সমস্ত ডাণ্ডি নগর দেখা যায়।

সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ অনেকদিনকার পুরাতন সহর। মধ্যযুগের বাড়ীঘর রাস্তা গির্জ্জা এখনও আছে। এখানকার কলেজগুলি অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের কলেজের ন্যায় নির্ম্মিত। কিন্তু সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজের কলেজ সমূহে ছাত্রেরা বাস করে না। আজকাল ডাণ্ডি এবং সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজের সকল কলেজই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এই বিশ্ববিদ্যালয় ৫০০ বৎসরের পুরাতন।

সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজের ভিন্ন ভিন্ন কলেজে এবং কলেজের প্রাঙ্গণে খানিক-ক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। পরে দুই তিনটা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-বিষয়ক উদ্যানে প্রাণবিজ্ঞান চর্চ্চা করিলাম। গেডিজের নূতন নূতন তত্ত্ব শুনা গেল। পিপীলিকা, মক্ষিকা, কীট পতঙ্গ ভ্রমর ইত্যাদির সঙ্গে পুষ্পপাত্রের সম্বন্ধ বিষয়ে গেডিজের সঙ্গে আলোচনা হইল। পুংলিঙ্গ উদ্ভিদ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উদ্ভিদের লক্ষণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আবেষ্টন, জন্মভূমি, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদির প্রভাবও আলোচিত হইল। গেডিজ বলিলেন, "এদেশে প্রাণবিজ্ঞানের এই সকল তত্ত্ব ও তথ্য বেশী শিখান হয় না। কেবলমাত্র লতাপাতা ফুলফলের আকৃতি, গঠন, বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। আমি কিন্তু জীবনবিকাশের কথাই বিশেষ পছন্দ করি।" আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষেও

আজকাল উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের সবিশেষ প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ-বিজ্ঞানের অংশ বেশী শিখান হয় না। যেমন ইংলণ্ড, তেমন ভারতবর্ষ এখানকার আদর্শ ই আমাদের ওখানেও অবলম্বিত!”

বাগানের নানা অংশ দেখাইতে দেখাইতে অধ্যাপক বলিলেন, “কি বলেন, মহাশয়, বাগানের মালী কখনও একগুঁয়ে লোক হইতে পারে কি? গাছপালার সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করিতে করিতে স্বাধীনতার প্রতি, স্বাভাবিকতার প্রতি, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাহার সম্মান স্বতই বাড়িতে থাকে না কি? মালীর আদর্শ শিক্ষকেরও থাকা কর্ত্তব্য। মালী যেমন প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য যত্নবান্‌, প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে নিজের মত গড়িয়া উঠিতে অবসর ও সুযোগ দেয়, শিক্ষকেরও ছাত্র সম্বন্ধে তাহাই করা কর্ত্তব্য। কোন এক বাঁধা পথে বহুসংখ্যক ছাত্রকে চালাইতে চেষ্টা করা উচিত নয়।”

বাগান দেখিয়া অধ্যাপক কাগজ পরীক্ষা করিতে গেলেন। অন্যান্য অধ্যাপককে ভার দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর আমরা অস্থিবিদ্যা-বিষয়ক সংগ্রহালয় দেখিলাম। নানাপ্রকার হাড়, হাড়ের চিত্র, হাড়ের মূর্ত্তি সাজান রহিয়াছে। এখান হইতে একজন ভদ্রলোকের বাগান নার্সারি ও আবাদ দেখিতে গেলাম। ইঁহার জমিতে অনেকগুলি গরম ঘর আছে। কোনটার মধ্যে কলা, কোনটার মধ্যে কুম্‌ড়া চাষ চলিতেছে। ইঁহার কোন কোন ক্ষেতে পাকা ষ্ট্রবেরি ফলিয়া রহিয়াছে। ষ্ট্রবেরি লতানে গাছ—ফলগুলি অর্দ্ধ মিষ্ট, অর্দ্ধ অম্ল। কিন্তু বিলাতের লোকেরা এই ফলের নামে জিহ্বার জল ফেলে। দেখিলাম মাটির উপর গাছগুলি লতাইয়াছে—জাল দিয়া সমস্ত ক্ষেতটা আবৃত। কতকগুলি ষ্ট্রবেরি চুরি করিয়া খাওয়া গেল। নার্সারির ভিতর নানা প্রকার ফুল গাছও আছে। এইগুলি সহরের ভদ্রলোকেরা কিনিয়া থাকেন।

নার্সারির পরে আবাদভূমি। অধ্যাপক বলিলেন, "ঐখানে নানা প্রকার শস্যের ও ফলের আকৃতি বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং গুণ পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লুথার বার্ব্বাঙ্কের নিয়মে এখানে কাজ হইতেছে কি?" ইনি বলিলেন, "লুথার বার্ব্বাঙ্কের নিয়মে হইবে কেন? পৃথিবীর সকল দেশেই লুথার বার্ব্বাঙ্ক আছে, অম্ল ফলকে মিষ্ট করা, বড় বীজকে ছোট বীজে পরিণত করা, সকণ্টককে নিষ্কণ্টক করা, ক্ষুদ্র ফলকে বৃহৎ করা সকল দেশের কৃষকেরাই জানে। আমেরিকার লোকেরা মূর্খ। এজন্য লুথার বার্ব্বাঙ্ক ওখানে 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে!' "

সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্মকেন্দ্র ছিল। মধ্যযুগে এখানে স্কচ্ জাতির জীবনধারা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইত। শিক্ষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প সকল বিষয়েই ইহার প্রাধান্য ছিল। সমুদ্রকূলে ইহা অবস্থিত। এজন্য ধীবরপল্লী স্বভাবতই গড়িয়া উঠিয়াছিল। নৌশিল্পী ও অর্ণব-বাণিজ্য ইহার বিশেষত্ব ছিল। এক্ষণে ধীবরপল্লী শোচনীয় অবস্থায় দেখিলাম—নরনারীর দারিদ্র্য অপরিসীম বোধ হইল।

ধর্ম্মসংস্কারের যুগে এখানে প্রবল সংগ্রাম হয়। স্কচজাতির ধর্ম্ম-সংস্কারক জন্‌নক্‌স্ স্কটল্যাণ্ডের আধুনিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তিনি মামুলি রোমাণ-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করেন। উত্তেজনার ফলে সংস্কারকেরা প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরাদি ভূমিসাৎ করে। আজকাল ভারতবর্ষে প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ্ স্তূপ ইত্যাদি ভগ্নরাশিতে পরিণত, এখানেও সেইরূপ ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাইলাম। বিরাট ধর্ম্মমন্দিরের কোন কোন প্রাচীর মাত্র বিদ্যমান, কোন কোন পূর্ব্ব-গৌরবের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম্মকলহ লোমহর্ষণ কাণ্ডের উৎপত্তি করিয়াছিল। ইংলণ্ডে এত শোচনীয় ব্যাপার ঘটে নাই।

একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। তাহার সম্বন্ধে অধ্যাপক বলিলেন, "এই মন্দির স্কটল্যাণ্ডবাসীর প্রিয় রাজা রাবার্ট ব্রুস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগকে ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জাতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টান পুরোহিতেরা তাঁহাকে যুদ্ধকালে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদেব পুরস্কার-স্বরূপই জয়স্তম্ভ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজকাল আপনারা ত ইংরাজদিগের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ব্যানক্‌বার্ণের কথা এখনও মনে আছে কি?" ইনি বলিলেন, "নিশ্চয়। গতকল্য আমাদের জাতীয় উৎসব ছিল। ব্যানক্‌বার্ণের যুদ্ধদিবস আমাদের জাতীয় স্মৃতিতে জাগরুক। আমরা ইংলণ্ডের সঙ্গে এক রাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছি। কিন্তু ব্যানকবার্ণ ভুলিতে পারি নাই। ইংরাজের সঙ্গে আমরা যত মারামারি কাটাকাটি করিয়াছি, পৃথিবীতে অন্য কোন দুই জাতি এত করিয়াছে কি না জানি না। এদিকে আজ আমাদের ঐক্য স্থাপিত, তথাপি ইংরাজের পরাজয় ফল এখনও আমরা গাহিয়া থাকি!"

স্কচ্‌জাতির ব্যানক্‌বার্ণ উৎসবে যদি ইংরাজেরা আপত্তি না করেন, তাহা হইলে মুসলমানেরা হিন্দুর শিবাজী উৎসবে আপত্তি করেন কেন?

সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ হইতে এডিনবারা ফিরিয়া আসিলাম। রেল হইতে অধ্যাপক প্রান্তরগুলি দেখাইয়া বলিলেন, "এই সমতল ভূমিগুলি উত্তর জার্ম্মাণি ও উত্তর রুশিয়ার ক্ষেত্রের মত। ছাত্রদিগকে সমতল ক্ষেত্রের ধারণা করাইবার জন্য এই সকল মাঠে লইয়া আসি।" খানিক পরে সমুদ্রের ধারে অনেক খানি নিম্নভূমি দেখা গেল। অধ্যাপক বলিলেন, "ঐ দেখুন স্কটল্যাণ্ডের হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডের সমস্ত অংশই সমুদ্রের জল হইতে নীচে। আমাদের এই অংশও সেইরূপ। সমুদ্রকূলে উচ্চ ও

বিস্তৃত প্রাচীর তৈয়ারী করিলে আমরা ওলন্দাজদিগের মত হইয়া যাইব।" আমি বলিলাম, "এ অঞ্চল ইয়োরোপের বিক্রমপুর।"

ফরাসী দার্শনিক বার্গ-সোঁ

হেনরি বার্গ-সোঁ আজকাল ইউরোপের দার্শনিক মহলে শীর্ষস্থানীয় কীর্ত্তি ভোগ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এবার গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে এডিনবারায়ও তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে, ছুটির পর আবার হইবে। ইহাঁর বক্তৃতা ফরাসী ভাষায় হইয়া থাকে। বলিবার ভঙ্গী এবং রচনা-প্রণালী চিত্তা-কর্ষক।

ইউরোপে "একমেবাদ্বিতীয়ং" রূপে পূজা পাওয়া সহজ কথা নয়। বার্গ-সোঁ সেরূপ পূজা পাইতেছেন না। তাঁহার দর্শনবাদ সর্ব্বত্র বিনা আপত্তিতে গৃহীত হয় না। ইহাঁর চিন্তার ভিতর কতখানি নিজস্ব এবং কতখানি পরকীয়, তাহার সমালোচনা ইতিমধ্যেই আরব্ধ হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক গবেষণার মূল্যই বা কতটুকু—ভবিষ্যতে বার্গ-সোঁর প্রভাব বাড়িবে কি কমিবে সমালোচকেরা তাহাও বুঝাপড়া করিয়া দেখিতেছেন।

জার্ম্মাণির কোন কোন দার্শনিক বলিতেছেন, "কাণ্টের পর পাশ্চাত্য জগতে বার্গসোঁর সমান চিন্তাবীর কেহ জন্মেন নাই। আধুনিক দর্শনের মধ্যে একমাত্র বার্গসোঁতত্ত্বই টিকিয়া যাইবে।" বিলাতের পণ্ডিত হ্যাল্ডেন বলেন, "বার্গসোঁ নূতন কিছুই শিখাইতে পারেন নাই, জার্ম্মাণি বৈদান্তিক শোপেন হোয়রের কথাই বার্গসোঁ ফরাসী ভাষায় প্রচার করিতেছেন।" এদিকে আমেরিকার সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত জেম্‌স্ বার্গসোঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। জেম্‌সের বক্তৃতা ফলেই ফরাসী দার্শনিক

অক্সফোর্ডে নিমন্ত্রিত হন। অথচ জেম্‌স্‌ ও বার্গসোঁ দুই ভিন্ন পথের পথিক! ফরাসীরাই কি বার্গসোঁকে সর্ব্ববাদিসম্মত গুরুরূপে গ্রহণ করিতেছে? তাহা নহে। প্রবীণ ফরাসী দার্শনিকেরা বলিতেছেন, "বার্গসোঁ নাস্তিকতার নূতন অবতার!" পক্ষান্তরে যুবক ফরাসীরা বার্গসোঁকে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচারক রূপে পূজা করিতেছেন। ইঁহারা বিবেচনা করেন বৈজ্ঞানিকতার পরিবর্ত্তে ভাবুকতা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। এই ভাবুকতার প্রচার বার্গসোঁতত্ত্বে ইঁহারা পাইয়া থাকেন।

বার্গসোঁতত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ মতবৈচিত্র্য বড়ই বিস্ময়জনক। সত্য সত্যই বার্গসোঁ একটা নূতন বাণী প্রচার করিতেছেন। তাহা বুঝিতে যাইয়া নানা মুনি নানা কথা বলিতেছেন। এই নূতন বাণীর প্রচারক আরও অনেকেই আছেন—অবশ্য সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত নন। তাঁহারা গত শতাব্দীর ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, সাম্রাজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রভাবপ্লাবিত মানবজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে সমাজ সভ্যতা, আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে বিপ্লব তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। মানবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নানা ভাবে আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনাপ্রণালীগুলি পূর্ব্বতন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র—প্রায়ই পূর্ব্বতন প্রণালীর প্রতিবাদস্বরূপ প্রবর্ত্তিত। সেই পুরাতন রীতির সাহায্যে মানবজীবন বুঝা যাইবে না—এই ধারণা ইঁহাদের সকলের মধ্যে বদ্ধমূল। দার্শনিক ও সুকুমার শিল্পের সমালোচক পোল্যাণ্ডবাসী নীট্‌সে, জার্ম্মাণির চিন্তাবীর পন্‌সেন ও অয়কেন আমেরিকার জেম্‌স্‌, এবং বিলাতের ব্র্যাড্‌লে ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই নব্যদর্শনের বিভিন্ন প্রচারক। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই নব্য চিন্তাবীরগণের সঙ্গে আসন পাইয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ এক্ষণে নূতন নূতন প্রথায় জীবন-সমালোচনা চাহেন।

এই জন্যই তাঁহারা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া "গীতাঞ্জলির" সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

বার্গ-সোঁ নব্যদর্শনের যে পথে চলিতেছেন তাহা আমাদের ভারতীয় পদ্ধতির অনেকটা নিকটবর্ত্তী। এডিনবারার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ইনি এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত Intuition বা "অন্তর্দৃষ্টি" তত্ত্বে হিন্দু দার্শনিকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন—এইরূপই ইহাঁর মত। কিন্তু ইনি নিজগ্রন্থে "ইনটুইসন" সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি আমাদের পরিচিত "অন্তর্দৃষ্টি," "নিদিধ্যাসন" "ধ্যান" ইত্যাদি হইতে বহুদূরে। ইনি পাশ্চাত্য মহলের Observation, Experiment, Inductive, Deductive, *apriori*, *apostcrcori* ইত্যাদি আলোচনা-প্রণালী অথবা আমাদের "শ্রবণ" "মনন" ইত্যাদি প্রণালী ছাড়াইয়া বেশী ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, এই অন্তর্দ্দৃষ্টি-তত্ত্ব ইউরোপে নিতান্ত নূতন নয়। জার্ম্মাণ শেলিঙ্গ ও শোপেনহোয়ার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী দার্শনিক সংসারে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাঁরা হিন্দু-সাহিত্যের নিকট ঋণী ছিলেন। সে ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে। বার্গ-সোঁ শেলিঙ্গের ফরাসী শিষ্য র‍্যাভেসার নিকট এই নূতন বিদ্যা পাইয়াছেন।

আজ 'আউট্ লুক টাওয়ারে' বার্গসোঁতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইল। প্রায় ত্রিশজন উপস্থিত—স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। গেডিজ সভাপতি। অন্যান্য সকলে ইহাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ—কেহ ডাক্তার, কেহ শিক্ষক, কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ ধনবিজ্ঞানবিৎ, কেহ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিৎ ইত্যাদি। এরূপ সান্ধ্যসম্মিলন আউট্‌লুক টাওয়ারে প্রতি সপ্তাহেই হইয়া থাকে। এক এক বার এক এক বিষয়ের আলোচনা হয়।

গেডিজ বার্গসোঁর সকল কথা গ্রহণ করেন না। প্রাণ-বিজ্ঞানের

হিসাবে বার্গসোঁ-তত্ত্ব টিকিবে না সুতরাং গেডিজ সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাহেন না। মানুষ, মানুষের জীবন, মানুষের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, এই সকল বিষয় বার্গসোঁ কর্ত্তৃক নূতনভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জন্যই গেডিজ বার্গসোঁ-তত্ত্বের আদর করেন। জীবনের কথা যিনিই গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করিবেন তিনিই গেডিজের ভক্তিভাজন।

গেডিজ বলিলেন, "বার্গসোঁ সমাজজীবন এবং বর্ত্তমান মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখনও কিছু বলেন নাই এবং বলিতে চাহেনও না। কিন্তু তাঁহার চিন্তারাশির প্রয়োগ কি এখনই করা যায় না?" একজন বলিলেন, "চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক হইতে বার্গসোঁতত্ত্বের সমালোচনা আমি করিতে ইচ্ছা করি। আগামী সম্মিলনে তাহা করা যাইবে।" আর একজন বলিলেন, "নগর বিজ্ঞানের বার্গসোঁ আমাদিগকে কি উপদেশ দেন তাহার আলোচনাও সেই দিন করা যাইবে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "মহাশয়-গণ, আপনারা বার্গসোঁকে একটা মহাদার্শনিক বিবেচনা করিতেছেন কেন? আমি ত ইহাঁর মহত্ত্ব খুঁজিয়া পাই না। বরং মনে হইতেছে ইহাঁর প্রভাবে দর্শন অবনতির দিকে যাইবে। আমার ইচ্ছা আপনারা ইহাঁকে প্রাণ-বিজ্ঞানের সমালোচনায় নকড়া ছকড়া করিয়া ফেলুন। গ্রীষ্মাবকাশের পর এডিনবারায় আসিলে যেন তাঁহার প্রতিপত্তি না থাকে।"

ম্যাক্স্ মুলারের শিষ্য ও সহযোগী

এডিনবারা হইতে ৮।১০ মাইল দূরে সমুদ্রকূল। এখানে একটি ক্ষুদ্র নগর বা পল্লী। ট্রামে বেড়াইতে আসিলাম। অধ্যাপক এগেলিঙ্গ ডাকিয়াছিলেন।

ইনি পল্লীর অতি নিভৃতম স্থানে বাস করেন। এ পাড়ায় আসিতে আসিতে বাঙ্গালাদেশের আবাদভূমির অভ্যন্তরস্থিত, অসংখ্য তরুরাজি-মণ্ডিত কুঞ্জবনসদৃশ কুটিরাবাসের দৃশ্য মনে পড়িল। চারিদিকে বাগান ও ক্ষেত,—পাকা রাস্তা বা গলির চিহ্ন নাই—গাড়ীঘোড়ার আওয়াজ শুনা যায় না। গ্রাম্য বালকেরা খালি পায়ে খালি মাথায় খেলা ধূলা মারামারি কান্নাকাটি করিতেছে। অনতিদূরে এডিনবারার পাহাড়।

লতা পাতায় আবৃত একটা বাগানে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে গিয়া দেখি একটা পোড়ো বাড়ী। এডিনবারা জনপদের ইহা একটি অতি পুরাতন গৃহ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই গৃহে রাজরাজড়ারা বাস করিতেন। ইংরাজ ও স্কচ্ জাতিদ্বয়ের ভিতর লড়াইয়ের সময়ে এই গৃহ দুর্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। আজ ইহা ইংরাজপক্ষের হস্তগত—কাল স্কচ্ পক্ষের হস্তগত এইরূপে ইহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। উভয় পক্ষই এই দুর্গগৃহ দখল করিতে চেষ্টা করিত।

এগেলিঙ্গ একজন জার্ম্মাণ। ইনি বহুকাল এদেশে বাস করিতে-ছেন। কিন্তু জার্ম্মাণির সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার অন্যতম জামাতা জার্ম্মাণ দেশীয়। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। এগেলিঙ্গের একটি পুত্র এডিনবারার বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ-সাহিত্যের অধ্যাপক।

এগেলিঙ্গ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। ইহাঁর অনূদিত "শতপথ ব্রাহ্মণ" ম্যাকৃস্‌মুলারের Sacred Books of the East Series" নামক গ্রন্থ-মালায় বাহির হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে Encyclopædia Britannica গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ আছে সে সমুদয় ইহাঁরই রচনা। এগেলিঙ্গ ম্যাকৃস্‌মুলারের ছাত্র এবং সহযোগী ছিলেন। অক্সফোর্ডের ম্যাকডোনেল এবং কেম্ব্রিজের র‍্যাপ্‌সন ইহাঁর ছাত্র।

এগেলিঙ্গের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হইল। ইহাঁর মতে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেখা অন্যায়। ইনি বিবেচনা করেন যে, বুদ্ধদেব হিন্দুতত্ত্বের সারসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ পাকা দার্শনিক ছিলেন না। এজন্য সারসংগ্রহ করিতে যাইয়া তিনি বিচক্ষণতা দেখাইতে পারেন নাই।

বার্গসোঁ সম্বন্ধে এগেলিঙ্গ বলিলেন, "আমি বড় আশা করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু দুইদিনের বেশী ভাল লাগিল না। বার্গসোঁর প্রভাব স্থায়ী হইবে না। নিতান্ত ছেলে ছোকরা মহলে এবং রমণী মহলে কিছুকাল ইনি আদৃত হইবেন। কিন্তু খাঁটি দার্শনিক ও তর্কশাস্ত্রের আসরে ইহাঁর স্থান অতি নিম্নে। ইনি জীবনতত্ত্ব গভীর-ভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ, শোপেনহোয়ার যাহা করিয়াছেন ইনি সেইগুলিই ক্ষীণভাবে সুললিত ভাষায় প্রচার করিতেছেন। যাহাহউক, গভীর কথা সুপ্রচারিত ত হইতেছে এই যা লাভ। আমার মতে, অয়কেন অপেক্ষা বার্গসোঁ নিম্নতর শ্রেণীর দার্শনিক।"

আগামী বৎসর লণ্ডনে জগতের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মিলন হইবে। এগেলিঙ্গ বলেন, "এইরূপ সম্মিলনে পণ্ডিতগণের পরস্পর আলাপ পরিচয় হয়। তাহা ছাড়া আর কোন লাভ দেখি না। প্রবন্ধপাঠ জঘন্য কাণ্ড।"

উনবিংশশতাব্দী

গ্লাসগো-নগর স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান শিল্প-কেন্দ্র। ইহার তুলনায় এডিনবারা পল্লীগ্রাম মাত্র। নানাপ্রকার কারখানা ও ফ্যাক্টরীর চিম্‌নী হইতে অহরহ ধূম নির্গত হয়। নিউকাস্‌লের কথা মনে পড়ে। আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। লীড্‌স্‌ ম্যাঞ্চেষ্টার ইত্যাদি নগরের বোধ হয় এই মূর্ত্তি। এডিনবারার লোকেরা গ্লাসগো পছন্দ করে না।

লোহালক্কড় কাঠ, ধাতু, খনি, কয়লা, রঞ্জন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার কারবার গ্লাসগো নগরের বিশেষত্ব। বাষ্পপোত, এঞ্জিন, রেলগাড়ী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কলকব্জা ইত্যাদিও এখানে প্রস্তুত হয়। অধিকন্তু জাহাজ তৈয়ারী করিবার কারখানাসমূহের জন্যই গ্লাসগো জগতে প্রসিদ্ধ। এখানকার বয়লার, টারবাইন এবং সমুদ্রপোত জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে।

বাষ্পচালিত এঞ্জিনের ব্যবহার পৃথিবীতে একশত বৎসর মাত্র চলিতেছে। এই গ্লাসগো নগরেই তাহার সূত্রপাত। তাহার প্রবর্ত্তক জেম্‌স্‌ ওয়াট এই নগরেরই সন্তান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "কমেট" নামক জাহাজে বাষ্প নিয়ন্ত্রিত কল প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত নূতন নৌশিল্পের উন্নতি দ্রুত সাধিত হয় নাই। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একব্যক্তি গ্লাসগোর শিল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কৃষি কর্ম্ম, তূলার কারবার, রঞ্জনশিল্প, মৎস্যচাষ, এবং অন্যান্য জীবিকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বাষ্পপোত নির্ম্মাণবিষয়ক শিল্প তখনও প্রসিদ্ধ হয় নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৮৫৯ সাল হইতে এই নূতন শিল্পের প্রভাব গ্লাসগোনগরে লক্ষিত হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে, আজকাল ইউরোপে যতকিছু সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখি না কেন প্রায় সকলই একশত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। আজ-কালকার লণ্ডন এবং এডিনবারা নগরের বাহ্যসম্পদ, অট্টালিকা ও রাজপথসমূহ এই সময়ের ভিতরই গড়িয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশশতাব্দীতে এই সমুদয় নগর স্বাস্থ্য, বিলাস, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অথবা সৌন্দর্য্য হিসাবে নিতান্ত অবনত ছিল।

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান আমলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ইংরাজ রাজত্বেই রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান দেশে দেখা দিয়াছে। সত্য কথা, ইংরাজেরা যখন ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ লাভ করিতে থাকেন তখন তাঁহাদের স্বদেশেই বড় বড় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, স্বাস্থ্য বিধানের নিয়মাবলী ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তাঁহারা ভারতবর্ষকে শিখাইবেন কোথা হইতে? বরং বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনেক কথা তাঁহারা দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি নগর হইতে শিখিয়াছিলেন। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের সঙ্গে সেই সময়কার ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশের আর্থিক এবং বৈষয়িক অবস্থা তুলনা করিলে কিছু বুঝিতে বাকী থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমারা অভাবনীয়রূপে জাগতিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অষ্টাদশশতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত ইহাঁরা কোন বিষয়েই ভারতবাসী হইতে উন্নত ছিলেন না। দৈবক্রমে ষ্টীমের প্রয়োগ আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরোপে যুগান্তর আসিয়াছে।

১৮০৫ সালে নেপোলিয়ানের রণতরী নেলসনকর্তৃক চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এই প্রসিদ্ধ ট্রাফালাগর যুদ্ধে কিরূপ জাহাজ ব্যবহৃত হইয়াছিল? তখনও বাষ্পের প্রভাব দেখা দেয় নাই। সেই ষোড়শশতাব্দীর পালের জাহাজ,

কাঠের জাহাজ এবং দাঁড়ের জাহাজই তখন প্রচলিত ছিল। আজকাল সেইগুলিকে জাহাজ বলিতে লজ্জাবোধ হইবে। ভারতবর্ষের লোকেরা যবদ্বীপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সময়েও এইরূপ জাহাজই ব্যবহার করিতেন। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমানেরা যেসকল সমুদ্র-পোত ব্যবহার করিত সেগুলির সঙ্গে বিংশশতাব্দীর রণতরীর তুলনা করা হাস্যজনক মাত্র। কিন্তু সেই যুগের পাশ্চাত্য রণতরীসমূহও আজকালকার হিসাবে নিতান্ত খেলনার সামগ্রী।

কোন সমাজের সঙ্গে অপরাপর সমাজের তুলনা করিতে হইলে যুগ ও সময়ের কথা মনে রাখা আবশ্যক। কোন এক যুগে দুই তিন সমাজের অবস্থা পরস্পর তুলনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা একথা ভুলিয়া যাই। অবিবেচকের ন্যায় আধুনিক পাশ্চাত্যগণের নূতন আবিষ্কারসমূহকে অতি প্রাচীন ভাবিয়া থাকি এবং তাহার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের অবস্থা তুলনা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ি! বাস্তবিক পক্ষে, নব্য ইউরোপের বিশিষ্ট আবিষ্কারগুলি ৭০।৮০।৯০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নয়। এই কয় বৎসরের ভিতরেই ওদেশে এই অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে।

ষোড়শ-শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্য্যন্ত গ্লাসগো নগর কিরূপ ছিল তাহার এক চিত্র প্রদান করিতেছি। ওয়ালেস্ প্রণীত "গ্লাসগোর ইতিহাসে" লিখিত আছে :—"The Sanitary condition of the city in those early periods was of a somewhat primitive description. In 1589 there was an order made by the Magistrates 'that no midden be laid upon the piegat,' but no attention seems to have been paid to this order. In 1655 the state of the streets was such, that the citizen had to place stepping stones in front of their houses

so that they might be enabled to make their exits and entrances 'dryshod.' But the Main Streets were used for other purposes than as the receptacles of 'Midden'. Swine were allowed to roam at large. Hay and peat stocks were erected on the streets and the fleshers appear to have been in the habit of slaying and building the whole bestial they kill on the Hie Street on both sides of the gate, which is very loathsome to beholders and also raises a filthy and noisome stink. About the year 1755 the magistrates erected a new market in King Street, and it was not till then that a public slaughter house was provided."

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই অবস্থা। লণ্ডনও এইরূপই ছিল। এই সকল কথা মনে রাখিয়া আমাদের নব্যভারতীয় ছাত্রেরা গ্লাসগো, এডিনবারা, লণ্ডন, প্যারি, বার্লিন ইত্যাদি নগরে প্রবেশ করিলে চমকাইয়া যাইবেন না এবং হতাশ হইয়া পড়িবেন না। ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর অবলম্বনই আত্মবিস্মৃতি এবং চিত্ত-সম্মোহন নিবারণের একমাত্র উপায়।

ষোড়শ-শতাব্দীর গৌড় কিরূপ ছিল? ডি ব্যারোজ ষোড়শ-শতাব্দীর পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

"It is said to be three of our leagues in length and contain 200,000 inhabitants. The Streets are so thronged with the concourse and traffic of people that they cannot force their way past. A great part of the houses of the city are stately and well wrought buildings."

ষ্টিভেন্‌সন 'Portuguese Asia' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"The principal city Gouro, seated on the bank of the Ganges, three leagues in length, containing one Million and two hundred thousand families and well fortified; along the streets which are wide and straight, rows of trees to shade the people, which sometimes in such numbers that some are trod to death."

পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকেরা মুসলমান গৌড় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বিংশ-শতাব্দীর লণ্ডননগরের ব্যাঙ্কপাড়ায় দাঁড়াইলে সেই কথা মনে হয়। অথচ লণ্ডনের এই জনতা-প্রবাহ ইউরোপের অন্য কোন নগরে দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

গ্লাসগোর টেক্‌নিক্যাল কলেজ ও কলাভবন

শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কটল্যাণ্ড তিন প্রদেশে বিভক্ত। এবার্ডিন, এডিনবারা এবং গ্লাসগো এই তিনটি নগর তিন বিভাগের কেন্দ্র। গ্লাসগোর টেক্নিক্যাল কলেজের কর্ত্তা বলিলেন, "আমাদের শিল্প বিদ্যালয়ই সর্ব্ব পুরাতন, বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবাডিন অপেক্ষা ডাণ্ডির টেক্নিক্যাল কলেজ প্রায় দ্বিগুণ। এডিনবারার হেরিয়ট ওয়াট কলেজ ডাণ্ডিবিদ্যালয়ের দ্বিগুণ। আমাদের রয়েল টেক্নিক্যাল কলেজ হেরিয়ট ওয়াটের দ্বিগুণ। আমরা ব্যবসায় বা বাণিজ্য শিখাইবার আয়োজন করি নাই, এডিনবারায় তাহার ব্যবস্থা আছে। সকালে বিকালে রাত্রে তিনবেলাই আমাদের বিদ্যালয় খোলা থাকে। চাকরী করিয়া যাহারা টাকা রোজগার করে তাহারাও অবকাশকালে আমাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া শিক্ষালাভ করে। এক্ষণে সর্ব্বসমেত ৬০০০ ছাত্র। একজনও ভারতবাসী নাই। আমাদের ছাত্রগণকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। ভারতীয় ছাত্রেরা বোধ হয় এই ভয়ে আসে না। তাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী ভালবাসে!"

এই টেক্নিক্যাল কলেজের সঙ্গে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষণীয় বিষয়, টাকা পয়সা, ল্যাবরেটরী, কারখানা ইত্যাদি সবই স্বতন্ত্র। তবে ইচ্ছা করিলে এখানকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রী পাইতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগের প্রভেদ কি?"

সম্পাদক বলিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় শিখান হয় না আমরা তাহাও শিখাইয়া থাকি। নৌশিল্প, সমুদ্র-পোতনির্ম্মাণ, জাহাজ চালান, রুটি প্রস্তুত করণ, আকর-বিষয়ক এঞ্জিনীয়ারী, ছাপাখানার কাজ, ইত্যাদি অনেক নূতন নূতন বিষয়ে আমরা শিক্ষা দিই। রসায়ন, মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি যে সকল বিষয় দুই বিদ্যালয়েই শিখান হয় তাহাতেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য আছে। আমরা ছাত্রগণকে সুদক্ষ কারিগর করিয়া তুলিতে চাহি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পুঁথিগত বিদ্যা বেশী শিখে—তত করিতকর্ম্মা হইয়া উঠিতে পারে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের ল্যাবরেটরী ও কারখানাগুলি কি কেবল পরীক্ষাগার এবং অনুসন্ধানালয় মাত্র? এই সকল স্থানে যে সমুদয় বস্তু প্রস্তুত হয় সেগুলি বাজারে বিক্রয় করা হয় কি?" ইনি বলিলেন, "ব্যবসায় চালান এবং শিক্ষা দান করা—দুই কার্য্য এক সঙ্গে চলিতে পারে না। একমাত্র ছাত্রগণকে শিখাইবার জন্যই আমাদের সকল প্রকার খরচ পত্র হইয়া থাকে। ছাত্রেরা যথার্থ শিক্ষা পাইলেই আমাদের ব্যয় সার্থক হইল মনে করি। আমাদের টাকা পয়সার লাভ চাহি না।" এডিনবারার হেরিয়ট ওয়াট শিল্পবিদ্যালয়ের সম্পাদকও এই কথা বলিয়াছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ল্যাবরেটরী এবং কারখানাগুলিকে ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিবেচনা করিলে ছাত্রেরা প্রথম হইতেই লাভ ক্ষতির হিসাব করিতে অভ্যস্ত হয় না কি?" সম্পাদক বলিলেন, "সেজন্য আমরা বড় বড় ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করিয়াছি। সেখানে মাঝারি কার-

বারের উপযুক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। সেই সমুদয়ের খরচপত্র ইত্যাদিও আলোচনা করা হয়। ছাত্রেরা একসঙ্গে দ্রব্য প্রস্তুত করণ এবং হিসাবও শিখিতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয়কে আমরা দোকান বিবেচনা করি না।”

এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে বাৎসরিক ১২০০৲ অপেক্ষা বেশী লাগে না।

একে একে এখানকার সকল ল্যাবরেটরী সংগ্রহালয় এবং কার্য্যালয় দেখিলাম। একজন কর্ম্মচারী রসায়ন, ভূতত্ত্ব, আকর তত্ত্ব, তড়িৎ, এঞ্জিনিয়ারী, রঞ্জন, জাহাজ প্রস্তুত করণ, নৌ চালন, চিনি প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি নানাবিষয়ক বহু কারখানা ও বিজ্ঞানগৃহের সাজ সরঞ্জাম বুঝাইয়া দিলেন। ছবি, মানচিত্র, মডেল ও মূর্ত্তি প্রত্যেক ল্যাবরেটরী বা সংগ্রহালয়েই দেখিতে পাইলাম। কোন কোন ল্যাবরেটরীতে কর্ম্মীরা যন্ত্রের কার্য্য দেখাইয়া দিলেন। মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং গৃহে দেখিলাম এসেটিলীন গ্যাসের দ্বারা একটি কলের সাহায্যে বেশ মোটা লোহা সহজে কাটা হইতেছে।

গ্লাসগোর এই টেক্নিক্যাল বিদ্যালয়ের শাসনপ্রণালী অতি সুন্দর। নগরের যত বড় বড় শিল্পী ও ব্যবসায়ী কোম্পানী আছে সকলেরই প্রতিনিধি এই বিদ্যালয়ের পরিচালনা-সমিতির সভ্য। দেশের শিল্প ও ব্যবসায় লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা জাতীয় শিল্পকলেজ চালাইয়া থাকেন। কাজেই সর্ব্বদা অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়। ছাত্রেরাও অতি সহজে চাকরী পায়, এবং কারবারের মালিকেরাও নিজেদের প্রয়োজনমত লোক তৈয়ারী করিতে পারেন।

ডাণ্ডি নগরে একদিন মাত্র কাটাইয়াছিলাম। গ্লাসগো নগরও একদিনে সারিতে হইল। টেক্নিক্যাল কলেজের যন্ত্র হাতিয়ার এবং

বিজ্ঞান গৃহগুলি দেখিয়া কলাভবন দেখিতে গেলাম। এখানকার আর্টস্কুলে কেবলমাত্র চিত্রাঙ্কন শিখান হয় না। স্থাপত্য, গৃহনির্ম্মাণ, বাস্তুবিদ্যা, নানাবিধ সুকুমার শিল্প, পাথর খোদাই, কাদামাটির কাজ, লিথো ছাপা, কাচের উপর রঙ্গিন চিত্র লেপা ইত্যাদি বহুপ্রকার কলা শিখান হয়। হাতের সাফাই এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞান পুষ্ট করিবার জন্যই এই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। আজকাল বিদ্যালয়ে ১২০০ ছাত্র। দিনে ও রাত্রে দুই বেলাই কলাভবন খোলা থাকে। ছাত্রীদিগের সংখ্যাই বেশী।

প্রতিবৎসর ৩।৪ বার করিয়া প্রদর্শনী খোলা হয়। ছাত্রগণের কার্য্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এক সঙ্গে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের নানা মিউজিয়ম হইতে সুন্দর সুন্দর বস্তু আনিয়া ছাত্রদিগকে দেখান হয়। আজকাল প্রদর্শনী খোলা রহিয়াছে। লণ্ডনের কেন্‌সিংটন সংগ্রহালয় হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি ও চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

কলাভবনের সংগ্রহালয় নানাবিষয়ক। অস্থিবিদ্যাবিষয়ক, উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক, জীববিদ্যাবিষয়ক বহু প্রকার দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সঞ্চিত রহিয়াছে। চিত্রকলা, পোষাক পরিচ্ছদ, সভ্যতা, মূর্ত্তিতত্ত্ব, গৃহের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে দেখিতে পাই-লাম। প্রাচীন গ্রীক, ইতালীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী শিল্পি-গণের চিত্রাবলীও সংগ্রহালয়ে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্যারি হইতে আনীত নরনারীদিগের প্রতিমূর্ত্তি অনেক রহি-য়াছে। এই সমুদয় সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রেরা মূর্ত্তি গঠন করে অথবা চিত্র আঁকিয়া থাকে। একটি গৃহ দেখিলাম। সেখানে জীবন্ত জানোয়ার আনিয়া রাখা হয়। সেইগুলি দেখিয়া ছাত্রেরা শিল্প শিক্ষা করে। ফলতঃ ছাত্রদিগকে নানা উপায়ে যথার্থ বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত

হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র কল্পনাশক্তি অথবা স্মৃতি-শক্তির উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় না।

একটা বিচিত্র নিয়মের কথা শুনিলাম। কলাভবনের একজন কর্ম্মচারী সকল ঘর দেখাইতেছিলেন। চারি পাঁচটা গৃহের ভিতর আনিয়া বলিলেন, "এই যে মঞ্চ দেখিতেছেন ইহার নিম্নে ইলেক্‌ট্রিক যোগ আছে। তাহার দ্বারা মঞ্চ গরম করা হয়। ঘরের অন্যান্য স্থান যখন বেশ ঠাণ্ডা তখন এই মঞ্চের উপর দাঁড়াইলে তাপ অনুভব করা যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই মঞ্চে দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি?" ইনি বলিলেন, "রমণী অথবা পুরুষগণকে উলঙ্গ ভাবে ইহার উপর দাঁড়াইতে হয়। অনাবৃত অবস্থায় তাহাদিগের শরীরে তাপ সঞ্চার করিবার জন্য ইলেক্‌ট্রিকযুক্ত মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই নগ্ন নরনারীর অবয়ব দেখিয়া ছাত্র ও ছাত্রীরা চিত্র অথবা মূর্ত্তি গড়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সকল লোক কোথায় পাওয়া যায়?" ইনি বলিলেন, "ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করিয়া রাস্তা হইতে লোক লইয়া আসা হয়। ঘণ্টায় বার আনা কিম্বা ১৷৹ দেওয়া হয়। দাঁড়াইবার অথবা বসিবার কিম্বা শুইবার ভঙ্গী অনুসারে ভাড়া বাড়ে বা কমে। পুরুষগণের মধ্যে ইতালীয় জাতির লোক বেশী পাওয়া যায়। স্ত্রীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ইংরাজ ও স্কচ লোকই আসিয়া থাকে।"

অর্ণবযান

বাষ্পশক্তির প্রয়োগ করিয়া নব্য পাশ্চাত্যেরা শিল্পজগতে বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে যুগান্তর আসিয়াছে। আমেরিকা অতিরঞ্জিত ইউরোপ মাত্র কাজেই আট্‌লাণ্টিকের অপর পারেও এই যুগান্তর প্রবলভাবে সাধিত হইয়াছে।

বাষ্পের ক্ষমতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম প্রচারিত হয়। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইহা লইয়া নানা শিল্পে নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতে থাকে। যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্যও এঞ্জিনের সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহার ফলে রেলগাড়ী ও কলের জাহাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই বিপ্লবের যথার্থ ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যত প্রকার পরীক্ষা হইতেছিল তাহার নিদর্শন গ্লাসগোর মিউজিয়ামে দেখিতে পাইলাম। আজকাল এখানে এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রদর্শনী হইতেছে। দেখিলাম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, হাতিয়ার, কলকব্জা ইত্যাদি নানা বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমুদয়ের প্রাথমিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান যুগের শেষ কারিগরি পর্য্যন্ত সকল প্রকার নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। এডিনবারার রয়েল স্কটিশ মিউজিয়ামে যেরূপ রেলগাড়ী, সমুদ্রপোত, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখান হইয়াছে, এখানে সেইরূপ শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আজকালকার কারিগরেরাও যে সকল নূতন নূতন আবিষ্কার প্রবর্ত্তন

করিতেছে সেইগুলিও দেখিতে পাইলাম। জনগণকে নব নব শিল্প-প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োগে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে।

প্রদর্শনীতে উনবিংশশতাব্দীর সকল যুগের বহুসংখ্যক জাহাজ দেখিতে পাইলাম। বাষ্পশক্তির প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া নব্য পোত নির্ম্মাণের রীতি পর্য্যন্ত সকল দৃশ্য এক ঘরের ভিতর পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। এগুলি বুঝিতে হইলে এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। বাষ্পযুগের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের কোন সমুদ্রপোত প্রদর্শিত হয় নাই।

কতকগুলি চিত্রের সাহায্যে উনবিংশশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রেলগাড়ী বুঝান হইয়াছে। সেই সময়ে পরীক্ষার যুগ ছিল। ১৮০০ সালের অবস্থাই সর্ব্বপ্রাচীন বুঝিতে পারিলাম। ১৮৩৪ সালের একটি দৃশ্য দেখা গেল। বাষ্পচালিত এঞ্জিনের সাহায্যে গ্লাসগোর নিকটবর্ত্তী এক নগরে গাড়ী চালান হইতেছে। হঠাৎ এঞ্জিন ফাটিয়া যায়। গাড়ী চুরমার হইয়া গেল। বহুলোকের জীবন নষ্ট হইল।

আজকালকার জাহাজ দেখিলে মনে হয় এগুলি নির্ম্মাণ করা বড়ই কঠিন। বাহির হইতে এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিলে মনে হইবে যে, নিতান্ত অমানুষিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ না করিলে এই বিরাট কলকারখানা সমন্বিত রণতরী বা বাণিজ্যপোত প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। প্রকৃত কথা তাহা নয়।

গ্লাসগো ক্লাইভ নদীর উপর অবস্থিত। কালীঘাটের গঙ্গা অপেক্ষা ক্লাইভ নদী প্রশস্ত নয়—জল নিতান্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে—জাহাজের যাতায়াতে এবং জাহাজ-খানার নৌ-নির্ম্মাণের ফলে জল সর্ব্বদা ময়লা থাকে। নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম—বাঙ্গলা দেশের সাধারণ নৌকার কারখানায় যে রীতিতে পান্সি, ছিপ, বজরা, বাঁহিচের নৌকা

প্রস্তুত করা হয় ঠিক সেই রীতিতে জাহাজ প্রস্তুত করা হইতেছে। কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। বাষ্পচালিত এঞ্জিনগুলি পরে বসাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। অন্যান্য সকল বিষয়ে সাধারণ নৌকা নির্ম্মাণের বিদ্যাই জাহাজ-খানার কারিগরেরা প্রয়োগ করে। বাঙ্গালা দেশের রামা শ্যামা সূত্রধরেরা অনায়াসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমুদ্র-জাহাজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাথার উপরে কয়েকজন আধুনিক বিজ্ঞান ও কল-কব্জায় পারদর্শী এঞ্জিনীয়ার থাকিলেই সহজে জাহাজ প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের মামুলি মাঝিমাল্লা, ছুতার কামার ইত্যাদি শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা নিতান্ত নগণ্য নয়। ইহাদিগকে চালাইতে পারিলেই উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞানানু-মোদিত কলকব্জা কারখানা, ফ্যাক্টরী, জাহাজ রেল প্রস্তুত করা সম্ভব। ক্লাইভ নদীর জাহাজখানা দেখিয়া বিশ্বাস দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লাইভের ধারে প্রায় সহস্র জাহাজ এক সঙ্গে প্রস্তুত হইতেছে দেখি-লাম। বহুদূর বিস্তৃত ভূভাগের উপর কাঠ, লোহা, ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। সহস্র সহস্র কারিগর এই সমুদয় শিল্পে নিযুক্ত। দেখিয়া সাধারণ নদীর ঘাটের নৌকা কারখানার দৃশ্য মনে পড়িল। সাধারণ কারখানাই এখানে বৃহৎ আকারে দেখিলাম।

গ্লাসগো এবং এডিনবারা দুইনগরেই চিকিৎসা শিক্ষার প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাইলাম। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষালাভের পর ছাত্রেরা উপাধি পায়। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও আছে। এই স্বতন্ত্র চিকিৎসা শিক্ষার পরিচালনার জন্য গ্লাসগো এবং এডিনবারার কর্ত্তৃপক্ষেরা মিলিত হইয়া একটি যৌথ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই আয়োজনে ছাত্রদিগের উপর চাপ কিছু কম।

নবম অধ্যায়

নব্য বিলাতের জন্মদাতা

গ্রামার-স্কুলের আবহাওয়া

কাল লীড্‌স্ হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়াছি। দেড় ঘণ্টার পথ মাত্র। কয়েকটা পাহাড়ের নীচে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া মনে হইল ভারতবর্ষের হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন জনসাধারণ-প্রবর্ত্তিত বিশ্ববিদ্যালয় ইহার আদর্শে স্থাপিত হইতে পারে। ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়—অতি বিশালও নয়। অল্প বিস্তৃত ভূভাগের উপর অবস্থিত। সামান্য স্থানের ভিতর অনেকগুলি বিভাগের কারখানাও ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১০০০ ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা আছে। খরচ বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা মাত্র।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা পয়সা জমিদারী বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব্বে ইহা একটা কলেজ মাত্র ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গতভাবে ইহা পরিগণিত হইত। ১৯০৬ সাল হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরের ভিতর আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হইতে পারে নাই। জনগণের চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক সাহায্যের

উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ডিউক অব ডিভন্‌শিয়রকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশা আছে ডিউক্ তাঁহাদিগকে বেশ একটা মোটা দান দিবেন। কিন্তু ৮ বৎসরের ভিতর ডিউক একদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন নাই, এখানকার কোন কার্য্যেরই সংবাদও রাখেন না!

ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি সুবিধা এখানে দেখিলাম। অক্‌স্‌ফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে রেসিডেন্‌শ্যাল প্রথা অবলম্বিত। এখানে কিন্তু ছাত্র ও ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বাস করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে কাহাকেও থাকিতে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু অধ্যাপক ও ছাত্রীগণের ভিতর এখানে যতটা বাধ্য বাধকতা এবং ভাব-বিনিময় ও কর্ম্মের আদান প্রদান হয় আক্‌স্‌ফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে বোধকরি ততটা হয় না। ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আফিসী চাল বেশী—এখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ বেশী। অধ্যাপকেরা এবং এমন কি, ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্বয়ং প্রায় সকল ছাত্রকেই চিনেন। তাহাদের পিতামাতারাও অনেক সময়ে ইহাঁদের পরিচিত হইয়া পড়েন। সন্তানগণের ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের কথা তাঁহাদের অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পান।

লীড্‌সের ভারতীয় ছাত্রেরা বেশ নাম করিয়াছে। ৩,৪ জন বড় বড় অধ্যাপক এবং ভাইস্‌চ্যান্সেলারও বলিলেন যে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা এখানে সকলেই কবিত্ব দেখাইয়াছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদিগের বিরুদ্ধে অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে অন্য ভাব দেখিলাম। এজন্য লীডস্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যল্প ভারতীয় ছাত্রই আসিয়াছে। সম্প্রতি ৮।১০ জন মাত্র আছে। বেশী আসিতে আরম্ভ করিলে খারাপ ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। তখন এখানকার মতও বদলাইবে সন্দেহ নাই।

ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়া মনে হইতেছে লণ্ডনেই পৌঁছিয়াছি। লণ্ডনের জনতা এবং কর্ম্মস্রোত এখানে বুঝিতে পারা যায়। লীড্‌স্ এই হিসাবে ম্যাঞ্চেষ্টার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কলিকাতার সঙ্গে ঢাকার যে অনুপাত লণ্ডনের সঙ্গে লীডসের প্রায় সেই সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টার লণ্ডনেরই পরবর্ত্তী নগর।

এখানকার "গ্রামার-স্কুল" ৪০০ বৎসরের পুরাতন বিদ্যালয়। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব্বে ভাষা, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি শিখান হইত। কিছুকাল হইল বিজ্ঞান এবং শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অবশ্য এডিনবারার জর্জ্জহেরিয়ট বিদ্যালয়ে এই সকল নব্য বিদ্যার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর।

বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। এখানকার হেড্‌মাষ্টার পেটন অতি নামজাদা লোক। প্রার্থনাগৃহে ধর্ম্মসঙ্গীত এবং উপাসনা হইল। ছাত্র এবং শিক্ষকগণকে এক সঙ্গে ইহাতে যোগদান করিতে হয়।

ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার অনুরূপ। ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্নমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আজ ছাত্রদিগের পরীক্ষার দিন ছিল।

Oxford and Cambridge Schools Examination Board.

Manchester Grammar School, 1914.

THE ACTS OF THE APOSTLES. Chapter IX–end.

Sc. 5, 5 b, R *a*, *β*. 5 a.

[*Time allowed*—1 *hour.*]

1. Describe the work of St. Peter outside Jerusalem as recorded in these chapters.

বহুপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইগুলি পাঠ করিলে ইংলণ্ডকে দুঃখ দারিদ্র্যময় অবনত দেশ ভিন্ন আর কিছু বিবেচনা করা কঠিন। ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা এত বেশী কিনা সন্দেহ হয়! ইংরাজসমাজ অস্থিকঙ্কালসার জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইংরাজের সেনাবিভাগে যত লোক কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার ভিতর শতকরা ৫০জন লোক অসুস্থ, পীড়িত এবং আইন অনুসারে সেনাবিভাগের অযোগ্য। ১৯০০ সালের সেনাবিভাগের কার্য্য-বিবরণী হইতে রাউণ্ট্রি তাঁহার বিখ্যাত দারিদ্র্য-চিত্র "Poverty" নামক গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানাইতেছেন:—"The health and physical development of one-half of the recruits who applied for enlistment in the British army during 1910 were below the comparatively low standard required by the army authorities, and it must be remembered that even this does not adequately measure the low standard of health amongst the working classes generally, for only those men were sent up for medical examination who were "reasonably probable" to be passed by the army doctors".

শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জ্জন করা অন্য কারণেও অত্যাবশ্যক। তাহা না হইলে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। Temperance Problem and Social Reform নামক "মাদকতা নিবারণ এবং সমাজসংস্কার" বিষয়ক গ্রন্থে রাউণ্ট্রি এবং শারওয়েল বলিতেছেন:—"Within the last thirty years Germany, Belgium and even Russia have transformed themselves economically. They are now highly developed industrial states claiming

a large share of the world's market, while we are also face-to-face with the unprecedented condition of the United states. The condition of industrial competition, therefore, wholly changed and the question of efficiency, moral and physical, has become one of paramount importance.

At present our most highly equipped and therefore most formidable competitors are our Kinsmen across the Atlantic. America is commercially formidable, not merely because of her gigantic enterprise and almost illimitable resources, but because, as recent investigations have shown, her workers are better nourished, and possess relatively higher efficiency."

এই ভাবনা ইংরাজসমাজের মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ১৮১৫ সাল হইতে ইংরাজ জগতের একমেবাদ্বিতীয়ং রূপে বিরাজ করিতেছেন। শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রুশিয়া ও জার্ম্মাণির প্রতিদ্বন্দ্বিতা পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিয়াছে। ১৯১৪ সাল শতাব্দী পূর্ণ হইল ইতিমধ্যে ইংরাজ ভবিষ্যত অন্ধকারময় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারই নাম জগতের চঞ্চলতা—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

ইংরাজ স্বদেশসেবকেরা প্রধানতঃ এই কয়টি প্রস্তাব তুলিয়াছেন ;—

(১) পল্লীজীবনের উন্নতি বিধান।

(২) কুটির-শিল্প এবং ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের প্রবর্ত্তন।

(৩) পারিবারিক বন্ধনে দৃঢ়তা ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব আনয়ন।

আজকালকার স্বাস্থ্যহানি, চরিত্রহানি এবং লোকক্ষয়ের কারণ ইহাঁদের মতে :—

(১) নগরে জীবন যাপন।

(২) বিশাল কারখানা ও ফ্যাক্টরীর প্রভাবে শ্রমজীবীদিগের মনুষ্যত্ব লোপ।

(৩) বিবাহিত জীবনে শিথিলতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা।

দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় আদর্শের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাই শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ-সমাজের লক্ষ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং ভারতবাসী কোন বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে ব্যাপারটা তলাইয়া মজাইয়া বুঝুন।

চর্ম্মবিজ্ঞান, বয়ন-বিদ্যা ও রসায়ন

ইংলণ্ডে চামড়ার কারবার অনেকগুলি আছে। কিন্তু এই কারবার-সংক্রান্ত বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা বেশী নাই। কারখানার ভিতর চাকরী লইয়া লোকেরা "হাতে কলমে" শিখিয়া থাকে। সম্প্রতি লীড্‌স্-বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্ম্মবিজ্ঞান শিখাইবার আয়োজন করা হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—ছাত্রেরা চামড়ার কার্য্য শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস্, সি, এম্, এস, সি ডিগ্রী পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনেও একটী চর্ম্মবিদ্যালয় আছে। তাহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নয়।

লীড্‌স্-বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্ম্মবিজ্ঞান, জার্ম্মাণির শিল্প-কলেজসমূহের চর্ম্ম-বিজ্ঞান হইতেও উন্নত। এখানকার একজন জার্ম্মাণ ছাত্র এই সংবাদ দিলেন। লীড্‌সে সম্প্রতি চামড়া-বিভাগের অধ্যাপক ষ্টিয়াসলি একজন অষ্ট্রীয়ান্। ইনি এ বিষয়ে নামজাদা লোক। ইঁহার পূর্ব্বে যিনি এই বিজ্ঞানে কর্ম্ম করিতেন, তিনিই নাকি চামড়া বিষয়ে প্রবর্ত্তক। তাঁহার নাম প্রক্টার।

চামড়া-বিজ্ঞান দেখিলাম। বেশী বড় বোধ হইল না। ৩০জন ছাত্র একসঙ্গে কর্ম্ম করিতে পারে—বর্ত্তমানে ২৫জন আছে। চামড়া-বিজ্ঞানের শিক্ষায় প্রধানতঃ দুইটি বিষয় আবশ্যক। (১) রসায়ন—চামড়া পরিষ্কার করা হইতে পালিশ করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের জন্যই রাসায়নিক

দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। অধ্যাপক ষ্টিয়াস্লি বলিলেন, চর্ম্ম-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত রসায়ন বড় জটিল। (২) এঞ্জিনীয়ারিং—পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য হাতে করা হইত এক্ষণে সে সমুদয় কলে করা হয়। কাজেই কল-কব্জা যন্ত্র ইত্যাদির সংখ্যা চামড়া-বিভাগে কম নয়। বাস্তবিক পক্ষে নব্য বিজ্ঞান-যুগে শিল্পের সকল বিভাগে রসায়ন এবং এঞ্জিনীয়ারিং আবশ্যক। এমন কোন কারবার আছে কিনা সন্দেহ যাহার কোন না কোন প্রণালীতে এই দুই বিদ্যার প্রয়োগ না করিতে হয়। যাঁহারা কটকের "উৎকলট্যানারির" কার্য্য দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহা বেশ বুঝিবেন।

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেই মিউজিয়াম ও সংগ্রহালয় থাকে। লীড্সে প্রত্যেক বিভাগের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র মিউজিয়াম রহিয়াছে। চর্ম্ম-বিজ্ঞান বিভাগের সংগ্রহালয়টি দেখিলাম। নানা প্রকার চামড়া, চামড়ার বিভিন্ন অবস্থা, চামড়া পরিষ্কার বা রঞ্জিত করিবার বিবিধ উদ্ভিজ্জ ও জন্তুজ উপকরণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু এই গৃহে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৌলিক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহও দেখা গেল। মিউজিয়াম এবং অনুসন্ধানগৃহ এই দুইটি প্রত্যেক বিভাগেরই অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

চর্ম্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত লীড্স-বিশ্ববিদ্যালয় বয়ন-বিভাগের জন্যও ইউরোপে প্রসিদ্ধ। একজন অষ্ট্রিয়ান এবং একজন জার্ম্মাণ ছাত্র এই বিভাগে কার্য্য শিখিতেছে। অষ্ট্রিয়ান ছাত্র ভিয়েনার একজন ধনী ব্যবসাদারের পুত্র। ইঁহাদের নিজের একটি কাপড়ের কল আছে। সেই কলের কাজ বুঝিবার জন্য ইনি লীড্স্-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখিতে আসিয়াছেন। স্বদেশে এণ্ট্র্যান্স পাশের পর এক বৎসর ব্যবসায় ও ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জার্ম্মাণির পলিটেক্‌নিক্‌-বিদ্যালয়ে না

যাইয়া দূরে আসিলেন কেন ?” ছাত্র বলিলেন, “জার্ম্মাণিতে খুব বড় বড় কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী আছে সত্য। কিন্তু কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে লীড্স্-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চশিক্ষা দিবার আয়োজন নাই। কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং-বিদ্যা আবার জার্ম্মাণিতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিখান হয়। সুতরাং বয়নবিদ্যা শিখিবার জন্য বিলাতে আসা আবশ্যক এবং কলকারখানার বিদ্যা শিখিবার জন্য জার্ম্মাণিতে যাওয়া কর্ত্তব্য।”

বয়ন-বিভাগের আনুষঙ্গিক চিত্রবিদ্যাও এখানে শিখান হয়। প্রথমে বয়ন-বিষয়ক মিউজিয়াম দেখিলাম। জগতের নানাস্থানের তুলা, রেশম, পশম, পাট, ঘাস, বৃক্ষ-ত্বক্ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি কলের ছবি এবং নক্সাও সাজান রহিয়াছে। এই সকল বস্তু দেখিয়া বয়ন-বিভাগের রসায়ন-গৃহ দেখা গেল। তাহার পর কলকারখানা এবং এঞ্জিনীয়ারিং শাখা। এই শাখাই আধুনিক বয়ন-বিদ্যার প্রধান অঙ্গ নানাপ্রকার জটিল কলের সাহায্যে বয়ন-কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। মিস্ত্রীরা কতকগুলি কল চালাইয়া বুঝাইয়া দিল। পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজে দেখিয়াছি, সকল কাজই কলে হইতেছে। বয়ন-কার্য্যেও তাহাই দেখিলাম।

বলা বাহুল্য লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্যার চর্চ্চা অতি উচ্চ-শ্রেণীর অন্তর্গত। রং প্রস্তুত করণ এবং কাপড়ে, রেশমে ও পশমে রং লাগান—এই দুই শিল্প সম্বন্ধীয় রাসায়নিক বিভাগ সবিশেষ উন্নত। বাঙ্গালীরা যে কয়জন লীড্সে আসিয়া নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই বিভাগের ছাত্র ছিলেন। রসায়ন-বিভাগের দুই জন প্রধান অধ্যাপক এই কথা বলিলেন। ভারতীয় ছাত্র সম্বন্ধে ইহাঁদের ধারণা বেশ উচ্চ। শুনিতে পাইলাম শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনে আসিয়া লীড্স দেখিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক কোহেন রসায়ন-মহলে নামজাদা লোক। ইঁহার Organic Chemistry বিষয়ক গ্রন্থ আমাদের দেশে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইনি রসায়ন ছাড়া সমাজসেবার নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। ইঁহার গৃহে আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অতিথি ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যাপক স্মিথেল্‌স্‌ একজন করিতকর্ম্মা লোক। ইঁহার প্রয়াসেই ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়র অঞ্চলে রসায়ন শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইনিই এই প্রদেশের নিম্ন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিখাইবার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। লীড্‌স্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন অধ্যাপক ভারতবর্ষে আসেন নাই। স্মিথেল্‌স্‌ সাহেব লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

রসায়ন-বিভাগের মৌলিক অনুসন্ধানগৃহ অথবা সাধারণ বিজ্ঞানগৃহ দেখিলাম না। কারণ এগুলি সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রায় একরূপ। কেবল ছাত্র-সংখ্যা দেখিয়া আকার বৃহৎ বা ক্ষুদ্র করা হয়। রিসার্চ্চ'-লয়েরও কোন বিশেষত্ব থাকে না। অধ্যাপক কোহেনের কুঠুরি অতি ছোট খাট, সামান্য ধরণের।

রাসায়নিক মিউজিয়ামটা দেখিলাম। রঞ্জন-বিভাগের কতকগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ নানাবিধ খড় ও ঘাস রঞ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। সাধারণ তূলার সূতাকে রেশমের চাকৃচিক্য প্রদান করা হইয়াছে। এই কৃত্রিম রেশমকে আমরা "কাশী সিল্ক" বলিয়া জানি। পশম পরিষ্কার করিলে বিচিত্র তেল ও চর্ব্বি বাহির হয়। এগুলি ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কেননা সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য এই সমুদয়ের ব্যবহার করা চলে। আজকালকার কারবারে 'অনাবশ্যক' বলিয়া কোন

পদার্থ নাই, সবই কাজে লাগান যায়। তুলা পরিষ্কার সময়েও এক প্রকার চর্ব্বি পাওয়া যায়। তাহাও সাবানের উপকরণ। এই চর্ব্বি দেখিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণোৎসব

লীডস্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল তিন দিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে। আজ ডিগ্রী ও বৃত্তি প্রদান করিবার দিন। এখানকার কন্‌ভোকেশন্‌-উৎসব নিতান্তই উৎসবমাত্র—বক্তৃতা, উপদেশ গাম্ভীর্য্যের প্রকোপ নাই। ফেলো, অধ্যাপক, শাসনকর্ত্তা ইত্যাদি কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা অপেক্ষা ছাত্রদিগের প্রভাবই বেশী। ছাত্রেরাই নাচানাচি, লাফালাফি, হাসিঠাট্টা, নৃত্যগীত ও আমোদপ্রমোদে সভামণ্ডপ গুলজার করিয়া রাখে। ছাত্রজীবনে এরূপ স্বাধীনতা ও আনন্দ কখনও দেখি নাই। কর্ম্মকর্ত্তাদের কেহই ছাত্রদিগকে কোন প্রকার বাধাও দেন না অথচ গান করিয়া বক্তৃতা করিয়া ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের জীবন সমালোচনাও করিতেছে! ছাত্রজীবন যে সুখকর তাহা আমাদের দেশে বুঝিতে পারা যায় না।

অধ্যাপক ওয়েন্টন এখানকার শিক্ষাবিজ্ঞান-বিভাগের কর্ত্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলার ইঁহার নিকট আমার বিষয়ে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন, "ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমি কেন, খুব কম ইংরাজই ভারততত্ত্ব বিষয়ক কোন সংবাদ রাখেন। আমরা এখানে ছাত্রদিগকে শিক্ষাপ্রণালীর ইতিহাস শিখাইয়া থাকি। বলা বাহুল্য তাহাতে ভারতের বিশিষ্ট বিদ্যাদান-রীতির কোন তথ্য প্রদত্ত হয় না।"

ইহাঁর মতে ইউরোপীয় ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া খাঁটি স্বদেশী ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলে ভারতীয় প্রণালীর সঙ্গে ইউরোপীয় প্রণালীর তুলনা সাধন সম্ভবপর হইবে। ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা নব্য পাশ্চাত্য প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় প্রথায় জীবন যাপন করিতে না পারিলে তাহার মূলতত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না। ভারতবাসীরা ইউরোপে আসিয়া খাঁটি পাশ্চাত্য আদর্শের জীবন যাপন বুঝিতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা এখনও ভারতীয় আদর্শের সীমারেখা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ওয়েল্টন বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ভারতের সনাতন প্রথার সঙ্গে নব্য পাশ্চাত্য রীতির সামঞ্জস্য বিধান বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু ইংরাজ শাসনে দুইয়ের খিঁচুড়ি প্রস্তুত করা হইতেছে মনে করি। পাশ্চাত্য আদর্শ ভারতীয় জীবনে প্রবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, ভারতবাসী-দিগের ইংরাজী সাহিত্য কাব্য, ইউরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এবং আধুনিক কলকারখানা ইত্যাদি বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত নয়?" ইনি বলিলেন "আমার কথা তাহা নয়। নূতন নূতন বিদ্যা আপনারা সমস্ত জগৎ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বদেশে প্রচার করিতে থাকুন, তাহাতে আপত্তি নাই। বিজ্ঞান, কলকারখানা, দর্শন, কলা ইত্যাদি বস্তু কি কাহারও একচেটিয়া পদার্থ? আমরা যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা কি আমাদের সমাজেই আবদ্ধ থাকিবে? না, অন্যান্য দেশের লোকেরা যে সকল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন সেগুলি তাঁহাদের সমাজেই থাকিয়া যাইবে? বিদ্যা সর্ব্বত্র চলিবে—ইহার গতি রুদ্ধ করিবার পরামর্শ আমি দিতেছি না। এরূপ পরামর্শ দিলে তাহার কোন ফলও নাই। আমি বলিতেছি যে, নব্য জগতের নূতন নূতন কার্য্যপ্রণালী ও চিন্তাপ্রণালী

ভারতবর্ষে অবলম্বিত হউক। কিন্তু তাহার দ্বারা ভারতবাসীর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেন পরিবর্ত্তিত না হয়। বরং তাঁহাদের স্বাভাবিক জীবন গঠনের প্রয়াসেই তাহার সাহায্য গ্রহণ করা হউক। জাতীয় আদর্শ পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই সকল বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত; বিদেশ হইতে কোন জ্ঞান বিজ্ঞান আমদানী করিবার সময়ে স্বদেশীয় আদর্শ এবং জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিবার প্রয়োজন আছে কি ?”

ওয়েন্টনের গৃহ হইতে কন্‌ভোকেশন্ গৃহে আসিলাম। দেখিলাম ছাত্রেরা নাচ গানে লিপ্ত। কেহ স্ত্রী সাজিয়াছে, কেহ নানা প্রকার পুরুষের পোষাক পরিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের টুপি, প্যাণ্ট, জামা ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। মুখোস পরাও বাদ যায় নাই। কেহ দাড়ি লাগাইয়া প্রবীন সাজিয়াছে। কেহ টাকিস টুপি মাথায় দিয়া স্থলতানের প্রজা হইয়াছে—কেহ আধুনিক স্পেনিস, কেহ বা জার্ম্মাণ, কেহ বা সেক্সপিয়ারীয় যুগের ইংরাজ হইয়াছে। ছাত্রীগণও এই উল্লাসে যোগদান করিতে বিরত নহে। কেহ নানা রংয়ের কাগজের টুক্‌রা হাতে রাখিয়া লোক জনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। কেহ কপি, শালগম, কড়াইশুটি ইত্যাদি আনিয়া উচ্চস্থান হইতে দর্শকগণের মাথায় ছুড়িতেছে। শুনিলাম, গত বৎসর এই দিনে ছাত্রেরা ভুঁইপট্‌কা বোমা ইত্যাদি আনিয়া অধ্যাপকগণের সম্মুখে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। আগুন লাগিবার ভয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হন। এজন্য এবার সেরূপ করা হয় নাই।

ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পিতা-মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন বহুদূর হইতে ডিগ্রী প্রদান উৎসব দেখিতে আসিয়াছেন। এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কোন টিকিটের আবশ্যক হয় না। সকলেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। অভিভাবকেরা সন্তানগণের পরীক্ষার ফল

দেখিতে দলে দলে আসিয়া থাকেন। কাহারও বাড়ী ৫০ মাইল, কাহারও বা ১০০ মাইল দূরে। অধ্যাপকগণ এবং ভাইস্‌চ্যান্সেলার অভিভাবকগণকে ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ দেন এবং আলোচনা করেন। এই কন্‌ভোকেশন্‌ উৎসবে ভাইস্‌চ্যান্সেলার সত্যসত্যই ছাত্রদিগের পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়েন।

গৃহমধ্যে নাচ-গান চলিতেছে। সুরগুলি মন্দ নয়। গানের বিষয়ও অত্যন্ত আমোদজনক। শিক্ষকগণের কার্য্যপ্রণালী লইয়া ঠাট্টা করাই প্রধান অঙ্গ। ভাইস্‌চ্যান্সেলারও বিদ্রূপ সহ্য করিতেছেন। ডিগ্রী প্রদানের সময়েও ছাত্রেরা হৈচৈ ইয়ারকি করিতেছে। কয়েকটা গানের নমুনা দেওয়া গেল।

1. Tho' some 'Varsities be older,
   Being established long ago,
By the glamour of antiquity surrounded ;
   Yet we're just as proud in Yorkshire,
      And have many things to show,
To prove to you our pride is fully grounded.

CHORUS.

So Kumati ! for Leeds and its 'Varsity
Its medicine, science, arts and law,
Its technicalities galore,
The students and the training corps,
   So Kumati for Leeds !

2. To this somewhat smoky City,
   With its energetic hum,
Where you find our educational foundation,

The animals came in nine by nine, Vive la compagnie.
Fanny once charged a ten bob fine, Vive la compagnie.
Vive la, &c.

The animals came in ten by ten, Vive la compagnie.
Next year we'll go through it all again, Vive la
compagnie.
Vive la, &c.

Tune · "TOUJOURS."

Our V. C. you know's a sport,
But he's not quite like his students.
Overworks, he is that sort,
When we work, we work with prudence.

Toujours, Toujours, pour Bacchus et pour l'amour.
With a yap, yap, yap, la, la, la, la, tra,
Yap, yap, yap, tra la la la la,
Yap, yap, yap, tra la la la la,
We're 'Varsity Students all.

Our V. C. likes all things new,
Especially when it's painting.
Just little dabs of blue,
Representing ladies fainting.—Toujours, &c.

Who's the man in blue,
Who walks about with hauteur ?
Is he a V. C, too ?
No, bless you ! he's the Porter.—Toujours, &c.

And here's to Professor Grant,
Who lectures us in History,
Tho' who was Cæsar's aunt,
To him remains a mystery.—Toujours, &c.

What about Professor Jim,
Who lectures Education,
Who feeds on Force and Vim,
And loves an osculation.—Toujours, &c.

Here's to Professor Bragg,
Who sailed it from "down under,"
To make this College wag
Its Physics tale in wonder.—Toujours, &c.

Here's Professor John,
Delights connubial fearing,
A thorough sporting don,
Who lectures Engineering —Toujours, &c.

There's Leonardo Rogers,
With maiden meditations,
A Prince of artful dodgers,
In intricate equations,—Toujours, &c.

We've got a Professor Green,
With a fascinating daughter,
Though Textiles are so keen,
There is n't one yet caught her,—Toujours, &c.

Prof. Smithells, he was game,
To India he travelled,

The mysteries of Flame
For students there unravelled.—Toujours, &c.

Who is that with soulful eyes,
Who talks of transmutation,
Brother dems, we may surmise,
Would prefer 'twere transportation.—Toujours, &c.

Who's Master of Satire ?
With Lowson no one's in it,
We set the Lab. on fire
With what's said after a visit.—Toujours, &c.

And then there's Redman king,
Whose hair's so long and curly,
You ne'er saw such a thing
Even on a girly.—Toujours, &c.

Our new President is Freddie,
Who is a lawyer bold,
For a hair cut he's been ready,
Since he was ten years old.—Toujours, &c.

And what's that over there
With coiffure like a broom,
Or like a grizzly bear.
Why that is R. C. Groom.—Toujours, &c.

Which man's a big voice.
Oh, is n't he a talker ?
And should n't we rejoice,
O'er a Chloroformed Walker.—Toujours, &c.

Then sing "God save the King,"
And give him jurisprudence,
To rule the greatest thing
On earth, the, Varsity Students.—Toujours,&c.

Tune : "WHO KILLED COCK ROBIN."

Who likes mad pictures ?
"I," said the V. C., "they're what I go to see,
"I like bad mixtures !"

And all the mad artists fell a debating
As to what the great V. C. meant when he was prating
As to what the great V. C. meant when he was prating.

Who likes work less than play ?
"We," all the students say, "then shall we chuck it, eh ?
"We like work less than play !"

And all the students said they would stop their Educations,
And take up fives and golf for the benefit of the nations.
And take up fives and golf for the benefit of the nations.

Who likes panama hats ?
"I," said Professor Jim, "as you saw at Reivaulx,
"I wear made hats."

And all the students there were struck absolutely dumb,
When they saw the kind of hat in which Jim had come.
When they saw the kind of hat in which Jim had come.

Who hates all exams ?
"I," said Professor Gordou, "they cause one such boredom,
"I hate all exams."

And all the English people fell a shouting and a clapping.
But he soon set such a stiff one that it nearly caught them napping.
But he soon set such a stiff one that it nearly caught them napping.

Who sells cheap choc'lates ?
"I," said Nell Brown, "for a bazaar in our town,
"I sell cheap choc'lates.

And the women voted me on the W.R.C.
For they thought that they would get free choc'lates out of me.
For they thought that they would get free choc'lates out of me

Tune : "POLLY WOLLY DOODLE."

Sam Cohen struts about with a pencil in his hand,
Sketching for the *Gryphon* all the day ;
His caricatures superb make the *Gryphon* in demand
And there's not a Varsity Student here but would say.

Chorus :

Fare thee well, fare thee well, fare thee well my fairy fay,
The Art Supplement is splendid but the stock is nearly ended
There's no doubt they're worth the sixpence you've to pay.

Oh the women students here are a jolly funy lot,
With their squabbles, squabbles, all the day.
They criticize the *Gryphon* but of course that's naught but rot
As the Editor will tell you, o'er the way.

Chorus :

Fare thee well, fare thee well, fare thee well my fairy fay,
If you'd here some language choice, which 'twould not be wise to voice ;
Ask The Editor about it any day.

Oh, the Engineers make a nasty noise
Up Collge Road and down it every day.
Whilst Connal was teaching his girls and boys
He said a little swear at them, they say.

Chorus :

Fare thee well, fare the well, fare the well my fairy fay,
Its a better policy far, to say your A, B, C,
Than to swear before the ladies any day.

And Bell this year is leaving too.
Who talked to foreign students all the day,
And Hindu, Greek, Chinee, French and Jew,
Are wondering how they can stay.

Chorus :

Fare the well, fare thee well, fare the well my fairy fay,
But the foreign student's club would be ruined there
and then
If they hadn't Percy Rothwell all the day.

Katey Fenton rides on a motor bike
And is going to let us see it some day,
But its either ill with a rusty spike
Or it's got the flue and had to go away.

Fare thee well, fare thee well, fare thee well my fairy fay,
For your motor bike, Miss Fenton, is exactly like Miss
Lenton,
It's a most elusive Creature every day.

Tune : JOHN PEEL." No chorus.

D'ye ken your alphabets, little Bobby lanky Byrne.
Their names on the exam. lists have given us many a
turn,
For names like these we shall always yearn,
Since we saw them first in print in the morning.

D'ye ken Miss Greenwood on this surprising day,
D'ye ken Miss Greenwood in this demure array,
D'ye ken Miss Greenwood, we would that she could
stay
And play as of yore in the morning.

D'ye ken R. C. Groom with his feather in his hat,
D'ye ken R. C. Groom with his socks, cane and spats
D'ye ken R. C. Groom, he's a Knut ! all that !
When he strolls up to College in the morning.

D'ye ken Miss Crowther energetic in debate,
D'ye ken Miss Crowther for lectures often late,
D'ye ken Miss Crowther, in *everything* she's great,
But her hair *will* fall down every morning.

D'ye ken Sam Cohen when he's gone what shall we do,
No more for our *Gryphon* caricatures he'll do.
D'ye ken if he's drawing the Prof. or you
When he's scribbling during lectures in the morning.
D'ye ken the Hostel Girls playing tennis all day long,

D'ye ken the Hostel Girls as across the Quad. they throng
D'ye ken the Hostel Girls as they gaily trip along
The dark passage to the Hall in the morning.

D'ye ken the O. T. C. and its greatest deed of fame,
By painting houses green they have earned a lasting name.
Have you heard the long orders their Sergeant doth declaim,
As they drill in the Quad, in the morning.

D'ye ken this noble throng of graduates so gay,
Through trials grim they've won the triumphs of this day,
It will live in their mem'ry when they're far, far away,
As they think of the din of this morning.

Tune : "ALL THROUGH THE NIGHT."

All the Library rules I've broken,
Fanny dear,
Oh, the times and times I've spoken
Fanny dear ;
Then you come round pussy-quiet,
Try to still our angry riot,
Till we madly want to fly at
Fanny dear.

Oh, select, and wrapped in mystery,
Seminer,
English, German, Latin, History
Seminar ;
Moorman cites a Gothic number,
Woodward shuts his eyes in slumber,
Connal revels in thy lumber,
Seminar.

Oh, the hours and hours we've frittered
In those Labs.
Patterson and Perkins twittered
In those Labs.

Odling chips the stones of ages,
Bragg and Garstang mock the sages,
Stiles and Perter earn their wages,
In those Labs.

Oh, the time and cash we've squandered
On the Courts.
After dancing too we've wandered
On the Courts.

Broadbent writhes within his sweater,
Gottlieb fails to find his better,
Wolff-Malm mentions "donnerwetter"
On the Courts.

Now our days at Leeds are over,
Kumati.
We must leave this bed of clover,
Kumati.
While our deeds the V. C.'s telling,
And our hearts with pride are swelling,
For the last time we are yelling.
Kumati.

Tune : "THE ROSARY."

The hours I spend with Mrs. Beck
Are more than all the lecs. to me ;
I count the price of fried and scraggy neck
Refectory ! Refectory !

Each day I feed, each day the beef
Moor minced than yesterday's I see !
The veal is simply tough beyond belief.
Refectory ! Refectory !

Oh, memories of soups that burn,
Oh, barren bones and bitter "pops."
I count my beans and strive at last to learn
To chew thy chops, Refectory.

* *
*

Tune : "SOLOMON LEVI."

My name is Sammy Abrams and I run the *Gryphon* fine.
So send in plenty of "articles" the pay's a penny a line.
And Sparling writes me poetry and I've fashion notes dress.
And I cut up with scissors, and paste, and send it off to press.
Oh Sammy Abrams, tra, la, la, la, la, la,
Oh Sammy Abrams, tra, la, la, la, la, la,

The Profs. are all delighted to walk inside of our store,
And trade with the elegant H.P., whom we pay to walk the floor.

We've second-handed storyettes and tons of racketty rime,
And all the 'Varsity buys *The Gryphon* and reads it every time.

Oh, Sammy Abrams, tra, la, la, la, la, la,
Oh, Sammy Abrams, tra, la, la, la, la, la, &c.

His name is R. H. W. Byrne—his course is History Hons.;
Of Science, Textiles, Leather, Law, he simply knows tons and tons.
On Post Impression he's a knut, on the Bible he's no peer,
The Law Professors all cower aside—he's filled them all with fear.

R. W. H, G. B Y R N E,
Came to Leeds from Ireland and now he's going back, &c.

Tune. MIDNIGHT CHOO CHOO.

When the 'Varsity students sit for and exam., an exam.,
They sit and stare an exam.,
And tear their hair
As they see that nasty supervisor man.
They get into a choler
And they holler,
"Hang Exams." "Hang Exams."
That's where they rack their brain
To bring facts back again
Which they cannot retain
And they could not cra-am,

And they hear the Textile's yells,
Motor horns and lecture bells,
All are bored, all are bored,
All are bored with an exam.
When you look for the results of your exam., your exam.,
your exam.,

You loudly swear,
Your name's not there,
If you had that musty old inspector man
You'd grip him by the collar
And you'd holler
"Hang it all, hang it all
You must have been insane
To make me plough again.
My work has been in vain
All my swot and cra-am."

And you hurry from the yells
And the news the notice tells,
On the Board, on the Board,
When you've faild in an exam.
If you never want to dine at the Refec., the Refec.,
the Refec,

You run up there
And find a chair
When you see the waitress, Jane or Mary Anne,
You widly wave your menu
Till she's seen you.

"Hang the girl, hang the girl,
She's going to make me late
If she comes at this rate
How long have I to wait
For my leg of la-amb,"
But if you wait long enough
She will come back with your stuff
If you wait, if you wait,
If you wait at the Refec.

Tune : "POLLY WOLLY DOODLE."

A Fresher as green as green could be,
Singing Hagi, hagi, hai all the day,
I came to Leeds its Varsity,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.
In the big main roads I looked in vain,
I found it at last in a little back lane.

Hail to thee, hail to thee,
Hail to thee, ecstatic day,
When I met at Yorkshire College,
The embodiments of knowledge,
Singing Hagi, hagi, hai all the day

And first I went to the H.P.
Singing Hagi, hagi, hai all the day,
I thought he must be the V.C.,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.
So who was so surprised as me,
W hen he handed me a locker key.

Hail to thee, hail to thee,
Hail to thee, amazing day,
When I met at Yorkshire College,
The H.P. devoid of knowledge,
Singing Hagi. hagi, hai all the day.

That night I went to a Debate,
Singing Hagi, hagi, hai all the day,
But we all sat round in silent state,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.
While Rolleston gassed on and on,
Till all but he and I had done.

Hail to thee, hail to thee,
Hail to thee, improving day,
When I heard at Yorkshire College,
Eloquence beyond my knowledge,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.

To inter. then my brains I bent,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.
The result was just 13 per cent.,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.
So I tried again for a year or two,
Till the Profs. got tried and shoved me through.

Hail to thee, hail to thee,
Hail to thee, triumphant day,
When I got at Yorkshire College
The acknowledgement of knowledge,
Singing Hagi, hagi, hai all the day.

And now my Final's over too,
  Singing Hagi, hagi, hai all the day,
They could't read my writing, so they had to put me through.
  Singing Hagi, hagi, hai all the day,

So now I am a B.Sc.,
  Singing Hagi, hagi, hai all the day,
Qualified to teach kids A.B.C.,
  Singing Hagi, hagi, hai all the day.
    Fare thee well, fare thee well
    Fare thee well, my comrades gay.
    For I'm quitting at yorkshire College,
    Having stuffed my head with knowledge,
    Singing Hagi, hagi, hai all the day.

* *
*

আজ সারা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা আমোদ প্রমোদে কাটাইল। বিকালে অধ্যাপক কোহেনের গৃহে একটা ক্ষুদ্র সান্ধ্য-সম্মিলন ছিল। অধ্যাপক মহাশয় মাসে প্রায় দুইবার করিয়া ছাত্রগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য এক্ষণে বিদ্যালয় তিনমাস কাল বন্ধ থাকিবে। সুতরাং আজিকার সান্ধ্য-মিলন গত বর্ষের শেষ অনুষ্ঠান। সামান্য জলপান, নাচ-গান, গল্প গুজব নক্সা ইত্যাদি হইল। একটা ক্ষুদ্র নাটকের অভিনও দেখিলাম। এই সকল আমোদ-প্রমোদ দেখিয়া মনে হইল, মানবসমাজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় এক ধরণেই হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। নানা বৈচিত্র্যের ভিতরে মানবাত্মার গভীরতম ঐক্য, বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তবে এদেশে মানুষেরা সর্ব্বদা নির্ভীক নিশ্চিন্তভাবে জীবন

কাটাইতেছে—আমরা ভারতবর্ষে যথার্থ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ভুলিয়া যাইতেছি। ইহাদের আনন্দোৎসবে যতটা সরস জীবনবত্তা পাওয়া যায়, আমাদের ভিতর ততটা সম্প্রতি পাওয়া কঠিন। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অন্তরালে একটা দারিদ্র্য ও বেদনা সর্ব্বদা অনুভব করিতে থাকি। সে জন্য গালভরা হাসি আমাদের পক্ষে বিরল।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, এ দেশে সমাজসেবা, লোকহিত, পরোপকার ইত্যাদি কর্ম্ম জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিয়া থাকে। এখানে আসিয়া দেখিতেছি, বাস্তবিক পক্ষে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই প্রধান সমাজসেবক, এবং লোকহিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, উৎসাহদাতা ও অর্থ সাহায্যকারী। কেবল বিদ্যাদান কেন—জলদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান ইত্যাদি দ্বারা দরিদ্র জনগণের সকল প্রকার অভাব মোচন করিবার ভার গবর্ণমেণ্ট লইয়াছেন। কোন বড় কার্য্যই গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত এদেশে হয় না। আগে জানিতাম যে, জার্ম্মাণির লোকেরাই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী এবং সাহায্য প্রত্যাশী। এখন বুঝিলাম, ইংলণ্ডও জার্ম্মাণির আদর্শে সকল কর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, শাসন এবং পরিচালনা প্রবর্ত্তন করিতেছে। রাষ্ট্র এদেশে ছাত্র ও যুবকগণের অভিভাবক, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের মা-বাপ, নরনারীগণের চরিত্রের সংস্কারক, এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সংরক্ষক হইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের আদর্শ ইংরাজরাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আজকালকার লয়েড জর্জ্জ ইংলণ্ডের জার্ম্মাণ-নীতি প্রচারক।

দরিদ্রের ক্রন্দন, রাষ্ট্রকর্ম্মীদিগের কর্ণে কিরূপে উঠিল? শ্রমজীবীদিগের পক্ষ অবলম্বনকারী পার্ল্যামেণ্ট সভ্যেরা এখনও প্রবল হইতে পারেন নাই। এখনও ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী এবং ভূস্বামীদিগের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করা ইংলণ্ডে অসম্ভব। পয়সাওয়ালা লোকদিগের কথায়ই

লোকেরা উঠে বসে—তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই জাতীয় মহাসভার সভ্য-পদ পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সমাজ যে ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে, স্বাস্থ্যের অভাব, শক্তির অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব, চরিত্রের অভাব যে জনগণকে অধঃপতিত করিতেছে, তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকী নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাত-সারেই হউক দারিদ্র্য-সমস্যা ইংরাজসমাজে মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। লেখক, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ধনবিজ্ঞানবিৎ সকলেই ইহা বুঝিতেছেন। এ কথা সমাজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজেই পার্ল্যামেণ্টও দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করা অনিবার্য্য। মোটের উপর সমস্ত সভাই কিছু না কিছু দরিদ্রপক্ষের বন্ধু হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিগত ১০।১৫ বৎসরের ভিতর বিলাতে যত আইনজারি হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই এই দারিদ্র্য-সমস্যা হইতে উত্থিত। আজ লীডস্-নগরের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সম্পাদকের সঙ্গে অনেক কথা হইল। পার্ল্যামেণ্ট, টাউনসভা, কাউণ্টিসভা, পল্লীসভা ইত্যাদি সকল সভা দরিদ্র-দিগের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সে সকল বিষয়ে আলো-চনা হইল। ছাত্রদিগকে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে খাওয়ান আজ কাল প্রত্যেক নগরে মহা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। খরচ মিউনিসিপালিটি হইতে দেওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে বুট, জামা, টুপিও দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে স্কুল ও কারখানার বালক বালিকাগণকে সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হয়। নগরের অসুস্থ নরনারীগণকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করান হয়—সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

এতদ্ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে আইন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ১২।১৫ বাড়ীতে একটি মাত্র জলের কল এবং পায়খানা থাকিত। এক্ষণে প্রত্যেক গৃহে কল ও পায়খানা রাখিবার আইন জারি করা হইয়াছে।

কারখানার গৃহগুলি স্বাস্থ্যকররূপে প্রস্তুত করা এবং সর্ব্বদা সেইরূপ রাখার জন্য গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীরা তত্ত্বাবধান করেন। কারখানার শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য দুই স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই অভিভাবকোচিত শাসন কেবল নগরেই আবদ্ধ নয়—পল্লীতে এবং কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইতেছে। কৃষকদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিভূমির মালিক করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য মনে করেন। ধনী, ভূম্যধিকারীদিগকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের জমি দরিদ্র কৃষকগণের নিকট বিক্রয় করান হয়। তাহা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সের লোক মাত্রকে পেন্সন দেওয়া হইতেছে। তাহাও গবর্ণমেণ্ট ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর জীবন-বীমা-প্রণালীও ইংলণ্ডে অবলম্বিত হইল। কারখানার শ্রমজীবীরা যাহাতে দৈবক্রমে কর্ম্মহীন এবং অসুস্থ হইলে অনাহারে মারা না যায় তাহা দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন। ফলতঃ, ধনী মহাজনগনের উপর কড়া আইন করিয়া, তাঁহাদের ধন-সম্পত্তির উপর অধিক হারে কর বসাইয়া দরিদ্র অভাবগ্রস্ত নরনারীর স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য বিলাতের রাষ্ট্রকে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহার নাম Socialistic state. বিলাতের রাষ্ট্রমণ্ডলে Small Holdings Act, Factory Act, Allotment Act, old age Pensions Act, State Insurance, Progressive Taxation, Feeding of the poor, Unemployment ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য-তত্ত্ব বিশেষরূপেই আলোচিত হইয়া থাকে। এখানকার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনসমূহও এই সকল আলোচনার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত।

রাষ্ট্র হইতে দরিদ্রের জন্য এইরূপে সুযোগ সৃষ্টি করা হইতেছে। দরিদ্রেরাও বসিয়া নাই। দরিদ্র জনসমাজের পক্ষ হইতে "শ্রমজীবী

সম্প্রদায়” পার্ল্যামেণ্টে সভ্য পাঠাইতেছেন। আজকাল এই সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোন্যাল্ড। ইনি Home University Library series of the socialist movement নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিলে বিলাতের দারিদ্র্যবিজ্ঞান সংক্ষেপে বুঝা যাইবে।

লীড্‌সে শ্রমজীবী বন্ধু বলিলেন, “পার্ল্যামেণ্টের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বেশী দিনের প্রতিষ্ঠান নয়। পূর্ব্বে দেশের সর্ব্বত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য শ্রমজীবী সমিতি ছিল। এইগুলি বৎসরে মিলিত হইয়া শ্রমজীবী মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান করিত। মহাজনগণের অত্যাচার, অবিচার, দুর্ব্ব্যবহার ইত্যাদি নিবারণই এই সমুদয়ের উদ্দেশ্য থাকিত। এইরূপ শ্রমজীবী মহাসম্মিলনের ফলে দেশের ভিতর একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ একটা রাষ্ট্রীয় দল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলের সভ্যেরা কেবলমাত্র মহাজনগণের বিরুদ্ধে অথবা শ্রমজীবিগণের স্বপক্ষে মতামত প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন না। ইহারা দেশের সকল স্বার্থই দরিদ্র সমাজের পক্ষ হইতে আলোচনা করিয়া রাষ্ট্র শাসনের সাহায্য করেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “লীড্‌সে এই দলের কোন কার্য্য হয় কি?” ইনি উত্তর করিলেন, “প্রত্যেক কাউণ্টির সভায় এই দলের পক্ষ হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ঠিক পার্ল্যামেণ্ট সভ্যের আদর্শেই কার্য্য করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। দোকান, কারখানা, হাট-বাজার সবই বন্ধ। কিন্তু নগরের ভিতর নানা উদ্যানে যাইয়া দেখুন, সেই সকল স্থানে সভা বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক পাড়ায় স্থানীয় শ্রমজীবীরা আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদিগের জন্য গত সপ্তাহে এই সহরের সভায় কি কি কার্য্য করা হইয়াছে সেইগুলি প্রচার করা হয়। ইংলণ্ডের অন্যান্য

স্থানেই বা শ্রমজীবীরা কি কি করিতেছেন তাহা বুঝান হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া হয়। এইরূপে শ্রমজীবীরা নিজেদের আর্থিক উন্নতির উপায় আলোচনা করিতে অভ্যস্ত হয়— অধিকন্তু রাষ্ট্রশাসন বিষয়েও তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকে।"

এই সকল প্রচার-কার্য্য ছাড়া শ্রমজীবীরা নিজেদের উন্নতির জন্য অন্যবিধ কার্য্যও করিয়া থাকে। যাহাতে শ্রমজীবীরা নিজেই মূলধন সঞ্চিত করিয়া শিল্পকর্ম্মে অথবা ব্যবসায়ে লাগিতে পারে তাহার প্রয়াস এখানে যথেষ্ট। শ্রমজীবিগণ গায়ে খাটিবে আবার মূলধনও যোগাইবে—তাহারা নিজেই কর্ত্তা, আবার নিজেই নিজের চাকর—এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানকে "কো-অপারেটিভ" বলা হয়। এইরূপ কো-অপারেটিভ ভাবে লীডসের শ্রমজীবীরা জুতা তৈয়ারী, বাড়ী তৈয়ারী এবং কাপড় তৈয়ারী করিয়া থাকে। এই সকলের ক্রেতাও ইহারাই। ইহার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পর প্রতিযোগিতা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রতিযোগিতা নিবারণ করিয়া তাহার স্থানে সাম্য, সামঞ্জস্য ও সহানুভূতির প্রবর্ত্তনই কো-অপারেটিভ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার ফলে প্রভুত্ব এবং দাসত্ব দুইই এক ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং পরের গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় না। ইহার নামই স্বায়ত্তশাসন।

এইরূপে ক্রয়, বিক্রয়ের ন্যায় ঋণ দান, ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি অন্যবিধ কার্য্যও হইয়া থাকে। শ্রমজীবীরা সামান্যহারে কোন স্থানে টাকা জমা রাখে, পরে সেই স্থান হইতেই আবশ্যকমত ধার লয়। অতএব ঋণদাতা এবং ঋণ-গ্রহীতা একই ব্যক্তি হইতে পারে। তাহার ফলে সুদের কঠোরতা ভোগ করিতে হয় না।

লীড্‌সের মিল্‌হিল চ্যাপেলে আজ সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মবক্তৃতা শুনা গেল।

এই গির্জ্জায় বিখ্যাত রাসায়নিক প্রিষ্ট্‌লী পুরোহিত ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইউনিটেরিয়ান্‌ মতাবলম্বী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই মন্দিরের উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকেন। ইহাদের মত :—

(১) জগদীশ্বর মানুষমাত্রের পিতাস্বরূপ।

(২) মানবগণ সকলই ভাই।

(৩) যীশু মানবজাতির নেতা।

(৪) মানবজাতির ক্রমিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

(৫) চরিত্রগঠনের দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায়।

এই মন্দিরের উপাসক হইতে হইলে খৃষ্টানদিগকে তাহাদের ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করা হয় না। বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নাই। জনগণের মত স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়।

প্রত্যেক রবিবার সকালে বিকালে যথারীতি উপাসনা, ধর্ম্মসঙ্গীত ইত্যাদি হইয়া থাকে। একজন আচার্য্য বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় বিবিধ। আজকার বিষয় ছিল—"নাস্তিকতার পর কি ?" অন্যান্য দিনের বক্তৃতার নাম :—(১) ধর্ম্ম ও শিল্প, (২) নিত্য ও অনিত্য, (৩) প্রকৃতি সেবার পুনরাবর্ত্তন ইত্যাদি।

লৌহ কারখানা

এ দেশের সরকারী কার্য্যালয়ের কর্ত্তাদিগের সঙ্গে দেখা করিলে নানা-প্রকার তথ্য কম সময়ের ভিতরে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, মিউনিসিপালিটি, শিক্ষা ইত্যাদি যে কোন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ কাজ কর্ম্মের সকল বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত থাকেন। স্কট্‌ল্যাণ্ডে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে ওখানকার বড় বড় অফিসের কর্ত্তাদের সঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের নিকট ছাপা কাগজপত্র, টাকা, অনুষ্ঠান-পত্র, কার্য্য-বিবরণী, তালিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি নানা প্রকার বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঐগুলি পাঠ করিলে সকল তথ্যই অবগত হইতে পারি।

লীড্‌স্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলার এখানকার কাউণ্টি কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে এখানকার শাসন ও রাষ্ট্রকর্ম্ম সম্বন্ধে অতি সহজে অনেক কথা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

আমাদের ওখানে এক এক প্রদেশের প্রায় সকল জেলাতে একই ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে এক লীডস্‌ নগরের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত। কোন বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী অন্য কোন বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর অনুরূপ নয়। পরিদর্শকগণের চাপে পড়িয়া বিদ্যালয়গুলির বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয় না। অধিকন্তু এই স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র ও স্বাধীনতা সমগ্র ইয়র্কশিয়ারের প্রত্যেক

নগর পল্লীজনপদে বিরাজমান। ইয়র্কশিয়ার আমাদের বাঙ্গালাদেশের একটা বড জেলার সমান। কিন্তু ইহার উত্তরাংশে, পশ্চিমাংশে এবং পূর্ব্বাংশে তিন ভিন্ন ভিন্ন শাসন-প্রণালী। প্রত্যেক অংশের অধীনে আবার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পর বিভিন্ন। এইরূপে একটা নাতি বৃহৎ জেলার ভিতর অসংখ্য চিন্তাকেন্দ্র ও কর্ম্মকেন্দ্র পরিপুষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এই জেলায় কর্ম্মবীর, ব্যবসায়বীর, ধুরন্ধর, জন-নায়ক, ঐতিহাসিক, ধর্মবিজ্ঞানবিৎ, শিল্পী, চিত্রকর, এঞ্জিনীয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদির অভাব নাই। এক ইয়র্কশিয়ারে যতগুলি বড় বড় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এবং যত সংখ্যক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কারিতকর্ম্মা লোকের কর্ম্মস্থল, সমগ্র ভারতবর্ষে ততগুলি চিন্তাকেন্দ্র, কর্ম্মকেন্দ্র এবং কর্ম্মীপুরুষ নাই।

তাহা ছাড়া শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্বও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ১৯০৫ সালের পর হইতে এখানে শিক্ষাসংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। গত ৮।৯ বৎসরের ভিতর ইয়র্কশিয়ার ইংলণ্ডের অন্যান্য জেলাকে অনেক বিষয়ে পরাস্ত করিতে পারিতেছে। অন্যান্য শায়র বা কাউণ্টি হইতে শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষাসংস্কারকেরা ইয়র্কে আসিয়া এখানকার কর্ম্মপ্রণালী বুঝিয়া যান।

লীডস্ নগরের ভিতর যতগুলি শিল্প ও ব্যবসায় আছে এখানকার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাহার কতকগুলি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই তালিকাগুলি আবার মানচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র এবং ধারা বুঝিয়া মিউনি-সিপ্যালিটীর শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা পাডায় পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। মুচীদের পাড়ায় চর্ম্মবিদ্যালয়, তাঁতীদের পাড়ায় বয়নবিদ্যালয় ইত্যাদি লীড্সের ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠিত। এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য খরচ মিউনিসিপ্যালিটী হইতে করা হয়। প্রয়োজন হইলে ছাত্রদিগের অন্নবস্ত্রও জোগান হয়। তাহা ছাড়া বৃত্তি পারিতোষিক ইত্যাদির অন্ত নাই। অর্থাভাবে ছাত্রের শিক্ষাভাব এখানে ঘটে না।

প্রত্যেক ছাত্রই নিজের পরিবারগত এবং পৈতৃক শিল্প ও ব্যবসায়ের অনুকূল বিদ্যা শিক্ষা করে। অথচ সাধারণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্কন, গণিত ইত্যাদিও তাহার বাদ যায় না। মিউনিসিপ্যালিটির টাকাতেই বিদ্যালয়গুলি চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু শিক্ষকেরা ইন্‌স্পেক্টর, সুপারিণ্টেডেণ্ট ইত্যাদির উপদ্রব সহ্য করেন না। তাঁহারা নিজের বুদ্ধি অনুসারে লেখা পড়া শিখাইতে অবসর পান।

লীডস্‌নগরকে নানাবিধ শিল্পের কেন্দ্র বলিয়া সকলেই জানেন। ইহা যে নানাবিধ বিদ্যালয়েরও কেন্দ্র তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। এই বিদ্যালয়গুলি আবার মামুলি ধরণের নয়। বহু বিষয়েই বিলাতের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে এখানকার বিদ্যালয়গুলির আদর্শ ও পরিচালনা স্বতন্ত্র। প্রধান কথা—ইহাদের ছাত্রেরা নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার উপযোগী বিদ্যার্জ্জন করিতে পারে। প্রকৃত জীবনের সঙ্গে এবং সমাজের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংযোগ সাধন আর কোন উপায়ে হইতে পারে না। একমাত্র এই ব্যবস্থায়ই শিক্ষাপ্রণালী সজীব ও সরস হইয়া থাকে।

আজ এখানকার একটা প্রকাণ্ড লৌহ কারখানা দেখা গেল। ফ্যাক্টরীগুলি দেখা বড় কঠিন। হয় শ্রমজীবীদিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা চাই। তাহাদের ইউনিয়নের বন্ধুরূপে সহজেই কারখানায় প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। অথবা কারখানার মালিক বা ম্যানেজারগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাধ্যাপক

কোহেন এই কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বন্ধু। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া এই কারখানা দেখিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন।

কারখানার ভিতর ২০০০ কুলী কাজ করিতেছে। লীড্‌সে এত বড় লোহার কারবার আর একটিমাত্র আছে। রেলওয়ে, এঞ্জিন ইত্যাদির সম্পর্কিত কাজ ছাড়া এখানে আর কিছু করা হয় না। দেখিলাম আমাদের ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে, এবং পঞ্জাবের নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের জন্য কতকগুলি এঞ্জিন প্রস্তুত করা হইতেছে। বিরাটকাণ্ড। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, নানা দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য স্থান হইতেও নানা অর্ডার আসিয়াছে। এক এক বিভাগে এক এক অংশ প্রস্তুত করা হইতেছে। যুবা, ছেলে, বুড়ো ইত্যাদি নানা বয়সের লোক এই কারখানার ভিতর কাজ করিতেছে। এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। চারিদিকে কলকব্জা, লোহালক্কড়, এঞ্জিন যন্ত্রের আওয়াজ কাহারও কথা শুনা যায় না। প্রায় সকল স্থানই অন্ধকার, তাহার ভিতর আবার বাহিরের ধূম, ময়লা, ধূলা আসিয়া পড়িতেছে। এই আবেষ্টনের ভিতর ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া শ্রমজীবীদিগের পরিশ্রম করিতে হয়।

শুনিলাম, বৎসরে ১২০ খানা এঞ্জিন এখান হইতে প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটার মূল্য ১৫০০০৲ হইতে ৪৫০০০৲ পর্য্যন্ত। এঞ্জিন ছাড়া রেলওয়ে কারখানার নানা যন্ত্রও এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য আগাগোড়া কলের কাজ।

এই কারখানার ভিতর আসিলে বিলাতী এবং পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞানের সকল কথাই একেবারে বুঝা যায়। গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধনবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে অনেক জিনিষই অলীক মনে হয়—বহুতথ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া যতগুলি ধন-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করি না কেন, এই বিজ্ঞানের সারকথা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারি না। কারণ, বাস্তবিক পক্ষে, ধনবিজ্ঞান কর্ম্মজীবনের একটা বিদ্যা। সেই কর্ম্মের আবহাওয়ার মধ্যে না জন্মিলে বা না থাকিলে তাহার বিজ্ঞান বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আজকালকার ধনবিজ্ঞান গ্রন্থে যে সকল তথ্য আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় এবং যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাদের আবেষ্টন ভারতবর্ষে আদৌ নাই। ভারতবর্ষে থাকিয়া সেই শক্তিপুঞ্জের ধারণা করিতে পারা দুঃসাধ্য। সেই সমুদয়ের প্রকৃত জন্মস্থান ইয়র্কশিয়ার ও ল্যাঙ্কাশিয়ার। এখানকার ফ্যাক্টরী, কারখানা, যন্ত্র হাতিয়ার, শ্রমজীবী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, কুলী-সমিতি, ধর্ম্মঘট ইত্যাদিই আধুনিক ধন-বিজ্ঞানের মাল-মশলা। এই সকল মাল-মশলা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়াই বিলাতের পণ্ডিতেরা 'ধনবিজ্ঞানের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাজেই ভারতবাসীরা এই ধন-বিজ্ঞান বুঝিবে কোথা হইতে? এই বিদ্যা ভারতবর্ষের শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করা ত দূরের কথা।

বিলাতের বিচিত্র সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য আধুনিক ধনবিজ্ঞান বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই সমুদয় সমস্যা একেবারেই নাই। কাজেই ধনবিজ্ঞান ভারতবাসী সত্য সত্যই বুঝিতে পারে না, এবং এই বিজ্ঞানের সারকথাও তাহারা স্বদেশের সমস্যা পূরণের জন্য লাগাইতে অসমর্থ।

একটা বড় ফ্যাক্টরী আধুনিক ধন-বিজ্ঞানের যথার্থ ল্যাবরেটরী। ইহার ভিতর প্রবেশ করিলেই এই বিদ্যার গোড়ার কথাগুলি সহজেই ধরিতে পারা যায়। বিলাতের লোকেরা এই বিদ্যায় এই জন্যই পারদর্শী, আমাদের পক্ষে পারদর্শী হওয়া তত সহজ নয়। বিলাতী লোকেরা কি সহজেই আমাদের জাতিভেদ, বিবাহতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম, রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ ইত্যাদি বুঝিতে পারে? এগুলি তাহাদের অভিজ্ঞ-

তার বহির্ভূত, কাজেই ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে তাহারা এখনও পারদর্শী হইতে পারে নাই। আমরাও এজন্য বিলাতী ধন-বিজ্ঞান বুঝিয়া উঠিতে পারি না।.

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এখানকার করিতকর্ম্মা লোকেরা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থকারদিগকেও মানুষের মধ্যে গণ্য করেন না। তাঁহারা ইঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যার কোন মূল্যই দেন না। লৌহকারখানার সকল বিভাগ দুই ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলাম। পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, অধ্যাপকেরা ধনবিজ্ঞানের কি বুঝেন? মার্শাকেই বলুন আর নিকলসনই বলুন, আর আমাদের লীড্‌সের ছোকরা অধ্যাপক ম্যাক্‌গ্রেগরের ত কথাই নাই; ইঁহারা কখনও ব্যবসায় দেখিয়াছেন কি? কখনও ২০০০ লোকের সঙ্গে মিশিয়া কারবার করিয়াছেন কি? এই প্রকাণ্ড গৃহের মালমশলা, লোহা লক্কড়, লোক-জনের ভার লইয়া তাহার পরিচর্য্যা দ্বারা লাভ বাহির করিতে পারিয়াছেন কি? ইঁহারা যদি এইরূপ কার্য্যে সফল হইতে পারেন তবে বুঝিব ইঁহারা ধনবিজ্ঞান বুঝেন।" আমি বলিলাম, "মহাশয়, ইঁহাদের নিকট বিদ্যা শিখিয়াই ত আপনাদের যুবকসম্প্রদায় মানুষ হইতেছে। তাহারাই ত ভবিষ্যতে আপনাদের সকল বিভাগের কর্ত্তা হইবে।" ইনি বলিলেন, "না। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কাহাদিগের শিক্ষক জানেন? যাহারা কখনও শিল্পকর্ম্মে আসিবেনা অথবা ব্যবসায়ে লাগিবেনা ইঁহারা তাহাদের উপর পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ে লাগিয়া যাইবে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যার ধার ধারে না। কর্ম্মী লোকেরা, তাহার প্রথম হইতেই আমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। আমরাই সেই সকল করিতকর্ম্মা লোকের অধ্যাপক এবং এই কারখানাই তাহাদের বিজ্ঞানশালা বা ল্যাবরেটরী।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহাশয় আরও অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। ইনি এখানকার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের উপর মহা বিরক্ত। কেয়ার হার্ডি এবং র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের নাম করিয়া বলিলেন, "এই দুইটা কুলীর সর্দ্দার ইংরাজ জাতির পরমশত্রু—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। ইহারা ইংলণ্ডের মধ্যেই আজকাল আন্দোলন আবদ্ধ রাখে না। ভারতবর্ষকেও তাহাদের দলাদলির পাকের ভিতর টানিয়া আনিয়াছে। স্বদেশে কুলীদিগকে ক্ষেপাইতেছে, বাহিরে ভারতবাসিদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষে এবং বিলাতের মধ্যেই বিরোধ সৃষ্টি করা কোন স্বদেশ সেবকের কার্য্য কি? কিন্তু এই দুইটা কুলীর সর্দ্দার উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দ্বারা ভারতবর্ষের লোকজনকে ব্রিটিস রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে।"

সান্ধ্য ভ্রমণ

কাল সন্ধ্যাকালে লীড্‌সনগরের বহির্ভাগে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর গত হইল এখানে একটা পাথরের খাদ কাটা হইতেছিল। খানিকটা কাটা হইবার পর ভিতর হইতে জল উঠিতে থাকে। সেই জলে একটা হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-প্রাচীর। দৃশ্য অনেকটা হিমালয়ের "ভীমতাল" হ্রদের কথা মনে করাইয়া দেয়। হ্রদের উপর রাজহাঁস খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাপৃষ্ঠে স্ত্রীপুরুষগণ বিহার করিতেছে। হ্রদের নিকটে দুই তিনটা হোটেল। এদেশে সংসারের কোন বস্তুই ভোগের বহির্ভূত নয়।

আজ বিকালে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট মঠ দেখিতে গেলাম। প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম-সংস্কারের যুগে এই মঠ ধ্বংস করা হয়। এরূপে বহু মঠ নষ্ট করা হইয়াছিল। স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট য়্যাণ্ড্রুজ গির্জ্জারও এই দশা ঘটিয়াছে।

লীড্‌সের এই মঠের নাম কার্কষ্টল য়্যাবি। ভগ্নদশায়ও ইহার গাম্ভীর্য্য চিত্তহারী। মধ্যযুগে খৃষ্টানেরা ধর্ম্মের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিতেন তাহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই অট্টালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকালয়ের অন্তরালে জনসমাজ হইতে বহুদূরে ধর্ম্মমন্দির মঠাদি নির্ম্মিত হইত। এই য়্যাবিও তখনকার জনপদ হইতে দূরেই অবস্থিত ছিল।

য়্যাবি হইতে হোটেলে ফিরিবার পথে একটি ঘটনা দেখিলাম। রাস্তার ধারে একটা পোড়ো জমির উপর কয়েকজন লোকের ভিড় দেখা গেল। কাছে আসিয়া বুঝিলাম একটা কাঠের মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া একজন

বক্তৃতা করিতেছেন, এবং নিকটে কতকগুলি বালকবালিকা হৈ চৈ করিতেছে, আর কিছু দূরে কতিপয় শ্রমজীবী দাঁড়াইয়া বা মাটিতে বসিয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তৃতার বিষয় ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি। বক্তা বুঝাইতেছেন, "বিগত ৮ বৎসরের ভিতর শ্রমজীবী ও দরিদ্র সমাজের জন্য বিলাতে কতকগুলি ভাল আইন জারি করা হইয়াছে। ইংরাজের জাতীয় ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইহার কারণ, বর্ত্তমান রাষ্ট্রমণ্ডলে দরিদ্র-সেবক নেতৃগণের প্রাধান্য। য়্যাস্‌কুইথ স্বয়ং দরিদ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। লয়েড জর্জ্জও সেইরূপ। ইহাঁরা বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কর্ণধার। এই জন্যই দরিদ্রের অনুকূল আইন জারি হইতেছে। সুতরাং এই রাষ্ট্রীয় দল যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনের সময়ে স্থায়ী হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

বিলাতের তাঁতী ও দর্জী

আজ দুইটা ফ্যাক্টরি দেখা গেল। একটা বয়ন-কারখানা, অপরটি দর্জী কার্য্যালয়। সেদিনকার লৌহ কারখানায় যে দৃশ্য দেখিয়াছি আজও তাহাই দেখিলাম। তবে যন্ত্র, হাতিয়ার এবং কলকব্জাগুলির আকার ও গঠন বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কলের আবশ্যক। তাহা ছাড়া মালমশলা এবং উপকরণ তিনকারখানায় তিনপ্রকার।

বয়ন কারখানায় প্রথমে নানাজাতীয় পশম দেখিলাম। কোনটার চর্ব্বি বেশী, কোনটার চর্ব্বি কম। কোনটার সূতা সূক্ষ্ম, কোনটার সূতা জড়ান ইত্যাদি। অষ্ট্রেলিয়ার পশমই শুনিলাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইয়র্কশিয়ারের পশমও মন্দ নয়।

কতকগুলি কলের সাহায্যে পশম পরিষ্কার করা হইতেছে। পরিষ্কার করিবার সময়ে চর্ব্বি বাহির হয়। নর্দ্দমার ভিতর দিয়া জলের সঙ্গে চর্ব্বি একস্থানে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এইগুলি ক্রয় করিয়া সাবানের ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে। এদেশে বাজে-মাল (waste-product) নষ্ট হইতে পারে না। কতকগুলি কলে পশম রং করা হইতেছে। রঞ্জিত হইবার পর পশম হইতে সূতা প্রস্তুত করা হয়। তাহার জন্য স্বতন্ত্র কল আছে। এই অবস্থায় অপরিষ্কার এবং নিকৃষ্ট জাতীয় পশম সহজেই আল্‌গা হইয়া যায়। এইগুলি স্বতন্ত্রভাবে কৃষকগণের নিকট বিক্রয় করা হয়। ইহার দ্বারা জমিতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা নিকৃষ্ট পশম তৈয়ারী করিবার জন্য এইগুলি কারখানাতেই রাখা হয়।

সূতা প্রস্তুত হইবার পর বয়নকার্য্য। এতক্ষণ যে সকল ঘর দেখিলাম

তাহাতে শ্রমজীবীরা সকলেই পুরুষ। কিন্তু বয়নগৃহে একজনও পুরুষ নাই সকলেই রমণী। ইহারা প্রত্যেকে এক একটা কলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে চোক মুখ বসিয়া গিয়াছে। কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা কাঁটা বা হ্যাণ্ডেল নাড়িয়া দিতে হয়। ইহারা নিৰ্জ্জীব যন্ত্রগুলির সজীব দাসীর কার্য্য করিতেছে। ইহাদের সজীবতা রক্ষা হইতেছে কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করিয়া এইরূপ কাজ করার নিয়ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁতের বিভাগে যে সকল যন্ত্র ও কার্য্য-প্রণালী দেখিয়াছিলাম এই কারখানায় ঠিক সে সমুদায় দেখিলাম। তবে ল্যাবরেটরীতে যেগুলিই ক্ষুদ্রভাবে করা হয়, এখানে সেগুলি বৃহৎ আকারে এবং বহু পরিমাণে করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এখানে কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত।

লৌহ কারখানা দেখিয়া যতটা বিস্মিত হইয়াছিলাম এই কারখানায় ততদূর হইলাম না। কারণ পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে ইহার নমুনা বেশ বিস্তৃতভাবেই দেখিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া ফ্যাক্টরী হিসাবে এটা নিতান্ত বৃহৎ নয়। মাত্র ১২০ জন লোক এখানে কর্ম্ম করে। কাজেই ফ্যাক্টরী-জীবনের দৃশ্য স্পষ্টভাবে এখানে বুঝা যায় না।

কিন্তু পরে দরজী-কারখানায় যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিব না। কারখানার অন্যতম মালিক সকল বিভাগে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এক বিভাগে দেখিলাম নানাপ্রকার পশমী কাপড়ের বাছাই ও দর দস্তুর করা হইতেছে। কোন বিভাগে দেখিলাম হাজার বস্তা পশমী কাপড় কিনিয়া মজুত করা হইয়াছে। এক জায়গায় আসিয়া মালিক বলিলেন, "এখানে আমাদের লোকেরা কোট, প্যাণ্ট, ওয়েষ্টকোট ইত্যাদির অর্ডার গ্রহণ করে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অর্ডারগুলি পাঠাইয়া দেয়।

সেখানকার লোকেরা যথা পরিমাণ কাপড়ের সঙ্গে প্যাণ্ট বা কোটের মাপ কাপড়কাটা বিভাগে পাঠাইয়া দেয়। এই বিভাগে নানাপ্রকার কাটা হইয়া থাকে।

কাপড় কাটা বিভাগে দেখিলাম ২০০ লোক নিযুক্ত। নানা ছাঁচের কাটা হইতেছে। সকল কার্য্য কলে চলিতেছে। এক সঙ্গে ৫০ খানা কোট বা প্যাণ্টের কোন কোন অংশ কাটা হইয়া যাইতেছে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ পোষাকের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত হইতেছে।

তারপর শেলাই বিভাগ। এখানে ১৪০০ স্ত্রীলোক কার্য্যে নিযুক্ত। সকলেই কলে শেলাই করিতেছে।

কারখানার মালিক তাহার পর শ্রমজীবীদিগের খানাগৃহ ইত্যাদি দেখাইলেন। ইনি ইহাদিগকে যথাসম্ভব সুখে রাখিবার জন্য চেষ্টিত —এইরূপ বলিলেন।

তিনটা কারখানায়ই দেখিলাম স্বত্বাধিকারী মহাজনেরা নিজেই কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কার্য্যাধ্যক্ষ। নিজেরা কারবার চালাইবার জন্য ইহাঁরা চেষ্টা করেন। বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ব্যবসায়ের সকল কথা বুঝিবার জন্য ইহাঁদের যত্ন আছে। অন্যান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও কুলী মজুরদের ন্যায় ইহাঁরাও দিনে আফিসে বসিয়া পুরা সময় খাটিয়া থাকেন। ইহাঁদের ছেলেরা উপযুক্ত হইলে কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন বটে কিন্তু মাহিনা প্রাপ্ত সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় ইহাঁদের থাকিতে হয়। স্বত্বাধিকারীদিগের বংশধর হিসাবে ইহাঁদের কোন অধিকার থাকে না।

নবম অধ্যায়

নব্য বিলাতের জন্মদাতা

গ্রামার-স্কুলের আবহাওয়া

কাল লীড্‌স্‌ হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়াছি। দেড় ঘণ্টার পথ মাত্র। কয়েকটা পাহাড়ের নীচে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত।

লিড্‌স্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া মনে হইল ভারতবর্ষের হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন জনসাধরণ-প্রবর্ত্তিত বিশ্ববিদ্যালয় ইহার আদর্শে স্থাপিত হইতে পারে। ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়—অতি বিশালও নয়। অল্প বিস্তৃত ভূভাগের উপর অবস্থিত। সামান্য স্থানের ভিতর অনেকগুলি বিভাগের কারখানা ও ল্যাবরেটরী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১০০০ ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা আছে। খরচ বৎসর ১০ লক্ষ টাকা মাত্র।

লীড্‌স্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা পয়সা জমিদারী বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব্বে ইহা একটা কলেজ মাত্র ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গতভাবে ইহা পরিগণিত হইত। ১৯০৬ সাল হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরের ভিতর আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হইতে পারে নাই। জনগণের চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক সাহায্যের

উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ডিউক অব ডিভন্‌শিয়রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশা আছে ডিউক্ তাঁহাদিগকে বেশ একটা মোটা দান দিবেন। কিন্তু ৮ বৎসরের ভিতর ডিউক একদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন নাই, এখানকার কোন কার্য্যেরই সংবাদও রাখেন না!

ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি সুবিধা এখানে দেখিলাম। অক্স্‌ফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে রেসিডেন্‌শ্যাল প্রথা অবলম্বিত। এখানে কিন্তু ছাত্র ও ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বাস করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে কাহাকেও থাকিতে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু অধ্যাপক ও ছাত্রীগণের ভিতর এখানে যতটা বাধ্যবাধকতা এবং ভাববিনিময় ও কর্ম্মের আদান প্রদান হয় আক্স্‌ফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে বোধকরি ততটা হয় না। ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আফিসী চাল বেশী—এখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ বেশী। অধ্যাপকেরা এবং এমন কি, ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্বয়ং প্রায় সকল ছাত্রকেই চিনেন। তাহাদের পিতামাতারাও অনেক সময়ে ইহাঁদের পরিচিত হইয়া পড়েন। সন্তানগণের ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের কথা তাঁহাদের অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ পান।

লীড্‌সের ভারতীয় ছাত্রেরা বেশ নাম করিয়াছে। ৩।৪ জন বড় বড় অধ্যাপক এবং ভাইস্‌চ্যান্সেলারও বলিলেন যে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা এখানে সকলেই কবিত্ব দেখাইয়াছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদিগের বিরুদ্ধে অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে অন্য ভাব দেখিলাম। এজন্য লীডস্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যল্প ভারতীয় ছাত্রই আসিয়াছে। সম্প্রতি ৮।১০ জন মাত্র আছে। বেশী আসিতে আরম্ভ করিলে খারাপ ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। তখন এখানকার মতও বদলাইবে সন্দেহ নাই।

ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়া মনে হইতেছে লণ্ডনেই পৌঁছিয়াছি। লণ্ডনের জনতা এবং কর্ম্মস্রোত এখানে বুঝিতে পারা যায়। লীড্‌স্ এই হিসাবে ম্যাঞ্চেষ্টার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কলিকাতার সঙ্গে ঢাকার যে অনুপাত লণ্ডনের সঙ্গে লীড্‌সের প্রায় সেই সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টার লণ্ডনেরই পরবর্ত্তী নগর।

এখানকার "গ্রামার-স্কুল" ৪০০ বৎসরের পুরাতন বিদ্যালয়। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব্বে ভাষা, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি শিখান হইত। কিছুকাল হইল বিজ্ঞান এবং শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অবশ্য এডিনবারার জর্জ্জহেরিয়ট বিদ্যালয়ে এই সকল নব্য বিদ্যার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর।

বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। এখানকার হেড্‌মাষ্টার পেটন অতি নামজাদা লোক। প্রার্থনাগৃহে ধর্ম্মসঙ্গীত এবং উপাসনা হইল। ছাত্র এবং শিক্ষকগণকে এক সঙ্গে ইহাতে যোগদান করিতে হয়।

ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার অনুরূপ। ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্নমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আজ ছাত্রদিগের পরীক্ষার দিন ছিল।

Oxford and Cambridge Schools Examination Board.

Manchester Grammar School, 1914.

THE ACTS OF THE APOSTLES. Chapter IX-end.

Sc. 5, 5 b, R *a*, *β*. 5 a.

[*Time allowed*—1 *hour.*]

1. Describe the work of St. Peter outside Jerusalem as recorded in these chapters.

2. Under what circumstances was Christianity first preached (*a*) at Athens, and (*b*) at Corinth ?

3. What places were visited during St. Paul's Third Missionary Journey ? Mention any striking incidents.

4. Narrate the events leading to St. Paul's imprisonment at Caesarea.

5. What do you learn from the Acts of Barnabas, Apollos, Timothy, Felix ?

6. Explain, with reference to the context :—

(*a*) Thou shalt be blind, not seeing the sun for a season.

(*b*) For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things.

(*c*) And when they had taken security from Jason and the rest, they let them go.

(*d*) For, as concerning this sect, it is known to us that everywhere it is spoken against.

বাইবেল বর্ণিত বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রদান করা ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা গেল। কোন একখানা সাহিত্যগ্রন্থ বা ইতিহাসপুস্তক পাঠ করিবার যে রীতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেরও সেই রীতি। এই প্রণালীতে নিজের ধর্ম্মবিষয়ক সকল তথ্য ও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় সত্য—কিন্তু ধর্ম্মের আদর্শে চরিত্র গঠিত হয় না, ধর্ম্মজীবনও বিকশিত হয় না।

হেডমাষ্টার বলিলেন, "ছাত্রদিগকে স্বদেশ-সেবার নানা কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। সহর হইতে নানা পল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে জনগণের সঙ্গে ইহারা মিশিবার সুযোগ পায়। Boy Scout আন্দোলনে যোগদান করিয়া প্রথম হইতেই ইহাদের সেবা প্রবৃত্তিগুলি জাগাইয়া তোলা হয়। ফলতঃ ছাত্রজীবনেই ইহারা প্রবীন বয়সের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে পারে। এই আদর্শে সকল ইংরাজ ছাত্রের চরিত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য আমি সম্প্রতি Political Quarterly Review পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি।"

এখানকার কারখানায় দেখিলাম ছাত্রেরা ১১।১২।১৩ বৎসর বয়সেই সুন্দর সুন্দর কার্য্য করিতে শিখিয়াছে। রেলওয়ে, জাহাজ, ব্যবসায় এবং যত প্রকার শিল্পের সম্পর্কে যে সকল যন্ত্র, আস্‌বাব, উপকরণ, কল-কব্জা আবশ্যক হয় সেই সমুদয়ের সরল ও সহজসাধ্য বস্তুগুলি ইহারা স্বহস্তে তৈয়ারী করিয়াছে। রেলওয়ে সেতু, সিগ্‌ন্যাল পোষ্ট, ষ্টেসনঘর, নৌকা, জাহাজ, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি নানা পদার্থ সংগ্রহালয়ে মজুত দেখিলাম। এই সমুদয়ের চিত্রাঙ্কনও ছাত্রেরা নিজেই করিতে পারে। অল্পবয়সেই এই সকল বিদ্যা শিখিয়া ভবিষ্যতে ইহারা পাকা এঞ্জিনীয়ার হয় তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি?

প্রাচ্য সমাজ ও ভারতীয় জাতিবিভাগ

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্মদাতা। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়ার আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন ইহার অধীনে বার্ম্মিংহাম, লীড্‌স্ এবং শেফিল্ডের তিনটি কলেজ পরিচালিত হইত। বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর এই তিনটি কলেজ তিন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পূর্ব্বে সমগ্র উত্তর-ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পরে এলাহা-বাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ইহা হইতে বাহির হইয়াগিয়াছে। সম্প্রতি ঢাকা এবং বাঁকিপুরেও দুইটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক জর্জ্জ আন্‌উইনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হইল। ইনি বিলাতের আর্থিক অবস্থাবিষয়ক ইতি-বৃত্ত সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ঐতিহাসিক আলোচনাই ইহাঁর বিশেষ কার্য্য। ইহাঁর দুই খানা গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ— The Gilds and Crafts of London এবং Industrial Organisa-tion in the 16th and 17th Centuries. সম্প্রতি জগতের ব্যবসায়বিষয়ক ইতিহাসের রচনায় নিযুক্ত আছেন। ইনি বলিলেন, "প্রাচ্য জগৎ ইউরোপকে নানা বিষয়ে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সাহিত্য, দর্শনের ত কথাই নাই। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে শিল্প ও ব্যবসায়

সম্বন্ধে এশিয়াই অগ্রণী ছিল। অবশ্য তথ্যের অভাবে আমি প্রমাণ সহকারে সকল কথা বলিতে অপারগ। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদ ও কাইরো নগরের শিল্প ও বাণিজ্য ইউরোপের শিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিত। এই সময়ে মুসলমানজগতের উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল। হারুণ-আল্‌রশিদের আমলে হিন্দু পণ্ডিতেরা বাগ্‌দাদে আনীত হইতেন। "হিতোপদেশ" গ্রন্থ এই উপায়েই আমাদের "ইসপ্‌-কাহিনীতে" রূপান্তরিত হইয়াছে। এমন কি, আমার বিশ্বাস, মধ্যযুগে জার্ম্মাণির উত্তরপ্রান্তে এবং হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে যে সকল ব্যবসায়-কেন্দ্র-স্বরূপ নগর স্থাপিত হইত তাহাদের আদর্শ বাগ্‌দাদ ছিল। বাগ্‌দাদের নগরনির্ম্মাণ-প্রণালী এই সকল স্থানে অবলম্বিত হইত। আমার নূতন গ্রন্থে এই সকল কথা প্রচার করিতেছি।"

আন্‌উইন দরিদ্রের সন্তান ছিলেন—শ্রমজীবীদিগের সমাজেই ইঁহার জন্ম। এজন্য বিলাতের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বহু তথ্য বিষয়ে ইঁহার কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা আছে। এই জন্যই ইনি শ্রমজীবীদিগের জীবনবিষয়ক ইতিহাস রচনায় উৎসাহী হইয়াছেন।

তিনি ৮।৯ বৎসরকাল লণ্ডনে লর্ড কেটিনের সহকারী ছিলেন। সেই সময়ে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণীতে যাইবার সুযোগও ইঁহার ঘটিয়াছিল। পরে এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অবস্থার ইতিহাস শিক্ষা দিতেছেন। সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা করিয়া ছাত্র পড়াইতে হয়। এজন্য পুস্তক লিখিবার সময় খুব অল্প।

ইঁহার মতে, "ইউরোপের আজকাল শোচনীয় অবস্থা চলিতেছে। প্রথমতঃ সমাজে আভ্যন্তরীণ অশান্তি। বড় বড় কারখানা ও কয়েকজন ধনী মহাজনের আধিপত্য, অথচ অসংখ্য দরিদ্র কুলী মজুরের অস্বাস্থ্য

এবং অকাল মৃত্যু। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের জাতিসমূহ পরস্পর সংগ্রামে আবদ্ধ। কে কাহাকে কখন আক্রমণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই। সকলেই সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ইউরোপকে রক্ষা করিবার উপায় ইউরোপে নাই। এশিয়ার জাতি-গুলি স্বাধীনভাবে শক্ত সবল হইলেই ইউরোপ বাঁচিয়া যাইবে। তাহা হইলে ইহারা এশিয়ার শিল্প ও ব্যবসায় দখল করিবার জন্য উদ্গ্রীব থাকিতে পারিবে না। তাহাতে একদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমিয়া আসিবে এবং লড়াইয়ের প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। অপরদিকে প্রত্যেক জাতির ভিতরেও অশান্তি কমিতে থাকিবে। কারণ বড় বড় ফ্যাক্টরী স্থাপন এবং শ্রমজীবী দলনের সুযোগ আর থাকিবে না। এক্ষণে এশিয়ার বাজারগুলি ইউরোপের হস্তগত। এই জন্যই ইউরোপের মহাজনেরা বিরাট কারখানা তৈয়ারী করিতে পারিতেছে। কিন্তু এশিয়া সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইলে ইউরোপের মাল সেখানে বেশী প্রবেশ পাইবে না। তখন ইউরোপীয়েরা স্বদেশের বাজারের জন্যই মাল জোগাইতে বাধ্য হইবে। কার্য্যতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার এখানে দেখা দিবে। তখন শ্রমজীবীদিগের দুর্দ্দশা কমিবে এবং সমাজের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং নীতিরও উন্নতি সাধিত হইবে।

এশিয়া যতদিন ব্যবসায়ে, শিল্প এবং রাষ্ট্রে পরাধীন থাকিবার যোগ্য ততদিন ইউরোপীয়দিগের প্রলোভনের এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এই ক্ষেত্র যত সঙ্কীর্ণ হইবে ততই ইউরোপের বাঁচিবার পথ প্রস্তুত হইবে। তাহা না হইলে মধ্যযুগের ইতালীয় নগরপুঞ্জের ন্যায় ইউরোপের ব্যবসায়ী জাতিগুলি মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

আনুউইন হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি-

লেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ব্যবসায়-সমিতি বা শিল্প-গিল্ড ইত্যাদি হইতে জাতিপ্রথা কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বতন্ত্র এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই ইঁহার উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যেরা মনে করেন, ভারতবর্ষের জাতিগুলি স্ব স্ব প্রধান সমাজবিশেষ। এই সমুদয়ের বিভিন্নতা ও অনৈক্যই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অন্তরায়। তাহা ছাড়া সমগ্র হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অংশে এক আদর্শ ও এক চিন্তা প্রচারিত হইতে পারে না এইরূপই ইঁহাদের বিশ্বাস।

ধর্ম্ম, বিবাহ, সমাজ, শিল্প, ব্যবসায়, রাষ্ট্র ইত্যাদি জীবনের সকল বিভাগ হইতেই ভারতীয় জাতি-প্রথার আলোচনা করিলাম। উন-বিংশশতাব্দীতে জাতিভেদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার সেই আকার ছিল না। কাগজে কলমে বর্ণনা করিবার সময়ে প্রত্যেক জাতিকে একটা স্বাধীন সমাজরূপে বর্ণনা করা হয়। কার্য্যতঃ তত বাঁধাবাঁধি ছিল না। বিশেষতঃ স্বাধীনতার যুগে রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমার পরিবর্ত্তন প্রায়ই সাধিত হইত। তাহার ফলে নব নব আবেষ্টনে জাতি-সমূহের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা নব নব আকার ধারণ করিত। সুতরাং আজকালকার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নড়ন-চড়ন-হীন বিভাগের ন্যায় বিভাগ বেশীদিন থাকিতে পারিত না। নূতন নূতন শক্তির প্রভাবে জাতিগুলি সর্ব্বদা সজীবভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। ইংরাজ আমলে স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্মের অভাব অত্যন্ত বেশী। তাহা ছাড়া আইনের প্রভাবও অত্যধিক। এই জন্য প্রত্যেক জাতির ভিতর এক একটা জমাট-বদ্ধ দানা বাঁধিয়া গিয়াছে। স্বাধীন চিন্তার অভাবে ভিতর হইতে নূতন প্রাণবিকাশের সুবিধা নাই—অথচ বাহির হইতেও নবশক্তি সঞ্চারিত হইতেছে না, হইলেও তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কার্য্যতঃ জাতিগুলি অনেকটা গতিবিধিহীন সমাজপ্রকোষ্ঠে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রকোষ্ঠগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অল্পায়তন প্রকোষ্ঠের ভিতর চলাচল বেশী হয় না। তাহাতে বিবাহের নির্ব্বাচন, ভাববিনিময় এবং কর্ম্মবিনিময় শীঘ্রই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতীয় জাতিগুলির লোকসংখ্যা যথেষ্ট অধিক। তাহার ফলে প্রত্যেক জাতির ভিতর উঠানামা এবং আদানপ্রদান ভালরূপই হইতে পারে। এইরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্তই জাতিভেদে সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতে পারে নাই। যুগে যুগে নব নব আদর্শ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমাজের ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

উনবিংশশতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংঘর্ষ, পরাধীনতা, রেলগাড়ী এবং সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হিন্দু সমাজকে নূতন এক স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পূরাপুরি ফল এখনও আমরা পাই নাই—কিন্তু কোন্‌দিকে যাইতেছি তাহা বুঝা কঠিন নয়।

প্রথমতঃ, অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা থাকিবে না। বিংশশতাব্দীর পরে বোধ হয় কাহাকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিব না।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম, ইত্যাদি অন্নসংস্থানের কোন পথই জাতিগত হইয়া থাকিবে না। যে কোন জাতির যে কোন লোকই এই সকল কর্ম্মে যোগদান করিতে থাকিবে। উনবিংশশতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এই কার্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বাস্তবিক পক্ষে, জাতি হিসাবে কোন ব্যবসাই নাই। ইহার ফলে আমাদের বৈষয়িক জীবনে একটা স্বাধীনতা এবং গতিবিধিপ্রিয়তা আসিয়াছে। ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে আমরা সকলেই সকল কর্ম্ম করিতে অধিকারী হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোকমত এবং জাতীয় আদর্শও অনেকটা একপ্রকার হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে

ধর্ম্ম ও সমাজের শাসনে সমগ্র দেশের ভিতর একপ্রাণতা বর্ত্তমান ছিল। পাশ্চাত্য শাসনের আমলে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত শাসন দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে নব্য ব্যবসায় ও নব্য শিক্ষার প্রভাবে সেই একপ্রাণতা নূতনরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। যতগুলি লোক এক ভাষায় কথা বলে তাহাদের সকলেরই আদর্শ ও লক্ষ্য একরূপ একথা আমরা বর্ত্তমানে বলিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, বিবাহের নিয়ম শীঘ্র বিস্তৃতরূপে বদলাইবে না। জাতি নির্ব্বিশেষে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনই জাতিভেদের শেষ নিদর্শন এখনও বহু-কাল থাকিবে। বিশেষতঃ আজকাল পাশ্চাত্যদেশীয় বিবাহ-বন্ধন এবং সামাজিক জীবনের দৃষ্টান্তে ভারতবাসী বিশেষ উৎসাহিত নন। তাহার উপর, নব্য "ইউজেনিক্‌স্"-বিজ্ঞান বা বংশতত্ত্ব এবং য়্যান্থ্রপলজি বা জাতিতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয় বিবাহ প্রথাই বোধ হয় সুফলদায়ক প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে।

তবে এক্ষণে জাতিগুলি বহু খণ্ডে উপখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতগুলি বিভাগ থাকিবে না। কয়েকটা মোটা মোটা বিভাগের ভিতর সামাজিক লেনদেন প্রচলিত হইতে থাকিবে। ইহার ফলেও সমাজজীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বেশ সুবিস্তৃত হইয়া পড়িবে। যৌন সম্বন্ধে নির্ব্বাচনের সুযোগ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। আজকালই এই সকল সুফল দেখা যাইতেছে।

চতুর্থতঃ, ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শ কখনও সামাজিক জাতিপ্রথা অনুসারে খণ্ডশঃ বিভক্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই একরূপ চিন্তা করিত এবং এক আদর্শে জীবন গঠন করিত। ইহারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু বা বিরোধী কোন দিনই ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার, ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার, পুরোহিতদিগের সংশ্রব

এবং তীর্থ গমন, মেলা, উৎসব, শোভাযাত্রা ও লোকসাহিত্যের প্রভাব—এই সকলের দ্বারা দেশের ভিতর কালোপযোগী ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইত। ফলতঃ মধ্যযুগে ঐক্যবন্ধনের যেরূপ আদর্শ ছিল সেইরূপ সমন্বয় এবং একজাতীয়তা স্থাপিত হইত। বর্ত্তমানকালে একজাতীয়তাই কথঞ্চিৎ নূতন আকারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে প্রাদেশিক সাহিত্য ও মাতৃভাষার প্রভাবে ঐক্যের পথ বিস্তৃত হইতেছে। অধিকন্তু আর্থিক অবস্থার প্রভাবেও ঐক্যবিধান সাধিত হইতেছে। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই একপ্রকার বৈষয়িক কর্ম্মে যোগদান করিতে পারে। তাহার ফলে নব উপায়ে আমাদের সমাজে একজাতীয়তা বিকশিত হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, এই সকল কারণে জাতিভেদকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির বিঘ্ন বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। সময়োপযোগী সংস্কার হইয়া চলিয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের অভ্যুদয়-কাহিনী ও বর্ত্তমান সমস্যা

ম্যাঞ্চেষ্টারের নগর-শাসন-প্রণালী বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। লীড্‌সে মিউনিসিপ্যাল কর্পরেশনের কোন কোন কার্য্য দেখিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া নগরশাসনের কেন্দ্র টাউনহলে উপস্থিত হইলাম। একজন শাসনকর্ত্তার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে পত্র ব্যবহার চলিতেছিল।

ইনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সেনাবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধে ইনি লড়াই করিয়াছিলেন। তাহার কিছুকাল পর হইতে ইনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারনগরেই ইহাঁর জন্ম। সম্প্রতি ইনি এখানকার কর্পরেশনের একজন গণ্যমান্য মেম্বর।

ইনি সর্ব্বপ্রথমেই টাউনহলের কামরাগুলির ভিতর লইয়া গেলেন। লর্ড মেয়রের আফিস-গৃহ, কাউন্সিলারদিগের সভাগৃহ, সঙ্গীত-গৃহ, ভোজনগৃহ ইত্যাদি সবই দেখিলাম। সঙ্গীতালয়ের ছাদে পৃথিবীর বিখ্যাত নগরসমূহের 'কোট অব আর্মস্' অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাচীরে দেখিলাম নানা চিত্রের সাহায্যে ম্যাঞ্চেষ্টারনগরের ভিন্ন ভিন্ন যুগের দৃশ্য বুঝান হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের আধুনিক গৌরব নিতান্ত অল্পদিনের। ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে অতি সামান্য জনপদ মাত্র ছিল। এই টাউনহল ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতরেই নগর-শাসন-বিষয়ক সকল প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। স্থানাভাব বশতঃ নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে।

কাউন্সিলার মহাশয় আজ বড় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকগুলি সভার ইনি সভাপতি। সেই সকল কার্য্যে মনোযোগ দিতে হইল বলিয়া সংক্ষেপে নানা কথার আলোচনা করা গেল। পরে ইনি স্বাস্থ্যবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অতি প্রবীণ ব্যক্তি। ৬০ বৎসর ধরিয়া ইনি টাউন-হলের কার্য্য করিতেছেন। ইনি বলিলেন, "আমি ম্যাঞ্চেষ্টারের জন্ম, যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থা দেখিয়াছি বলিতে পারি। আমার চোখের সম্মুখেই এই নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমার বাল্যকালে এখানে কিছুই ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাব, শিল্প-কারখানার আধিক্য, প্রাসাদ তুল্য ভবন, চিমনীর ধূম, রাস্তা-ঘাট-সমস্যা, শ্রমজীবি-সমস্যা ইত্যাদি তখন দেখিতাম না। সবই অল্পকালের মধ্যে জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে নগর-শাসনকার্য্য এখনকার মত শক্ত ও দায়িত্বপূর্ণ ছিল না। শাসন-কর্ত্তারাও কাজে ঢিল দিতেন। এক্ষণে শাসনকার্য্য মহাব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কর্পরেশনের কার্য্যতালিকা প্রতিদিনই বাড়িতেছে। নানাবিধ নূতন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপও করিতে হইতেছে।

বস্তুতঃ সকল দিক্ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, আধুনিক ইংরাজজাতির সকল প্রকার গৌরব ও সম্পদ নিতান্তই নূতন। সমস্তই ১০০ বৎসরের ভিতর সাধিত হইয়াছে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খোলা হয়। তাহার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়া যাইতে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিত। তাহা ছাড়া ইংরাজজাতির ব্যবসায় সম্বন্ধীয় আইনও তখন ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কোন কোন কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার

প্রদান করা হইত। "তুরস্ক কোম্পানী" ব্যতীত আর কোন ব্যবসায়-মণ্ডলী তুরস্কে বাণিজ্য করিবার অধিকারী ছিল না। সেইরূপ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ব্যতীত আর কোন কোম্পানী চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। কাজেই ম্যাঞ্চেষ্টারের ধনী মহাজন সমিতিসমূহ সর্ব্বত্র ব্যবসায় বিস্তারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল একচেটীয়া অধিকার সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করা হয়। তাহার পর হইতেই ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী সমাজে স্বাধীনতা এবং কর্ম্ম প্রবণতার যুগ আরব্ধ হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়-শক্তিও তাহার পূর্ব্বে বিশেষ লক্ষিত হয় নাই।

আর একটা কথাও মনে রাখা আবশ্যক। ম্যাঞ্চেষ্টার নগর তুলার কারবার এবং কাপড়ের কারখানার জন্যই আজকাল জগতে প্রসিদ্ধ। এই কারখানাগুলিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োগেই শিল্পজগতে বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। এই যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার হইয়াছিল ১৭৬৯-৮৭ খৃষ্টাব্দের ভিতর। কিন্তু এগুলি শিল্প-কারখানায় সুচারুরূপে ব্যবহার করিয়া লাভবান্ হইবার সুযোগ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পরে উন্মুক্ত হইয়াছে। এই সময়ে "পেটেণ্টের" আইন সংস্কার করা হয়। তাহার ফলে শিল্প-কারখানার স্বত্বাধিকারী মাত্রেই নিজ নিজ কারবারে যন্ত্রসমূহ প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে; এবং ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে জগতের সর্ব্বত্র মাল পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খালের প্রভাবে বাণিজ্য পথ সুগম হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্প-সম্পদ এবং বাণিজ্যৈশ্বর্য্য নিতান্তই কালকার কথা।

আজ ম্যাঞ্চেষ্টার জগতে অদ্বিতীয় ব্যবসায়-কেন্দ্র। এই ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার জন্য এখানকার "রয়্যাল এক্সচেঞ্জ" নামক গৃহ দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহাকে ম্যাঞ্চেষ্টারের "কাপড়ের বাজার" বলা যাইতে পারে। এত বড় বাজার জগতে বোধ হয় আর কোথাও নাই। কোন গোলমাল হৈ চৈ ডাকহাঁক, মালপত্র দেখিতে পাইলাম না। প্রকাণ্ড বাড়ী তাহার ভিতরকার হলে হাজার হাজার লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যাহার সঙ্গে যাহার প্রয়োজন পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কথাবার্ত্তা আর কিছুই নয়—কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের দর দস্তুর মাত্র। একটা দেওয়ালের উপরে আজকার দিনে মিশরীয় ও আমেরিকার তূলার মূল্য লেখা রহিয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া, লিভারপুল এবং নিউইয়র্ক হইতে ৫।১০ মিনিটের ভিতর তার আসিতেছে। তূলার মূল্যের হার দেখিয়া কাপড়ের ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিজেদের দর কষাকষি করিয়া থাকেন। রয়্যাল এক্সচেঞ্জে বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ। ব্যবসায়ী ভিন্ন আর কোনও লোক ইহার মেম্বার হইতে পারেন না। এইরূপ মেম্বারের সংখ্যা ৬০০০। ইহাঁদের একজনের সঙ্গে আলাপ ছিল; তাঁহার বন্ধুভাবে এখানে আসিবার 'পাশ' পাইয়াছিলাম।

ব্যবসায়ী বন্ধু বলিলেন, "তূলার বাজার লিভারপুলে। কাপড়ের বাজার ম্যাঞ্চেষ্টারে। লিভারপুল হইতে মিনিটে মিনিটে তার আসিতেছে এবং টেলিফোনেও কথা চলিতেছে। আজ আমেরিকায় ও মিশরে তূলার যে দর তাহা লিভারপুলে স্থিরীকৃত হইয়া যাইতেছে। লিভারপুলের বাজারদরই এখানকার ব্যবসায়ীরা জগতের দর স্বরূপ গ্রহণ করেন। তূলার দর বুঝিয়া কাপড়ের দর স্থির করা হয়। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের বাজার বড় মন্দ চলিতেছে। আমরা যে কোন উপায়ে কাপড়গুলি ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচি। কারখানার কাজ

বন্ধ না হয় এ জন্যই কারবার চালাইতেছি। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এক্ষণে মহা ক্ষতির দিন যাইতেছে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই অসংখ্য লোকদিগের ভিতর ক্রেতাই বা কে? এবং বিক্রেতাই বা কে? বুঝিবার কোন উপায় আছে কি? কেনাবেচা কিছু হইতেছে কিনা তাহাই বা বুঝিব কি করিয়া? কোন লেখাপড়া কাগজ পত্র কিছুই দেখিতেছি না!” ইনি বলিলেন, “ব্যবসাদারেরা নিজেদের খরিদ্দার চিনিয়া ফেলিতে কষ্ট পায় না। ইহারা নানা লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সকল কথাই গোপনীয়। যাহার সঙ্গে দরে বনিবে তাহার নিকট মাল বিক্রী করা হইবে। কিন্তু এখানে মুখের কথাই সব। কোন লেখাপড়া এখানে হয় না—পরে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মাল ক্রয় করা হইল। চালান করা হইবে কবে?” ইনি বলিলেন, “মাল চালানের জন্য প্রস্তুত করিতে এখনও বহুকাল লাগিবে। কারণ একেবারে ব্যবহারোপযোগী কাপড় বিক্রয় হয় না। আজ বাজারে যে কাপড়ের দর হইতেছে তাহা ক্রয় করিয়া আবার অন্য কারখানায় পরিষ্কার করাইতে হইবে। পরিষ্কার হইয়া গেলে বস্তাবন্দী করিবার জন্য অন্য কারখানায় পাঠাইতে হইবে। সুতরাং এখনও অনেক কাজ বাকী।”

তূলা পরিষ্কার করা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়ের গাঁট বাঁধা পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কাজ কোন এক কারখানায় সম্পূর্ণ করা হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টারে শ্রমবিভাগ নীতির চূড়ান্ত দেখিতে পাইতেছি। কোন কোম্পানী হয়ত তূলা পরিষ্কার করে বা সূতা কাটে, কোন কোম্পানী কেবলমাত্র বয়ন করে, কোন কোম্পানী গাঁট বাঁধে ইত্যাদি। রয়্যাল এক্সচেঞ্জে গাঁটের ক্রয় বিক্রয় প্রায়ই হয় না।

ইংলণ্ডে ধনীসম্প্রদায়ের উপর উচ্চহারে খাজনা বসাইবার ঝোঁক

দেখা যাইতেছে। জাতীয় মহাসভার আইনে, কাউন্টিসভার আইনে নগর-শাসন-সমিতির আইনে সর্ব্বত্রই সেই লক্ষণ দেখিতেছি। দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষকগণের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে সুখময় ও স্বচ্ছল করিবার উদ্দেশ্যে সরকার হইতে নানাপ্রকার খরচ করা হয়। মহাজনগনকে বাধ্য করিয়া কুলী মজুরদের বেতন বাড়ান অবশ্য হয় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে এবং প্রত্যেক কাউন্টির বড় বড় নগরের মিউনিসিপালিটিতে দরিদ্র নরনারীগণের জন্য যথেষ্ট খরচ করা হয়। তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রমজীবীদিগের বেতন হারই বাড়িয়াছে। ইহাদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসগৃহ, স্নানাগার, উদ্যানভূমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবর্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেছেন। জীবনধারণের জন্য ইহাদের স্বকৃত ব্যয় কমিয়া যাইতেছে—ফলতঃ অল্প বেতন পাইয়াও সুখে জীবনযাপন করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইতেছে।

কর্পরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার একজন এঞ্জিনীয়ার কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আজ বিকালে ৩ ঘণ্টা কাটাইলাম। ম্যাঞ্চেষ্টারের কর্পরেশন জনগণের বসতিগৃহের সংস্কার এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছুকাল হইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলগুলি দেখাইবার জন্য এঞ্জিনীয়ার আমাকে লইয়া নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। কর্পরেশন হইতে মটর গাড়ীতে ভাড়া বহন করা হইয়া থাকে। কয়েকদিন হইল সুইডেনের এক চিকিৎসককেও এই সব দেখান হইয়াছিল।

কোন কোন অঞ্চলে অতি জঘন্য বাসগৃহ ছিল। তাহার ভিতর বাতাস ও আলো আসিতে পারিত না। অসংখ্য নরনারী তাহার ভিতর বাস করিত। নানা প্রকার ব্যায়রাম সহজেই সেই সকল স্থানে উৎপন্ন হইত। কিন্তু জমিদারেরা নিজে খরচ করিয়া এই সকল স্থানের সংস্কারসাধন

করিতেন না। কাজেই কর্পরেশন হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কতকগুলি গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। গৃহ ভাঙ্গিবার সময়ে জমিদার-গণকে প্রথম প্রথম মূল্য দেওয়া হইত। কিন্তু বিগত দুই বৎসর হইতে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে। বড়লোকদিগের উপর জুলুম চলিতেছে বলা যাইতে পারে। তাঁহারাও বেশী উচ্চবাচ্য করিতে-ছেন না। শ্রমজীবীদিগের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ধনীরা স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করিতে অগ্রসর না হইলে সমগ্র জাতি শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। এই আশঙ্কা চিন্তাশীল সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। ধনবানেরাও ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন।

কোন কোন মহল্লা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহার উপর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। যথাসম্ভব উন্মুক্ত বায়ুপথ এবং খোলা আকাশের প্রভাবে জনগণকে রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি হইতে সাবান ও গরম জল দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহারা যে হারে গৃহ ভাড়া করিত তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট সস্তায় মিউনিসিপ্যালিটি ইহাদিগকে ঘর ভাড়া দিতেছে। ঘরগুলি পূর্ব্বকার তুলনায় প্রাসাদস্বরূপ। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমরা ভারতবর্ষে এত ভাল ঘরে থাকি না! কিন্তু এঞ্জিনীয়ার বলিলেন, "এত সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিলে কি হইবে? ইহাদের স্বভাব উন্নত করা বড় কঠিন। জানালা খুলিলে যে উপকার হয় সে কথা এখনও ইহারা শিখে নাই। ইহাদের ঘরের ভিতরে যাইয়া আমাদের ইন্‌স্পেক্টরেরা জানালা খুলিবার উপকারিতা শিখাইয়া আসেন। ঘর পরিষ্কার রাখা ইহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। সস্তায় এত ভাল বাড়িতে থাকিতে পাইয়াও ইহারা পুরাতন কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই।"

মিউনিসিপ্যাল কর্পরেশন শ্রমজীবীদিগের জন্য এক এক পাড়ায়

স্বাস্থ্যের জন্য এক এক প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এঞ্জিনীয়ার সহরের ভিতরকার ৩।৪ স্থান দেখাইয়া বহুদূরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম নগর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছি। উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠে কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণের মাঠ দেখা যাইতেছে। এই অঞ্চলে প্রান্তরের উপর একটা আদর্শ পল্লী স্থাপিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মিত হইয়াছে। কুটিরগুলি পরস্পর-সম্বন্ধহীন—প্রত্যেকটির সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান সংলগ্ন। এই অঞ্চলে একটি ক্লাব বা সম্মিলন-গৃহও স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক সংবাদপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা দেখিলাম। জনগণ সামান্য চাঁদায় ইহার সভ্য হইতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্যহিসাবে চূড়ান্ত করা হইয়াছে বোধ হইল।

কেবল তাহাই নহে। পরে নগরের ভিতর ফিরিয়া আসিলাম। প্রদর্শক একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। সেটা শ্রমজীবী নারীদিগের জন্য হোটেল বা পান্থাবাস। সস্তায় ইহারা এখানে রাত্রি-যাপন করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ভাড়া দিয়া বসতিও করিতে পারে। পূর্ব্বে যে সকল স্থান দেখিয়া আসিয়াছি সেগুলিতে স্থায়ী লোকেরা বাস করে। এখানে অস্থায়ী লোকের সুবিধার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরূপ আর একটা হোটেল পুরুষদিগের জন্যও আছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার নগরই নব্য শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রথা আবিষ্কার করিয়াছে। ধনবিজ্ঞান এবং ফ্যাক্টরী-জীবনের জন্ম এই নগরেই হইয়াছে। তাহার সুফল কুফল, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য উভয়ই এখানে চরম আকারে দেখা দিয়াছে। একদিকে বিজ্ঞানাবলম্বিত শিল্প ও ব্যবসায় এবং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ—অপর দিকে স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, গৃহহীন, চরিত্রহীন কুলী-সমাজ। দেখিতেছি, এই নগরেই আবার কুলীসমাজের জন্য ধনীদিগের দয়াও মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে। মানুষ একহাতে নিজের ব্যাধি আহ্বান

করিয়া আনে—অপর হাতে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্"—এই নীতি কি মানবসংসারে প্রচলিত হইতে পারে না? মানবসভ্যতার এই বিচিত্র ধারা কি বিস্ময়-জনক! সহজ পথে সভ্যতার প্রবাহ অগ্রসর হইলে কত শক্তির অপব্যয় বাঁচিয়া যাইত!

গৃহ-সমস্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এক্ষণে শিশুরক্ষিণী সমিতির কথা কিছু বলিব। মিউনিসিপ্যালিটির খরচেই Infant Life Preservation Committee, Health Visitors' Society, Ladies' Health Society ইত্যাদি সেবকসমিতির কার্য্য পরিচালিত হয়। ১৯১২ সালের মিউনিসিপ্যাল কার্য্যবিবরণী হইতে নিম্নের তথ্য উদ্ধৃত হইতেছে।

"In 1909 a cleansing station was opened by the Sanitary Committee at the Corporation Depôt in Oldham Road for the cleansing of verminous children. School children found to be in a verminous condition are sent by the Education authorities to the cleansing station, and at the same time a notice to this effect is sent to the Medical Officer of Health, who refers the case to the Health Visitor for that district. It is her duty to visit and report to the Medical Officer for health upon the condition of the house, and especially of the bedrooms and bedding. She is required to inspect all the children in the house, whether of school age or under, and to instruct the mother, or person in charge

as to treatment, and also to continue to visit at regular intervals until she can report that the house has been cleansed, the bed clothes washed and the children kept clean. This work has to be specially arranged, as those children who attend school can only be seen during the dinner hour on Saturday, and frequently when the Heath Visitor call to inspect the house and children, she finds that the family has removed, and much time is spent in trying to trace them. If, after making full inquiries, the family cannot be found, a letter is sent to the school Medical Officer asking him to obtain the correct address.

Those cases which come outside the area worked by a Health visitor are undertaken by a Nurse specially appointed to deal with them, or by the District Sanitary Inspector. Then again it has been found advisable to pay monthly visits to delicate children threatened with Phthisis or children of consumptive parents. The object of these visits is to see that the children get medical advice and treatment in time and that they are sufficiently clothed and fed. In order to ensure the latter, it is sometimes necessary to send warning letters to the parent, or in cases where poverty is causing suffering, efforts are made to procure assis-

tance either from the Board of Guardians, District Provident Society or other agency.

কালিদাস আদর্শ হিন্দু নরপতির বর্ণনা করিয়াছেন,—

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

ম্যাঞ্চেষ্টার মিউনিসিপ্যালিটি সেই আদর্শ-রাষ্ট্রের কর্ম্মই করিতেছেন দেখিতেছি। যে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হইলে সমগ্র রাষ্ট্র প্রতাপশালী হইবে বিবেচনা করা যায় একমাত্র সেই দেশেই এইরূপ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড বুঝিয়াছেন জনগণকে হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল না করিতে পারিলে তাঁহারা জগতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। এই জন্যই তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সমগ্র রাষ্ট্রই এদেশে সমাজসেবক ও স্বদেশসেবক। এজন্য জনসাধারণ প্রবর্ত্তিত সেবাসমিতি, রামকৃষ্ণমিশন, Social Service League ইত্যাদি বেশী আবশ্যক হয় না।

কাউন্সিলার ফক্‌স্‌ ও বিলাতী স্বদেশসেবা

কাউন্সিলার ফক্‌সের গৃহে আজ সকালে অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। কোঅপারেটিভ আন্দোলনের বর্ত্তমান আকার, সোশ্যালিষ্ট দলেব চরম আদর্শ ও কার্য্যতালিকা, এবং শ্রমজীবি-সমস্যা সম্বন্ধে নানা কথা জানা গেল।

আজকাল ইংলণ্ডে শিল্প ও ব্যবসায়গুলি লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বা সমিতির হাত হইতে মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আনিবার প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। এতদিন ইংরাজ লেখক ও বক্তারা বলিতেন, "এই সকল কার্য্যে সরকারের হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। ষ্টেটের পরিচালনায় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" কিন্তু বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর এই মত ধীরে ধীরে বদলাইতেছে। নূতন লোকমত গঠনে সোশ্যালিষ্টদিগেরই কৃতিত্ব। এখন মত দাঁড়াইতেছে যে, গবর্মেণ্ট স্বত্বাধিকারী হইলে শিল্প ও ব্যবসায় সুচারুরূপে সম্পন্ন ত হয়ই। তাহার উপর সস্তায় জনগণকে বেশী সুখ দেওয়া যায়। অধিকন্তু, গবর্মেণ্টের লাভও থাকে। এই লাভ বশতঃ খাজনা কম তুলিলেই চলে। তাহাতেও দরিদ্রদিগের যথেষ্ট অব্যাহতি হয়।

ফক্‌স্‌ বলিলেন, "এই মত এক্ষণে ন্যূনাধিক পরিমাণে ইংরাজ-সমাজের সকল বিভাগেই দেখিতে পাইবেন। আমাদের সাহিত্য, চিত্র, নাট্য, বক্তৃতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই কথা প্রচারিত হইতেছে।"

এই মত ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। লণ্ডন বাস্তবিক পক্ষে ইংলণ্ডের কোন জিনিষেরই জন্মদাতা নয়। ম্যাঞ্চেষ্টার পূর্ব্বযুগের ধন-বিজ্ঞান, ফ্যাক্টরীবিজ্ঞান, স্বার্থবিজ্ঞান ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারই আবার নব্য নীতি, নব্য সমাজশাসন রীতি, নব্য ধনবিজ্ঞান ইত্যাদির জন্ম দিয়াছে। কেবল চিন্তায় নয়, কর্ম্মেও ম্যাঞ্চেষ্টার ইংলণ্ডকে নূতন পথে লইয়া যাইতেছে।

লণ্ডনের জল সরবরাহ করিবার জন্য লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী সমাজ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের জল জোগায় মিউনিসিপ্যালিটি। তাহা ছাড়া গ্যাস, ইলেক্ট্রিসিটি ইত্যাদিও মিউনিসিপ্যাল ব্যবসায়ের অন্তর্গত। ফক্স্ বলিলেন, "আমরা নিজেই ট্রামও চালাইয়া থাকি। পূর্ব্বে ট্রামারোহীদিগের যত সময় ও যত খরচ হইত তাহার অর্দ্ধেক সময়ে ও অর্দ্ধেক খরচে আমরা জনগণকে সেই পরিমাণ সুবিধা দিতে সমর্থ হইয়াছি। অধিকন্তু আমাদের তহবিলে লাভও অনেক জমিতে পারিয়াছে। সোশ্যালিষ্ট নীতির শাসনপ্রণালী কিরূপ ইহা হইতেই বিশদরূপে বুঝা যাইবে।"

সকল স্বাধীন দেশে গবর্মেণ্ট স্বয়ং স্বদেশসেবক। নিম্নশ্রেণীর উত্তোলন, দরিদ্রের উপকার, অশিক্ষিতের দুঃখ নিবারণ ইত্যাদি কার্য্য রাষ্ট্র হইতেই করা হয়। কিন্তু সাধারণ জনগণ, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং ধনী মহাজনেরা উদাসীনভাবে গবর্মেণ্টের কার্য্য দেখিয়া ক্ষান্ত হন না। তাঁহারাও যথাসম্ভব সমাজহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, ব্যক্তি-গত ভাবে স্বদেশ সেবকেরা নানা কার্য্যে ব্রতী হন বলিয়াই সরকার ক্রমশঃ সেই সমুদয় অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা বুঝিতে আরম্ভ করেন।

রাষ্ট্রের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া বহু সেবাকার্য্য এক্ষণে ইংলণ্ডে চলিতেছে। তাহার মধ্যে "বয়-স্কাউট" আন্দোলন অন্যতম। বিদ্যালয়ের

ছাত্রদিগকে আত্মরক্ষা, লোকরক্ষা, দেশরক্ষা, পরোপকার, লোকহিত ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নানা কার্য্য শিখান হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সামরিক বিভাগের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে ছাত্র ও ছাত্রীরা যথার্থ সামরিক জীবনের জন্যও প্রস্তুত হইতে পারে। দেশের নানাস্থানে ইহাদিগের জন্য মানবসেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। অর্দ্ধোদয় যোগ, দামোদর বন্যা, অথবা গুজরাতের দুর্ভিক্ষ, এবং কুম্ভমেলার জন্য ইহাদের বসিয়া থাকিতে হয় না। প্রতিদিনই ইহারা ছোট হউক, বড হউক, কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ ও ক্ষতিস্বীকারের কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়।

"বয়স্কাউট" আন্দোলন আজ বিলাতে যেরূপ প্রসিদ্ধ, সেইরূপ "নির্ম্মল বায়ু সেবন" আন্দোলনও এখানকার স্বদেশসেবকগণের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। বিলাতের প্রত্যেক অঞ্চলেই দরিদ্র নরনারী ও বালক-বালিকাগণকে নির্ম্মল বায়ু সেবনের সুযোগ তৈয়ারী করিয়া দিবার প্রয়াস চলিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটি পুরাতন বাডী ভাঙ্গিতেছে, স্বাস্থ্যকর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, ভাল বাড়ী সস্তায় ভাড়া দিতেছে, নগরের নানাস্থানে বড় বড় উদ্যান রচনা করিতেছে, শিশুদিগকে পরিষ্কার করিতেছে, ছাত্রদিগকে জামাজুতা দিতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারেও এই সব যথেষ্ট হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ দরিদ্রদিগকে সমুদ্রের কূলে লইয়া যাওয়া, জাহাজে নৌকায় ট্রামে খোলা আকাশের নীচে মুক্ত বায়ুর আবেষ্টনে বেড়াইবার এবং ভোজন করাইবার ব্যবস্থাও করিতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য না লইয়া দরিদ্র-বন্ধু ধনী ব্যক্তিরাও এই সমুদয় সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

আজ ম্যাঞ্চেষ্টারে জনসাধারণের প্রবর্ত্তিত "নির্ম্মল বায়ু সেবন-" সমিতির এক বিরাট অনুষ্ঠান দেখিলাম। শ্রীযুক্ত পীয়ার্সন নামক লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বৎসর বৎসর এজন্য ধন দান করিয়া থাকেন।

তাহার দ্বারা ম্যাঞ্চেষ্টারের সকল দরিদ্র ছাত্র ও ছাত্রীকে শনিবার বিকালে ময়দানে লইয়া আসা হয়। সেখানে সকলকে চা-বিস্কুট খাওয়ান হয়। তাহা ছাড়া নাচগান আমোদ প্রমোদের আয়োজন থাকে।

চারিটার সময়ে মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অসংখ্য বালকবালিকা এবং স্ত্রীপুরুষ নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও ব্যাণ্ড বাজিতেছে, কোথাও খেলা হইতেছে। কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ নাচিয়া, কেহ গাহিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছে। কাউন্সিলার ফক্‌স্ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে কার্য্য পবিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার নিমন্ত্রণেই এখানে দেখিতে আসিয়াছি। ইনি মটরকারে করিয়া ময়দানের নানাস্থানে দেখাইতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, প্রায় ২০,০০০ বালক বালিকা উপস্থিত। এতদ্ব্যতীত দর্শকমণ্ডলী ত আছেই। নানা বিদ্যালয় হইতে স্বেচ্ছাসেবকের দলও আসিয়াছে। বয়স্কাউট দলের ছাত্রেরাও এই বালকবালিকাগণের সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়াছে। বিশহাজার দরিদ্র ছাত্র ও ছাত্রীকে নগরের নানা অঞ্চল হইতে আনা হইয়াছে। এজন্য ৯০ খানা ট্রামগাড়ী বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ট্রামগাড়ী মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি, বাগানও মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি। মিউনিসিপ্যালিটি বিনামূল্যে পীয়ারসনের সমিতিকে এইগুলির ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

ফক্‌স বলিলেন, "গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে এই কার্য্য হয় না। তখন ভয়ানক শীত। খোলা মাঠে অধিকক্ষণ থাকা অসম্ভব। কিন্তু গ্রীষ্মকালের প্রায় প্রতিসপ্তাহেই এই আন্দোলনের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বৎসরে একলক্ষের অধিক বালক ও বালিকা পীয়ারসনের সদ্ব্যয়ে সুখভোগ করে। প্রত্যেক দলে ১৫।২০ হাজারের বেশী আসে না। মোটের উপর বৎসরে পাঁচ ছয়বার করিয়া প্রত্যেকের পালা পড়ে।"

পীয়ারসন আজকার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া লণ্ডন হইতে তারে দুঃখজ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকেও পাঠাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নগরের মেয়র, মেয়রপত্নী, এবং কর্পরেশনের কতিপয় সভ্য ও সভ্যপত্নী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ৫ টার সময়ে কর্ম্মকর্ত্তারা বাগানের সরকারী গৃহে চা-পান করিতে আসিলেন। ফক্‌সের বন্ধুভাবে চা-পানে যোগ দিতে হইল। চা-পানের পর যথারীতি বক্তৃতা।

এই অনুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে ৪।৫ জন বক্তৃতা করিলেন। কেহ বলিলেন সহরময় আন্দোলন পৌঁছাইয়াছে। কেহ বলিলেন, ট্রামের কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে। কেহ বলিলেন, পীয়ারসনের এই প্রয়াস সর্ব্বত্র অনুসৃত হউক। কেহ বলিলেন, তাঁহার দান যেন বৎসর বৎসর দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্য পাওয়া যায়। ফক্‌স্ বলিলেন, "পরমেশ্বর করুন, এইরূপ দান যেন দেশ হইতে শীঘ্র উঠিয়া যায়। দারিদ্র্য সমাজকে যেন বেশী দিন আক্রান্ত করিয়া না রাখে। শীঘ্রই বোধ হয় সময় আসিতেছে, যখন পীয়ারসনের দানেব ন্যায় দানের আবশ্যকতা ইংলণ্ডে থাকিবে না।"

বলা বাহুল্য ফক্‌সের বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইল। পীয়ারসনের কর্ম্মচারী বলিলেন, "পীয়ারসন এক্ষণে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য সম্প্রতি তিনি অন্ধ ব্যক্তিগণের সেবায় মনোযোগী হইয়াছেন।"

নব্য ভারতে বিশ্বশক্তি

অধ্যাপক আন্নুইন বলিলেন, "মহাশয়, আজ কাল ভারতবর্ষে মেকলে-নীতির বিরুদ্ধে দেশীয় শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন চলিতেছে শুনিতে পাই। আপনারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য বর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন না, অথচ একমাত্র এই বিদেশীয় চিন্তারাশির প্রভাবেও জীবন-গঠন করিতে অস্বীকার করিতেছেন। আপনাদের সনাতন জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে নব্য জগতের উৎকর্ষ অঙ্গীভূত করিয়া লইতে আপনারা প্রয়াসী হইয়াছেন। এই প্রয়াস অত্যন্ত সাধু এবং সুবিবেচনার পরিচায়ক। বাহির হইতে আপনাদের উপর পরকীয় সভ্যতার বোঝা চাপান হইতেছিল। তাহাতে আপনাদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি। তাহার পরিবর্ত্তে আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আধুনিক সভ্যতা হইতে প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি বাছিয়া লইলেই সুফল ফলিবে, এইরূপই আমার বিশ্বাস।

কিন্তু বিদেশের আবিষ্কারগুলি আপনাদের সমাজে ও সভ্যতায় প্রবিষ্ট হইবে কি করিয়া? প্রবিষ্ট হইবার কোন পথ আছে কি? ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি পরকীয় সভ্যতার অনুষ্ঠানগুলি সহজে গ্রহণ করিতে অবসর দেয়?"

আমি বলিলাম, "বর্ণাশ্রম বলিলে আপনি যেরূপ পরস্পর-বিরোধী এবং স্বস্ব প্রধান সঙ্কীর্ণ দলভেদ বিবেচনা করিতেছেন তাহা সত্য নয়। তাহা ছাড়া অষ্টাদশ ও উনবিংশশতাব্দীতে বর্ণাশ্রমের ভিতর যে সকল সঙ্কীর্ণতা প্রবিষ্ট হইয়াছিল সেগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহার জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

অধিকন্তু, আমাদের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই হিন্দু সমাজতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতসমাজ জগতের সকল প্রকার শক্তিপুঞ্জ হইতেই নিজ কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। গ্রীক, রোমাণ, পারস্য, মুসলমান, চীনা, তিব্বতী সকল জাতীয় সভ্যতাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমাদের সমাজে স্থান পাইয়াছে। আমরাও এই সকল সভ্যতাকে নানা উপকরণে ভূষিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা প্রকার আবিষ্কার গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে কেন পারিবে না?

সত্য কথা, আমরা কোন দিনই সোজা একটানা ভাবে গড়িয়া উঠি নাই। আমরা নিজেদের ভিতরই কত অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমন্বয় করিতে করিতে বিকশিত হইয়াছি। ভারতবর্ষ সর্ব্বগ্রাসী, এতদিন আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হজম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছি। নূতন শক্তি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা কি এক্ষণে আর নাই?

যতদিন ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনভাবে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অগ্রসর পাইত, ততদিন হিন্দু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে দুনিয়ার নব নব আবিষ্কার সহজে প্রবেশ করিতে পারিত। সংস্কৃত ভাষার ভিতর কোন চিন্তা একবার প্রবেশ করিলে তাহা ক্রমশঃ প্রাদেশিক ভাষায় এবং লোক-সাহিত্যেও আসিয়া পড়িত। অধ্যাপকগণের গবেষণায়, শিষ্যগণের আলোচনায়, পুরোহিত-গণের সাহচর্য্যে, কথক ও পুরাণপাঠকগণের প্রচারে এবং শোভাযাত্রা, মেলা, উৎসব, সঙ্গীত ইত্যাদির প্রভাবে কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলিও অল্প-কালের ভিতর সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যাইত। প্রয়োজনানুসারে নিত্য নূতন পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি হইত। গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আবিষ্কার বরাহমিহির গ্রহণ করিলেন। পঞ্জিকার সাহায্যে সেগুলি

এক্ষণে নিরক্ষর কৃষকেরও সহজে বোধগম্য হইয়া রহিয়াছে। খনার বচনই বা কে না জানে ?

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি এই উপায়েই আধুনিককালেও গ্রহণ করিতে পারিব। জোর করিয়া গ্রহণ করাইবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের অভাব অনুসারে গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইলেই কোন গোল বাধিবে না। উনবিংশশতাব্দীতে সে সুযোগ পাই নাই। এই জন্যই পরকীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতে যাইয়া পরানুকরণ ও পরানুবাদ মাত্র করিতে পারিয়াছি। বিংশশতাব্দীতে আমরা নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়া, নিজেদের স্বভাব বুঝিয়া, নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্র অনুসারে ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বুঝা পড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই বুঝা পড়ার ফল প্রধানতঃ আমাদের মাতৃভাষায় দেখিতে পাইবেন। আমাদের মাতৃভাষা কোন জাতিবিশেষের বা ধর্ম্মবিশেষের সম্পত্তি নয়। হিন্দু মুসলমান নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ সকলেরই এক মাতৃভাষা। বিবাহের নিয়ম এবং রান্নাঘর ও পূজা-পদ্ধতি বিভিন্ন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষা এবং ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব ও চিন্তাপ্রাণালী সকল সম্প্রদায়েরই একরূপ। মাতৃভাষার কোন বিভাগে পাশ্চাত্য জ্ঞান একবার স্থান পাইলে অল্পকালের ভিতরেই তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে আপামর জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়িবে।

আপনি "স্বদেশী আন্দোলনে"র কথা বোধ হয় শুনিয়াছেন। এত তথাকথিত প্রভেদ স্বত্বেও সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এক হইল কি করিয়া ?"

আনুইন বলিলেন, "স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা দেখিয়া আমারও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, দলাদলি, ধর্ম্মবিদ্বেষ এবং গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়া থাকি তাহা সত্য নয়।"

শিল্প-শিক্ষা, কারখানা ও সমাজ-সমস্যা

এদেশের টেক্‌নিক্যাল কলেজগুলিতে ছাত্রদিগকে শিখাইবার জন্যই সকল প্রয়াস করা হইয়া থাকে। ব্যবসায় চালান এবং শিক্ষাপ্রদান দুই কার্য্য এক সঙ্গে করা ইহাঁরা পছন্দ করেন না। এডিনবারার হেরিয়ট ওয়াট টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। ম্যাঞ্চেষ্টারের "মিউনিসিপ্যাল স্কুল অব্ টেক্‌নলজি"র অধ্যক্ষকেও এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ইনি বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের কারখানায় যতগুলি যন্ত্র আছে সেগুলির দ্বারা যদি বাজারের জন্য মাল তৈয়ারী করিতে বলি তাহা হইলে ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে অশেষ ক্ষতি হয়। অবশ্য শিল্পকারখানায় কাজ করিলে ছাত্রগণ ভাল শিখিতে পারে স্বীকার করি। তাহাতে খরচ পত্রের হিসাব, লাভ করিবার উপায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ও আনুষঙ্গিকভাবে শিক্ষা হইয়া যায়। অধিকন্তু, কারখানার কাজে ছাত্র করিতকর্ম্মা বেশী হয়। কিন্তু শিল্প-বিদ্যাবিষয়ক তত্ত্বগুলি আমরাই বেশী শিখাইতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবরেটরী এবং ক্ষুদ্র কারখানার সাহায্যে আমরা বৃহৎ ব্যবসা-কেন্দ্রের উপযোগী সকল শিক্ষাই দিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের শিক্ষালাভ করিবার পর ছাত্রেরা যদি ২।৩ বৎসর কাল কোন ফ্যাক্টরীতে যাইয়া এপ্রেন্টিশী করে তাহা হইলে তাহারা পাকা হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ের ভিতরেই এইরূপ

একটা ব্যবসায় খুলিয়া লাভ করিবার চেষ্টা করিলে হয় ত সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যাইবে। আমাদের বিদ্যালয়ে যত ব্যয় হইতেছে সমস্তই বিদ্যাদানের জন্য এইরূপই আমরা বুঝিয়া থাকি।”

ম্যাঞ্চেষ্টারের এই টেক্‌নিক্যাল স্কুল ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমস্ত খরচ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে আসিয়াছে। গ্লাস-গোর রয়্যাল টেক্‌নিক্যাল কলেজ এবং এডিনবারার পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ও এইরূপ সরকারী খরচে পরিচালিত হয়। তিনটিই অতি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়। তিনটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির টেক্‌নিক্যাল বিভাগের সঙ্গে এই টেক্‌নিক্যাল কলেজগুলির সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়েই রাত্রে শিক্ষাদিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যাহারা অন্নসংস্থানের জন্য দিবাভাগে কারখানায় বা আফিসে কর্ম্ম করে তাহারা রাত্রিকালে নানাপ্রকার উচ্চ অঙ্গের শিল্পবিদ্যা অর্জ্জন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাতীত কতকগুলি শিল্প এবং ব্যবসায়ও এখানে শিখান হয়। দর্জ্জীগিরি, দপ্তরীগিরি, রবার তৈয়ারী করা ইত্যাদি নানা-প্রকার শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম। কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানাটা বিশেষভাবে দেখা গেল।

একটা যন্ত্রে ছেঁড়া ন্যাকড়া গলান হইতেছে, দ্বিতীয় যন্ত্রে সেগুলি ধুইয়া ফেলা হইতেছে। তাহার পর এগুলিকে ‘ব্লীচ্’ বা বর্ণহীন করি-বার কতিপয় যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অবস্থায় ন্যাকড়াগুলি ভিজা কাগজের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর কাগজের শাঁস হইতে জল নিংড়াইয়া ফেলিতে হয়। কাগজ তৈয়ারী করিবার প্রণালীতে জলীয়ভাগ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। জলশূন্য শাঁসকে পাত্‌লা চাদরের আকারে পরিণত করিবার জন্য আর একপ্রকার

যন্ত্র আছে। ইহাই কাগজ। তাহার পর ইহাকে গরম করিয়া শুকান হয়।

কাগজ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রগুলি সবই পরস্পর সংলগ্ন। একটা এঞ্জিন চালাইয়া সবগুলি কল খুলিয়া দিলে দেখিতে পাই যে কারখানার এক অংশে ছেঁড়া ন্যাকড়া জমা হইয়া রহিয়াছে, অপর অংশে কাগজ ভাঁজ হইয়া বাহির হইতেছে। কোন স্থানেই মানুষের কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

যন্ত্রচালিত কারখানা ব্যবহার করিলে বোধ হয় এক অংশে গাভী ছাড়িয়া এবং আখের ক্ষেত চষিয়া অপর অংশে সন্দেশের চাকৃতি বাহির করিতে পারা যায়! রজনী সেনের "যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত পান তোয়া শত শত" আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব মনে হইতেছে না। "সকলই ত হবে বিজ্ঞানের বলে।" বিলাতের ফ্যাক্টরী-গুলি দেখিলে কোন বিষয়ে বিস্মিত হইবার কারণ কমিয়া আসে।

কাগজ ভাঁজ করা হইয়া গেলে তাহার দৃঢ়তা পরীক্ষা করা হয়। ইহার জন্যও নানাবিধ কল আছে। কত চাপে কোন্ কাগজ কিরূপ ছিঁড়িয়া যায় ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখিলাম।

আজ ম্যাঞ্চেষ্টারের একটা বড় "ব্লীচ্-কারখানা" দেখিলাম। সেদিন একজন ব্যবসাদার বলিয়াছিলেন, "ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন কার-খানার ভিন্ন ভিন্ন কাজ হয়। যে কারখানায় কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করা হয় সেখানে আর কোন কাজ করা হয় না।" এই কারখানাগুলির নাম ব্লীচ-ওয়ার্কস্।

সকল কারখানাতেই কার্য্যপ্রণালী একপ্রকার, কেবল যন্ত্রগুলির পার্থক্য। শ্রমজীবীরা স্ত্রী পুরুষে সকলেই কলের দাস দাসী মাত্র ইহাদের জীবন বড়ই উদ্বেগপূর্ণ, কর্ম্মময় ও শান্তিহীন।

অষ্টাদশশতাব্দীর শেষভাগে বাষ্প এবং যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। শিল্প ও ব্যবসায়ে এই সমুদয়ের প্রভাব উনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পূর্ণরূপে দেখা দেয়। তাহার ফলেই ইংলণ্ডের সকল প্রকার সম্পদবৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশাল সাম্রাজ্যের বাজার একচেটিয়া ভাবে ইহাঁরা ভোগ করিয়াছেন। এইজন্যই ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ইয়র্কশিয়রের নগরগুলিতে বৃহদাকার ফ্যাক্টরীর মৌচাক সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র ইংলণ্ডের $\frac{1}{6}$ অংশ নরনারী এই প্রদেশের ৮।১০ টা নগরে জমা হইয়াছে।

নরনারীর জীবন অতি বিষাদময় বৈচিত্র্যহীন, সৌন্দর্য্যশূন্য। এক-ঘেয়ে কর্ম্মে প্রত্যেকের জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারের সুখ দুঃখে দেখিবার সময় মাতারও নাই, পিতারও নাই। কারখানার গোলাম এবং যন্ত্রের সেবকসেবিকারূপে ইহারা জীবন ধারণ করে।

ফ্যাক্টরীর মালিকেরাও বেশী কিছু দেখেন না। তাঁহারা যে মাল জোগাইতেছেন তাহার কাট্‌তি যথেষ্ট থাকিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাঁহারা সর্ব্বদা কাট্‌তি ও বাজার অন্বেষণ করিতেছেন। যতই সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক-রূপে বিস্তৃত হইয়াছে ততই ইহাঁদের বাজার দৃঢ় ও বড় হইয়াছে; ততই ইহাঁরা ফ্যাক্টরীর কলযন্ত্রগুলি বাড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন, ততই শ্রমজীবীরা নির্জ্জীব পদার্থের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে। সাম্রাজ্য-নীতির প্রভাবেই ফ্যাক্টরী-নীতি সফল হইয়াছে। সাম্রাজ্য না থাকিলে এই সকল বিশাল ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিত না।

সস্তায় মাল জোগানই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। কলের নিয়ম এই যে, কার-বার যত বড় হইবে খরচ তত কমিতে থাকিবে, শ্রমবিভাগ-নীতি তত বেশী প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে, তত অল্প সময়ে বেশী মাল বাজারে ফেলা যাইবে। কাজেই উনবিংশশতাব্দীতে ফ্যাক্টরীর আকার বাড়িয়া চলিয়াছে।

দুইজন একজন মহাজনের আওতায় সকল ব্যবসায়ই আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ফ্যাক্টরীগুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করিতেছে।

সাম্রাজ্য বাড়িয়াছে, কলকারখানা বাড়িয়াছে, সম্পদ বাড়িয়াছে, অথচ সুখ ত বাড়িতেছে না, ইংলণ্ডের দারিদ্র্য ত কমিতেছে না। বরং যে পরিমাণে সাম্রাজ্য ও ফ্যাক্টরী, সেই পরিমাণেই দারিদ্র্য! বুথ সাহেব লণ্ডন নগরের শ্রমজীবীদিগের বৈষয়িক অবস্থা তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনা করিয়া ৫ খণ্ডে পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ ৩২% লোক অর্দ্ধাশনে থাকে। ইয়র্কনগরের শ্রমজীবিজীবনও ঠিক সেইরূপই শোচনীয়—এ কথা রাউণ্ট্রি সাহেবের তথ্য সংগ্রহের ফলে জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বার্ম্মিংহাম নগরের শ্রমজীবিসমাজবিষয়ক গ্রন্থেও দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছি।

শিল্পবিপ্লবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ঊনবিংশশতাব্দীর আরম্ভ হইল কিন্তু ঊনবিংশশতাব্দীর শেষ হইল ইংরাজজাতির সর্ব্বনাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া। চার্লস্ বুথের Life and Labour in London গ্রন্থ সমগ্র ঊনবিংশশতাব্দীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। কাজেই ইংরাজ এখন স্তম্ভিতভাবে ফ্যাক্টরী-নীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "কোন্ পথে চলি?" ইহাই ইংরাজের কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ঊন-বিংশশতাব্দীর পথে চলিলে অল্পকালের ভিতরই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ইহা গভীরভাবে বুঝিয়াছেন বলিয়াই দরিদ্র নরনারীদিগের জন্য ইহাঁরা যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। নগর-সংস্কার, স্বাস্থ্যোন্নতি, গৃহনির্ম্মাণ, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, মিউজিয়াম-গঠন, ইত্যাদি নানাবিধ লোকহিতবিষয়ক কর্ম্মে তাঁহারা জলের মত টাকা খরচ করিতেছেন। শ্রমজীবিসমাজে বিবাহ-বন্ধন সুখময় করিবার জন্য ইহাঁরা সচেষ্ট।

যাহাতে ইহাদের অবকাশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যাহাতে ইহারা কর্ম্ম হইতে বেশীক্ষণ বিরাম ও শান্তি পায় তাহার ব্যবস্থা আইন দ্বারা করা হইতেছে। দেশের বৈষয়িক জীবনে, ধনী দরিদ্রের সম্বন্ধে, প্রভু ভৃত্যের ব্যবহারে, কতকগুলি নূতন আদর্শ, নূতন লক্ষ্য, এবং নূতন লক্ষণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের চিহ্নগুলি দেখিলে মনে হইবে যেন, এ দেশে আবার একটা নব্য শিল্পবিপ্লব সাধিত হইতে চলিয়াছে। ঊনবিংশশতাব্দীর ফ্যাক্টরী-যুগ ছাড়াইয়া ইংরাজাতি এক নূতন ধরণের বৈষয়িক অবস্থায় প্রবেশ করিতেছে। বিংশশতাব্দীর এই সমীপ-বর্ত্তী শিল্পবিপ্লব পূর্ব্বতন বিপ্লব হইতে কোন বিষয়ে হীন মনে হইতেছে না।

লোকহিত ব্রত, দরিদ্রসেবা এবং পরোপকারের অনুষ্ঠানগুলি হইতে ইংলণ্ডের বৈষয়িক বিপ্লব মাত্র সাধিত হইবে না। ইংরাজের পারি-বারিক এবং সামাজিক জীবনেও একটা বিপ্লব আসিতেছে। স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত জীবনের চরম লক্ষ্য, মানবের কর্ত্তব্য ইত্যাদি মনুষ্যতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তাগুলিও অভিনবভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। এই নব্য সমাজ ও পরিবার বিলাতের পক্ষে একটা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিবেচিত হইবে। বার্ণস্ স্কট, কার্লাইল, রাস্কিন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ গত শতাব্দীতে নবযুগ আনিয়াছিলেন। বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইংলণ্ডে এইরূপ একটা যুগান্তর সাধিত হইবে বোধ হইতেছে।

সম্প্রতি চিন্তাক্ষেত্রে এবং সাহিত্যজগতে সামান্য সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। মানবসেবা, পরোপকার, লোকহিত, জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদান ইত্যাদি কর্ম্মক্ষেত্রেই নবযুগের আবাহন বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি। যাঁহারা ঊনবিংশশতাব্দীতে বিজ্ঞান

ফলাইয়া ৩০% নরনারীকে অর্দ্ধাশনে রাখিয়াছেন তাঁহারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানা উপায়ে বিংশশতাব্দীতে দরিদ্র নারায়ণের সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। দরিদ্র সেবার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডে আজকাল সংখ্যাতীত।

ম্যাঞ্চেষ্টার নগরেই এই সেবাশ্রমগুলির সংখ্যা এত বেশী যে দরিদ্রেরা ইহাদের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ম্যাঞ্চেষ্টার ফ্যাক্টরীর মৌচাক, ম্যাঞ্চেষ্টারই আবার দরিদ্রসেবক "সোশ্যালিষ্ট"দিগেরও প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র!

আজ Civic League of Help নামক "হিতকারিণী সভার" কার্য্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহার সম্পাদক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের গ্র্যাজুয়েট। ইনি বলিলেন, "মহাশয়, পূর্ব্বে আমাদের লোকেরা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য শাসনের কার্য্য ভালবাসিত। এক্ষণে কেহ বিদেশে যাইতে চাহিতেছে না। ভাল ভাল লোকেরা স্বদেশেই সমাজসেবার কাজে লাগিতে চাহে।" হিতকারিণী সভার লোকেরা দরিদ্রদিগকে সেবাশ্রম গুলির পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকেন। এবং সহজেই তাহাদের সাহায্য প্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দেন। মিউনিসিপ্যালিটি নিজেই দানভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। তাহা ছাড়া অসংখ্য স্বাধীন ভাণ্ডারও আছে। এই সমুদয়ের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইঁহারা দরিদ্রদিগের উপকার করেন।

কো-অপারেটিভ আন্দোলন

দারিদ্র্য-সমস্যা মীমাংসা করিবার মিউনিসিপ্যাল আয়োজন দেখিলাম, জনসাধারণের স্বাধীন আয়োজনও দেখিলাম। এই সকল দানভাণ্ডার ও সাহায্যসমিতি, অনাথভাণ্ডার এবং সেবাশ্রম ব্যতীত অন্যপ্রকার আয়োজনও আছে। সেগুলির নাম "কো-অপারেটিভ" বা সমবায়-সমিতি। এদেশে "কো-অপারেটিভ"-আন্দোলন দরিদ্রের ক্রন্দন নিবারণের অন্যতম মহদনুষ্ঠান।

ম্যাঞ্চেষ্টার সমবায়-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। বাস্তবিক পক্ষে এই নগরে শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় যতপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দেখিতেছি তাহাতে লণ্ডনকে ইংলণ্ডের প্রধান নগর বলিতে ইচ্ছা হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টারকেই ইংরাজজীবনের কেন্দ্র বিবেচনা করা উচিত। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ম্যাঞ্চেষ্টারে, ইংরাজের দারিদ্র্যও ম্যাঞ্চেষ্টারে, আবার এই দারিদ্র্য নিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়গুলি আবিষ্কৃতও হইয়াছে ম্যাঞ্চেষ্টারে।

এখানকার Co-operative Wholesale Society এক অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান। ইহা একটি সাম্রাজ্যবিশেষ। যেমন বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলি একদিকে দারিদ্র্যের আকর, তেমনি এই বিশাল "শ্রমজীবিসমবায়-মণ্ডলী" দারিদ্র্য নিবারণের মহৌষধি। এই প্রতিষ্ঠানই বহু দরিদ্রের ভগ্ন শুষ্ক বুকে আশা ধ্বনিয়া তুলিয়াছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য এতবড় সুসজ্জিত দুর্গ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম।

ম্যাঞ্চেষ্টার নগরের কতকগুলি সুবৃহৎ অট্টালিকায় সমবায়-সমিতির

কার্য্যালয় অবস্থিত। অট্টালিকাগুলি সবই সমিতির সম্পত্তি। নূতন নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিতও হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, নগরের এই অংশকে সমবায়-পাড়া বলিলেই চলে। একটা রাস্তার আগাগোড়া সবই সমবায় আন্দোলনের বাড়ী ঘর। কলিকাতায় ২৫।৩০ খানা "ধর্ম্ম-সমবায়" সৌধ মিলাইলেও ম্যাঞ্চেষ্টারের সমবায় মহাল্লার পরিমাণ বুঝা যায় না।

হোলিয়োক সাহেব ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সমবায়নীতিপ্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি সুবৃহৎ ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভবনে আন্দোলন সম্পর্কিত নানাপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। সমবায়-সমিতির প্রচারবিভাগ, আলোচনাবিভাগ, লোকশিক্ষা-বিভাগ ইত্যাদি হোলিয়োক-ভবনে অবস্থিত। এখানে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলাম। ইনি বলিলেন, "মহাশয়, আজ আমাকে এই বিরাট ব্যাপারের একজন কর্ণধার দেখিতেছেন। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি আরদালি ও পিয়ন মাত্র ছিলাম। নিম্ন বিভাগের কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে উঠিতে উঠিতে আজ এই আন্দোলনের এক প্রধান বিভাগের সম্পাদক হইয়াছি। আমার সঙ্গে এই যে সহকারী সম্পাদক দেখিতেছেন ইহাঁকে আমার আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছি। ইনি পূর্ব্বে সামান্য মজুর মাত্র ছিলেন।"

ইনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের অম্বিকাচরণ উকিলকে চিনেন কি? তাঁহার নিকট হইতে ভারতীয় সমবায় আন্দোলন বিষয়ক কাগজপত্র মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। তাঁহার উদ্যোগে আমাদের এই পুস্তিকাখানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।" এই বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র পুঁথি আমার হাতে দিলেন। নাম "Our Story" অতি সরল ভাষায় বালক বালিকাদিগের জন্য সমবায়-তত্ত্ব এবং বিলাতী সমবায়-আন্দোলনের ক্রমবিকাশ বিবৃত করা হইয়াছে। শুনিলাম এই পুস্তকের

প্রতিপাদ্য বিষয় শিক্ষা করিয়া হাজার হাজার ছাত্র প্রতি বৎসর পরীক্ষা দিয়া থাকে।

সাধারণ কেনা বেচা, দোকানদারী ও মাল প্রস্তুত করায় এবং সমবায়-নীতির অন্তর্গত কেনা বেচা, দোকানদারী ও মাল প্রস্তুত করায় কি প্রভেদ তাহা অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারে। সমবায়ের নিয়মে দোকান খুলিবার জন্য প্রথমে কি কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহাও ইহাতে বর্ণিত আছে। ফলতঃ দরিদ্র শ্রমজীবীরা সহজে নিজেদের আর্থিক উন্নতির উপায়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য পায়।

এই পুস্তিকা দিবার পর সম্পাদক নানা ধরণের ৫০।৬০ খানা পুস্তিকা উপহার দিলেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আমেরিকা ইত্যাদি সকল দেশের সমবায়-সমিতির বিবরণ এই সমুদয়ে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা ছাড়া বিলাতী সমবায় আন্দোলনের কেন্দ্র সম্বন্ধে অতীত এবং বর্ত্তমান সকল প্রকার তথ্যও এই পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়।

আমি বলিলাম, "সমবায়-নীতির ব্যাখ্যা অথবা সুফল কুফল শুনিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে বসিয়া এতদ্বিষয়ক ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছি। এক্ষণে চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইতে চাহি। এই বিরাট আন্দোলনের কয়েকটা বিভাগের কার্য্যপরিচালনা স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

ইনি বলিলেন, "অল্প সময়ের ভিতর বেশী কাজ করিতে হইলে আপনাকে দুই জায়গায় লইয়া যাইব। প্রথমে আমাদের দোকানদারী বিভাগের কার্য্য দেখুন। পরে আমাদের মাল উৎপাদন বিভাগের কার্য্য দেখিবেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের ইন্সিউর‍্যান্স এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে আপনাকে কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিব।"

দোকানদারী বিভাগের কার্য্য পরিচালনা দেখিতে অগ্রসর হইলাম। একখানা "চাঁদনী চক্" ইহাঁদের বাজার। মানুষের যত প্রকার জিনিষের প্রয়োজন থাকিতে পারে সকল প্রকারই এই বাজারের ভিতর রহিয়াছে। এই বিশাল গৃহগুলির নানা প্রকোষ্ঠে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নাই।

কোন কোন গৃহে যাইয়া খরিদদার এবং বিক্রেতাদিগের সঙ্গে আলাপ করিলাম। বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা সকলেই সমবায়-সমিতির অংশীদার ও সভ্য কেহই সমিতির ভৃত্য বা কর্ম্মচারী নন। মালগুলি সমস্তই সমিতির সম্পত্তি। কোন বাজে লোক ঘরের ভাড়া দিয়া এই বাজারে মাল রাখিতে পায় না। চাঁদনী চকের বাজারে এবং সমবায় আন্দোলনের বাজারে এই প্রভেদ।

ক্রেতাদিগের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারা সকলেই সমবায়-সমিতির অংশীদার ও সভ্য। কোন বাজে লোক এই বাজারে মাল খরিদ করিতে পারেন না। ইহাঁরা মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায়-দোকানের জন্য মাল লইতে আসিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের Co-operative Wholesale Societyএর দোকানে খুচরা বিক্রয় হয় না। মফঃস্বলের সমবায়-সমিতি-সমূহ এখান হইতে পাইকারী ক্রয় করিতে পারে। এই সমিতিসমূহই কেন্দ্র-সমিতির অংশীদার। কোন ব্যক্তি কেন্দ্র-সমিতির অংশীদার নন।

ইংলণ্ডের ভিতর ছোট বড় বহু সমবায়-সমিতি আছে। তাহারা ৭৫৲ টাকার অংশ খরিদ করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের এই কেন্দ্র-সমিতির সভ্য হইয়াছে। কেন্দ্র-সমিতি এই সকল মফঃস্বলের সমিতি দ্বারাই পুষ্ট। ক্ষুদ্র সমিতিগুলি দলবদ্ধভাবে বড় সমিতির সকল সম্পত্তির মালিক।

সুতরাং ক্ষুদ্র সমিতিগুলিই বড় সমিতির আকারে দলবদ্ধভাবে বিক্রয় করিতেছে। আবার তাহারাই স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ ক্রয় করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষুদ্র সমিতিই নিজের মাল বিক্রয় করিতেছে আবার

নিজের জন্যই ক্রয়ও করিতেছে। একই সমিতি ক্রেতা এবং বিক্রেতা। এই ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। চাঁদনী চকের বাজারে ক্রেতা চাহেন অতি সস্তায় মাল পাইতে, বিক্রেতা চাহেন বেশী দামে মাল বেচিতে, প্রত্যেকেই নিজের লাভ খতাইয়া দেখেন। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের এই সমবায়-বাজারে দেখিতেছি যে, লাভটা শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমিতির নিজ তহবিলেই ফিরিয়া আসে। ক্রেতারূপে সমিতি যাহা খরচ করিতেছে বিক্রেতারূপে সমিতি তাহার লাভ পাইতেছে। যে যত বেশী কিনিবে সে ভবিষ্যতে তত বেশী লাভ পাইবে।

ক্রেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা না হয় এই বাজারের অংশীদার। কিন্তু এখানে কিনিতে বাধ্য কি?" ইহাঁরা বলিলেন, "না। আমরা এখানে ক্রয় না করিলেও পারি। তাহাতে আমাদেরই ক্ষতি। কারণ অংশীদারভাবে আমরা কতটুকু লাভই বা পাইতে পারি? কিন্তু ক্রেতা হইলে দুইবার দুইহিসাবে লাভ পাইব। প্রথমতঃ, অংশীদার হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ ক্রেতা হিসাবে।" ক্রয়-বিক্রয়ে সমবায়-নীতি অত্যন্ত সুবিধা জনক নহে কি?

তাহা ছাড়া সমবেত দোকানদারীর অন্য লাভও আছে। প্রথমতঃ, অল্প দামে মাল কিনিতে পারা যায়। চাঁদনীর বাজারে কিনিতে গেলে যত পয়সা লাগে সমবায়সমিতির সভ্যরূপে সমবায়ের বাজারে কিনিতে গেলে তাহা অপেক্ষা কম পয়সা লাগে। এখানে দেখিলাম Wholesale Society মফঃস্বলের ক্রেতা-সমিতির নিকট যথাসম্ভব কম দামে বেচিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, Wholesale Society অতি সস্তাদরে মাল আনিতেও পারেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে দেখিলাম ইহাঁরা বেলজিয়াম, ডেন্‌মার্ক, জার্ম্মাণি এবং ইংলণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ কারখানা হইতে সস্তায় মাল কিনিয়া জমা রাখিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, কেন্দ্র-সমিতির অধীনে কতক-

গুলি বড বড় কারখানাও পরিচালিত হইতেছে। এই কারখানাগুলিতে জুতা, জামা, বিস্কুট, মিঠাই, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বহুসংখ্যক সমিতি মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিয়া প্রচুর মূলধন কেন্দ্রসমিতির হস্তগত হইয়াছে। এই টাকায় অশেষ প্রকার ফ্যাক্টরী চালান হইতেছে।

সমবেত ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্যপরিচালনা অতি সহজেই হইয়া থাকে। প্রতি সপ্তাহে মফঃস্বলের সমিতি হইতে লোক আসিয়া কেন্দ্র-বাজারে মাল অর্ডাব দেন। কেন্দ্রের বিক্রেতাবা কাগজে অর্ডার লিখিয়া রাখেন। অর্ডারের মূল্য বাজারে দিতে হয় না কেন্দ্রসমিতির ব্যাঙ্কবিভাগে জমা দিতে হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরেই মাল যথাস্থানে পাঠান হইয়া যায়।

মফঃস্বলের সমিতিগুলিও ঠিক এই নিয়মে কার্য্য করেন। অংশীদার ও সভ্যগণ ব্যতীত কেহই সমিতির বাজারে কেনা বেচা করিতে পারেন না। যাহা কিছু লাভ হয় সমস্তই অংশীদারগণের ভিতর বিভক্ত হইয়া যায়। এইরূপে পল্লীবাসীরা সমবেত দোকানদারী করিয়া ক্রেতা বিক্রেতার বিবাদ ঘুচাইয়া দিতেছে। যে ব্যক্তি বিক্রেতা সেই ব্যক্তিই ক্রেতা। সুতরাং কে কাহাকে ঠকাইবে বা কে কাহার নিকট বেশী লাভ করিবে? এ ক্ষেত্রে ঠকিবার বা ঠকাইবার কোন লোকই নাই। ক্রয়বিক্রয়ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানের নাম সমবায়।

সমবায়নীতি বহুবিধ কার্য্যেই অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের বৈষয়িক জীবনে দোকানদারী ক্ষেত্রেই সমবায়প্রথা বিশেষরূপে ফলবতী হইয়াছে। সস্তায় মাল পাইতে, উৎকৃষ্ট মাল পাইতে, এবং ক্রয় করিবার ফলেও ভবিষ্যতে লাভ করিতে হইলে এই প্রথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে।

১৯১২ সালে ম্যাঞ্চেষ্টারের কেন্দ্রসমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল ২,৮৭৬,০০০।

অর্থাৎ ইংরাজ জাতির শতকরা ২৫ জন লোক মফঃস্বলের সমবায়-সমিতির সভ্য হইয়া বিরাট Co-operative Wholesale Society এর সকল সম্পত্তির অংশীদার হইয়াছেন। ১৯১২ সালে ইহাঁদের ভিতর ২১ কোটি টাকা লাভরূপে বিভক্ত হইয়াছিল।

ম্যাঞ্চেষ্টারের কেন্দ্রসমিতির হিসাব পত্র বৎসরে দুইবার করিয়া হইয়া থাকে। ইহার আয় দ্বিবিধ (১) অংশ বিক্রয় লব্ধ, (২) মাল-বিক্রয় লব্ধ। ইহার ব্যয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) কার্য্যপরিচালনা

(২) অংশীদারদিগের সুদ ও লাভ

(৩) পুঁজি (ভবিষ্যতের জন্য)

(৪) দান—বিদ্যার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য ইত্যাদি

(৫) ক্রেতাদিগের মধ্যে লাভ বিতরণ।

সুতরাং সমবায়ের প্রতিষ্ঠান সভ্যগণের জন্য ক্রেতা হিসাবে পরোপকার এবং লোকসেবা করিবার সুযোগও সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতার ধর্ম্ম-সমবায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও এইরূপ। নিম্নের বিজ্ঞাপন হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় :—

অংশ—প্রত্যেক অংশের নির্দ্দিষ্ট মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। জনসাধারণের সুবিধার্থে আগামী ইং ৩০শে জুন, ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত উক্ত মূল্যেই অংশ বিক্রয় করা হইবে। তৎপরে শতকরা ২০৲ টাকা মূল্য বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ ৫৲ টাকা মূল্যে প্রত্যেক সাধারণ অংশ ৬৲ টাকায় বিক্রয় করা হইবে। অংশের মূল্য প্রাপ্তির ক্রমানুসারে অংশ প্রদত্ত হইবে; আগামী জুলাই মাসে লভ্যাংশ বৎসরে চারিবার বিতরিত হইবে। বিগত ৩ বৎসর যাবৎ অংশের লাভ বার্ষিক শতকরা ২৫৲ টাকা হারে বিতরিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যাদিও ভাল চলিতেছে।

উদ্দেশ্যবর্দ্ধন—গোপালন ও গোরক্ষা, এবং তৎসহ ধর্ম্মানুগত অর্থোৎপাদন বিভাগ ও বিনিয়োগ; কিস্তিবন্দী ক্রমে জনসাধারণের জন্য গৃহ ও ভূসম্পত্তি সংস্থাপন, ভূমির উৎকর্ষ সাধন, উদ্যান-বন-জনপদ সংস্থাপন এবং তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত ধন ধেনু ধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন। এতদর্থে সমবায়ের সমগ্র আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত নিয়ম মূলসূত্রে আছে ও প্রতিপালিত হইতেছে।

অনুষ্ঠান—পূর্ত্তকার্য্য, কলিকাতা কাশিমবাজার ও ৺কাশীধামে প্রকৃষ্ট-রূপে তিন বৎসর হইতে গো-পালন ভূমির উন্নতি বিধান এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ আরব্ধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ দধি, ঘৃত, দুগ্ধ ও মাখনাদির আবশ্যক হইলে সমবায়-সৌধ, করপোরেশন প্লেস, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

সমবায় নিয়ন্ত্রিত বিস্কুট ফ্যাক্টরী

কাল সমবেত ক্রয়বিক্রয়-মণ্ডলীর বিরাট বাজার দেখিয়াছি। ইংলণ্ডের ¼ অংশ লোক মিলিত হইয়া এই বাজার গঠন করিয়াছেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন পঞ্চাশদ্বর্ষোপলক্ষে জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কোটি কোটি টাকা এক্ষণে ইহাঁদের হস্তগত।

সস্তায় মাল জোগান ইহাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য—অথচ মালগুলি যাহাতে নিখুঁত এবং ভেজালহীন হয় তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা রহিয়াছে। কারণ ইহাঁরা ত কেবল বিক্রেতা নন—ইহাঁদের ক্রেতাও যে ইহাঁরা নিজেই।

ইহাঁরা যথাসম্ভব উৎপত্তি স্থান হইতে মাল লইয়া আসেন। ১৯১২ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ।

উৎপত্তি স্থান	আমদানী মাল
আমেরিকা	চিনি, মাংস, চর্ব্বি, গোধূম ইত্যাদি
অষ্ট্রেলিয়া	চর্ব্বি
অষ্ট্রিয়া	চিনি, ময়দা, কাপড়চোপড়, আসবাব্
ক্যানাডা	মাখন, চামড়া, মাংস
ডেন্‌মার্ক	ডিম, মাখন, মাংস
ফ্রান্স	চিনি, শুষ্কফল, সৌখীন কাপড় চোপড়,
জার্ম্মাণি	চিনি, ফল, ডিম
গ্রীস্ ও তুরস্ক	শুষ্ক ফল
হল্যাণ্ড	চাউল, পণির, ডিম
সুইডেন	মাখন, ডিম, কাষ্ঠ
স্পেন	ফল

দরিদ্র লোকেরা সমবায়ের গুণে দুনিয়া হইতে মাল আমদানী করিতেছে। কাজেই সস্তায় ভাল জিনিষ ভোগ করা তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। যাহারা এই সমবায় আন্দোলনের বাহিরে জীবন যাপন করে তাহারা সাধারণ বাজারের যে কোন দোকানে যাইয়া প্রয়োজনীয় বস্তু বেশী দামে কিনিতে বাধ্য।

বিদেশ হইতে আমদানী করা ব্যতীত কেন্দ্র-বাজারের কর্ত্তারা ইংলণ্ডের বড় বড় কারখানা হইতে পাইকারী দরে মাল লইয়া আসেন। খাঁটি উৎপত্তি স্থানের মাল আনিতে হইলে বড় বড় "অর্ডার" দেওয়া আবশ্যক। সমবায়-সমিতির অর্ডারগুলি কখনই ছোট হয় না—কারণ ইঁহাদের বাজার অতি বৃহৎ, মূলধনও প্রচুর। কারখানায় অর্ডার দিবার ফলে সস্তায় মাল পাওয়াও যায়।

এই দুই প্রকারে মাল জোগাইবার ফলে কেন্দ্র-সমিতির যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কতকগুলি জিনিষ ইঁহারা নিজেই প্রস্তুত করিতেছেন। এজন্য অনেকগুলি ফ্যাক্টরী ইঁহাদের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ একটা ফ্যাক্টরী আজ দেখিলাম।

এখানে বিস্কুট তৈয়ারী করা হয়। বলা বাহুল্য, সবই কলের কাজ। সেদিন কলে সন্দেশ তৈয়ারীর কল্পনা উল্লেখ করিয়াছি। আজ কল্পনা কার্য্যে পরিণত দেখিলাম। কোন কলে ময়দা গুঁড়া হইতেছে, কোন কলে চিনি, ডিম, চর্ব্বি, মাখন ইত্যাদির সঙ্গে ময়দা মিশান হইতেছে। এইরূপে ভাজা পর্য্যন্ত কলে হইয়া থাকে। এইখানেই শেষ নয়। কাগজের মোড়কে ভাঁজ করা, কৌটা বন্দী করা এবং বাক্সগুলি গুদাম ঘরে চালান করা—সবই যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। কোন ঘরে পুরুষেরা, কোন ঘরে রমণীরা এক একটা কলের নিকট দাঁড়াইয়া কল-সেবা করিতেছে। প্রায় ৭০০ জন শ্রমজীবী এই কারখানায় কার্য্য করে।

এই কারবারের প্রায় সকল লোকই কোন না কোন ক্ষুদ্র সমবায়-সমিতির অংশীদার। সেই সকল সমিতির অংশীদার হিসাবে ইহারা সকলেই এই কারখানার মালিক। কাজেই ইহারা স্বয়ংই নিয়োগ কর্ত্তা, আবার নিজেরাই নিযুক্ত কর্ম্মচারী এবং শ্রমজীবী। কাজেই সাধারণ ফ্যাক্টরীতে প্রভু ও শ্রমজীবিগণের যে দ্বন্দ্ব এই কারখানায় সেই দ্বন্দ্ব নাই। এখানকার ৭০০ লোক সকলেই মহাজন আবার সকলেই শ্রমজীবী।

এখানে নিয়োগ কর্ত্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যে সকল স্বাধীন দেশে স্বরাজ বা স্বায়ত্ত শাসন আছে সেখানে যেমন শাসনকর্ত্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এখানেও ঠিক সেইরূপ প্রভু বা মহাজন বা নিয়োগকর্ত্তাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। সকলেই কর্ম্মী আবার সকলেই মনিব। সমবেত উৎপাদন প্রণালীতে এক সম্প্রদায় Capitalist বা Employer এবং অপর সম্প্রদায় Labourer বা Employed—এইরূপ দুই সম্প্রদায় নাই। সুতরাং লাভ বা ক্ষতি কোন এক সম্প্রদায়ের হয় না—দুইই উভয়ের।

এখানকার লাভ সমস্তই কেন্দ্র-সমিতির নিকট জমা হয়। তাহার পর মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সমিতিগুলির নিকট পাঠান হয়। সেখান হইতে অংশীদারেরা তাহাদের অংশের লাভ পাইয়া থাকে। ইহারা যদি সমিতির দোকানে কিছু মাল ক্রয় নাও করে তাহাতেও ক্ষতি নাই। শেষ পর্য্যন্ত অংশের সুদ ও লাভ তাহার সুনিশ্চিত। বিস্কুট-ফ্যাক্টরীর কর্ম্মীরা নিজ নিজ সমবায়সমিতির অংশীদারহিসাবে বৎসরে দুইবার করিয়া লাভ পাইতেছে। আজ এখানে শ্রমজীবী হিসাবে কর্ম্ম করিতেছে, কাল মফঃস্বলে অংশীদার অতএব নিয়োগকারী হিসাবে লাভ ভোগ করিবে।

বিস্কুট-ফ্যাক্টরীর ভিতর আরও অনেক লক্ষ্য করিবার বিষয় পাইলাম। প্রথমতঃ, এখানকার ঘরগুলিতে আলোক ও বায়ুর গতিবিধি বেশ সহজে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি আছে। সাধারণ কারখানায় মনিবেরা যেরূপ ঘরে কল রাখিতে ইচ্ছা করেন সেইরূপ ঘরেই রাখিয়া থাকেন। আইনের দ্বারা বাধ্য না হইলে তাঁহারা শ্রমজীবীদিগের জন্য কার্য্যালয়গুলির সুবন্দোবস্ত করেন না। কিন্তু সমবায়-সমিতির এই বিস্কুট-ফ্যাক্টরীতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নাই। লাভ ক্ষতি যে সকলেরই পক্ষে সমান। কাজেই জীবনধারণের নিয়ম পালন করায় কারখানার সকলেরই সমান স্বার্থ।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহিত রমণীকে কারখানায় নিযুক্ত করা হয় না। জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, পারিবারিক জীবনের উন্নতি বিধান করিবার জন্য এই নিয়ম হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিবাহিতা স্ত্রীকে নিজগৃহের সকল প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবার জন্য ইঁহারা চেষ্টিত। রমণীরা নিজ পরিবারের সুখ দুঃখ গৃহস্থালী ইত্যাদিতে মনোযোগী না হইলে সমাজ টিকিবে না—সমবায়সমিতিরা ইহা বুঝিয়াছেন, সুতরাং সমবেত উৎপাদনের নিয়মে বিলাতে একটা সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতেছি।

তৃতীয়তঃ, ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ কাহাকেই করিতে হয় না। ইংলণ্ডে যত প্রকার শিল্প আছে সকল শিল্পের শ্রমজীবীরা দলবদ্ধ হইয়া এক একটা Trade Union বা "শ্রমজীবী সমিতি" গঠন করিয়াছে। প্রায় ২০০ বৎসর হইতে এই সকল ইউনিয়নের কার্য্য হইতেছে। ইহাদের প্রবল চেষ্টায় অনেক সময়ে ধনী মহাজনেরা ইহাদের স্বার্থ অনুসারে ফ্যাক্টরীর নিয়ম বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতী ট্রেড ইউনিয়ানসমূহ স্থির করিয়াছে যে, কোন শিল্প কারখানায় শ্রমজীবীরা

৮ ঘণ্টার বেশী খাটিবে না। এই নিয়ম এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু সমবায়-সমিতির বিস্কুট-ফ্যাক্টরীতে এই নিয়ম কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

চতুর্থতঃ, শ্রমজীবীদিগের জন্য বাগান, মাঠ, ক্রীড়াক্ষেত্র, লাইব্রেরী, ভোজনালয়, সঙ্গীতগৃহ ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষাপ্রদ এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিষ্ঠান এই ফ্যাক্টরীর ভিতর দেখিতে পাইলাম। ইহারা সকলেই সুখে সুস্থ জীবন যাপন করিতেছে বুঝা গেল।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অংশীদার হিসাবে ইহারা লাভ ভোগ করে। এক্ষণে দেখিতেছি, শ্রমজীবী হিসাবেই ইহাদের সুখ ও সুবিধা কম নয়। প্রতিদিনকার সাধারণ জীবন যাপনের ভিতর একটা আনন্দ পাওয়া কি আধুনিক বিলাতী সমাজে কম কথা? এদেশে ফ্যাক্টরী-নীতির প্রভাবে তাহার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না।

প্রভুনিয়ন্ত্রিত ফ্যাক্টরীতে শ্রমজীবীরা কঠোরভাবে জীবন যাপন করে, সমবায়নিয়ন্ত্রিত ফ্যাক্টরী তাহারা সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে জীবন গঠনের সুযোগ পায়। পরাধীন দেশের জনগণ যে ভাবে জীবন ধারণ করে স্বায়ত্ত শাসন এবং প্রজাতন্ত্র শাসনের অধীন জনগণ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মে চলাফেরা করে। স্বাধীনতার আব্‌হাওয়া এবং সমবায়ের আব্‌হাওয়া এক প্রকার। রাষ্ট্রীয় জগতের স্বায়ত্ত শাসন এবং বৈষয়িক জগতের সমবায় প্রথা এক বস্তু। এক ক্ষেত্রের কর্ম্ম ও চিন্তা যিনি বুঝিতে পারিবেন, অন্য ক্ষেত্রের কর্ম্ম ও চিন্তা তাঁহার পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে না।

খালাশীর সর্দ্দার

আজ একজন কুলীর সর্দ্দারের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি একটি "ট্রেড ইউনিয়নে"র সম্পাদক। এই ইউনিয়ন জাহাজের খালাসীদিগের সমিতি।

বিলাতে সকল প্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত কুলীরা নিজ নিজ ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। নিয়োগকারীদিগের সঙ্গে দর দস্তুর, কারখানার নিয়ম, কুলী-গৃহ, কার্য্যের সময়, অবকাশ, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্ত্তা এই ইউনিয়নগুলিই করিয়া থাকে। শ্রমজীবীরা ব্যক্তিগত-ভাবে কোন মহাজন বা নিয়োগকারীর সংশ্রবে আসেনা। পরিশ্রম এইরূপে দলবদ্ধভাবে কেনা বেচা হয়। ইহার ফলে শ্রমজীবীরা তাহা-দের অবস্থা অনেকটা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

খালাসী-ইউনিয়নের আফিসে অনেকক্ষণ কাটাইলাম। এখানকার কর্ম্মচারী সকলেই খালাসী। সর্দ্দার বন্ধুটিও প্রথমে নানা প্রকার কাজ করিবার পর খালাসীগিরি করিতেন। এক্ষণে সমিতির একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছেন।

সহকারী সম্পাদকের নিকট বহু খালাশী যাওয়া আসা করিতে লাগিল দেখিলাম। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া ছাপান পাশ। তাহার উপর ১০।১২ খানা ষ্ট্যাম্প লাগান রহিয়াছে। সহকারী সম্পাদক বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, আমাদের ইন্‌সিউর‍্যান্স বা বীমা কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করা হয়। আপনি বোধ হয় জানেন যে, সম্প্রতি বিলাতের গবর্মেণ্ট শ্রমজীবীদিগের অনুকূল একটা আইন জারি করিয়াছেন।

তাহার ফলে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক শ্রমজীবী ৶০ করিয়া গবর্মেণ্টের খাজাঞ্চীখানায় জমা রাখিতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে মহাজন বা নিয়োগ-কারীও প্রত্যেক শ্রমজীবীর জন্য সপ্তাহে।০ করিয়া জমা রাখিতে বাধ্য হন। এইরূপে প্রতি সপ্তাহে।৶০ করিয়া প্রত্যেক শ্রমজীবীর নামে গবর্মেণ্টের নিকট জমা থাকে। এই যে ষ্ট্যাম্পগুলি দেখিতেছেন এই সমুদয় ঐ সাপ্তাহিক জমার সাক্ষ্য।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই গুলি ফিরাইয়া পাইবার নিয়ম কি ?" ইনি বলিলেন, "যদি কখনও দৈবক্রমে কোন লোক কর্ম্মহীন হয় তাহা হইলে গবর্মেণ্ট টাকা পাঠাইয়া দেন। অথবা অসুস্থ হইলেও শ্রমজীবীরা জমা টাকা ফিরাইয়া পায়।"

খালাশীসমিতির সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজকাল শ্রম-জীবীর পক্ষ হইতে পাল্যামেণ্টে বিশেষ নামজাদা লোক কে ?" ইনি বলিলেন, "র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড। কিন্তু ইনি বড় ভীরু। নেতৃত্বের ক্ষমতা ইঁহার একেবারেই নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য ইনি আমাদের দলপতি। তবে একথাও ঠিক যে, ইঁহার দল বলিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। কারণ এখন পর্য্যন্ত ইনি এমন কিছু করেন নাই যাহার দ্বারা ইহাঁর প্রতি শ্রমজীবীদিগের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পরীক্ষিত হইতে পারে।

আমরা কেয়ার হার্ডিকে বেশী ভালবাসি কিন্তু এই বেচারা ম্যাক্‌-ডোনাল্ডের পশ্চাতে চাপা পড়িয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে ট্রেড ইউনিয়ন কিরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে ? সমবায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে শ্রমজীবীসমিতিরা পছন্দ করেন কি ?" ইনি বলিলেন, "সমবায়ের পাণ্ডারা মুখে যাহা বলেন, কার্য্যে তাহা করিতে পারেন নাই। আমা-দের বিশ্বাস যে, ধনী মহাজন-নিয়ন্ত্রিত কারবারে এবং সমবায়-মণ্ডলী

নিয়ন্ত্রিত কারবারে প্রভেদ বেশী নাই। ধনী মহাজন-সমিতির সঙ্গে শ্রমজীবীদিগের যেরূপ সম্বন্ধ, সমবায়-সমিতির সঙ্গেও শ্রমজীবীদিগের সেইরূপই সম্বন্ধ। সমবায়ের পাণ্ডারা মূলধনের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ইঁহারা প্রকারান্তরে মামুলি মহাজন এবং নিয়োগকর্ত্তা হইয়া পড়িতেছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের কো-অপারেটিভ বিস্কুট কারখানা, জ্যাম কারখানা, জুতা কারখানা ইত্যাদি দেখিয়াছেন কি? দেখিলে বুঝিবেন যে, সাধারণ যৌথ কারখানায় এবং সমবায় কারখানায় সামান্য প্রভেদও নাই। শ্রমজীবীরা এখানেও নিযুক্ত, ওখানেও নিযুক্ত। ইহাদের দাস্যভাব সমবায়ের প্রতিষ্ঠানে নিবারিত হয় নাই। অবশ্য কারখানার বাড়ীঘর, কার্য্যের সময়, অবকাশ, ইত্যাদির ব্যবস্থায় কতকগুলি সুবিধা সমবায়ের নিয়মে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবীসমস্যার মীমাংসা এই টুকুতে হইবে না। কারণ নিয়োগ কর্ত্তা এবং নিযুক্ত এই দুই দল কো-অপারেটিভ কারখানাতেও দেখিতে পাইবেন। মূলধনের দৌরাত্ম্য, এবং শ্রমজীবীদিগের গোলামী সমবায়ের অবস্থায়ও বড় কম নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রমজীবীদিগের অবস্থা উন্নত করিবার উপায় তাহা হইলে কি কি?" ইনি বলিলেন, "আর যাহাই হউক, এ কথা ঠিক যে, যতদিন পর্য্যন্ত কারখানার কার্য্য পরিচালনার দুই দল থাকিবে নিয়োগকারী এবং নিযুক্ত ততদিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত দলের জন্য ট্রেড্ ইউনিয়নের আবশ্যকতা থাকিবে। ট্রেড্ ইউনিয়ন না থাকিলে শ্রমজীবী-দিগকে মহাজনেরা পিষিয়া ফেলিতে পারেন!"

সর্দ্দার মহাশয়ের সঙ্গে সমিতির কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়া খালাসীদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে গেলাম। ম্যাঞ্চেষ্টার সমুদ্রতীর হইতে ৩০।৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রকৃত প্রস্তাবে লিভারপুলের বন্দরই ম্যাঞ্চে-ষ্টারের বন্দর। কিন্তু ৩০ মাইল দূর হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারের মাল আমদানী

রপ্তানী বিশেষ অসুবিধাজনক বোধ হইতেছিল। এজন্য আজ বিশবৎসর হইল ম্যাঞ্চেষ্টার নগরকেই বন্দরে পরিণত করা হইয়াছে।

স্থয়েজখাল অপেক্ষা বিস্তৃত একটা খাল কাটিয়া সমুদ্রের সঙ্গে নগরের যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। বিশাল জাহাজ এক্ষণে মাঠের ভিতর দিয়া নগরের মধ্যস্থলে আসিতে পারে। এই খালের নাম Ship Canal এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের এই পাড়াকে বন্দর বলা হয়।

সর্দ্দার বন্ধুর সঙ্গে ডকের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রথমে সর্ব্ব-প্রাচীন মালগুদাম দেখিয়া ক্রমশঃ নূতনতম গৃহগুলি দেখিলাম। এঞ্জি-নীয়ারিং কলা হিসাবে এই ডক ও খালের ভিতর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ঐসকল দিকে লক্ষ্য করিবার বিদ্যা নাই। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র বুঝিয়া লইলাম।

খালের উপর কতকগুলি কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলি খাল-কোম্পানীর অধিকৃত নয়। কো-অপারিটিভ কোম্পানীর ময়দার কল এইখানেই অবস্থিত। এতবড় ময়দার কল বিলাতে আর নাই। এতদ্ব্যতীত একটা সুবৃহৎ তেল-কল এই খালের ধারেই অবস্থিত। শুনিলাম পৃথিবীর ভিতর এতবড় তেলের কারখানা আর কোথাও নাই। মিশর, মাঞ্চুরিয়া ইত্যাদি নানা স্থান হইতে বহুবিধ বীজ এখানে আমদানী হয়। জাহাজগুলি কারখানার ঘাটে আসিয়া দাঁড়ায়। কার-খানার কলের সাহায্যে জাহাজ হইতে মাল উঠান নামান হয়। কাজেই বাজে খরচ অনেক বাঁচিয়া যায়।

গুদাম ঘরগুলির ভিতর দেখিলাম কোথাও রাশি রাশি ফলের বাক্স জমা রহিয়াছে। এগুলি মেডিটারেনিয়্যান বন্দর হইতে আসে। বাল্টিকসাগরের স্কাণ্ডিনাভিয়া উপকূল হইতে কাঠের শাঁস আসিয়াছে। এগুলি কাগজ প্রস্তুত করিবার উপকরণ। তাহা ছাড়া ক্যানাডা হইতে

নানাবিধ ফল, মধ্যআমেরিকা হইতে কলা, করাচি হইতে গোধূম, নরওয়ে হইতে কাঠ, হল্যাণ্ড হইতে কাগজ, টেক্‌স্যাস হইতে তূলা ইত্যাদি নানা আমদানীর পরিচয় পাইলাম। জাহাজ হইতে গোধূম নামাইবার জন্য এক প্রকার কল আছে—তাহার নাম এলিভেটর। সর্দ্দার বলিলেন "ইহা একটা দেখিবার জিনিষ।"

কোন কোন মালগুদাম অর্দ্ধ মাইল লম্বা। এইগুলির দুই একটা দেখিতে দেখিতেই দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

চিড়িয়াখানায় আমোদপ্রমোদ

ম্যাঞ্চেষ্টারে একটি জুলজিক্যাল উদ্যান আছে। ইহা এখানকার একজন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি। এই বাগান হইতে ইনি যথেষ্ট রোজগার করেন। অবশ্য এই উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচও কম হয় না।

জীবজন্তুর সংগ্রহালয় হিসাবে এখানে লক্ষ্য করিবার বিশেষ কিছু নাই। এডিনবারায় দেখিয়াছি প্রত্যেক জানোয়ারকে তাহার স্বাভাবিক বন জঙ্গলময় আবাসস্থল দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। মানুষেরা জানোয়ারগুলি ধরিয়া আনিয়া খাঁচার ভিতর রাখিয়াছে—ইহা তাহাদিগকে বুঝিতে না দেওয়াই কর্ম্মকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য। এজন্য বাগানের ভিতর নদী, পুষ্করিণী, পর্ব্বত, গহ্বর, বনভূমি, তরুলতা ইত্যাদি সৃষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। ঘরের ভিতর পিঞ্জরাবদ্ধভাবে জন্তুগুলি জীবনধারণ করিয়া থাকে। কলিকাতা ও লণ্ডনের জুলজিক্যাল উদ্যানেও এই সস্তা প্রথাই অবলম্বিত।

বাগানে প্রবেশ করিবার জন্য পয়সা দিতে হয়। অন্যান্য স্থানের বাগানেও এই নিয়ম। কিন্তু স্বত্বাধিকারী পয়সা রোজগারের নানা অনুষ্ঠান বাগানের ভিতর সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও একটা কৃত্রিম জঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার ভিতর শিকার করিবার সুযোগ আছে। দেখিলাম বহুলোক এখানে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করা শিখিতেছে। এজন্য উচ্চ হারে মূল্য দিতে হয়। কোন কোন স্থানে সুদীর্ঘ কৃত্রিম সরোবর খনন করা হইয়াছে। নৌকাবক্ষে এবং ষ্টিমলাঞ্চবক্ষে ইহার উপর অসংখ্য নরনারী বিহার করিতেছে।

কোথাও নাচগানের ব্যবস্থা। আজ প্রায় ৫০,০০০ লোক সন্ধ্যা-কালে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। ব্যাণ্ড বাজিতেছে। ইহার স্বরের সঙ্গে তালে তালে প্রায় ১০,০০০ স্ত্রী পুরুষ নৃত্য করিতেছে। বাজনার স্বর এবং নৃত্যভঙ্গী এরূপ যে নাচিবার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করিতে হয় না। যে যেখানে আছে সে সেইখান হইতেই কোন জুড়িদারকে হস্তগত করিয়া নাচিতে আরম্ভ করে। হাঁটিতে হাঁটিতেই নৃত্য স্বরু করা যায়।

স্বাধীন ও নিরুদ্বেগ জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। এতগুলি লোক একসঙ্গে নিরুদ্বেগে নাচগান করিতেছে—এ দৃশ্য যে-সে দেশে দেখিতে পাইব না। এত সহজে বিনা আয়োজনে যখন তখন নাচিবার গাহিবার জন্য প্রস্তুত থাকা নিতান্ত সুখী জনগণের পক্ষেই সম্ভব। চিত্তে দুর্ভাবনা থাকিলে অথবা জীবনে বিষাদ ও নৈরাশ্য থাকিলে কোন জাতি এতগুলি সরলহৃদয় আনন্দপ্রিয় নরনারী তৈয়ারী করিতে পারে না। আমাদের দোল দুর্গোৎসবেও আজকাল এরূপ স্বচ্ছন্দ জীবন ও উল্লাস উচ্ছাস দেখিতে পাই কি? "তেহি নো, দিবসা গতাঃ"!

এই নাচ গানের জন্য পয়সা খরচ করিতে হয় না। হঠাৎ জল বৃষ্টি আরম্ভ হইলে লোকেরা একটা বিশাল গৃহের ভিতর প্রবেশ করে। ইহা এই বাগানের নাচ-ঘর। বাগানের মালিক এই গৃহ ব্যবহারের জন্য পয়সা লন না। নাচ গান এদেশের এত স্বাভাবিক যে জলবায়ুর ন্যায় স্বাধীন ও সস্তা থাকা উচিত এই বুঝিয়াই বোধ হয় নাচঘরের ভাড়া আদায় করা মালিক যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। অন্ততঃ ইহা একটা 'বিজ্ঞাপন'-খরচের অন্তর্গত।

একস্থানে দেখিলাম আমাদের দেশীয় "নাগর দোলা" ঘুরিতেছে। কোন স্থানে কতকগুলি কাঠের ঘোড়ায় বসিয়া বালক বালিকারা বৃত্তা-

কারে দোলসুখ ভোগ করিতেছে। কোথাও বা চেয়ারে উপবিষ্ট বালক-বালিকারা বৃত্তাকারে উঠিতে নামিতেছে। এই সকল বৃত্তাকার গতি আমাদের দেশে মানুষের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়। এখানে দেখিলাম ইলেক্ট্রিক শক্তিদ্বারা চেয়ার বা ঘোড়াগুলি ঘুরান হইতেছে। এই যা প্রভেদ। কিন্তু দুনিয়ার সর্ব্বত্রই কি মানুষের আমোদ প্রমোদ মূলতঃ একরূপ? বাস্তবিক পক্ষে, জাতিতে জাতিতে সাদৃশ্য বেশী কি বৈসাদৃশ্য বেশী? সভ্যতার types বা ছাঁচ লইয়া পণ্ডিতমহলে তর্ক আছে। কিন্তু ছাঁচগুলির ভিতর বোধ হয় বিভিন্নতা অপেক্ষা ঐক্যই

এই ইলেক্ট্রিক "নাগর দোলা"র একটা অভিনব রূপও এখানে দেখিলাম। এক স্থানে ৪ এই সংখ্যার আকারে প্রকাণ্ড মঞ্চ নির্ম্মিত করা হইয়াছে। মঞ্চটা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত—মোটের উপর পাঁচতলা বোধ হইল সর্ব্বোচ্চ তলে একখানা গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গড়াইতে গড়াইতে ইহা ৪ এই সংখ্যার আকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ নিম্ন ভূমিতে উপস্থিত হয়। দেখিলাম এইরূপ ২০।২৫ খানা মোটরকার উর্দ্ধস্তরে উঠান হইতেছে। তাহার ভিতর লোক বসিয়া আছে। ইহারা এই গতির সুখ ভোগে মত্ত। গাড়ীগুলি তড়িতের শক্তিতে চলে।

বিলাতী সঙ্গীত অনেক স্থানেই শুনিলাম। ইংরাজের সামরিক বাজনা এবং গানের সুর বুঝিতে বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। এতদ্ব্যতীত আমোদ প্রমোদ, এবং জনতাগত কোরাস্ অথবা দলবদ্ধ আনন্দ ইত্যাদির প্রকাশক গীতসমূহ সহজেই উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু চিন্তাপূর্ণ গভীর ভাবময় গীতসমূহের সুর ও তাল অনেক সময়েই ধরিয়া উঠিতে পারি না। ইংরাজেরাও বোধ হয় আমাদের হাল্‌কা হাসির গান, টপ্পা, খাম্বাজ ইত্যাদি সহজে বুঝিতে পারেন। রস যতই করুণ ও

গম্ভীর হইতে থাকে ততই বোধ হয় ইহা জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়, ততই বোধ হয় বিদেশীয়ের পক্ষে ইহার মর্ম্ম বুঝা কঠিন হইতে থাকে।

বিলাতী ও হিন্দু পারিবারিক জীবন

একজন পয়সাওয়ালা সওদাগরের গৃহে আজ সন্ধ্যা কাটাইলাম। প্রায় ৪ ঘণ্টা ছিলাম। ইনি ভারতবর্ষে অন্ততঃ ৪০ বার গিয়াছেন। বিগত ৩০ বৎসর হইতে ইনি ভারতবর্ষে কারবার করিতেছেন। পূর্ব্বে কারবারের একজন সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন অক্ষণে অন্যতম মালিক হইয়াছেন।

প্রথমেই বলিলেন, "মহাশয়, যুবক বাঙ্গালীর বিলাতী বিলাস অত্যন্ত বেশী প্রবেশ করিতেছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী দেখিতাম তাঁহাদের ভিতর ব্যবসায়ের উৎসাহ ও ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছি। এক্ষণে সে উদ্যম দেখিতে পাই না। আপনাদের স্যার রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা স্বতন্ত্র। এ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিস্ময়জনক। বিলাতী লোকের সঙ্গে কারবার করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার Senior Partner হওয়া অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক।"

ইনি কলিকাতার কয়েকঘর বড় বড় মহাজনের নাম করিয়া বলিলেন, "ইহাঁরা নূতন নূতন ব্যবসায়ে সাহস করিয়া লাগিয়া যাইতে পারেন না। পুরাতন কারবারে যে লাভ হইয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন। লাভ বাড়াইবার চেষ্টা করেন না—ভয় পাছে লোকসান হয়।" কলিকাতার লাহা, চন্দ্র এবং অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে ইনি বিশেষ পরিচিত এরূপ বুঝিলাম।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ, ইংলণ্ডের সম্পত্তি-বিষয়ক আইন, ইংরাজ-সমাজে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা হইল। ইহাঁরা

নিকট ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতীয় সমাজের গল্প শুনিলাম। বোম্বাইয়ের একজন ধনী ভাটিয়া ইহাঁকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। এজন্য গৃহে ফিরিয়া ভাটিয়া বন্ধুকে স্নান করিতে হইয়াছিল। ইনি মান্দ্রাজে বাস করিবার সময়ে ভৃত্যকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী গৃহে থাকিলেন ইহাঁর কাজকর্ম্ম করিও।" ভৃত্য স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সমস্ত দিন ঘরের ভিতর আবদ্ধ রাখিয়াছিল। ইনি ফিরিয়া আসিলে পর ঘরের চাবি খুলিয়া দেয়! এই গল্প স্ত্রী তাঁহার ভারতভ্রমণ বিষয়ক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

খানিকক্ষণ কথোপকথনের পর সওদাগরপত্নী গৃহসংলগ্ন বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন। কপি, কড়াইশুটি, রুবাব, শাক ইত্যাদি নানা শব্জীর উদ্যান দেখিতে পাইলাম। ইনি বলিলেন, "কাল ৭৮ জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানের তরকারী রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি। নিজ বাগানের জিনিষ বেশী মিষ্টই লাগিয়াছিল।" অনুরোধে কয়েকটা কড়াই শুটি গাছ হইতে ছিড়িয়া খাইলাম। বেশ সুমিষ্ট বোধ হইল।

বাগান দেখিয়া ফিরিলে সওদাগর বলিলেন, "মহাশয়, আমি লেখা-পড়ার ধার ধারি না। তথাপি ২।৪ খানা বই রাখিয়াছি। আসুন আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরী আপনাকে দেখাই।" লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার পুস্তকই দেখিলাম।

পুস্তক দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, "আমার এক পুত্র অক্স্ফোর্ডে ইতিহাস পাঠ করিতেছে। "ইউজেনিক্স্" তাহার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। প্রথম পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়া এক্ষণে ব্যারিষ্টারী করিতেছে। তাহার বিবাহও হইয়াছে। এজন্য সে আজকাল স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করে। তাহাকে বৎসরে ৭৫০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য দিব বলিয়াছি। অবশ্য সে যখন এই পরিমাণ টাকা নিজেই রোজগার

করিতে পারিবে তখন তাহাকে কিছুই দিব না। তবে এখনই যদি ২৫০০৲ নিজে রোজগার করিতে পারে তাহা হইলে অবশিষ্ট ৫০০০৲ মাত্র দিব। যদি ৫০০০৲ পারে তাহা হইলে ২৫০০৲ মাত্র দিব ইত্যাদি। বিবাহ দিবাব সময়ে কন্যার পিতাকে এবং পুত্রকেও এই মর্ম্মে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিয়াছি।"

যথাসময়ে পুত্রকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া ইংরাজ সমাজের রীতি। যৌথপরিবারের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র পরিবারই এদেশের লোকেরা পছন্দ করেন। বাস্তবিকপক্ষে এখানে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গগুলি যথাসম্ভব বিভক্তই দেখিতে পাইলাম। উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীতে ইংরাজেরা বিজ্ঞানে, ব্যবসায়ে, ও রাষ্ট্রে শ্রমবিভাগ-নীতির (Division of Labour) অত্যধিক প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সমাজ এবং পরিবারও এই নীতির বাহিরে থাকিতে পারে নাই। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকে যথাসম্ভব বিভিন্ন বিভাগে বা প্রকোষ্ঠে গণ্ডীবদ্ধ করা ইহাঁদের স্বধর্ম্ম বোধ হইতেছে।

প্রথমতঃ, শিক্ষার কথা ধরা যাউক। বিদ্যাদান ও চরিত্রগঠনের জন্য ইহাঁরা প্রধানভাবে পিতামাতা এবং পারিবারিক প্রভাবের উপর নির্ভর করেন না। যথাসম্ভব অল্প বয়সে বালক বালিকাগণকে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দেওয়াই ইহাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্য। শিক্ষাদানের দায়িত্ব পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া বিশেষজ্ঞগণের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই বর্ত্তমান। হিন্দু স্বভাবতই গুরুগৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বুঝিতে পারে। সেখানে গুরুর পরিবারের ভিতর স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। গোসেবা, রোগশুশ্রূষা, ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালাভ, চরিত্র গঠন ইত্যাদি চলিতে থাকে। পরিবারই

বিদ্যালয় স্বরূপ বিবেচিত হয়। পরিবারের ও বিদ্যালয়ের জন্য দুই প্রকার বিভিন্ন কার্য্য হিন্দুসমাজে বিশ্লেষিত (differentiated) হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সেইরূপ হিন্দুর নিয়মে পরিবারই দেবালয়। সাধারণ পারিবারিক জীবনপ্রবাহের ভিতরেই ধর্ম্মমন্দিরের প্রভাব বিরাজ করে। শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন ভারতসমাজে বেশী দেখিতে পাই না। গৃহ-দেবতা, শালগ্রাম শিলা, শিবমূর্ত্তি, তুলসীগাছ, আকাশ-প্রদীপ, ইত্যাদি ধর্ম্মজীবনের নানা অনুষ্ঠান পরিবারের ভিতরেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কিন্তু ইংরাজসমাজে শিক্ষালয়ের মত দেবালয়ও পরিবার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "চার্চ্চ" শ্রমবিভাগের নিয়মে ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ধর্ম্মঘটিত সকল কর্ম্মই ইহার অধীন। ধর্ম্মকর্ম্ম পারিবারিক অনুষ্ঠানের বহির্ভূত। পরিবারের কাজকর্ম্ম ইহার ফলে অনেকটা সহজ সরল হইতে পারিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয় এবং দেবালয় ব্যতীত ইংরাজ সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও এইরূপে পরিবার হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্যুতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রসেবা, পশুসেবা, জীবে দয়া, লোকহিত, ইত্যাদি সকল প্রকার অনুষ্ঠানের জন্য এখানে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সকলগুলিই পরস্পর স্বাধীন, এবং সাধারণ পারিবারিক জীবন-প্রবাহের সঙ্গে ইহাদের কোনটিরই সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু হিন্দুর পরিবারই সমগ্র বিশ্বের প্রতিকৃতিস্বরূপ। দুনিয়ার সকল পদার্থই ভারতীয় পারিবারিক জীবনে স্থান পায়। দুঃস্থ জনগণের সেবা, মুষ্টিভিক্ষা, অকর্ম্মণ্য আত্মীয়ের পালন, গোপালন গোষ্ঠপ্রতিষ্ঠা, অহিংসা, অতিথি-সৎকার ইত্যাদির জন্য হিন্দুরা পরিবারের কাজকর্ম্ম বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ সমিতির হস্তে দায়িত্ব প্রদান করেন না। "পঞ্চমহাযজ্ঞ" ইহাঁদের গৃহস্থালীর মামুলি অনুষ্ঠান। ইংলণ্ডের পরিবারে স্ত্রী স্বামী এবং শিশুসন্তান ব্যতীত আর কাহারও স্থান নাই। কাজেই অসহায় বা

অকর্ম্মণ্য আত্মীয়-স্বজন অথবা দূর সম্পর্কিত বিধবা বা মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাগণকে পালন করিবার জন্য দেশের ভিতর নানাবিধ সেবা-সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক হয়। Nursing Home প্রতিষ্ঠা করিয়া রমণীদিগকে লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী করান হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিধবা রমণীরা নিজ পরিবারের ভিতরেই সেবাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পান। তাঁহাদিগকে বাহিরে পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না। এজন্য Alms House, Work-house ইত্যাদিও আবশ্যক হয় নাই।

চতুর্থতঃ, উচ্চ সভ্যতার বড় বড় অঙ্গগুলি ছাড়িয়া দিলেও শ্রমবিভাগ-নীতির অত্যধিক প্রবর্ত্তন ইংরাজসমাজে দেখিতে পাই। এমন কি পরিবারের ভিতর রন্ধনকার্য্য, ভোজনালয়ের কার্য্য ইত্যাদিও এদেশে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হোটেল, ক্যাফে, রেস্তরাঁ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এদেশে যৎপরোনাস্তি। স্ত্রী গৃহে রন্ধন না করিলেও পরিবারের অসুবিধা হয় না। বরং হোটেলে গেলে সস্তায় উৎকৃষ্ট খাদ্যই পাওয়া যায়। কাজেই রন্ধনকার্য্য পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া "বিশেষজ্ঞ"গণের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। যাঁহারা গৃহে রন্ধনাদি এখনও করিয়া থাকেন তাঁহারাও অনেক তৈয়ারী মালই হোটেল হইতে ক্রয় করিয়া আনেন। ফলতঃ, রন্ধনশালা ইংরাজগৃহে অতি বিরল।

পঞ্চমতঃ, ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহেই প্রাঙ্গণ বা উঠান থাকে। এদেশে তাহা নাই। নগর-সভ্যতার বিকাশ ঊনবিংশশতাব্দীতে এত বেশী হইয়াছে যে, পারিবারিক লোকালয়ে সামান্য মাত্র ফাঁকা স্থান পাওয়া সুকঠিন। কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের চিত্র মনে রাখিলেই ঊনবিংশশতাব্দীর বিলাতী নগর-সভ্যতা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে। কাজেই এদেশে "পার্ক," উদ্যান, বনভূমি, কৃত্রিম সরোবর ইত্যাদি নগরের

স্থানে স্থানে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এত আগ্রহ। নগরবাসীকে মুক্ত আলো ও মুক্ত বায়ু দান করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। পারিবারিক গৃহগুলি জনগণের খোঁয়াড় বা শয়নগৃহ মাত্র। মাঠে না আসিলে open air ভোগ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। শয়নকার্য্য গৃহে হউক, স্বাস্থ্য অর্জ্জন বাহিরে হইবে;—সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং পরিবারে শ্রমবিভাগ সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের লোকেরা ঘরে বসিয়াই স্বাস্থ্যকর প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিতে পায়। এজন্য মুক্ত বায়ুর আকাঙ্ক্ষা এখানে উৎকট ভাবে দেখা দেয় না। ইংলণ্ডেও যতদিন পল্লীসভ্যতা ছিল ততদিন মিউনিসিপ্যালিটিকে এজন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত না।

গভীরভাবে দেখিলে বুঝিব যে, এক পরিবারকে ভাঙ্গিয়া বিলাতে ২০।২৫ টি স্বস্ব প্রধান প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে পারিবারিক জীবনের ভিতর দিয়াই এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য হইত। মানবজীবন হিন্দুর বিধানেই বৈচিত্র্যময় এবং ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নহে কি?

দশম অধ্যায়

ইংরাজের বিদ্রোহী ভ্রাতা

উত্তর-ওয়েল্‌স্‌

আজ আয়র্ল্যাণ্ড যাত্রা করিলাম। উত্তর ওয়েল্‌সের ভিতর দিয়া য্যাংগ্‌ল্‌সী দ্বীপের প্রান্তে রেল আসিল।

চেষ্টারনগর ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের সীমায় অবস্থিত। চেষ্টারের পশ্চিম হইতে ওয়েল্‌সে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে চলিতে লাগিলাম। আমাদের উত্তরে সমুদ্র, দক্ষিণে পর্ব্বত। গাড়ী হইতে সমুদ্রের কিনারায় দুই তিনটা নাতি বৃহৎ নগর দেখা গেল। যেখানেই লোকালয় দেখিতে পাইলাম সেখানেই সমুদ্রকূলে বেড়াইবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম। পুরীর দৃশ্য মনে পড়িল। এখানে সমুদ্রের মূর্ত্তি অতি শান্ত। গভীরতাও সামান্য মাত্র। সকল স্থানেই বালক বালিকাগণ এবং স্ত্রীপুরুষেরা স্নানবস্ত্র পরিধান করিয়া সাঁতার কাটিতেছে। সমুদ্রের ধারে প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ী চলিল। ইহার ভিতর প্রায় ৫০০ লোককে স্নান করিতে ও সাঁতার কাটিতে দেখা গেল। শেষে শুনিলাম এই অঞ্চল স্নান ও সন্তরণের সুবিধার জন্য প্রসিদ্ধ।

উত্তর ওয়েল্‌সের বড় সহর ব্যাঙ্গরে গাড়ী থামিল না। অধ্যাপক আন্‌উইন বলিয়াছিলেন, এখানে শ্রমজীবীদিগকে শিখাইবার জন্য অতি

সুন্দর আয়োজন আছে। তিনি নিজেই এই আয়োজনে একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রায় ২০০০ ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে এইখানে শিক্ষালাভ করে। লীড্‌স্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানাধ্যাপক ম্যাক্-গ্রেগরও এখানে গ্রীষ্মাবকাশে অধ্যাপনা করিতে আসিয়াছেন।

আর একটা বড় সহর এই পথে পাইলাম। নাম কন্‌ওয়ে। এখান-কার প্রাচীন দুর্গের ভিতর দিয়া রেল চলিল। দুর্গটিই আজকালকার ষ্টেসন। এই দুর্গ মধ্যযুগের সাধারণ গঠন রীতি অনুসারেই নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য দুর্গগুলির নির্ম্মাণকৌশলও এইরূপ।

জাহাজে সমুদ্র পার হইতে প্রায় ১॥ ঘণ্টা লাগে। সৌভাগ্যক্রমে আজ সমুদ্র নিতান্তই নরম। সাধারণতঃ এই সমুদ্র ইংলিশ চ্যানেলের মত তরঙ্গময় থাকে। এই ভয়েই ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে লিভারপুলের পথে না আসিয়া য়্যাগ্‌ল্‌সী দ্বীপের হোলিহেড বন্দর দিয়া যাইতেছি। লিভারপুল হইতে ডাব্লিন যাইতে হইলে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা কাল সমুদ্রে থাকিতে হয়।

জাহাজ ডাব্‌লিন গেল না। কিংসটাউন বন্দরে আসিল। বন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমুদ্র হইতে পর্ব্বতপ্রাচীর ও নগরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। সমস্ত নগরটাকে সমুদ্রকূলস্থিত পর্ব্বত-দুর্গ বোধ হয়।

কিংস্‌টাউন বন্দর হইতে ডাব্‌লিন সহরে পৌঁছিতে ১৫ মিনিট লাগিল। রেল আছে।

আইরিশ জাতির বেদনা

ডাব্‌লিন নিতান্তই দরিদ্র নগর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য এখানে দেখিতে পাইতেছি না। না অট্টালিকার গৌরব, না শিল্পসম্পদ, না ব্যবসায়-বৈভব। রাস্তাঘাট দুই একটা বড় বড় আছে সত্য কিন্তু সবই যৎপরোনাস্তি অপরিস্কার। সর্ব্বদা ধূলা উড়িতেছে—গাড়ী ঘোড়ার ময়লাও বোধ হয় রাস্তা হইতে প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় না। বড় বড় রাস্তায় ট্রাম পথ নির্ম্মিত হইয়াছে—কিন্তু মটরকার এ সহরে নাই বলিলেই চলে। লোকজনের গতিবিধি এতই অল্প। কলিকাতা ও বোম্বাই অপেক্ষা ডাব্লিন এ হিসাবে বহু নিম্নে বোধ হইতেছে।

লীড্‌স্ ও ম্যাঞ্চেষ্টার নগরদ্বয়ে সৌন্দর্য্য নাই—আগাগোড়া মালগুদাম, কারখানা বা হোটেল ও প্রয়োজনীয় দোকানগৃহ এবং শ্রমজীবী-"স্লাম"। বাড়ীগুলি সবই আফিসী কায়দায় নির্ম্মিত—কলের ধূমে নূতনতম গৃহ-সমূহও দুই তিন বৎসরের ভিতর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সহরের যে দিকেই যাইতাম সর্ব্বত্র একটা ঘন মেঘের আবরণ লক্ষ্য করিতাম—প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইতে জীবনের সৌষ্ঠবগুলি নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ধনসম্পদের আকর স্বরূপ ল্যাঙ্কাশিয়র ও ইয়র্কশিয়র হইতে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান নগরে পদার্পণ করিয়া আইরিশ জাতির দারিদ্র্য অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছি।

সাম্রাজ্য হিসাবে ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড এক-পরিবারভুক্ত-রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাজ্যের যে কোন অংশে আমরা একই প্রকার

সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা দেখিবার আশা করিতে পারি। বস্তুতঃ বুঝিতেছি এ আশা নিতান্তই অমূলক। ইংরাজের জন্মভূমি, স্কচজাতির জন্মভূমি এবং আইরিশের জন্মভূমি সত্য সত্যই তিনটি স্বতন্ত্র দেশ। ল্যাঙ্কাশিয়র, অক্সফোর্ডশিয়ার বা কর্ণওয়ালকে ইংরাজজাতির স্বদেশের বিভিন্ন অঙ্গ বিবেচনা করা যাইতে পারে কিন্তু স্কটল্যাণ্ড বা আয়র্ল্যাণ্ডকে সেই হিসাবে এক দেশের বিভিন্ন অংশ বিবেচনা করা অসম্ভব। ইংরাজেরা জন্মভূমি বলিলে ইংলণ্ডকেই বুঝিয়া থাকেন—স্কটল্যাণ্ড বা আয়র্ল্যাণ্ডকে তাহার অন্তর্গত ভাবেন না। United Kingdom বা যুক্তরাজ্য একটা কাল্পনিক দেশ, রাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রিত দেশসমষ্টি —বাস্তবিক পক্ষে কোন জাতিবিশেষের স্বদেশ নহে। আইরিশেরা তাঁহাদের শ্যামাঞ্চলা Emerald Isle কেই দেশমাতা জ্ঞানে পূজা করেন—স্কচেরাও Caledonia কেই জন্মভূমি বিবেচনা করেন।

সমাজের পার্থক্য, ভাষা ও সাহিত্যের পার্থক্য, রীতিনীতির পার্থক্য ইত্যাদি পার্থক্য ত আছেই। কেবল তাহাই নহে, আর্থিক এবং বৈষয়িক অবস্থার পার্থক্যও যৎপরোনাস্তি। এই জাতিত্রয় এক পরিবারের তিন কন্যা বা তিন ভগ্নী কখনই হইতে পারে না। আয়র্ল্যাণ্ড ইহাদের মধ্যে দরিদ্রতম। ঐশ্বর্য্যশালী যুক্ত রাজ্যের ভিতর দরিদ্রতম অঙ্গ বলিলে হয় ত আয়র্ল্যাণ্ডকে দরিদ্র বিবেচনা করা কঠিন হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশসমূহ অপেক্ষা আয়র্ল্যাণ্ড দরিদ্র—ডাব্‌লিন ইউরোপের দরিদ্রতম নগর। কাজেই আয়র্ল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়া অবধি ইংরাজের জন্মভূমি হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছি বলিতে বাধ্য। এখানে ইংরাজের ভাষা ও সাহিত্য পাইতেছি—কিন্তু ইংরাজের গৌরব ও ঐশ্বর্য্য পাই না।

ইহার কারণ আছে, আয়র্ল্যাণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে একটা বিজিত দেশ। আমরা জানি, আয়র্ল্যাণ্ডের লোকেরা লণ্ডনের মহাপার্ল্যামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, আয়র্ল্যাণ্ডের লোকেরা জগদ্ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যে সহায়তা করিবার অধিকারী। আমরা শুনিয়াছি, ওয়েলিংটন হইতে রবার্টস্ কিচেনার পর্য্যন্ত বড় বড় সেনাপতিরা আইরিশ জাতি সম্ভূত। এমন কি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আইরিশ সন্তানের কৃতিত্ব ইংরাজ সন্তানের গৌরবকে হীনপ্রভ করিয়াছে। তথাপি বলিব, আয়র্ল্যাণ্ড পরাধীন দেশ, আয়র্ল্যাণ্ডের লোকেরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন যে তাঁহারা বিজিত জাতি। পরাধীনতার সকল ফলই আয়র্ল্যাণ্ডে দেখা দিয়াছে।

১৮০০খ্রীষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় যোগ স্থাপিত হয়। তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযোগে এবং আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযোগে আকাশ পাতাল পার্থক্য। স্কচেরা ইংরাজদিগের সঙ্গে মিলিত হইবার সময়ে নিজেদের সকল প্রকার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বজায় রাখিয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় স্কচনেতৃগণ তাহার যথেষ্ট আয়োজন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগস্থাপন ব্যাপারে আইরিশ জাতির কোন ব্যক্তিই দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। দুই পক্ষে যথোচিত কথাবার্ত্তা, দরদস্তুর, কষাকষি করা হয় নাই। খরচপত্রের কথা, রাষ্ট্র শাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিবার জন্য সময় ব্যয় করা হইতে পারে নাই। তখন নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরাজের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। ফরাসীরা আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। ভয়ে ও হুজুগে

পড়িয়া ইংরাজসচিব পিট্ যেন তেন প্রকারেণ আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংলণ্ডের সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। বাস্তবিকপক্ষে আয়র্ল্যাণ্ড ইংরাজের দখলে আসিল। কাজেই আইরিশজাতির মতামত গ্রহণ করিবার প্রয়োজনই হয় নাই। ইংরাজের ভারতাধিকারে এবং আয়র্ল্যাণ্ডাধিকারে প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছুই নাই।

ফরাসী জুজুর ভয় অল্পকালের ভিতরই নিবারিত হইয়াছিল। তার-পর এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিনেও ইংরাজ বিজেতারা আয়র্ল্যাণ্ডকে "আমার জন্মভূমি"র অন্তর্গত বিবেচনা করিতে পারেন নাই। ল্যাঙ্কাশিয়ারের তাঁতীদের স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য ভারতবর্ষে ইংরাজেরা যে শিল্প-নীতি ও ব্যবসায়-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আয়র্ল্যাণ্ড সম্বন্ধেও অবিকল সেই নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। একসঙ্গে ভারতবর্ষে ও আয়র্ল্যাণ্ডে একই প্রকারে শিল্পের ও ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধন করা হইতেছিল।

হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় নরনারীকে ইংলণ্ডের নব্য শিল্পীকুল ভ্রাতা ও ভগিনী বিবেচনা করিতে পারেন নাই। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আইরিশ নরনারীকেও যে ঊনবিংশশতাব্দীর ইংরাজ বণিক্ ও মহাজনেরা স্বজাতীয় বিবেচনা করেন নাই—ইহাই বিস্ময়ের কথা। বরং সকল বিষয়ে আয়র্ল্যাণ্ডকে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে বাধা প্রদান করাই ইংরাজ ব্যবসায়ী এবং সচিবগণের নীতি রহিয়াছিল।

ঊনবিংশশতাব্দীর কথা ছাড়িয়া দিলাম। মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, আইরিশ ও ইংরাজ জাতিদ্বয়ে চিরকাল ভক্ষ্য ভক্ষকের সম্বন্ধ রহিয়াছে। দ্বাদশশতাব্দীর দ্বিতীয় হেন্‌রি হইতে ষোড়শশতাব্দীর অষ্টম হেন্‌রি পর্য্যন্ত ইংরাজরাজেরা আইরিশ ধর্ম্ম, সমাজ, রীতিনীতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি ধ্বংস করিতে যত্নবান

ছিলেন। সেই আমলে "Killing an Irishman was reckoned no crime." যে কোন ইংরাজ যে কোন আইরিশকে হত্যা করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আইরিশদিগের জমি জমা কাড়িয়া লইতে পারিলে ইংরাজেরা প্রশংসিত হইত। আইরিশজাতির সঙ্গে ইংরাজ-জাতির বিবাহ সম্বন্ধও আইন দ্বারা নিবারিত হইত। আইরিশদিগের জাতীয় ক্রীড়াকৌতুক, ব্যায়াম, বেশভূষা, আমোদপ্রমোদ, নামকরণ, ভাষাব্যবহার ইত্যাদির বিরুদ্ধেও কঠোর আইন জারি করা হইয়াছিল। তার পর অষ্টম হেন্‌রির আমল হইতে ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলন আরব্ধ হয়। আইরিশেরা রোমান-ক্যাথলিক। এই ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে নব্য প্রটেষ্টান মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা হইল। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ-রাজেরা আয়র্ল্যাণ্ডের ধনীসম্প্রদায়ের সম্পত্তি কড়িয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্থানে ইংলণ্ড হইতে নূতন জমিদার পাঠান হইত। এইরূপে একাধারে ধর্ম্মনাশ, সম্পত্তিনাশ এবং জাতিনাশ সাধন করা হইতেছিল। আল্‌ষ্টার প্রদেশে ইংরাজ ভূম্যধিকারীর উৎপত্তি এই যুগে ঘটিয়াছিল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক-পত্নী গ্রীণ তাঁহার Irish Nationality নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Chiefs were made to draw and carry, to abase them before the tribes. Poets and historians were slaughtered, and their books and genealogies were burned, so that no man might know his own grandfather, and all Irish men be confounded in the same ignorance and abasement, all glories gone, and all rights lost. The great object of the Government was to destroy the whole tradition, wipe out the Goelic memories and begin a new English life."

একটা জাতিকে সমূলে সর্ব্বনাশ করিবার উপায় এরূপ ভাবে অন্য কোন দেশে অবলম্বিত হইয়াছে কি? সভ্য মানবের ইতিহাসেও কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে স্পেনের লোকেরা পেরু ও মেক্সিকো এই উপায়েই দখল করিয়াছিলেন! প্রেস্কটের গ্রন্থাবলী তাহার নজির।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজজাতির জন্মভূমিতে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সাধিত হইল—বিদেশীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। তখন হইতে অষ্টাদশশতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংরাজেরা অন্য উপায়ে ধ্বংস করিতে প্রয়াসী ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেকি বলিতেছেন, "Protestants then began to find that they were as little thought of as Catholics. The suppression of the woollen trade brought ruin upon twelve thousand Protestant families in Dublin and thirty thousand in the rest of the country; by her commercial laws England deliberately crushed the prosperity of the Protestant colony of Ireland."

বিজ্ঞান ও শিল্প-বিপ্লবের যুগ তখনও আরব্ধ হয় নাই—ইংলণ্ডের নব্য শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা তখনও দুনিয়ার ভিতর নূতন নূতন বাজার পাইবার জন্য লালায়িত হয় নাই। তথাপি আয়র্ল্যাণ্ডের পশম ব্যবসায়, পশু ব্যবসায় ইত্যাদি ধ্বংস করা হইল। কাজেই যখন ঊনবিংশশতাব্দীর শিল্পবিপ্লব আসিল তখন আয়র্ল্যাণ্ডের নাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে এক-প্রকার মুছিয়া গেল। ঊনবিংশশতাব্দীতে যে শক্তি ও সুযোগের ফলে ইংরাজের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ বাড়িয়াছে সেই সমুদয়ের ফলেই আইরিশের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা সেই পরিমাণেই বাড়িয়াছে। ইংরাজের অভ্যুদয়ের

অপর দিক আইরিশের অবসাদ। আজ আয়র্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। এই সময়ের ভিতরেই কিন্তু ইংরাজজাতির লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান আন্দোলন বুঝিতে হইলে এই কথাগুলি মনে রাখা আবশ্যক। তাহা হইলেই "Englands' Wealth Ireland's Poverty" নামক গ্রন্থের প্রচার বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রন্থের লেখক একজন পার্ল্যামেণ্ট-সভ্য। গ্লাডষ্টোনের আমলে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়—তিনি ইহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে Miss Murray প্রণীত "History of the Commercial Relations of England and Ireland" নামক গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে The New Birth of Ireland নামক গ্রন্থে বেডমণ্ড-হাওয়ার্ড লিখিয়াছেন, "Some such volume was badly needed to point out what waste must have gone on to turn one of the richest and most industrious nations into one of the poorest, and that at the very door of the greatest market of the world."

ঐতিহাসিক ফ্রুড (Froude) ও বলিতেছেন, "The English deliberately determined to keep Ireland poor and miserable as the readiest means to prevent it being troublesome. They destroyed Irish trade and shipping by navigation laws. They extinguished Irish manufactures by differential duties. They laid disabilities even on its wretched agriculture for fear that Irish importations might injure the English farmer."

অষ্টাদশশতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবসায়-নীতির প্রভাবে

আয়র্ল্যাণ্ডের ক্ষতি হইয়াছে। তাহার পর Union বা সংযোগের যুগ। এই যুগে অন্যান্য ফল যাহাই হউক আয়র্ল্যাণ্ডের রাজস্ববিভাগ এবং শাসন ব্যবস্থা অত্যন্তই শোচনীয় ধরণের ছিল। আজ কাল আইরিশ জাতির যে সকল দুঃখ কষ্ট বিবৃত হয় তাহার মধ্যে এই রাজস্ব-ব্যবস্থা অন্যতম। আয়র্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বীরেরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ধর্ম্ম, শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অত্যাচারের কাহিনী ভুলিয়া গেলেও কেবলমাত্র রাজস্ব-বিভাগের কুনিয়মসমূহ সংশোধন করিবার নিমিত্তই আয়র্ল্যাণ্ডে Home Rule বা স্বরাজ প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে Royal Economic Society এর সভায় গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের রাজস্ব-সমস্যা সম্বন্ধে কতিপয় ধুরন্ধর ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেগুলি "The Fiscal Relations of Great Britain and Ireland" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজস্ববিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইলে আইরিশ জাতি 'স্বরাজ' পাইয়া সুখী হইবে না—ইহাই এই গ্রন্থের মর্ম্ম।

শ্রমজীবি-সমস্যা।

বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডের ন্যায় আয়র্ল্যাণ্ডেও শ্রমজীবি-সমস্যা রহিয়াছে —বরং বেশী হইবার কথা। ইংলণ্ডের পথে ঘাটে কোন দরিদ্র বালককে নগ্নপদ দেখি নাই। ডাব্লিনের সকল রাস্তায়ই ভিখারী বালক খালি-পায়ে ঘুরিতেছে। সেদিন ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা বলিয়া-ছিলেন, "মহাশয়, একটা সুখের সংবাদ দিতেছি। কাল হীটন-উদ্যানে পীয়ার্সন-ফাণ্ড-সমিতির ব্যয়ে দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে খাওয়ান দাওয়ান হইয়াছে। আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম দশহাজার ছাত্রের ভিতর মাত্র ১০।১২ জনের পায়ে মোজা ছিল না।" ম্যাঞ্চেষ্টারে ও ডাব্লিনে বামুন শূদ্র তফাৎ। দুইশত আড়াইশত মাইল ব্যবধানে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান! ধনী ইংরাজের ধন-কেন্দ্রের সঙ্গে দরিদ্র ডাব্লিনেব তুলনা চলিতে পারে না।

ডাব্লিনে শ্রমজীবী সমাজের মাবাপ স্বরূপ একব্যক্তিব সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি আজকাল সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সুপরিচিত। দরিদ্র জন-গণের সুখ ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এজন্য ঘটনাচক্রে ইহাঁকে জেল খাটিতেও হইয়াছে। জেল খাটিবার পর ইহাঁর প্রভাব চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। আজ ইনি র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডো-ন্যাল্ড, লয়েড জর্জ্জ ইত্যাদি রাষ্ট্র-বীরগণের সমকক্ষ।

ইনি স্বয়ং শ্রমজীবি—জাহাজের খালাশী। ডাব্লিনের খালাশী "ট্রেড ইউনিয়নে"র কর্ণধার রূপে এক্ষণে জীবনযাপন করিতেছেন। খালাসী-দিগের জীবন যথাসম্ভব সুখময় করিয়া তুলিবার জন্য ইহাঁর সময় প্রযুক্ত

হইয়া থাকে। দেখিলাম খালাশী-সমিতির জন্য সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে। ইহার ভিতর ক্লাব, লাইব্রেরী, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র, কৃষিভূমি ইত্যাদি রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালে বহুলোক এই গৃহে ও মাঠে বেড়াইতে আসিয়াছে। জাহাজ-ঘাটার কর্ম্মাবসানের পর ইহারা কেহ খেলিতেছে কেহ গাহিতেছে, কেহ ব্যায়াম করিতেছে। নাচ গানের জন্য ব্যবস্থাও আছে। প্রকাণ্ড খোলাভূমিতে এই সমুদায় কার্য্য চলিয়া থাকে। কর্ম্মবীর লার্কিন যথাসম্ভব উদ্যোগ করিতেছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় আন্দোলন, আইরিশসমাজ, কেল্টিক জাতি ইত্যাদি নানাবিষয়ে ইহাঁর সঙ্গে গল্প হইল। ইনি বলিলেন, "আল্‌ষ্টার-সমস্যা বাস্তবিক পক্ষে মহাজন-সমস্যা মাত্র। ইহার ভিতর রাষ্ট্রনীতি, বা ধর্ম্ম-সমস্যা কিছুই নাই। আল্‌ষ্টারের লোকেরা ল্যাঙ্কাশিয়ারের ব্যবসাদারগণের ন্যায় শ্রমজীবি-সমাজের বিরুদ্ধপক্ষ। আয়র্ল্যাণ্ডে স্বরাজ স্থাপিত হইলে ধনী মহাজনদিগকে উচ্চহারে কর দিতে হইবে এই ভয়ে আল্‌ষ্টার ওয়ালারা আইরিশ জাতির শত্রু হইয়াছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি মহাশয়, আজকাল Socialist রাষ্ট্রের আদর্শে ইংলণ্ডে কার্য্য হইতেছে না কি? ম্যাঞ্চেষ্টার, লীড্‌স্ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই ত ইহা দেখিলাম। ধনী মহাজন এবং ভূম্যধিকারীদিগের স্বার্থ কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া পার্ল্যামেণ্ট, কাউণ্টি-কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যালিটি নূতন নূতন আইন করিতেছেন। ধনবানেরা এই সকল আইন মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।" ইনি বলিলেন, "আয়র্ল্যাণ্ডের আল্‌ষ্টারে সে সব আইন এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।"

ডাব্‌লিনে একটা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, ইত্যাদি নানা বিষয়ের তথ্য প্রদর্শিত হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, এবং নগরনির্ম্মাণ এই তিন শ্রেণীর বস্তুই

বিশেষরূপে সংগৃহীত। এজন্য প্রদর্শনীর নাম Civic Exhibition. আয়র্ল্যাণ্ডের লাট সাহেব অধ্যাপক গেডিজের বন্ধু। গেডিজের পরামর্শেই এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে।

এডিনবারার "আউটলুক টাওয়ারে" নগর-বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল বস্তু দেখিয়াছি এখানে সেই শ্রেণীরই বহু পদার্থ দেখিলাম। গেডিজের একজন শিষ্য বলিলেন, "যতগুলি ছবি, চার্ট ও মানচিত্র দেখিতেছেন সকলগুলি লম্বা করিয়া সাজাইলে এক মাইল হইবে। এই গুলির কোন কোনটা গত বৎসর বেল্‌জিয়ামের সিভিক্ প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। ডাব্‌লিন হইতে কতকগুলি ভারতবর্ষে পাঠান হইবে।" এবার মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিমন্ত্রণে গেডিজ সেখানে সিভিক প্রদর্শনী খুলিবেন। গেডিজ এই বস্তুসমূহ মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে বোম্বাই নগরে লইয়া যাইবেন। ঐ দুই নগরেও "সিভিক প্রদর্শনী"র ব্যবস্থা করা হইতেছে।

নগর-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসীদের এখন বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে শ্রমজীবি-সমাজের জন্য আবাস নির্ম্মাণ আজকাল একটা সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। ফ্যাক্টরী-সভ্যতার প্রভাবে নগরের অস্বাস্থ্য, অকাল মৃত্যু, মুক্ত বায়ুর অভাব ইত্যাদি দোষ ইউরোপে উনবিংশশতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। এই জন্যই সম্প্রতি বিশেষ ভাবে এদেশে Town Planning, Housing ইত্যাদির প্রতি গবর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়িতেছে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে এ সমস্যা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিলাতী আদর্শে মিউনিসিপ্যালিটি ও রাজধানী স্থাপনের ফলে ভারতের সর্ব্বত্রই জেলায় জেলায় এই দুরবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংরাজের ধনশক্তি এবং ফ্যাক্টরী-শক্তি আমাদের নাই। অথচ তাঁহাদের দোষগুলি আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। কাজেই আধুনিক

ভারতবাসীকে গৃহ-সমস্যা, নগর-সমস্যা, এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার মীমাংসাও করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য বিলাতী ব্যাধির বিলাতী প্রতীকারই গ্রহণ করিতে হইবে। সরকার রোগ আনিয়াছেন—সরকারই তাহার চিকিৎসকও আনিতেছেন। যাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটি দিয়াছেন তাঁহারাই এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটির দোষ-সংস্কারকও দিতেছেন! এজন্য প্যাট্রিক গেডিজ ভারতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

সে যাহাহউক, নগর-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক বিভাগ হইতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিকগণের বহু তথ্য শিখিবার আছে। গেডিজের আলোচনার ফলে আমাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারীদিগের দৃষ্টি সেইদিকে যাইতে পারিবে। নগর-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিলে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ইতিবৃত্ত প্রণয়নে নূতন কতকগুলি সুযোগ সৃষ্ট হইবে। এ হিসাবে গেডিজের ভারতগমন শুভসূচক।

আয়র্ল্যাণ্ডে অসংখ্য দলাদলি। ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে যে সকল দলাদলি আছে তাহা ত এখানেও আছেই। অধিকন্তু অবনত পরাধীন জাতির সঙ্কীর্ণতা, রেষারেষি, ও পরশ্রীকাতরতা আইরিশ চরিত্রকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিতেছে। এখানে কোন অনুষ্ঠানেই সমগ্র জাতির সহানুভূতি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। একদল যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন অপর দল তাহার বিরোধী হন। এইরূপে আয়র্ল্যাণ্ডের সমাজ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সমস্ত দ্বীপের ভিতর মাত্র ৪৩ লক্ষ নরনারীর বাস! আমাদের এক ময়মনসিংহ জেলার লোক-সংখ্যা আয়র্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার দেড় গুণ অপেক্ষাও বেশী।

ডাব্‌লিনে "সিভিক্ প্রদর্শনী" হইতেছে। কিন্তু আইরিশ জাতির

সহানুভূতি ইহাতে নাই। গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে ইহার আয়োজন করা হইয়াছে। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা ইহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা,—লাটসাহেব স্বয়ং প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। কাজেই স্বরাজাকাঙ্ক্ষী ন্যাশন্যালিষ্ট দল প্রদর্শনীকে 'বয়কট' করিয়াছেন। ১৯০৭ সালের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীকেও এইরূপ কারণেই বাঙ্গালীরা বয়কট করিয়াছিলেন।

ডাবলিন মিউজিয়ামে প্রাচীন কেল্‌টিক সভ্যতা

আজ ডাব্‌লিনের মিউজিয়াম দেখিলাম। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই এই গৃহ। সাধারণ সংগ্রহালয়ে যে সকল বস্তু দেখা যায় এই মিউজিয়ামেও সেই সমুদয়ই দেখিলাম। জীবজন্তু, উদ্ভিদ্, কৃষি, যন্ত্র, নৃতত্ত্ব, বিদ্যালয়ের উপকরণ, প্রস্তর, ধাতু, প্রাচীন ঐতিহাসিক পদার্থ, মূর্ত্তি এবং অন্যান্য সকল প্রকার শিক্ষাপ্রদ বস্তু এই সংগ্রহালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার মিউজিয়াম অপেক্ষা ইহার ভিতর বেশী জিনিষ আছে বোধ হইল। কিন্তু গ্লাসগো এবং এডিনবারার মিউজিয়ামে নব্যশিল্প ও বিজ্ঞান-বিভাগে যত প্রকার নিদর্শন দেখিয়াছি ডাব্‌লিনে তাহার পরিচয় পাই না। ডাব্‌লিনের মিউজিয়াম ভারতবর্ষের কোন নগরে অবস্থিত থাকিলেও এক প্রকার মানাইয়া যাইত। কারণ আধুনিক ইউরোপের আবিষ্কার-গুলি এই সংগ্রহালয়ে যত্নসহকারে রক্ষিত হয় নাই। অষ্টাদশশতাব্দীর ইউরোপীয় নগরে যে সকল পদার্থ সংগৃহীত হইতে পারিত এখানেও প্রায় সেই সমুদয়ই দেখিতেছি।

অবশ্য উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু বিভাগে এমন কতকগুলি বস্তু দেখিলাম যাহা ভারতবর্ষে দেখা যায় না। তাহা ছাড়া প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য-বিষয়ক সংগ্রহাবলীও ভারতবাসীর নিকট নূতন ও শিক্ষাপ্রদ বোধ হইবে। এতদিন যে সকল সংগ্রহালয় দেখিয়াছি তাহাতে প্রাচীন কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শন নজরে পড়ে নাই। সেগুলি দেখিয়া থাকিলেও

তাহাদের প্রতি মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। আজ কেল্টিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী কেল্টিক গৌরবের প্রচারক আইরিশজাতির জীবনকেন্দ্রে বাস করিয়া সেগুলি দেখিবার ও বুঝিবার জন্য আগ্রহ হইল।

আয়র্ল্যাণ্ডের খাঁটি কেল্টিক যুগ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ৮০০ বৎসরের কথা। তখন আয়র্ল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টীয় পঞ্চম (৪৫০) শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইতে নবমশতাব্দীতে দিনেমার আক্রমণ পর্য্যন্ত ৪০০ বৎসরের কথা। এই যুগে আয়র্ল্যাণ্ড ইউরোপের সভ্যতাকেন্দ্র ও শিক্ষালয় ছিল। আয়র্ল্যাণ্ডে অসংখ্য ধর্ম্ম-মন্দির, বিদ্যামন্দির ও মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল কেন্দ্র হইতে দলে দলে ধর্ম্মপ্রচারক ও অধ্যাপক বহির্গত হইয়া জার্ম্মাণি সুইজর্লাণ্ড এবং ইতালী পর্য্যন্ত জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেন। ইউ-রোপের সুদূরপ্রান্ত হইতেও অসংখ্য শিক্ষার্থী আসিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। এই যুগকে নব্য আইরিশ জাতি তাঁহাদের "সত্যযুগ" বিবেচনা করেন। এই যুগে স্কটল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডও আয়র্ল্যাণ্ডের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। তাহার পর দিনেমারেরা দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করে—অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংরাজেরা আয়র্ল্যাণ্ড দখল করেন। কিন্তু কেল্টিক সভ্যতা কোন দিনই সম্পূর্ণ-ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই।

যাহাহউক, ডাব্‌লিন মিউজিয়ামে সেই কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শন-গুলি দেখিতে যত্নবান্ হইলাম। প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অঙ্গভূষণ প্রথম দ্রষ্টব্য। এইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে রোমীয়, মিশরীয় এবং স্কাণ্ডিনাভীয় অলঙ্কারগঠনরীতি হইতে

কেণ্টিক-রচনাকৌশলের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। এই স্বাতন্ত্র্য একবার বুঝিয়া লইলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনে কেণ্টিক জাতির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয়।

অধিকন্তু প্রাচ্য জগতের শিল্প, ব্যবসায় ও সাহিত্য ইতালীর ভিতর দিয়া কেণ্টিক সভ্যতা গঠনের জন্য কতখানি উপকরণ জোগাইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আজ ইউরোপের সর্ব্বপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন কেণ্টিক সভ্যতার শেষ নিদর্শন বর্ত্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টীয় নবম-শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সভ্যতার প্রভাবে ইউরোপের বহু জনপদ নিয়ন্ত্রিত হইত। সম্ভবতঃ তখন এশিয়াবাসীর সঙ্গে কেণ্টিক জাতির আদান-প্রদান সহজেই সাধিত হইত। সেই আদানপ্রদানের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই।

তাহার পরবর্ত্তী যুগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। প্রাচীনকালে এশিয়া ও ইউরোপের ব্যবসায়সম্বন্ধ ও ভাববিনিময় বড় কম ছিল না। আজ যাহারা সভ্যজগতের নিতান্ত নগণ্য প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে তাহারাই তখন সমগ্র মানবজগতের ঐক্যপ্রতিষ্ঠাতা এবং আদানপ্রদান প্রবর্ত্তক বণিক স্বরূপ ছিল। Guide to the Celtic Antiquities of the Christian Period (Dublin, 1910) নামক গ্রন্থে Coffey স্কাণ্ডিনাভীয় জাতিসম্বন্ধে বলিতেছেন,—We usually think of the early Vikings and Danes as simply plunderers; but this is erroneopys. There was a considerable trading side to the Vikings life. In the isle of Gotland was an important centre of eastern trade established by the Vikings, where from the close of the ninth century trade intercourse was opened across Russia to the countries

adjoining the Caspian Sea and the Eastern Mediterranean. In this way oriental goods and large quantity of silver were brought to the Swedish and Danish lands; thence they were conveyed to Britain and Ireland in the track of the Viking expeditions. The large number of oriental coins found with these deposits (many thousands have been found in Gotland) are thus accounted for. Much of the silver imported was re-worked by Northern Craftsman into characteristic ornaments, but many of the objects are attributed to an eastern origin."

মিউজিয়ামের সংগৃহীত কেল্টিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম সম্পর্কিত পদার্থই অনেক দেখিলাম। ক্রুশ, পুরোহিতের যষ্টি, কৌটা, বাক্স বা ঢাকনা, পেয়ালা, ঘণ্টা এবং আরও নানাপ্রকার ধর্ম্মজীবনের নিদর্শন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বৈষয়িক জীবনেরও কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। হাঁড়ী, কলসী, বগলস্, পুস্তকাধার, ছুরি, জুতা, মল, চিত্রিত হাড, বাল্তি বা জলপাত্র, তরবারি, নৌকা, প্রস্তরদীপ, জাঁতা ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যের সংগ্রহ দেখিলাম। এই সকল বস্তুর নির্ম্মাণে উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কেল্টিক সভ্যতার নিদর্শনগুলি বিশেষরূপে দেখিয়া অন্যান্য ঘরে অল্পক্ষণ কাটাইলাম। এক গৃহের গলিতে দেখিলাম দুই দেয়ালে Bayeux Tapestry ঝুলান রহিয়াছে। লম্বা পটে নরম্যানদিগের ইংলণ্ড অধিকার বুঝাইবার জন্য এই সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। চিত্রহিসাবে এই সমুদয়ের ভিতর কোন কারিগরী নাই। সেই যুগের বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা, এবং বেশভূষা, সংগ্রামসজ্জা, শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদি বুঝিবার

পক্ষে ইহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। ইংরাজরাজ হ্যারল্ড কিরূপ জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নর্ম্যাণ্ডিতে গিয়াছিলেন, এবং নরম্যান্‌ডিউক উইলিয়ামই বা কিরূপ জাহাজে সৈন্য পার করিয়া, ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার সমসাময়িক চিত্র দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া আমাদের অজন্তাচিত্রে (খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০) বঙ্গবীর বিজয়রাজের সিংহল যাত্রার দৃশ্য মনে পড়িল। আজকালকার সমুদ্রপোতের তুলনায় যাঁহারা এই প্রাচীন বস্তুগুলি দেখিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারা হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। অথচ এই সমুদয় খেলানার জাহাজেই তখনকার লোকেরা উত্তাল সমুদ্র পার হইত—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। প্রাচীনকালে মানবের সাহস অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তা বর্ত্তমান অপেক্ষা বেশী ছিল না কি ?

Bayeux Tapestry চিত্রাবলীর দুই এক স্থানে দেখিলাম উইলিয়ামের আদেশে নরম্যান কাঠুরিয়ারা কাঠ চিরিতেছে। ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য জাহাজ তৈয়ারী হইবে। কাঠ কাটার ভঙ্গী দেখিলে নিম্নলিখিত বিবরণ সহজবোধ্য হয়। "Some light is thrown on the growth of the ship-building industry of Gaur by an old Bengali ms. a poem, called Manasamangala, by Jagajjivana. The merchant Chand Saodagar summons to his presence the master-crafts-man named Kusai, and orders him to build for him fourteen boats at once. Forthwith goes Kusai with his many apprentices to the forest, where he fells all kinds of trees for materials to build the various parts of the boats with.

"শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি
কাটিল নিম্বের গাছ গাম্ভারি পারলি।

আম্র কাঠাল কাটে কাটয়ে বকুল
চম্পা খিরনি কাটি করিল নির্ম্মূল ॥
চিরিয়া করিল ফালি লক্ষ তিন চারি।"

("Indian Shipping")

বঙ্গ সাহিত্যের এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার প্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে বাঙ্গালী জাতিকে উপহাস করিয়াছেন। তিনি Bayeux Tapestry এর নৌবিদ্যাবিষয়ক চিত্র-গুলি অথবা ইউরোপীয় মধ্যযুগের বিভিন্ন জাহাজের চিত্রসমূহ দেখিলে ইউরোপীয়দিগকে পাগল বিবেচনা করিবেন। কারণ আধুনিক বিবেচনায় এগুলিকে জাহাজ বলাই যাইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানের মাপকাঠি যে প্রাচীন সভ্যতার বিচারে আদৌ প্রযোজ্য নয়—একথা ঐতিহাসিক মাত্রের প্রথম জ্ঞাতব্য তত্ত্ব।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার চিত্র

সম্প্রতি পার্ল্যামেণ্টের এক সমিতি হইতে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ভূমিবিষয়ক অনুসন্ধানের ফলসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত—প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অনুসন্ধানকারীরা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেগুলি পাঠ করিলে বিলাতের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের চরিত্র ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশীয়েরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "ভারতীয় জনসাধারণ নিতান্তই মূর্খ, নিরক্ষর এবং শিক্ষালাভে উদাসীন ও অনিচ্ছুক। নূতন নূতন কৃষি-প্রণালী, শিল্প-প্রণালী ও ব্যবসায়-প্রণালী ইহারা অবলম্বন করিতে চাহে না। মামুলি পথ পরিত্যাগ করা ইহাদের স্বভাববিরুদ্ধ।" এই সকল কথা তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া আমরা ভাবি যে, বোধ হয় পাশ্চাত্য সমাজে জনগণ সর্ব্বদা নব নব আবিষ্কার কাজে লাগাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু পার্ল্যামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Report of the Land Inquiry Committee (Vol. I. Rural, Vol. II. Urban) পাঠ করিলে এ ভুল বিশ্বাস থাকিবেনা। কারণ অনুসন্ধানকারীরা দুঃখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার মর্য্যাদা এখনও বুঝে নাই। ইহাদিগকে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করান বড় সহজ ব্যাপার নয়। কৃষিকর্ম্মে কো-অপারেটিভ নীতির প্রবর্ত্তন ইংলণ্ডে বড় শীঘ্র সফল হইবে না। পুরাতন প্রথার প্রতি ইংরাজ নরনারী এত আসক্ত যে

নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য গবর্মেণ্টের যৎপরোনাস্তি অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্থিতিশীল অবৈজ্ঞানিক ভারতবাসীতে এবং গতিশীল বিজ্ঞানাবলম্বী পাশ্চাত্য নরনারীতে বিশেষ প্রভেদ বুঝা যায় কি? বস্তুতঃ, চোখ কান খুলিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইলে বুঝিব যে ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবাসী যাহা কিছু শিখিবার সুযোগ পাইয়াছে প্রায় সকলই একদেশদর্শী, একচোখো, অসম্পূর্ণ, সুতরাং মিথ্যা। বিশেষতঃ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভেদ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট যে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহা নিতান্তই অবজ্ঞেয়। বিংশশতাব্দীতে আমাদিগকে নূতন করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান তথ্য বুঝিতে হইবে।

একটা কথা আমরা শুনিয়া শুনিয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছি। কথায় কথায় আমাদিগকে বলা হয়, "ভারতবর্ষের ইতিহাস অনৈক্য ও পরাধীনতার কাহিনী। ইউরোপের ইতিহাস ঐক্য এবং স্বাধীনতার বৃত্তান্ত।" এই বচন বর্ত্তমানে আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। ব্যাপারটা কি খতাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নাই। সত্য কথা, ইউরোপের ইতিহাস ভারতবাসীকে আদৌ শিখান হয় নাই বলিলেও চলে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত তথ্যরাশির তালিকা মাত্র! ইঁহারা বর্ত্তমান ভারতশাসন ও ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়া থাকেন ভারতেতিহাস লিখিতে যাইয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হন। কাজেই আমরা ভারতেতিহাসে কোন শিক্ষাপ্রদ বস্তু পাই না। যাহাকিছু শিখি তাহার চরম কথা "অনৈক্য এবং পরাধীনতা—অর্থাৎ পাশ্চাত্য বীরজাতীয় নরনারীর জীবন বৃত্তান্তের বিপরীত!"

অথচ ইউরোপের ইতিহাস সত্যভাবে আলোচনা করিলে কি দেখিতে

পাইব ? এত অনৈক্য এবং এত পরাধীনতা, এত লাঠালাঠি, এবং এত রক্তারক্তি ইউরোপীয় পণ্ডিত-লিখিত ভারতেতিহাস গ্রন্থেরও ত্রিসীমানায় পাইব না। ইউরোপের ইতিহাসই অনৈক্য এবং পরাধীনতার চরম দৃষ্টান্ত—ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে তুলনা করিলে ইউরোপেরই হীনতা প্রমাণিত হইবে। অথচ ইউরোপের দেশগুলি প্রত্যেকটাই ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যথেষ্ট ক্ষুদ্র।

বর্ত্তমান ইউরোপের কথা আর কি বলিব ? নব্য জার্ম্মাণি, নব্য ফ্রান্স, নব্য ইতালী ইহারা ত ১৮৭০ সালে গঠিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর পরাধীনতা এবং অনৈক্যের বীজ এখনও সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে কি ? জার্ম্মান সাম্রাজ্যে যথার্থ ঐক্য এখনও স্থাপিত হয় নাই। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং পরপীড়ন-নীতির সম্বন্ধে কে না খবর রাখেন ? বল্কান অঞ্চলে স্লাভনীয় ও তুরস্ক জাতিদ্বয়ের পরস্পর মারামারি আজ সুবিদিত। পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ এখনও সুনিয়ন্ত্রিত হইল না। পোলিশ জাতি তিন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত। বেলজিয়ামের দুই জাতি মিশে নাই—মিশিবে কি না সন্দেহ। ফরাসীর দুই জেলা জার্ম্মাণির অধিকৃত। বিশাল রুশিয়ায় যে কত জাতির অনৈক্য ও পরাধীনতা এক সঙ্গে বর্ত্তমান তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ? আয়র্ল্যাণ্ডের স্বরাজ-আন্দোলন কি পরাধীনতার প্রতিবাদ নয় ? আয়র্ল্যাণ্ডের আলষ্টার-আন্দোলন কি অনৈক্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত নয় ? স্কচজাতীয় লোকেরা এখনও ইংরাজবিদ্বেষী ক্রুশরাজের ব্যানকবার্ণ যুদ্ধ-দিবসে "জাতীয়" উৎসব সম্পন্ন করে। ফলতঃ, বর্ত্তমান ইউরোপে রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার চিত্র বেশী উজ্জল, না অনৈক্য, বিভিন্নতা, পরস্পর বিদ্বেষ, যুঝাযুঝি এবং পরাধীনতা, পর-পীড়ন, ও অত্যাচারের চিত্র বেশী উজ্জল ?

তাহার উপর, প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দলাদলিগুলি বিশ্লেষণ

করিলে অনৈক্য ও পরপীড়নের চিত্র আরও স্পষ্ট হইবে। ডিমক্রেসী বা প্রজাতন্ত্রশাসন বলিয়া কোন পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে ইউরোপের কুত্রাপি নাই। সে কথা সম্প্রতি না তুলিলাম। ঐতিহাসিক ভাবেই ইউরোপের "ঐক্য ও স্বাধীনতা" তত্ত্ব বুঝা যাউক। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপের যেদিকে তাকাই কোথাও স্বাধীনতা ও ঐক্য নাই। এক জাতি অপর জাতির উপর অত্যাচার ও অবিচার করিতেছে, এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতেছে, ধর্ম্মসংস্কারের নামে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য এবং দলাদলি পুষ্ট হইতেছে, ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার জন্য রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব ও কলহ ঘোরতর জটিল আকারে দেখা দিতেছে। এই গেল আধুনিক ইউরোপের চিত্র। Cambridge Modern History, কিম্বা Foreign Statesman Series গ্রন্থাবলী, কিম্বা Periods of European History Series গ্রন্থাবলীর কোন পৃষ্ঠায় ঐক্য বা স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র পাই নাই। স্পেনের ফিলিপ হইতে জার্ম্মাণির বিস্‌মার্ক পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাসের এক বাণী—পরস্পর রেষারেষি, পর-জাতি-পীড়ন এবং ঘরোয়া বিবাদ। ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির কথা বলিতে চাহ? ইউরোপের ভিতর আদৌ ঐক্য ছিল না বলিয়াই অষ্ট্রিয়া কাবু হইয়াছিল এবং ইতালীয় বীরগণের কার্য্য হাঁসিল হইতে পারিয়াছিল!

মধ্যযুগের চিত্রেই বা সুখকর দৃশ্যাবলী আছে কি? সে যে ফিউড্যাল যুগ—Feudalismএর অর্থই অনৈক্য। সে ত আরও অন্ধকারময় গহন বন। পাশ্চাত্যেরা স্বয়ংই তাহার নিন্দা করেন। তাহা হইলে তথাকথিত ঐক্য এবং স্বাধীনতার বড়াই করা হয় কেন? ভারতবাসীরাই বা এই বড়াই শুনিয়া চমকাইয়া যান কেন? ভারতের মানুষ সৃষ্টিছাড়া জানোয়ার নয়—ইউরোপের মানুষও স্বর্গের দেবতা নয়!

ইউরোপের ইতিহাস একমাত্র স্বাধীনতা ও ঐক্যের চিত্র নয়— ভারতবর্ষের ইতিহাসও তথাকথিত অনৈক্য এবং পরাধীনতার কালিমা-লিপি নয়।

ইংরাজজাতির ইতিহাসটাই দেখিনা কেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দুইটি প্রধান কথা শিখিতে পারি—হয় অনৈক্য, না হয় পরাধীনতা। এই দুই শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে এবং তাহার বিচিত্র প্রভাবে ইংরাজের জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইংরাজ রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীন। তাহার তিনশত বৎসর পরে জার্ম্মাণির "বর্ব্বরেরা" ইংলণ্ড দখল করিল। তখন ভারতবর্ষে সমুদ্রগুপ্তের প্রবল প্রতাপ। ইংলণ্ডের এই যুগ স্বাধীনতার যুগ না পরাধীনতার যুগ? তাবপর, এই বর্ব্বরগণ ইংলণ্ডের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "স্বদেশ" গঠন করিতে লাগিল। তাহার বৃত্তান্ত Heptarchy বা "সপ্তরাষ্ট্রীয়তা" এবং Triarchy বা "ত্রিরাষ্ট্রীয়তা"র ইতিহাস। ইহা হইতে ঐক্যের পরিচয় পাই না অনৈক্যের পরিচয় পাই? খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের লোকেরা "এক-রাষ্ট্রীয়তা"র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। এই আমলেই আবার দিনেমারেরা অর্দ্ধ ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইল। ইহার নাম ইংরাজের স্বাধীনতা না পরাধীনতা? এই যুগে বাঙ্গালায় পাল সম্রাটগণ এবং দ্রাবিড়ে চোল রাজবংশ দ্বিগ্বিজয় করিতেছেন।

তাহার দেড় দুইশত বৎসরের ভিতর ফরাসী সেনাপতি উইলিয়ামের ইংলণ্ডবিজয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজসমাজে ফরাসী ভাষা, ফরাসী সাহিত্য, ফরাসী কায়দা ইত্যাদির বিস্তার। এ যুগ কি ইংরাজজাতির গৌরব যুগ? অধিকন্তু উইলিয়ামের বিজয় ব্যাপারটাও বুঝা যাউক। ইংরাজ-রাজ হ্যারল্ড সেনল্যাকের যুদ্ধে হারিলেন কি করিয়া? কারণ—ইংরাজের গৃহকলহ, ভ্রাতৃবিরোধ বিশ্বাসঘাতকতা। নিম্ন-বিদ্যালয়ের পাঠ্য

পুস্তকেও কি একথা নাই? এই ঘটনার ১৩০ বৎসর পর ভারতবর্ষে পৃথ্বীরাজ ও থানেশ্বর যুদ্ধ।

ইংল্যণ্ডে ফরাসীশাসন দুই শতাব্দী চলিল। তখন আবার ঘোরতর অনৈক্য আসিয়া জুটিল। Wars of the Roses সংগ্রামটা কি ইংরাজের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সাক্ষী? ইহার ৫০ বৎসরের ভিতরেই ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলন। ধর্ম্মসংস্কারটা যে ইউরোপে কি পদার্থ তাহা সকলেই জানেন। ইংলণ্ডেও ধর্ম্মসংগ্রামের বিষময় ফল প্রচুর পরিমাণেই দেখিতে পাই। স্কচ ও ইংরাজজাতিদ্বয়ের কলহ ত আছেই—সঙ্গে সঙ্গে তুমুল গৃহবিবাদ, রাজ-হত্যা, রাজ-নির্ব্বাসন ও বিপ্লব। সপ্তদশশতাব্দীতে ইংরাজজাতির ভিতর ঐক্য ছিল না অনৈক্য ছিল? এই Civil War এবং Glorious Revolutionএর তত্ত্ব কথা কি?

বিপ্লবের পর কি দেখিতেছি? ওলন্দাজ সেনাপতি ইংরাজজাতির রাজসিংহাসনে বসিলেন। ইহা আবার কিরূপ স্বাধীনতা? তাহার ৫০ বৎসর পরে আবার জার্ম্মাণির হ্যানোভারবংশীয় লোকেরা ইংলণ্ডের রাজা। প্রথম দুই রাজা ইংরাজী ভাষায় কথা পর্য্যন্ত বলিতে জানিতেন না! এইরূপে আমরা অষ্টাদশশতাব্দী শেষ করিলাম।

উনবিংশশতাব্দীতে পরাধীনতা নূতন আকারে আর আসে নাই। নেপোলিয়ান ইংল্যণ্ড দখল করিতে আসিতেছিলেন—ট্রাফাল্‌গারে তাঁহার ধ্বংস হইল। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থাটা বিশ্লেষণ করা যাউক। পার্ল্যামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচনরীতি, ধনীনির্ধনের সম্বন্ধ; House of Lords এবং House of Commons এর বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বুঝিতে পারিলে দেখিব বর্ত্তমানের ইংরাজও ঐক্য অথবা স্বজাতিপ্রিয়তা বড় বেশী দেখাইতেছেন না।

ইংরাজের যে বৃত্তান্ত, ইউরোপের অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে সেই বৃত্তান্তই

প্রযোজ্য—আরও কলঙ্কময়। অনৈক্য ও পরাধীনতা ভারতবর্ষেরই কি একচেটিয়া ?

আজ ইউরোপের সকল রাষ্ট্র-কেন্দ্রে মহা দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল একজন সার্ভ যুবক অষ্ট্রীয়াহাঙ্গারীর ভাবী সম্রাটকে হত্যা করিয়াছে। অষ্ট্রীয়ার গবর্মেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়াছেন যে, সার্ভিয়া রাজ্যে যে সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্য সমিতি আছে তাহার সঙ্গে এই যুবক সংশ্লিষ্ট। সার্ভিয়া সকল স্লাবণীয় জাতিকে এক-রাষ্ট্রভুক্ত করিবার জন্য অষ্ট্রীয়ার সার্ভ প্রজাবৃন্দকে তাহাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং সার্ভিয়াকে জব্দ না করিলে অষ্ট্রীয়ার শান্তি নাই। এইরূপ বুঝিয়া অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ সার্ভিয়ারাজকে আজ পত্র লিখিয়াছেন যে, ৪৮ ঘণ্টার ভিতর সন্তোষজনক জবাব না দিলে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করা হইবে।

এই ultimatum-পত্র পাইয়া সমস্ত ইউরোপ চমকাইয়া গিয়াছে। সার্ভিয়া রুশিয়ার ক্ষুদ্র স্বজাতি—সার্ভিয়াকে যেভাবে অপমানিত ও পদদলিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে রুশিয়া তাহা সহ্য করিবেন না। এদিকে জার্ম্মাণিও অষ্ট্রীয়ার জ্ঞাতি—কাজেই সকল বিষয়ে অষ্ট্রীয়ার সহায়ক। জার্ম্মাণি বলিতেছেন, "অষ্ট্রীয়ায় ও সার্ভিয়ায় যে পত্র ব্যবহার হইতেছে তাহাতে তৃতীয় জাতির হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। যদি কেহ হস্তক্ষেপ করেন তাঁহার বিরুদ্ধে আমি কামান দাগিয়া বসিয়া আছি।" ব্যাপার মন্দ নয়। জার্ম্মাণি রুশিয়ার সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র একটা লড়াই করিবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব। এই জন্য অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে দিয়া সার্ভিয়ার রাজার নিকট এই কঠোর ও অপমানসূচক পত্র লিখান হইয়াছে। জার্ম্মাণির বিশ্বাস, রুশিয়া অষ্ট্রীয়ার এই দুর্ব্যবহার কখনই সহ্য করিবেন না। রুশিয়া গায়ে পড়িয়া সার্ভিয়ার পক্ষ লইতে বাধ্য

হইবেন। তখন রুশিয়ায় জার্ম্মাণিতে মল্লযুদ্ধ চলিতে পারিবে। তাহা হইলে দেখিতেছি আবার নেপোলিয়ানের যুগ ইউরোপে ফিরিয়া আসে। ১৮১৫ সালে ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ১৯১৪ সালে শতাব্দী পূর্ণ হইতে না হইতেই ইউরোপের দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র সুরু হইতে চলিল।

এদিকে ইংরাজ ত বুয়ার সমরের পর হইতে জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। জগতের কোথাও কিছুমাত্র নড়ন চড়ন হওয়া ইঁহারা পছন্দ করেন না। কিন্তু জার্ম্মাণি ও রুশিয়ার মল্লযুদ্ধ দূর হইতে দেখা ইংরাজের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না। কারণ এই মল্লযুদ্ধে আনুষঙ্গিক অনেক ঘটনা ঘটিবে, যাহার ফলে তাঁহাকে কোন না কোন দিকে চলিতেই হইবে। বড়ই কঠিন সমস্যা।

তাহার উপর, ইংরাজ নিজের ঘর সাম্‌লাইতেই পারিতেছেন না। আয়র্ল্যাণ্ডের সমস্যা মীমাংসা হইল না। রাজা স্বয়ং একটা রফা করিবার চেষ্টায় ৪ দিন ধরিয়া সকলপক্ষের লোক ডাকিয়া আলোচনা করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বোধ হয় আল্‌ষ্টার বা আল্‌ষ্টারের কোন এক অংশ স্বরাজের বহির্ভূত রাখিয়া দিলে স্বরাজ-বিরোধীরা সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু আলোচনার কোন ফল ফলিল না। এই সংবাদও আজই প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই ইংলণ্ডেও একটা Civil War বাধিবার আশঙ্কা এক্ষণে ঘণীভূত হইল। এই ঘরোয়া লড়াইয়ের জন্য আয়র্ল্যাণ্ডের দুই দলই কিছুকাল হইতে প্রস্তুত হইতেছেন। দুই দলই সৈন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতেছেন। আজ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য নির্ব্বাক্।

ইংলণ্ডের এই গৃহবিবাদ লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে অল্প সময়ের ভিতর কাবু করিবার ফন্দী করিয়াছেন। অষ্ট্রিয়ার বিশ্বাস ইংলণ্ড এখন কোন প্রকারেই গৃহসমস্যা ছাড়িয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র-

মণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। অষ্ট্রিয়ার আর এক সুযোগ—রুশিয়ার শ্রমজীবীদিগের মহা ধর্ম্মঘট। এই ধর্ম্মঘটের ফলে রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ অশান্তি ঘটিয়াছে। অশান্তি যতদিন দেশের ভিতর থাকে ততদিন রুশিয়া দূর জ্ঞাতির জন্য সাহায্য পাঠাইতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসেও বোধ হয় অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার নিকট ৪৮ ঘণ্টার ভিতর জবাব চাহিয়াছেন--ভাবিবার, পরামর্শ করিবার, সাহায্য আনিবার সময় দেন নাই। দেখা যাউক—ব্যাপার কতদূর গড়ায়।

ডাব্‌লিনের "আইরিশ জাতীয় থিয়েটারে" এই সময়ে কোন অভিনয় হয় না। নব্য ভাবুক কবি ও নাট্যকারগণ মিলিয়া এই রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছেন। সীঙ্গ, য়ীট্‌স্, রাসেল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ লেখকগণ ইহার জন্য নাটক রচনা করেন। আমাদের গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদির ন্যায় ইঁহারা ইতিহাস হইতে জাতীয় আদর্শ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অভিনয়যোগ্য কাব্য লিখিয়া থাকেন।

একদিন এখানকার সাধারণ থিয়েটার দেখিলাম। লণ্ডনের তুলনায় ইহা নগণ্য। সন্ধ্যাকালে সময় কাটাইবার জন্য এইরূপ অভিনয় দেখিতে আসা চলে।

এখানকার শ্রমজীবী-ইউনিয়নের ক্লাবগৃহে সন্ধ্যাকালে নাচ গান ইত্যাদি আমোদজনক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কালকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। শুনিলাম, আইরিশদিগের "জাতীয়" রীতি অনুসারে নাচ হইতেছে। ইংরাজ প্রভাবে আয়র্ল্যাণ্ডে সকল জিনিষই বিলাতী ধরণে হয়। খেলা, নাচ, গান, বাজনা ইত্যাদি সকল বিভাগ হইতে আইরিশদিগের স্বতন্ত্র কায়দা বিতাড়িত করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমজীবী-সমিতির উদ্যোগে এই সকল দিকে জাতীয় রীতি পুনঃ প্রবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। সকল ক্ষেত্রেই এখানে "স্বদেশী আন্দোলন" দেখিতে

পাইতেছি। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তারা বলিলেন, "আমরা এতই বিলাতী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে এক্ষণে, আমাদের স্বদেশী কায়দা আর ভাল লাগে না। এই যে আজ আইরিশ রীতির নাচ দেখিতেছেন—ইহা সপ্তাহে একদিন মাত্র হয়। লোকেরা ইহা পছন্দ করে না—অন্যান্য দিন বিলাতী নাচই হইয়া থাকে। যাহা হউক, শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।"

এবার অয়র্ল্যাণ্ডে স্বরাজ-আন্দোলনের ফলে হোটেলওয়ালা ও রেল-কোম্পানীর বড় ক্ষতি হইতেছে। Thomas Cook কোম্পানী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে তিরস্কার করিতেছেন, "আপনাদের হুজুগে পড়িয়া পর্য্যটকেরা আয়র্ল্যাণ্ডে আসিতেছেন না। তাঁহারা ভাবিতেছেন, আয়র্ল্যাণ্ডে চলাফেরা করা আজকাল নিরাপদ নয়। আপনারা কাগজ সম্পাদনে বড়ই দায়িত্ববিহীন লোকের ন্যায় কাজ করিতেছেন। আমরা ডাব্লিন ও বেলফাষ্টের হোটেলে হোটেলে ঘুরিয়া খবর আনিয়াছি। হোটেলের মালিকেরা এবার বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। পাঁচ ছয় মাস যাবৎ তাঁহাদের "খরিদদার" নিতান্ত কম হইতেছে। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে এদেশে পর্য্যটকের সংখ্যা অত্যধিক থাকে—হোটেলে লোক ধরে না।"

সেদিন আয়র্ল্যাণ্ডের লাট সাহেবও বড় দুঃখ করিয়াছেন। কাগজ-ওয়ালাদের সংবাদদাতারা অতি ভীষণ খবর পাঠাইয়া আমেরিকা ও ইউরোপের "টুরিষ্ট"দিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছেন। লাট সাহেব সম্পাদকগণকে অধিকতর বিচক্ষণ ও সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

ডাব্লিনে বসিয়া দেখিতেছি, হৈ চৈ বা হুজুগ কিছুই নাই। বিদ্রোহ, রক্তপাত, সংগ্রাম ইত্যাদির পূর্ব্ব লক্ষণ বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ স্বয়ং রাজা, মন্ত্রিবর্গ এবং পার্ল্যামেণ্টের সভ্যগণ হইতে আরম্ভ

করিয়া চুণোগলির কাগজ সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেই Civil War এর লোমহর্ষণ চিত্র প্রচার করিতেছেন। ইহার নাম কি "Lull before storm ?"

সমবায়-পন্থী ভাবুককবি
জর্জ্জ রাসেল

আয়র্ল্যাণ্ডের প্রবীণ চিন্তাবীরের সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহার সম্বন্ধে ডাব্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাবুক অধ্যাপক পত্র লিখিয়াছেন, "The ablest and most interesting personality in Dublin is George Russell (A.E.). Do you know him? If not, you certainly ought to make his acquaintance. He is the editor of the *Irish Homestead*, the maker of Agricultural Co-operation in Ireland, and the St. John the Baptist of the Co-operative Commonwealth, in which, like him I profoundly believe as the only solution of our economics and moral troubles."

এই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রাসেলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ইনি একাধারে কবি, চিত্রকর, সমালোচক, দার্শনিক, জাতীয়তার প্রচারক এবং কৃষিক্ষেত্রে সমবায়-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। এই সাহিত্যরথী ও কর্ম্মবীর সম্বন্ধে আমেরিকার একজন অধ্যাপক তাঁহার নবপ্রকাশিত Irish Plays and Playwrights নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"You may think of Mr. Russell as you will, as organiser of the Irish Agricultural Organisation Society, as stimulator of the Irish Literary Revival, as economist,

playwright, poet, painter, preacher, but always as you put by his books you will think of him as mystic, as stargazer wandering, as he so often tells us in his poems, on the mountains by night, with his eyes keener with wonder at the skies than ever shepherd's under the star of Bethelhem ; you will see him, the human atom, on the fare Dublin mountains, thrilling as he watches the sweep of world beyond world ; and yet, atom that he is, the possessor of it all ;—you will think of him as stargazer whose 'spirit rolls into the vast of God.'"

এই অধ্যাত্মবাদী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভাবুক কবিবরের বাল্যজীবনের শিক্ষা নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

"Even as a boy he could not read most English literature, and so he took to reading the literature of the East, the Bhagavad Gita and the Sufis. From his reading of these, with other young men that somehow found each other out, came the Hermetic Society, at whose meetings everything mystic from the Upanishads to Thomas Taylor was discussed. From the study of the Universal, he said, they came at last to the national, to the study of the ancient folklore and stories of their people, which, had it not been for the Danes and Normans, would have been shaped into literary form long before now, when, he said, they were only being so shaped."

দেখা হইবামাত্র রাসেল বলিলেন, "মহাশয়, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল লোকেরা ইউরোপীয় ফ্যাক্টরী-বিজ্ঞানে মুগ্ধ হইতেছেন না দেখিয়া আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট। কারণ আমরাও আয়র্ল্যাণ্ডে ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কার্য্যে পরিণত করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী-স্বরাজ ব্যতীত মানবের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ-বিকাশ হইতে পারে না। লম্বা লম্বা বৃহদাকার ব্যারাকে বাস করিয়া নগরের নরনারীগণ মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঊনবিংশশতাব্দীর নগর-সভ্যতার বিষময় ফল বুঝিতে এখন আর কাহারও বাকী নাই। এক্ষণে পল্লীসভ্যতার প্রবর্ত্তন না করিলে মানব-সমাজে সুখ আসিবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নগর-সভ্যতা এবং ফ্যাক্টরী-জীবনের অসম্পূর্ণতা ও দুঃখদারিদ্র্যগুলি নিবারণ করিবার জন্য ইউরোপে নানা আন্দোলন হইতেছে না কি? Factory Acts, Housing Acts, Feeding the Poor Acts, Sanitary Inspection Acts, Fresh Air Movements, Municipal Aids ইত্যাদির দ্বারা দরিদ্র শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবীদিগকে সুখী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না কি? এই যে আজকাল ডাব্‌লিনে Civic Exhibition হইতেছে তাহার দ্বারা দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়াইবার সূত্রপাত করা হইতেছে না কি? সরকার হইতে এত অর্থব্যয় করিয়া জনসাধারণের জীবনে আনন্দ ও মধুরতা প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াসকে আপনি কি চক্ষে দেখিতেছেন?" ইনি বলিলেন, "দূর ও বাহির হইতে মনে হইবে যে রাষ্ট্র যখন Socialist হইতে চলিল তখন ধনী মহাজনদিগের উপর কড়া হারে খাজনা বসাইয়া দরিদ্র জনসাধারণের সুখ বিধানই করা হইতে থাকিবে। জনগণের জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত সকল অবস্থায়ই সরকার অর্থ সাহায্য করিতেছেন। জলদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, বিদ্যাদান—ইত্যাদি সকল প্রকার

দানই ষ্টেট হইতে করা হইতেছে। দেখিলে মনে হইবে এত রাম রাজ্য আর কি ? সোশ্যালিষ্ট ষ্টেট্ ত জনগণের পিতামাতা স্বরূপ ?

গভীরভাবে তলাইয়া দেখুন, এই সদাব্রত অনাথভাণ্ডারস্বরূপ রাষ্ট্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে বুঝিবেন এই সর্ব্বতোমুখী অনাথভাণ্ডারের দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে ধনী মহাজনদিগকেই সাহায্য করা হইতেছে। দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়া রাষ্ট্রবীরেরা সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা দূষণীয় কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার দ্বারা "ক্যাপিট্যালিষ্ট" ও নিয়োগকর্ত্তাদিগকেই "সংরক্ষণ" করা হইতেছে !

মহাজনগণ শ্রমজীবীদিগকে আর অধিক হারে বেতন দিতেছেন না। অল্প বেতনে লোক নিযুক্ত করিবার সুযোগ ইহাঁরা পাইতেছেন। চারিদিকে বাজার দর বাড়িয়াছে—প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের মূল্য বৃদ্ধি অত্যধিক। কাজেই শ্রমজীবীরা উচ্চহারে পারিশ্রমিক না পাইলে জীবনধারণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু নিয়োগকর্ত্তারা মজুরী বৃদ্ধি করিলেন না—তাহার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্র আসিয়া শ্রমজীবীদিগের গৃহ, বাসস্থান, উদ্যানভূমি, বিদ্যালয়, স্নানাগার ইত্যাদি সকল জিনিষ দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথবা বাজার দর অপেক্ষা অল্পমূল্যে জোগাইতেছেন। ফলতঃ, শ্রমজীবীরা সুখ পাইতেছে—কিন্তু মহাজনগণ মজুরী বৃদ্ধির দায় এড়াইতে পারিতেছেন। ইহাঁরা সস্তায় লোকজন পাইতেছেন।

সুতরাং ষ্টেট হইতে যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহার দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছেন কাহারা ?—শ্রমজীবী সমাজ না ধনী সমাজ ? তেলা মাথায় তেল দেওয়া হইতেছে না কি ? এ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না। দারিদ্র্য-সমস্যা এ-ভাবে মীমাংসিত হইবে না।

শ্রমজীবী ও মহাজন এই দুই জাতীয় লোকের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিরোধীভাব নিবারণ না করিলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাহার এক মাত্র উপায় কো-অপারেশন বা সমবায়। তাহার বিধানে প্রত্যেক ব্যক্তিই একাধারে শ্রমজীবী ও নিয়োগ-কর্ত্তা, মজুর ও মহাজন, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ, ক্রেতা ও বিক্রেতা হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় বড় বড় কারবার, বড় বড় ফ্যাক্টরী, বড় বড় নগর হয় ত না থাকিতে পারে। কিন্তু মানবসভ্যতায় ঐক্য, সুবিচার এবং যথার্থ সুখ উৎপন্ন হইতে থাকিবে।"

রাসেলের এই মত আয়র্ল্যাণ্ডের ভাবুক মহলে সুপ্রচলিত। ডাব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, "I will have no dealings whatever with the Civic Exhibition, which is merely an attempt of the sweaters and slum-landlords to white-wash themselves and put off the evil (to them) day of having to pay decent wages and rebuild the foul slums of Dublin. All the evil elements in Ireland are focussed in this Civic Exhibition."

চরমপন্থী চিন্তাবীরগণ নগরজীবনবিষয়ক প্রদর্শনীকে এই চোখে দেখিতেছেন। যাঁহাদের দরদ তাঁহারাই বুঝেন—বাহিরের লোক গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিতে অসমর্থ। ইহাঁদের বিশ্বাস ধনী মহাজনেরা এইরূপ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জনগণকে 'হাত' করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রমজীবীদিগকে নানা উপায়ে বুঝান হইতেছে যে তাহাদের সুখ ও স্বাস্থ্যবিধানের জন্য ফ্যাক্টরীর মালিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! এইরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত আন্দোলন চালাইলে মজুরেরা বেতন বৃদ্ধির হুজুগ সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কর্ত্তরাও বাঁচিয়া

যাইবেন। গত বৎসর ডাব্লিনের শ্রমজীবীরা বিরাট ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। এই ধর্ম্মঘটের ধুরন্ধর ও সেনাপতি ছিলেন লার্কিন। আবার সেইরূপ ধর্ম্মঘটের আয়োজন হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা প্রথম হইতেই চাপিয়া দিবার জন্য শ্রমজীবী-"বন্ধু" মহাজনেরা Civic Exhibition এর ব্যবস্থা করিয়াছেন।" কিন্তু রাসেল বলেন, এ ঔষধে ব্যাধির প্রতীকার হইবে না।

সমবায়-নীতি প্রবর্ত্তিত সমাজগঠন এবং পল্লীস্বরাজের কথা বলিতে বলিতে ইনি ভারতীয় আদর্শের উল্লেখ করিলেন। ইঁহার মতে ভারতবর্ষে ইংরাজী সাহিত্য শিখাইবার প্রয়োজন নাই। "ইংরাজী সাহিত্যে জড়বাদ এত ঘনীভূত রহিয়াছে যে তাহা হইতে আত্মার আনন্দ হয় না। এমন কি ভাবুক ওয়াড্স্ওয়ার্থকেও হিন্দু অধ্যাত্মবাদীরা নাবালক মনে করিবেন না কি? বোধ হয় আমেরিকার এমার্সনকে আপনারা স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। ইংরাজী সাহিত্যে আপনাদের শিক্ষণীয় বস্তু নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে একটা কথা, যতদিন পরাধীন ভাবে পরকীয় আদর্শ অনুকরণ করা হয় ততদিনই বিদেশীয় সাহিত্যের কুফল হইতে আশঙ্কা থাকে। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যুগ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এক্ষণে উচ্চ অঙ্গেরই হউক বা জঘন্য শ্রেণীরই হউক—দুনিয়ার চিন্তাসম্পদ হইতে নব নব উপকরণ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আমাদের জন্মিয়াছে। তাহার দ্বারা আমরা পরকীয় ভাবাপন্ন হইতেছি না, বরং স্বকীয় অভাবানুসারে এবং স্বকীয় আদর্শেই জীবনগঠনের সুযোগ পাইতেছি। ইহার নাম assimilation বা হজম করা। এজন্য বিদেশীয় আদর্শের সম্মুখীন হইতে আমাদের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। জগতের কোন চিন্তাই বয়কট করিবার প্রয়োজন আমরা বোধ

করিতেছি না। বরং বিশ্বশক্তির সকল প্রকার অভিব্যক্তির সঙ্গে ভারতবাসী যুঝাযুঝি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।"

ইনি নিজেই বলিতে লাগিলেন, "আমি বাল্যকাল হইতে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনে অনুরাগী হইয়াছি। আমি সংস্কৃত জানি না—অথচ হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র, তন্ত্র, ব্যাকরণ, বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদের আলোচনায় বহু সময় কাটাইয়াছি। তাহার দ্বারা আমার জীবনেরও উপকার হইয়াছে। আমার চিন্তা ত গঠিত হইয়াছেই—এমনকি, আমার জীবনের আদর্শও হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছে। আমি যোগাভ্যাসের মর্ম্ম কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি বলিতে পারি। আমি উপযুক্ত গুরুলাভ করি নাই—এজন্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু হিন্দু অধ্যাত্মতত্ত্ব যে লোকজনকে প্রতারণা করিবার কল নয় তাহা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। যোগাসনে বসিয়া আপনাদের "কুণ্ডলিনী তত্ত্বের" ইঙ্গিত পাইয়াছি। তাহার দ্বারা এই ধারণাও আমার দৃঢ় হইয়াছে যে, হিন্দু যোগী ঋষিরা খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগতের নিগূঢ় বিষয়ে তাঁহাদের যথার্থ জ্ঞান ছিল।"

ইনি বিবেচনা করেন যে, হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের অনেক কথাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। ইহাঁর উৎসাহে কোন কোন আইরিশ চিকিৎসক এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি নিজেও পাণিনির ব্যাকরণ আলোচনায় নিযুক্ত। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রের শব্দতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস করিতেছেন। বর্ণমালার অক্ষর সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে যে গূঢ় ব্যাখ্যা আছে তাহা ইনি বিশ্বাস করেন। দেবদেবীগণের বর্ণ বিষয়েও ইনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছেন বলিলেন।

রাসেলের বিবেচনায় হিন্দুসমাজ ও সাহিত্যের কোন বিভাগই নিতান্ত

উপেক্ষণীয় বস্তু নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিল্প-বিপ্লবের যুগেও সেগুলির আবশ্যকতা আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের আবিষ্কারগুলি যথার্থ বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে বুঝিবার জন্য বেশী লোক অগ্রসর হইতেছেন না এই জন্য ইনি দুঃখিত।

ইনি বলিলেন, "রবিবাবু এই হিসাবে ভারতবর্ষের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। হিন্দুর গভীর দর্শনতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যেরা বুঝিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ সরল কাব্যে যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা নব্য ইউরোপের সহজে বোধগম্য। এই জন্যই পাশ্চাত্য মহলে একটা আলোড়ন হইতে পারিয়াছে। অবশ্য পাশ্চাত্যেরা এইরূপ নবীন আলোকের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন।"

রাসেলের সঙ্গে রবিবাবুর দেখা হয় নাই। ইহাঁর পরিচয়লাভের জন্য রবিবাবু আয়র্ল্যাণ্ডে আসিতেছিলেন। কিন্তু শীঘ্র আমেরিকায় চলিয়া যাইতে হয় বলিয়া তাঁহার আসা হইল না। ইহাঁর বন্ধু ও সতীর্থ-সুহৃৎ য়ীট্‌স্‌ই রবিবাবুকে বিলাতী সাহিত্যে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। আয়র্ল্যাণ্ডের হিন্দুদর্শনানুরাগী কেল্টিকভাবুক নব্যভারতীয় চিন্তাবীরকে সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন।

নব্য আয়র্ল্যাণ্ডের পরিচয় পাইতে হইলে রাসেল, য়ীট্‌স্‌, সীঙ্গ, গ্রেডি, গ্রেগরি, মুর এবং কলাম এই কয়জনের কাব্য, নাট্য ও গদ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁদের কেহ নব্য আইরিশ জাতির স্বপ্ন প্রচার করিতেছেন, কেহ প্রাচীন কেল্টিক কথাসাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। কেহ বর্ত্তমান আন্দোলনের সুরু বুঝাইয়াছেন, কেহ আধুনিক কালের পল্লীচিত্র প্রদান করিয়াছেন। Lady Gregory এর "Gods and Fighting men," এবং Grady এর "Heroic Period" ও "Cuchallain" পাঠ করিলে প্রাচীন আয়র্ল্যাণ্ডের রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড

ও ওডিসীর পরিচয় পাওয়া যায়। Moore এর "Hail and Farewell"-নামক গদ্যগ্রন্থে নব্য আইরিশ আন্দোলনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান যুগের সকল কর্ম্মীর চরিত্র বিশ্লেষিত রহিয়াছে। লেখক স্বয়ং আইরিশ। বহুকাল ফ্রান্স ও বিলাতে ছিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ভাবিয়া ছিলেন, নব্য ভাবুকেরা তাঁহাকে দলপতি জ্ঞানে পূজা করিতেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই। এজন্য ৭।৮ বৎসর আয়র্ল্যাণ্ডে থাকিয়া অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে বিলাতে ফিরিয়াছেন। নব্য আয়র্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে এই ভগ্নহৃদয়ের সমালোচনা পাঠ করিলে ভারতবাসীরা নিজেদেরই সমসাময়িক অনেক কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত উদীয়মান কবি Columb, "My Irish Year" গ্রন্থে একটি পল্লীর যথার্থ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। কবির নিকট সমাজবৃত্তান্ত এবং আর্থিক অবস্থার সমালোচনা যেরূপ আশা করা যায় ইহাতে সেইরূপই আছে। তবে ইহা কাল্পনিক নয়—সত্য বিবরণই লিপিবদ্ধ। অষ্টাদশশতাব্দীর "Deserted Village" এর সঙ্গে এই গদ্যগ্রন্থের তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয়।

রাসেলের মতে য়ীট্‌স্ (Yeats) প্রাচীন কেল্টিক বীরগাথাসমূহের প্রকৃত মর্ম্ম সম্যক্ প্রদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সেইগুলি নূতন আকারে প্রদান করিতে যাইয়া উচ্চ অঙ্গের কলা-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁর বিবেচনায় গ্রেডির গ্রন্থাবলীই আদর্শ হিসাবে উৎকৃষ্ট। য়ীট্‌স্‌ও তাহাই বলিলেন—"It was Grady who started us all." গ্রেডিই নব্য আইরিশ সাহিত্য-বিপ্লবের প্রবর্ত্তক।

সীঙ্গের (Synge) রচনায় আইরিশ সাহিত্যের জাতীয়তা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। ইনি দুনিয়ার সকল কথাই সুখ দুঃখ

হরিষ বিষাদ সমস্তই—কাব্যে স্থান দিয়াছেন। জীবনের কোন তত্ত্বই ইহাঁর চিত্তে বাদ পড়ে নাই। ইনি নব্য আয়র্ল্যাণ্ডের সেক্সপীয়ার। সেই-রূপ অধ্যাত্মবাদী রাসেলের কাব্যে আইরিশ আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য বুঝা যাইবে না। আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় বীরগাথা ইহাঁর আলোচিত বিষয় নয়। ইনি বিশ্বের নিগূঢ় সত্য বিশ্লেষণে তৎপর। তবে ইহা হইতেই আইরিশ প্রতিভার পরিচয়ও আনুষঙ্গিক ভাবে পাওয়া যাইবে। আইরিশ চিন্তায় আধ্যাত্মিকতা কোন্ আকারে দেখা দিয়াছে রাসেলের কাব্য পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আবার আয়র্ল্যাণ্ডের "স্বদেশী আন্দোলন"কে ইনি কোন্ পথে চালিত করিতে চাহেন তাহাও বুঝিতে পারি। ইহাঁকে এই হিসাবে আয়র্ল্যাণ্ডের "বাণীমূর্ত্তি" বিবেচনা করা যাইতে পারে। রাসেল তাঁহার "Ireland" নামক গ্রন্থে আইরিশ জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচার করিয়াছেন :—

"We live in the invisible world. If I rightly understand our mission and our destiny, it is this : To restore to other men the sense of that invisible ; that world of our immortality ; as of old our race went forth carrying the Galilean Evangel. We shall first learn and then teach, that not with wealth can the soul of man be satisfied, that our enduring interest is not here but there, in the unseen, the hidden, the immortal, for whose purposes exist all the visible beauties of the world. If this be our mission and our purpose, well may our fair mysterious land deserve her name : Iris Fail, the Isle of Destiny."

ইহা যে নব্য ভারতেরও বাণী! ভারতশিষ্য কবিবর আইরিশ জাতীয়তার হিন্দু আদর্শই প্রচার করিতেছেন। ভারতমাতাই ইউ-রোপীয় নব্য কেল্টিক আন্দোলনের এবং আইরিশ ভাবুকতার মূলমন্ত্র জোগাইয়াছেন দেখিতেছি।

রাসেল স্বয়ং চিত্রশিল্পী। নবা আয়র্লাণ্ডে চিত্রকর বেশী নাই। ইনি বলিলেন, "দরিদ্র দেশে চিত্রশিল্পী বেশী থাকিতে পারেন না।" ইহাঁর চিত্রকলায় প্রকৃতি এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রধান স্থান পাইয়াছে। যে বৈঠক-খানায় বসিয়াছিলাম তাহার প্রাচীর গাত্রে অনেকগুলি চিত্র ঝুলান দেখিলাম। প্রত্যেকটাতেই একটা নিবিড়তা মাখান বোধ হইতেছিল। ইনি নীলবর্ণ বিশেষ পছন্দ করেন বুঝিতে পারিলাম। কতকগুলি চিত্রে গূঢ় অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। দুই একটা সম্বন্ধে বলিলেন, "এই মূর্ত্তিগুলি আমি ধ্যানে লাভ করিয়াছি। ইহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বহু সময় লাগিবে। এ সকল চিত্র আমি কল্পনায় পাই নাই। যোগে বসিয়া এই সকল দৃশ্যের সাক্ষাৎ করিয়াছি। যাঁহারা এ সমুদয় উপলব্ধি করেন নাই তাঁহাদিগকে বুঝান কঠিন।" এই কথায় হিন্দু "শিল্পশাস্ত্রে"র নিয়মাবলী মনে পড়েনা কি?

বিলাতী রাষ্ট্র আজকাল জনগণের মাবাপ স্বরূপ হইতেছে। পূর্ব্বে Laisses faire নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জনসাধারণের স্বাধীন প্রয়াস বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রিত করা হইত না। লোকেরা স্বেচ্ছায় শিল্প, শিক্ষা, কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে শক্তি নিয়োগ করিত। কিন্তু Socialism এর প্রভাবে এক্ষণে সকল বিভাগে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইতে চলিয়াছে। রাসেল বলেন,—শিশু ও যুবক সমাজ সম্বন্ধেই এই নীতি প্রযোজ্য—প্রবীন দেশ সম্বন্ধে ইহা খাটে না।

এই নূতন রাষ্ট্র-নীতি আয়র্ল্যাণ্ডেও প্রবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা

উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার কৃষি-সমবায় আন্দোলনকে সরকারের আয়ত্ত করিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। রাসেলের মতে,—স্বাধীন-ভাবে কর্ম্ম করিবার সুযোগ না পাইলে সমবায়ের আন্দোলনে কোন উপকার হইবে না। ষ্টেট-পরিচালিত কো-অপারেটিভ সমিতি জনগণের সর্ব্বনাশের উপায়। 'সমবায়' শব্দের ভিতর কোন মধু নাই। কি প্রণালীতে, কি উদ্দেশ্যে, কাহার পরিচালনায় সমবায়-অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা না দেখিলে এই আন্দোলনের যথার্থ মূল্য বুঝা যায় না।

রাসেল আয়র্ল্যাণ্ডের সমবায়-আন্দোলনে ষ্টেটের হস্তক্ষেপ নিবারণ করিতে প্রয়াসী। সরকার-নিয়ন্ত্রিত কো-অপারেশনের চিত্র রাসেলের "Co-operation and Nationality" পুস্তিকা হইতে প্রদত্ত হইতেছে :—

As it is difficult just at present to lay hold of urban industries and urban life, the spread of agricultural Co-operation has seemed to our Irish Mandarins (the state) the very thing to begin on. Here were associations which could be drilled and disciplined so as to yield Mandarins and inspectors the exquisite sensation of being rulers. They could be bribed into the fold by loans, subsidies, certificates and official smiles. They could be penalised by withholding information, loans, subsidies, and certificates. Here was a joyful prospect indeed, a fair and glittering vista leading away to the official earthly paradise, and it has been the continual aim of some of the Mandarins of the Department of

Agriculture to lay hold of, supervise, and control the operations of Co-operative Societies. The greater the movement grew, the greater became the anxiety of the Mandarins to control it. * * * * This desire of the Mandarins for control, this itch for overlordship over everything which besets the new school of bureaucrats, is the greatest danger before us in our path to the Co-operative Common-wealth, * * * * * The greatest voluntary movement Ireland has ever seen is in danger of being eaten up by the state, which Neitzsche rightly called "the coldest of all cold monsters." * * * * * * If the state, "the coldest of all cold monsters," is allowed by Irishmen to take control of this work, all the fire of life in it will die out. A state department is sterilised of all beauty of thought. Whoever enters the service of the state has to keep his heart under lock and key. His official duty is to organise the undisputed platitude, and to preact the most material commonplaces. We all know these are necessary duties, but are we to give over our hopes and our ideals also to this benumbing agency? Is Ireland not to have one activity of its children free from the greed of the Mandarin for control? Our supine population has allowed the most gigantic state Machinery to be set up over it that the modern

world has knowledge of. Is nothing to be exempt? For this thing is surely true; that if our voluntary workers are dispensed with, and the sole link which united the association is their relation to the state department, they will never be able to resist effectively further encroachments on their liberty by the Mandarins. Their officials will be bribed by doles, or thwarted with restrictions, until the chilly ideal of the bureaucracy is attained, until the whole activities of the country are under its control to satisfy its itch for power, and it can contemplate with satisfaction the soulless mediocrity it has instituted. * * * * * * Without free communities developing according to their own desires, carrying out some scheme they themselves have devised, and for which they accept full responsibility, there can be no progessive life in Ireland."

ইহা র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের Socialist State এবং কাউন্সিলার ফক্‌সের Municipalisation-নীতির তীব্র প্রতিবাদ। ভারতবর্ষে আজকাল সমবায়-আন্দোলনের হুজুগ উঠিয়াছে। কর্ত্তারা সকল দিক বুঝিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন কি?

নব্য কেল্‌টিক আন্দোলন

আজকালকার রাষ্ট্রবীরেরা বিশেষ মনোযোগের সহিত আয়র্ল্যাণ্ডের স্বরাজ আন্দোলনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান আলোচনা করিতেছেন। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিচার হইতেছে এবং আইরিশ জাতির কর্ম্মপটুত্বও পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক আর একটা আলোড়ন আইরিশসমাজের অভ্যন্তরেই এখন চলিতেছে। তাহার প্রভাবে সমগ্র ইউরোপের চিন্তামণ্ডল এবং জীবন-তত্ত্ব প্রবলরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে। সে দিকে ইউরোপের বেশী লোক এখনও দৃষ্টি দেন নাই। এশিয়ায়ও তাহার কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য জগতে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হইতে চলিয়াছে তাহার পুষ্টিবিধানকল্পে আয়র্ল্যাণ্ডের এই চিন্তাতরঙ্গ বিশেষ শক্তি প্রদান করিবে।

ইউরোপের এক নগণ্য অবনত দ্বীপের হৃদয়মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ-সংস্কারের বাণী উত্থিত হইয়াছে। রোমাণ সাম্রাজ্যের নিতান্ত পদদলিত প্যারিয়া সমাজেই তাহার মুক্তিদাতা, স্বর্গের পথপ্রদর্শক "ভগবৎপুত্রে"র আবির্ভাব হইয়াছিল। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই,—

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ

আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।”

এই জীবনের আন্দোলন, আনন্দের আন্দোলন, মহাপ্রাণতার আন্দোলন এবং আশাবাদের আন্দোলনের তুলনায় রাষ্ট্রীয় “হোমরুল”-আন্দোলন অতি তুচ্ছ। কিন্তু এই সকল আন্দোলন আয়র্ল্যাণ্ডে আছে বলিয়াই আজ আইরিশজাতির স্বরাজ-প্রচেষ্টা জগতের গৌরব-সামগ্রী।

আয়র্ল্যাণ্ডের এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নূতন নয়। উনবিংশশতাব্দীতে ইহার বহু অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বরং আজকাল ইহা লইয়া বাক্যযুদ্ধ বেশী হইতেছে। পূর্ব্বে এত বাক্‌বিতণ্ডা হইত না। অনেক সময়েই ইহার রাক্ষসীমূর্ত্তি দেখা যাইত। তথাপি স্বরাজ-আন্দোলনে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রাণ ছিল না, তাহাতে আইরিশজাতির হৃদয় দেখিতে পাইতাম না। বিংশশতাব্দীতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখিতেছি তাহা “আইরিশ জাতীয়তার “স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।” ইহাই বর্ত্তমান হোমরুল-আন্দোলনের বিশেষত্ব।

য়ীট্‌সের (Yeats) ভাবরাজ্য নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

“All would be well
Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense
Is shadow, and not linger wretchedly
Among substantial things ; for it is dreams
That lift us to the flowing changing world
That the heart longs for. What is love itself,
Even though it be the highest of light love,
But dreams that hurry from beyond the world,

To make low laughter more than meat and drink
Though it but set us sighing."

য়ীট্‌স্ The Land of Heart's Desire লিখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী রাসেল The Divine Vision লিখিয়াছেন। রচনাদ্বয়ের নামেই আলোচ্য বিষয় বুঝিতে পারা যায়। রাসেলের কথায়, "The spirit in man is not a product of nature, but antecedes nature, and is above it as sovereign, being of the very essence of that spirit which breathed on the face of the waters and whose song flowing from the silence as an incantation, summoned the stars into being out of chaos. To regain that spiritual consciousness, with its untrammelled ecstasy is the hope of every mystic. That ecstasy is the poetic passion."

এই স্বপ্নপ্রচারক ভাবুকেরা আয়র্ল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ স্বর্ণযুগ চিত্রিত করিতেছেন। ইঁহারা স্বয়ং অনাদ্যন্ত অসীমের উপাসক—এবং জগতের নরসমাজে সেই অদৃশ্য অশ্রাব্য বিশ্বের বার্ত্তা প্রচলিত করিতে চাহেন। ইঁহারা বর্ত্তমান মানবকে অমরতার তত্ত্ব শিখাইতেছেন—বন্ধনহীন বাধাহীন মনুষ্যত্ববিকাশের পথ দেখাইতেছেন। ইঁহাদের বিবেচনায় দৃশ্যমান জগতের ভোগ্যবস্তুসমূহই সংসারের একমাত্র পদার্থ নয়—এগুলি বিরাট সত্তার আবরণ মাত্র। এই বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যদৃষ্টির অন্তরাল ভেদ করিয়া ক্রমশঃ অন্তঃসৌন্দর্য্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা ইঁহাদের জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য। মানুষ মাত্রের জন্যই এই আদর্শ ও লক্ষ্য ইঁহারা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন। "বিশ্বমাহমমৃতমশ্নুতে"-তত্ত্বকে ইঁহারা পরম সত্য বিবেচনা করেন।

রাসেল গাহিতেছেন,—

"Now when the giant in us wakes and broods,
Filled with home-yearnings, drowsily he flings
From his deep heart high dreams and mystic moods,
Mixed with the memory of loved earth things
Clothing the vast with a familiar face;
Reaching his right hand forth to greet the starry race.

*   *   *   *   *

Nearer to thee, not by delution led,
Though there no housefires burn nor bright eyes gage :
We rise, but by the symbol charioted,
Through loved things rising up to Love's own ways :
By these the soul unto the vast has wings
And set the seal celestial in all mortal things."

এই তত্ত্বেই আইরিশজাতির প্রাচীন জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে জীবন আজ বহুদিন নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এতদিন রাশীকৃত স্তূপের তলদেশে সেই জাতীয় জীবননদী ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। সম্প্রতি নব্য আয়র্লাণ্ডের ভাবুকগণ সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার ফলে প্রাচীন জীবনের সরলতা, স্বাভাবিকতা, দৃঢ়তা, ওজস্বিতা এবং ভগবৎপরায়ণতা দ্বারা আধুনিক নরনারীগণের জীবন প্লাবিত করা হইতেছে।

এই প্রাচীন আইরিশ আদর্শের পুনরাবর্ত্তনের নাম Celtic Revival.

নব্য জার্ম্মাণির অয়কেন, ও নীটুশে-তত্ত্ব, বেলজিয়ামের মেটারলিঙ্ক, নব্য ফরাসীর বার্গসোঁদর্শন এবং যুবক আইরিশের স্বদেশী আন্দোলন বর্ত্তমান যুগে নবীন ইয়োরোপ গঠনের সূত্রপাত করিতেছে।

প্রাচীন কেণ্টিক সাহিত্যের আদর্শ ইতিপূর্ব্বে অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। জার্ম্মাণ অধ্যাপক মেয়ার এবং ফরাসী লেখক রেণাঁ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যসেবীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইংরাজ সমালোচক ম্যাথ্যু আর্ণল্ডও কেণ্টিক সাহিত্যের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থেও কেণ্টিক প্রভাবের আলোচনা মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। প্রাচীন কেণ্টের প্রকৃতিপূজা, তাহার আন্তরিক ভগবদ্ভক্তি, এবং তাহার স্বাভাবিক দেশপ্রীতি পণ্ডিত-মহলে কিছুকাল হইতে সুবিদিত রহিয়াছে। আজকাল ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ইউরোপের ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনার জন্য কেণ্টিক সভ্যতার অনুসন্ধানও করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের Rennes বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রাচীন কেণ্টের ধর্ম্মমত এবং দেবদেবীতত্ত্ব সম্বন্ধেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

কিন্তু এইগুলির সাহায্যে আয়র্ল্যাণ্ডের কেণ্টিক আন্দোলন সৃষ্ট হয় নাই। নব্যকেণ্টিক আন্দোলনের মূল বাহির করিবার জন্য ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বা পাণ্ডিত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে না। কারণ এই সমুদয়ের দ্বারা আইরিশ-ভাবুকতা পুষ্ট হয় নাই। আয়র্ল্যাণ্ডের ভাবুকগণ নিজ জাতি ও দেশের প্রকৃত আত্মা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের "অতীত গৌরবকাহিনী বাণী"র পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই উদ্ধারের ফলে এমন এক রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা ইউরোপে এক বিপুল আন্দোলন শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই নূতন জগতের কথা বর্ত্তমানে আইরিশ কবিকুলই প্রচার করিতে-

ছেন। সম্প্রতি ইহাঁরা একাকী *ব্রতবদ্ধ—ইউরোপের কোন সাহিত্যে ইহাঁরা যথোচিত সম্মান এখনও পান নাই।

বিংশশতাব্দীর সাহিত্যে এই প্রাচীন জগদাবিষ্কারের কথা শুনিলে স্বভাবতই ঊনবিংশশতাব্দীর রোমাণ্টিক আন্দোলনের তথ্যসমূহ মনে পড়ে। পার্সির "Ancient Reliques," ম্যাকফার্সনের Ossian এবং স্যর ওয়াল্টার স্কটের মধ্যযুগ সম্বন্ধীয় সাহিত্য—এই সকলের দ্বারা গত শতাব্দীর চিন্তামণ্ডল প্রচুর পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই সঙ্গে প্রাচীন কেল্টের জীবনকথাও সাহিত্য-সংসারে আলোচিত হইত। কিন্তু সেই যুগের কেল্টতত্ত্ব সাহিত্যে ও চিন্তায় বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অধিকন্তু, ম্যাক্‌ফার্সনের রচনায় কেল্টিক কাহিনীর অতি যৎসামান্য উপকথা বিকৃতরূপে প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল। ফলতঃ, ঊনবিংশশতাব্দীর সাহিত্যমণ্ডলে যথার্থ কেল্টিক আন্দোলনের স্থান ছিল না। সত্য কথা, তখনও কেল্টিক আন্দোলন আরব্ধই হয় নাই।

রাসেলের সঙ্গে এই কেল্টিক আন্দোলন লইয়া অনেক কথা হইল। ইনি বলিলেন, "গত শতাব্দীর রোমাণ্টিক আন্দোলনে এবং বর্ত্তমান কেল্টিক আন্দোলনে কোন যোগ নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে ত নাইই —অধিকন্তু দুইয়ের প্রেরণা স্বতন্ত্র, দুইয়ের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। রোমাণ্টিক আন্দোলন অষ্টাদশশতাব্দীর বন্ধনশৃঙ্খল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা কোন প্রবল শক্তির প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রাচীন আদর্শে যাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবন-বিকাশের ধারা অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমরা আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সংরক্ষণ করিতে যাইয়া দৈবক্রমে এই অমূল্য রত্নের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

তাহা ছাড়া, আমাদের কেল্টিক সাহিত্য রোমাণ্টিক সাহিত্য হইতে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রোমান্টিকেরা প্রধানতঃ প্রেমসঙ্গীত, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সংযমহীনতার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কেল্টিক সাহিত্য প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক। প্রাচীনতম বীরযুগের গাথায় যে ধর্ম্মপ্রাণতা, সরলজীবনবত্তা এবং শক্তি দেখা যায় আমাদের নব্য সাহিত্যে তাহারই পরিচয় বেশী পাইবেন। প্রকৃতিপূজা, ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রোমান্টিক ও কেল্টিক দুই সাহিত্যেই আছে সত্য কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিম্বা শেলীর চিন্তায় প্রাচীন কেল্টিক কল্পনার সহজ স্বাভাবিক গতি নাই। কেল্টেরা প্রকৃতি ও দেবতার আবেষ্টনে সর্ব্বদা বাস করিতেন। আপনাদের রামায়ণে সেই রস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির সহচর, দেবগণের ভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ সরল স্বভাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরনারীর কাহিনী ঊনবিংশশতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্যে পাইবেন না।"

আয়র্ল্যাণ্ডের একটি প্রাচীন—বোধ হয় প্রাচীনতম কেল্টিক কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"I am the wind which breathes upon the sea,
I am the wave of the ocean,
I am the murmur of the billows,
I am the ox of the seven combats,
I am the vulture upon the rock,
I am a beam of the sun,
I am the fairest of plants,
I am a wild boar in valour
I am a salmon in the water,
I am a lake in the plain,
I am a word of science,

I am the point of the lance of battle,
I am the God who creates in the head (*i.e.* of man)
the fire (*i.e.* the thought)
Who is it who throws light into the meeting on the mountain?
Who announces the ages of the moon (if not I)?
Who teaches the place where couches the sea (if not I)?

এই উচ্ছ্বাস পাঠ করিলে হিন্দু সহজেই বেদ, উপনিষদ ও গীতার বাণী স্মরণ করিবেন। আর মনে পড়িবে—"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া, যাইব বহিয়া যাইব বহিয়া।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রাচীন কেল্টিক বীরগাথা বলিলে কোন্ যুগের কাহিনী বুঝিব? নব্য আইরিশ কবিকুল কোন্ গাথাসমূহের আধুনিক গদ্য বা পদ্য সংস্করণ প্রচার করিতেছেন? খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পর ২০০।৩০০ বৎসর কাল আয়র্ল্যাণ্ডের এক গৌরব যুগ ছিল জানি। তাহার পর দিনেমার এবং য়্যাংগ্লো-নর্ম্যানেরা আয়র্ল্যাণ্ডের কলিযুগ আনয়ন করে। আপনারা কি সেই "সত্যযুগ"কে আপনাদের বীরযুগ বিবেচনা করেন?"

রাসেল হাসিয়া বলিলেন, "না, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের যুগ আমাদের সত্যযুগ বা বীরযুগ নয়। আমাদের কেল্টিক বীরগাথা আরও প্রাচীন,—খৃষ্টীয় প্রভাব অপেক্ষা বহু পুরাতন। সেই যুগের ইতিহাস রচিত হয় নাই। বোধ হয় সেই সময়ে গ্রীক জগতে হোমারীয় সাহিত্য এবং হিন্দু জগতে রামায়ণ সাহিত্য রচিত হইতেছিল। কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু পূর্ব্বে আমাদের জীবনে যে স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিকতা, ভগবদ্ভক্তি, ও অনন্তবোধ

এবং প্রকৃতিপরায়ণতা ছিল খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে তাহা বিশেষরূপেই মলিন হইয়া গিয়াছে। অন্য দেশের কথা জানি না। আয়র্ল্যাণ্ডে অন্ততঃ খ্রীষ্ট প্রভাবে ক্ষতি হইয়াছে, বিন্দু মাত্র উপকার সাধিত হয় নাই। সরল সহজ আনন্দময় প্রকৃতি-পূজার পরিবর্ত্তে আমরা কতকগুলি মতবাদ এবং আনুষ্ঠানিক ও বাচনিক স্বর্গতত্ত্ব ও নরকতত্ত্ব শিখিয়াছি। আমাদিগকে আত্মার কথা, ঈশ্বরের কথা, পরজন্মের কথা ভুলান হইয়াছে।

কিন্তু ভুলিয়াছি কি? না—আয়র্ল্যাণ্ডের কোন লোকই সত্য ভাবে খ্রীষ্টান নয়। বিশেষতঃ আইরিশজাতির নামজাদা যে কোন লোকের ধর্ম্মজীবন আলোচন করুন, দেখিবেন তাঁহারা সকলেই অ-খৃষ্টান, কেল্ট—সকলেই আত্মার স্বাধীনতা, মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি এবং সর্ব্বময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খাঁটি খৃষ্টমতাবলম্বী কাহাকেই পাইবেন না। আমাদের দার্শনিক বার্কলে খৃষ্টান ছিলেন না। ঐতিহাসিক লেকি খৃষ্টান ছিলেন না। বর্ত্তমানে নাট্যকার সাঁঙ্গ খৃষ্টান নন, কবিবর য়ীটস্ খৃষ্টান নন। আমার কথাও বলিতেছি—আমি আদৌ খৃষ্টান নহি।"

এই কথা বলিতে বলিতে রাসেল খৃষ্টধর্ম্মের কুফল সম্বন্ধে একটা প্রাচীন কাহিনীর সার মর্ম্ম প্রদান করিলেন। একজন প্রাচীন কেল্ট খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আইরিশ-সমাজ দেখিবার জন্য মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। তাঁহার নাম Oisin. ইনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক প্যাট্রিকের সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়া তর্ক করিতেছেন। ওসিন যাহা বলেন তাহাতে ব্যক্তিত্ব, স্বাভাবিকতা এবং জীবনবিকাশের কথা প্রকাশিত হইতেছে। আর খৃষ্টান যাহা বলিতেছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক দলগঠন, সমাজের বন্ধন, আত্মবিকাশের বিঘ্ন, এবং মুক্তিপথের বাধাসমূহ স্পষ্ট হইতেছে। উভয়ের তর্কে প্রাচীন Bard বা চারণ স্বাভাবিকতার ও স্বাধীনতার জয় প্রচার করিয়াছেন।

এরূপ অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহবাসের আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন কেল্টের মজ্জাগত। খৃষ্টান-সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। রাসেলের মতে খৃষ্টানেরা ইহার উপর বন্ধনের বর্ম্ম পরাইয়াছেন মাত্র। ইনি বলেন, "এমন কি, ইহার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যেরও তুলনা হয় না। অবশ্য জগতের বীরযুগে সকল স্থানেই চারণগণ বীরসুলভ চরিত্রদৃঢ়তা এবং সবলতা ও নৈসর্গিক উচ্ছ্বাসপ্রবণতা দেখাইয়াছেন। স্কাণ্ডিনাভীয়, হোমারীয়, কেল্টিক, ভারতীয় সকল প্রাচীন বীরগাথায়ই তাহা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ কেল্টের অধ্যাত্মবাদ এবং মুক্তিতত্ত্ব গ্রীসে পাই না। গ্রীকসাহিত্যে প্রত্যেক আত্মার চরম পরিণতি দেখি না। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল-কার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দুনিয়ার সকল পদার্থই গ্রীস হইতে টানিয়া আনেন! ইঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, হোমারীয় সাহিত্যের এ্যকিলিসই কেল্টিক সাহিত্যের কুহুলান—দুই সাহিত্যের ঘটনা এক প্রকার। আমার বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কেল্টিক সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন কোন চিন্তারাশির তুলনা করিতে হইলে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। Mysticism, ভাবুকতা, প্রকৃতিপূজা ও অধ্যাত্ম-বাদ এত সহজভাবে জগতের আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। কেল্ট ও হিন্দু বোধ হয় এক অধ্যাত্ম-শক্তির সন্তান।"

গ্রীকেরা এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারী রোমানেরা তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী সকল জাতিকেই অশিক্ষিত বর্ব্বর ম্লেচ্ছ বিবেচনা করিতেন। কেল্টেরাও ইঁহাদের সম্মান পাইতেন না। অথচ সেই যুগে ইউরোপের অধিকাংশই কেল্টিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কেল্টিক ভাষা ও সাহিত্য, কেল্টিক শিল্পকলা ও সমাজবন্ধন ইউরোপের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আজ যেখানে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, উত্তর ইতালী, জার্ম্মাণির কিয়দংশ, স্পেন, সুইজর্ল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড

ও আয়র্ল্যাণ্ড অবস্থিত সেই সমস্ত ভূভাগই কেল্টিকজাতীয় নরনারীর আবাসস্থল ছিল। পরে এই সকল স্থানে রোমীয় সভ্যতা এবং টিউটনিক সভ্যতা যথাক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে। তাহার ফলে কেল্টিক জাতি ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে এবং পর্ব্বতকন্দরে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অন্যান্য স্থানে কেল্টিক জাতির সকল প্রকার স্বাতন্ত্র নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ফ্রান্সের ব্রিটানী, ইংল্যাণ্ডের ওয়েলস্ ও কর্ণওয়াল, স্কটল্যাণ্ড, এবং আয়র্ল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে টিউটনিক সভ্যতা হইতে দূরে লুক্কায়িত থাকিবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছিল। এজন্য কেল্টিক সভ্যতার বিশেষত্ব এই সকল স্থানে রক্ষিত হইতে পারিয়াছে।

প্রাচীনকালের সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডের জাতীয় জীবন ও আদর্শ বুঝিবার উপায় এক্ষণে বেশী নাই। কারণ গ্রীক, রোমীয় এবং টিউটনিক সভ্যতার সংমিশ্রণে অথবা চাপে পড়িয়া কেল্টিক আদর্শের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ওয়েলস্, আয়র্ল্যাণ্ড, ব্রিটানী ইত্যাদি জনপদে তাহার সাক্ষ্য এখনও পাওয়া যায়। এজন্য এই সকল দেশেই বর্ত্তমানকালে নব্য কেল্টিক রেনাস্যাঁস দেখা যাইতেছে। এই রেনাস্যাঁসের ফলে প্রাচীনতম ইউরোপীয় সভ্যতারই পুনরভ্যুদয় হইতেছে।

আইরিশজাতি তাঁহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বহুকষ্টে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। সাতশত বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের উপর বিদেশীয় সভ্যতার কঠোর আবরণ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাঁহাদের উৎসব, আমোদ, সঙ্গীত, নৃত্য, ক্রীড়াকৌতুক সকল বস্তুই যথাসম্ভব ধ্বংস করা হইয়াছে। এমন কি তাঁহাদের ভাষা পর্য্যন্ত রক্ষা পায় নাই। ইহাঁরা বিদেশীয় ভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ এই সাতশতাব্দীর ভিতর যে কয়জন স্বদেশসেবক আয়র্ল্যাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা কেহই প্রকৃত স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার ধ্বজা

তুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে মাত্র।—পূর্ব্বে খড়্গযুদ্ধ করিতেন, গত শতাব্দীতে পার্ল্যামেণ্টে constitutional agitation বা বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছেন।

উনবিংশশতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিগত ২০।২৫ বৎসরের ভিতর আয়র্ল্যাণ্ডে যথার্থ "জাতীয় আন্দোলনের" সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন সাহিত্যসেবীর চেষ্টায় আয়র্ল্যাণ্ডে "গেলিক-লীগ" নামক ভাষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়। ইহাঁরা প্রধানতঃ দুই কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ, আইরিশদিগের প্রকৃত মাতৃ-ভাষা সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় গেলিক ভাষার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। দেখিতে দেখিতে লেখক, কবি, গায়ক, সম্পাদক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোকই আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষায় রচনা প্রকাশ করিতে ব্রতী হন। বর্ত্তমানে এই ভাষা-পরিষদের ১০০০ শাখা আয়র্ল্যাণ্ডের নানা কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহাঁদের অধীনে ১০০ পর্য্যটক গেলিক ভাষায় জ্ঞানপ্রচার করিয়া বেড়ান। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি শিক্ষক-বিদ্যালয়ও ইহাঁরা পরিচালনা করিতেছেন। তাহার সাহায্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া শিক্ষকেরা উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন ভাষা এই উপায়ে নবজীবন লাভ করিয়া জাতীয়তার পুষ্টিবিধানে সাহায্য করিতেছে।

"গেলিকলীগের" দ্বিতীয় কর্ম্ম লোকসাহিত্যের প্রচার। ইহাঁরা দেশের অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীতবাদ্য, এবং রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এইগুলির অধিকাংশই প্রাচীন কেল্টিকজীবনের নিদর্শন। কেল্টিক আদর্শ এই উপায়ে আয়র্ল্যাণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে

পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রচার কার্য্যের জন্য ইঁহারা প্রতিবৎসর নানা স্থানে নানা প্রকার মেলা, সম্মিলন, সভা, প্রদর্শনী, ভোজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। এইসকল উৎসব উপলক্ষ্যে খাঁটি স্বদেশী রীতি অনুসারে নাচ গান, হাস্যকৌতুক, রসিকতা, রঙ্গরস, নাটকাভিনয়, খেলাধূলা,ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ফলতঃ কেল্‌টিক জগতের আব্‌হাওয়া বহুল পরিমাণে নব্য আইরিশ সমাজে সৃষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত জনগণের রীতিনীতিকেই জাতীয় সম্পদ্‌জ্ঞানে আদর করিতেছেন।

নিম্নশ্রেণী এবং জনসাধারণের ভাষাও ইঁহারা উচ্চ-সাহিত্যে ব্যবহার করিতেছেন। নব্য আয়র্ল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটককার তাঁহার The Playboy of the Western World নামক ব্যঙ্গনাট্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"In writing *The Playboy of the Western World* as in other plays I have used one or two words only that I have not heard among the country people of Ireland, or spoken in my own nursery before I could read the newspapers. A certain number of the phrases I employ I have heard also from herds and fishermen along the coast from Kery to May, or from beggar-women and ballad singers nearer Dublin; and I am glad to acknowledge how much I owe to the folk imagination of these fine people. * * * When I was writing *The Shadow of the Glen*, some years ago, I got more aid than any learning could have given me from a chink in the floor of the old Wicklow house where I

was staying, that let me hear what was being said by the servant girls in the kitchen."

কেবল তাহাই নহে। কেণ্টিক জগতের অন্তঃকরণও যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহার জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাই নব্য আইরিশ ভাবুকগণের অসাধারণ কর্ম্মপটুত্বের পরিচয়। ইহাঁরা এজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। পূরাদমে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহাঁরা কেণ্টিক আদর্শ বর্ত্তমান চিন্তাক্ষেত্রে ও সাহিত্যমণ্ডলে বিকীর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এরূপ কঠোর প্রয়াস বোধ হয় জগতে আর কোন সাহিত্যমণ্ডলী করেন নাই—এবং এরূপ উদ্যমের ফলতা লাভও এত শীঘ্র আর কোথাও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

লোকসাহিত্য, প্রবাদ, প্রবচন, কাহিনী, উপকথা, এবং জনগণের সংস্কার অবলম্বন পূর্ব্বক কাব্য, নাট্য ও গদ্য রচনা করিতে অগ্রসর হইলে সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করিতে পারা যায়। জার্ম্মাণ সাহিত্যে হার্ডার এরূপ করিয়াছিলেন। নব্য আয়র্ল্যাণ্ডের কবিকুল তাহাই করিয়াছেন। লোকেরা যে সকল গল্প ছেলেবেলায় শুনিয়াছে, ঠাকুরমার ঝুলির ভিতর যে সমুদয় গল্পগুজব সাধারণতঃ থাকে, আবহমানকাল হইতে যে সমুদয় কথা দেশমধ্যে চলিয়া আসিতেছে নব্য আইরিশ ভাবুকগণ সেই সমুদয় লইয়াই উৎকৃষ্ট গদ্য, কাব্য ও নাট্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নূতন সাহিত্য রচনার জন্য ইহাঁরা যথার্থ মাতৃভাষার ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ ইহা এখনও পূরাপূরি বাঁচিয়া উঠে নাই। আয়র্ল্যাণ্ডে ইংরাজী ভাষাই এখন পর্য্যন্ত অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই ইহাঁরা ইংরাজীতে এই সমুদয় কবিতা ও নাটক রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তাহা ছাড়া প্রাচীন কেণ্টিক সাহিত্যে যে সকল উপাখ্যান সুপ্রচলিত

ছিল ইহাঁরা সেইগুলিও নূতন ভাষায়, নূতন ছন্দে, নূতন আকারে প্রকাশ করিতেছেন। সেই বীরগাথাসমূহের আধুনিক ইংরাজী সংস্করণই নব্য কেল্টিক আন্দোলনের বিশিষ্ট মূর্ত্তি। রাসেল বলেন, "হোমারের সাহিত্যই তাঁহার পরবর্ত্তীযুগে ইস্কীলাস, সফক্লীস, ইউরিপিডিস ও য়্যারিষ্টফেনিস নূতন আকারে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যই পরবর্ত্তীযুগে কালিদাস-ভবভূতি-মাঘভারবির গ্রন্থে নূতন আকারে প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন কথাবস্তুর ভিতর নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিলে নূতন কলা সৃষ্টি হয়—অথচ জাতীয় জীবনের পারম্পর্য্য এবং ঐক্যও রক্ষিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আয়র্ল্যাণ্ডের বীরগাথা রচিত হইবার পর সেগুলিকে নূতন আকার প্রদান করিবার সুযোগ ২৫০০ বৎসরের ভিতর আমরা পাই নাই। কোনমতে সেগুলি লোকমুখে বিকৃতভাবে বাঁচিয়া গিয়াছে মাত্র। অথবা তাহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথির ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু সেই লুক্কায়িত ভাণ্ডার ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের বহু উপাদান পাওয়া যাইবে।

এই বুঝিয়া আমরা "জাতীয় রঙ্গমঞ্চ" স্থাপন করিয়াছি। সেই সকল জাতীয় উপাখ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক নাটক রচনা করিবার জন্য আমাদের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবীদিগকে আহ্বান করা হয়। সেই নাট্যাবলীর অভিনয় এই মঞ্চে দেখান হইয়া থাকে। বিগত ১৫ বৎসরের ভিতর এই উপায়ে শতাধিক জাতীয় নাট্য অভিনীত হইয়াছে।"

এই সকল বীরগাথার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। O Gradyকৃত গদ্য অনুবাদ-গ্রন্থসমূহের একখানার ভূমিকায় লিখিত আছে :—

"There are three great cycles of Goelic literature. The

first treats of the gods, the second of the Red Branch Knights of Ulster and their contemporaries ; the third is the so-called Ossianic. Of the Ossianic, Finn is the chief character ; of the Red Branch cycle, Cuculain, the hero of our tale.

Cuculàin and his friends are historical characters, seen as it were through mists of love and wonder, whom men could not forget, but for centuries continued to celebrate in countless songs and stories. They were not literary phantoms. but actual existences. * * * And as to the gigantic stature and superhuman prowess and achievements of those antique heroes, it must not be forgotten that all art magnifies, as if in obedience to some strong law : and so even in our own times, Grattan, where he stands in artistic bronze, is twice as great as the real Grattan thundering in the Senate. * * * * * *

I have endeavoured so to tell the story as to give a general idea of the cycle, and of primitive heroic Irish life as reflected in that literature, laying the cycle so far as accessible, under contribution to furnish forth the tale."

"জাতীয় রঙ্গমঞ্চে" নাটকগুলি ইংরাজীভাষাতেই অভিনীত হয় সত্য—কিন্তু ইহার ফলে সমগ্র আইরিশ জাতির চিন্তা নূতন পথে ধাবিত হইয়াছে। গেলিক ভাষা দেশের ভিতর পুনরায় সুপ্রবর্ত্তিত হইতে

পারিবে কি না সন্দেহ কিন্তু প্রাচীন কেল্টিক সাহিত্যের বীররস, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ভাবুকতা এবং ব্যক্তিত্ববাদ 'Gigantic stature', বিপুল উদ্যম, "superhuman prowess", ইত্যাদি লক্ষণ নব্য আইরিশ জাতির মজ্জাগত হইতে চলিয়াছে। প্রাচীন ভাষা ফিরিয়া না আসিলেও প্রাচীন সাহিত্য ইতিমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

আয়র্ল্যাণ্ডের স্বদেশী আন্দোলনে ইউরোপে কেল্টিক আদর্শের পুনরভ্যুদয় হইল। ভারতীয় ভাবুকগণও আইরিশকে জগতে নবযুগ আনয়নের সহযোগী পাইলেন।

আয়র্ল্যাণ্ডের নবজীবন ও কেল্টিক আন্দোলন বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষ সাহায্য করিবে—

(১) ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ Paul-Dubois এর Contemporary Ireland.

(২) Captain Francis O'neill এর Irish Minstrels and Musicians.

(৩) আমেরিকান Weutz এর The Fairy Faith in Celtic Countries.

(৪) Hyde এর Literary History of Ireland.

(৫) Sophie Bryant এর The Genius of the Gael.

১৮৭০ সালের ইয়োরোপ

ইউরোপে লড়াই বোধ হয় বাধিল। রাষ্ট্র-মণ্ডলের শত্রুতা মিত্রতা বাহির হইতে বুঝা কঠিন। প্রতি মুহূর্ত্তে শত্রুতা মিত্রতার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আজ যে তোমার সহায় কাল সে তোমার বাধা। আজ যে তোমার শত্রু কাল সে তোমার সম্পদে বা বিপদে উদাসীন। ইহা দুনিয়ার নিয়ম। এই জটিলতাময় রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন মূল সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কি? নিশ্চয়ই যায়—তাহা এই যে, প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বার্থ রক্ষা ও পুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

লড়াই বাধিয়াছে শুনিয়া লোকেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করে—"যুদ্ধের কারণ কি? কাহার সর্ব্বনাশ কে করিয়াছে যে লড়াই সুরু হইল?" বাস্তবিক পক্ষে, লড়াইয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। দুনিয়ায় যত লড়াই হইয়াছে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। একটা সোজা কারণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই—স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। "কথা-মালা"র সিংহ ও মেষশাবকের গল্প সকলেরই মনে আছে। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাওদিগের আমল হইতে বিসমার্কের উত্তরাধিকারী নব্য নেপোলিয়নের যুদ্ধঘোষণা পর্য্যন্ত সেই এক কথা। "আমি সিংহ, তুমি মেষশাবক—সুতরাং যুদ্ধং দেহি।" ইহা ছাড়া লড়াইয়ের অন্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না তাহা বুঝিবার জন্য International Law বিষয়ক তাড়া তাড়া গ্রন্থ ঘাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়, প্রত্যেক

লড়াই সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য—"কে সিংহ, কে মেষ-শাবক ?" কারণ আজ যে মেষ কাল সে হয় ত সিংহ।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বার্থসিদ্ধি কতকগুলি উপায়ে হইতেছিল। আজ আমি সেই সকল উপায় বর্জ্জন করিয়াছি—এক্ষণে নূতন সমস্যা হয়ত উপস্থিত হইয়াছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমার বিগত সফলতার প্রভাবে জগতের লোকেরা আমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গতি নূতন দৃষ্টিতে দেখিতেছে। যাহারা পূর্ব্বে আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিত না তাহারা হয়ত আমার সফলতায় ভীত হইয়া উঠিয়াছে। অথবা আমরাই সফলতার প্রভাবে নূতন উদাসীন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছি। কাজেই পুরাতন "ডিপ্লমেসী," পুরাতন রাষ্ট্র-বন্ধন, পুরাতন আদানপ্রদান এক্ষণে বর্জ্জন করিতেই হইবে। নূতন অবস্থা অনুসারে নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতিগত সম্বন্ধে সর্ব্বদা এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ইউরোপে বিপুল একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ঘটিয়াছিল ১৮৬৫-১৮৭০ সালের ভিতর। তাহার পরেও দুই একটা বড় বড় ঘটনা হইয়াছে। তাহার দ্বারা তুরস্ক এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর ইউরোপের মানচিত্র ১৮৭০ সালের সীমাবিভাগ অনুসারেই এখনও অঙ্কিত হইয়া থাকে।

সেই সময়ে ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া এই চারিটি নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। উহা ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, বিসমার্কের যুগ। সেই সময়কার প্রধান ঘটনা—জার্ম্মাণিতে এবং ফ্রান্সে লড়াই। কিন্তু প্রশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতাই সেই যুগের ইতিহাসের কেন্দ্র কথা। মধ্য ইউরোপে প্রশিয়া কর্ত্তা থাকিবেন কি অষ্ট্রিয়া কর্ত্তা থাকিবেন তাহার মীমাংসা বহুকালাবধি হইতেছিল। ১৮৭০ সালের

ঘটনায় জার্ম্মাণভাষাভাষী নরসমাজ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল। একখণ্ডের কর্ত্তা হইলেন প্রশিয়া তাহাই নব্য জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য। বিগত ৪৪ বৎসরে ইহাঁরা সমগ্র জগতের আশঙ্কাস্থল হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য রুশিয়া ও ইংলণ্ড ইহাঁদের প্রবল শত্রু।

আর এক খণ্ডের কর্ত্তা থাকিলেন অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়াকে নানা ভাষাভাষী এবং নানা ধর্ম্মাবলম্বী সমাজের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইল। এরূপ অনৈক্যপূর্ণ বিভিন্নতাময় দুর্ব্বল রাষ্ট্র ইউরোপে আধুনিককালে আর নাই। নানা প্রকার গৃহবিবাদ মীমাংসা করা ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। সম্প্রতি এই সাম্রাজ্য অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী নামে পরিচিত। ইহার ফলে হাঙ্গারীর ম্যাজিয়ার জাতি অনেকটা সন্তুষ্ট রহিয়াছে। অথচ ইহার প্রজাবৃন্দ মধ্যে বহুসংখ্যক লোকই স্লাভনীয় জাতিসম্ভূত। তাহারা রুশের ভ্রাতা ও ভগ্নী—বল্কানজাতীয়দিগেরও আত্মীয়। ইহাদিগকে দাবিয়া রাখিতে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী যত্নবান্।

এতগুলি পরস্পরবিরোধী সমাজের সমন্বয়সাধন করিয়া উঠা সহজ কথা নয়। তাহা না পারিলে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধেই বা প্রতিহিংসা লওয়া হইবে কি করিয়া? কাজেই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী আর মাথা তুলিয়া জার্ম্মাণির বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারেন নাই। অধিকন্তু ফ্রান্সকে সেডানের যুদ্ধে খর্ব্ব করিয়া জার্ম্মাণি ইউরোপের প্রবলতম শক্তি হইয়া পড়িলেন। সুতরাং অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণির সঙ্গে শত্রুতার পরিবর্ত্তে মিত্রতা রক্ষা করাই শ্রেয়জ্ঞান করিলেন।

এদিকে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে হাত বাড়াইয়া চলিলেন। এই খানেই স্বাধীন স্লাভনীয়দিগের সঙ্গে বিরোধ। কোন সময়ে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী কোন ক্ষুদ্র স্লাভরাষ্ট্রের বন্ধু—কোন সময়ে তাহার ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীর সহায়ক। সার্ভিয়াও দুই একবার অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর সাহায্য

পাইয়াছেন। এই উপায়ে স্লাভনীয়দিগকে নানা স্বাধীন অথচ নগণ্য রাষ্ট্রে বিভক্ত রাখা অষ্ট্রিয়ার "সাম্রাজ্য-নীতি"র লক্ষ্য থাকিল। ফলতঃ স্লাভনীয়দিগের ভিতর কিয়দংশ সাম্রাজ্যের বিজিত প্রজা থাকিল, কিয়দংশ ইহার Protected বা রক্ষিত রাজ্য হইল, কিয়দংশ দূরে পড়িয়া কিছু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মোটের উপর স্লাভনীয় জাতির দুর্দ্দশা বাড়িতে লাগিল। অধিকন্তু, তুরস্ক হইতে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা এবং তুরস্ককে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করার প্রবৃত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্লাভনীয় রাষ্ট্রের অন্তরে সর্ব্বদাই বিরাজমান। তাহার চরম দেখা গিয়াছে সেদিনকার বল্কান-সমরে। দেখা যাইতেছে,—ক্ষুদ্র স্লাভনীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রথম শত্রু অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী এবং দ্বিতীয় শত্রু তুরস্ক। এই দুয়ের মধ্যে ইহাদের জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে। অথচ ইহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অপারগ। এই অনৈক্য পুষ্ট করা অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্কের স্বার্থ। কাজেই বিগত বল্কান সমরে তুরস্কের একমাত্র খ্রীষ্টান বন্ধু ছিলেন—অষ্ট্রিয়া এবং তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু জার্ম্মাণি। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে জার্ম্মাণেরা মুসলমানদিগকে সাহায্য করেন নাই—কিন্তু সকলেই তাঁহাদের সহানুভূতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বল্কান সমরে স্লাভনীয়েরা এক ঢিলে দুই পাখী মারিতেছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা যুক্ত স্লাভ-রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করিয়া কেবল তুরস্ককে পরাজিত করিলেন। দ্বিতীয়তঃ অষ্ট্রিয়ার হৃদয়েও ইহাঁরা মহা ভয় সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন। এখনও যুক্ত-স্লাভরাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নই আজকালকার যুবক স্লাভের প্রাণ।

১৮৭০ সালের গোলমালে ইউরোপে একটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল—তাহাই ম্যাজিনির ইতালী। একটি নগণ্য রাষ্ট্র সাম্রাজ্যে পরিণত হইল—এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভ ইহারই কপালে আসিল। তাহার নাম

জার্ম্মাণি। ডেন্‌মার্ক এবং ফ্রান্সের কোন কোন জেলা জার্ম্মাণি কাড়িয়া রাখিলেন। এই খানেই ভবিষ্যৎ গোলযোগের বীজও থাকিয়া গেল। ফরাসীজাতির চূড়ান্ত অধোগতি সাধিত হইল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-গৌরব হইতে ফ্রান্স ইউরোপের 'পতিত' জাতির পদে অবনত হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইল অষ্ট্রিয়ার। প্রথমতঃ, প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী চিরগোলাম ইতালীর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহাঁরা "হঠাৎ বড়" জাতি প্রশিয়ার নিকট পরাজিত হইয়া ম্যাজিয়ার স্লাভনীয় ক্রোশিয়ান ইত্যাদি অৰ্দ্ধসভ্য জাতি-পুঞ্জের সঙ্গে সমভাগ্যে গ্রথিত হইলেন। একে অপমান ও লোকসান—তাহার উপর নূতন সাম্রাজ্য গঠনে অসংখ্য বিঘ্ন। গত ৪৪ বৎসর ধরিয়া অষ্ট্রিয়ার এই "ট্র্যাজেডি" চলিতেছে। বৰ্ত্তমানে আমরা এই ট্র্যাজেডির"ই মীমাংসার প্রয়াস দেখিতেছি। বস্তুতঃ অষ্ট্রিয়ার বেদনাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। সার্ভিয়ার সঙ্গে সমরে অষ্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইতেছে। ১৮৭০ সালের ব্যবস্থা নিতান্তই অস্বাভাবিক—তাহা স্থায়ী হইতে পারে না।

এই যুক্ত-স্লাভ-রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নে এবং প্রয়াসে একজন বন্ধুও ইহাঁরা পাইয়াছেন। যে সে বন্ধু নন—সমগ্র ইউরোপের আশঙ্কাস্থল প্রবল পরাক্রান্ত রুশ। রুশ এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইনি ইহাঁদের অভিভাবক ও সংরক্ষক। তুরস্কের কন্‌ষ্টান্টিনোপল দখল করিয়া প্রাচ্য ভূমধ্যসাগরের কর্ত্তা হওয়া রুশিয়ার জীবনব্যাপী সাধ—পিটার দি গ্রেটের আমল হইতে এই আকাজ্ক্ষা। কিন্তু এই আকাজ্ক্ষা চরিতার্থ হইলে রুশিয়ার প্রতাপে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রই বাঁচিবে না। এই ভয়ে ইউরোপীয়েরা প্রথম হইতেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য তুরস্ককে বড়

হইতে না দেওয়াই ইহাঁদের ইচ্ছা—তুরস্ক কোনমতে জীবনধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেই রুশিয়ার দুয়ার বন্ধ করা হইতে পারে। এজন্য তুরস্ককে যেনতেন প্রকারেণ ফ্লানেল জড়াইয়া বাঁচাইয়া রাখা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবীরেরা নীতির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইহারা নাম Eastern Question.

বলা বাহুল্য প্রথমতঃ রক্তের টানে রুশিয়ার সঙ্গে ক্ষুদ্র স্লাভনীয়দিগের বন্ধুত্ব। কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় টান স্বার্থের টান। কারণ বল্কানের স্লাভনীয়েরা তুরস্ককে সর্ব্বদা ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া রাখিলে রুশিয়ার কার্য্যই সস্তায় সারা হয়। এজন্য যুক্ত-স্লাভ-রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসে রুশিয়া বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ইহার ফলে রুশিয়া আজ অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির প্রবল শত্রু, এবং ইহাঁরা তুরস্ক ও মুসলমান জাতির সহায়ক।

বাস্তবিক পক্ষে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণি বর্ত্তমান রাষ্ট্রমণ্ডলে একাকী পড়িয়াছেন। ইউরোপের এই নব্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমস্ত জগৎ ব্রতবদ্ধ। কাগজে কলমে ইতালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু ইতালীর সহায়তার উপর কি অষ্ট্রিয়া নির্ভর করিতে পারেন? প্রথমতঃ ইতালী অষ্ট্রিয়ার দখল ছাড়াইয়া সেদিন মাত্র স্বাধীন হইয়াছেন। অষ্ট্রিয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। তাহা ছাড়া য়্যাড্রিয়াটিক সাগরে বন্দর ও বাণিজ্য লইয়া অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইতালীর নূতন মামলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অষ্ট্রিয়ায় ও ইতালীতে যে একটা বন্ধুত্ব হইতে পারিয়াছে তাহাই আশ্চর্য্যের কথা!

ফ্রান্সের ত কথাই নাই। ১৮৭০ সালের ঘা খাইয়া ফরাসী নিতান্ত নীরব রহিয়াছেন। সে আঘাত ভুলিয়া থাকা বড়ই কঠিন। কারণ ফরাসী ভাষাভাষী দুইটি জেলা জার্ম্মাণি ফ্রান্স হইতে কাড়িয়া রাখিয়াছেন।

এ নিদারুণ শোক ফরাসী কোন দিন ভুলিতে পারিবেন কি ? কিন্তু কোন উপায় নাই। কাজেই ফ্রান্স জার্ম্মাণ-শত্রু রুশের বন্ধু হইয়াছেন।

রক্তের টানে জার্ম্মাণেরা একদলভুক্ত, এবং স্লাভনীয়েরা আর একদল-ভুক্ত। এই দুইদলের শত্রুতাই বর্ত্তমান রাষ্ট্রমণ্ডলের প্রধান কথা। ফরাসী আত্মরক্ষার জন্য রুশিয়ার সাহায্য ও ইংলণ্ডের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। এদিকে ইংলণ্ডের বন্ধু জাপান এবং পর্ত্তুগাল আমেরিকা, চীন এবং আফ্রিকায়ও ইহাঁদের সকলের উপনিবেশও রহিয়াছে।

ঘটনাচক্রে জাপান আজ রুশিয়ার মিত্র হইলেন! রুশিয়াও আজ ইংল্যাণ্ডের বন্ধু! এবং ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সহায়ক!

কিন্তু রুশিয়া, জাপান, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিলন অতি বীভৎস ব্যাপার। এ মিলন-চক্র কতদিনের সৃষ্টি ? ১৯০৫ সালে এশিয়ার জাগরণের পর। প্রকৃত প্রস্তাবে মাত্র ৩।৪ বৎসর হইল এই আজীবন শত্রুগণ মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বিগত ৩।৪ বৎসরের ভিতর ইহাঁদের যথার্থ মিলন ঘটিয়াছে কি ? কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—"ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলের জাতিবিভাগগুলি আর বেশী দিন বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিতে পারিবে কি ?"

বর্ত্তমান লড়াইয়ের ফল যাহাই হউক না কেন, রাষ্ট্রমণ্ডলের ভারকেন্দ্র যথাপূর্ব্বং তথাপরং থাকিবে না। অনতিদূর ভবিষ্যতেই বিশ্বশক্তির নূতন সমাবেশ ঘটিতে বাধ্য। যাহাহউক স্লাভনীয় ও জার্ম্মাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলমাত্র এই দুই জাতির ভিতরই আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড এই পাকের ভিতর আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইবেন।

এদিকে তুরস্কও সুযোগ পাইয়া স্লাভনীয় প্রদেশের কোন অংশ হস্তগত করিতে চেষ্টিত হইবেন না কি ? তাহার উপর, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর অভ্যন্তরে যে সকল বিজিত স্লাভনীয় প্রজা রহিয়াছে তাহারাই বা কি বিদ্রোহী

হইবে না? অধিকন্তু, ত্রিধা বিভক্ত পোল্যাণ্ডের লোকেরাও কি এই সুযোগে চুপ করিয়া থাকিবেন?

সুতরাং লড়াই যদি সত্যসত্যই বাধে তাহা হইলে ইউরোপ বিরাট কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তাহার ফল এশিয়া এবং আফ্রিকায়ও দেখিতে পাইব। কোন ফরাসী সংবাদপত্রে দেখিতেছি—Timesএর অনুবাদ:—

It is a question of nothing less than the entire changing of the map of Europe, analogous to the change which followed the war of 1864, the war of 1866, and the war of 1870 At bottom it is not Servia which is now at stake, it is not even Europe; it is the balance of Power in Europe. If France, Russia, and England, forgetting history and renewing a capital error, allowed Servia to be strangled in 1914, as they allowed Denmark to be despoiled in 1864, they would be committing suicide.

ইংরাজ রাষ্ট্রবীরগণ মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন। জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রুশিয়াকে সাহায্য করিলে রুশিয়া বল্কানে বলবান হইবেন। অথচ রুশিয়াকে বড় করিয়া ইংরাজের লাভ কি? নিজের প্রকৃত শত্রুকেই বড় করা হইতেছে না কি?

ফরাসীরা ইংরাজকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—"যুদ্ধ না করিলে ইংরাজকে জার্ম্মাণেরা দুর্ব্বল বিবেচনা করিবে, এবং ফ্রান্স একবার জার্ম্মাণির হস্তগত হইলে ইংরাজের স্বদেশ রক্ষা কঠিন হইবে।" এদিকে জার্ম্মাণেরা বলিতেছেন, "ইংরাজেরা

রুশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজপায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। না হয় আমরা ধ্বংস হইলাম, এবং রুশিয়া জয়লাভ করিল! কিন্তু তাহার পর কি হইবে? ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষা তখন অসম্ভব হইয়া পড়িবে যে!" কাজেই ইংরাজকে ভাবিতে হইতেছে—"কোন্ পথে চলি?—স্বদেশ রক্ষা, না সাম্রাজ্য-রক্ষা?" অথচ সাম্রাজ্য রক্ষা না হইলে ইংরাজের স্বদেশ রক্ষাও অসম্ভব। অবশ্য ইঁহাদের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা—শান্তি। দেখা যাউক, ইংরাজরাষ্ট্রবীরেরা মাথা ঘামাইয়া কোন্ পথ বাহির করেন।

সেদিন এখানে আর একবার নাটকাভিনয় দেখিলাম। পালার নাম A Royal Divorce. নেপোলিয়নের বিবাহিত জীবনের এক কলঙ্ক এই নাটকের আলোচিত বিষয়। সাম্রাজ্যনীতির বশবর্ত্তী হইয়া দিগ্বিজয়ী বীর প্রথম পত্নীকে বর্জ্জন করিলেন। প্রথম পত্নী সামান্য ঘরের কন্যা—তাঁহার পরিবর্ত্তে এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করা হইল। নাট্যকার নেপোলিয়ান চরিত্রের এই পাপ অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই পাপের ফলেই প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাটের অধঃপতন হইল তাহাও বিশেষরূপেই বুঝান হইয়াছে।

অষ্টার্লিট্‌জের গৌরবের পর নাটকের কার্য্যাবলী আরব্ধ—রুশিয়া হইতে পলায়ন-দৃশ্যই রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান চিত্র—অবশেষে ওয়াটার্লু ও সেণ্ট হেলেনা। কবি দেখাইয়াছেন যে নিরপরাধ পত্নীবর্জ্জনের পরক্ষণ হইতেই নেপোলিয়নের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত।

পারিবারিক জীবনের শৈথিল্য রাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও অধঃপতনের কারণ—গৃহস্থালী সম্বন্ধে ব্যভিচারী ও অত্যাচারী হইলে জীবনের কোন বিভাগেই উন্নতি হয় না। এই উপদেশ পাইয়াই দর্শকমণ্ডলী গৃহে ফিরিলেন। ঐতিহাসিক ভাবে নেপোলিয়ান-বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে গেলে হয়ত জাগতিক জয় পরাজয়ের অন্য ব্যাখ্যা দিতে হইবে। কিন্তু কবি এখানে

সমস্যাটা অতি সরলভাবে গ্রহণ করিয়া একটি সরল মীমাংসা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রদান করিয়াছেন। বিলাতী সমাজে পারিবারিক জীবনের এইরূপ মাহাত্ম্যকীর্ত্তন বর্ত্তমান যুগে নিতান্তই আবশ্যক। কবি এ বিষয়ে অতি উচ্চ আদর্শই প্রচার করিয়াছেন।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হইল রামায়ণ রঘুবংশের "সীতা-বর্জ্জন"-অধ্যায়ও বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক করুণ ও শিক্ষাপ্রদ নয়। হিন্দু রচনার সীতা-চরিত্র ইংরাজী সাহিত্যের জোসেফিন-চরিত্রকে নিষ্প্রভ করিতে পারিবে না।

"A Royal Divorce" নাটক সত্য সত্যই "সীতার বনবাস"-স্বরূপ। ইহা পাঠ করিয়া অথবা ইহার অভিনয় দেখিয়া সভ্যতাক্ষেত্রের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহার পরিবর্ত্তে মানবাত্মার ঐক্যই সর্ব্বত্র বিরাজিত—এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়।

পরদিন সকালে এই অভিনয়ের প্রশংসা কাগজে কাগজে দেখা গেল। এখানে নাটক-সমালোচনা কিরূপ হয় নিম্নের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে :—

"A ROYAL DIVORCE."

Last night the Gaiety Theatre was crowded by an enthusiastic audience, perhaps that is too strong, and so let one say a deeply interested audience, who welcomed the reappearance of "A Royal Divorce." After all, the best tribute to success is in dramatic matters what is known as a "long run." "Nothing succeeds like success," and here we have a play which has not only captured the interest of all sorts of infuriated critics,

but has held its own for years simply, if one may say it, by its own intrinsic merits. When Mr. W. W. Kelly brought this play round—now some years ago, to put it delicately—he, as well as one can remember, endeavoured to make it as distinctly effective as possible by the provision of an excellent company and all kinds of realistic embellishments. These were always of an artistic and impressive character, and now, after all these years of delightful association with "A Royal Divorce" and Mr. Kelly, the popularity of the former and the universal personal affection for the latter remain as strong as ever All the parts were admirably played, and, lest there should be any feeling of that which sometimes follows from lines of discrimination, let it pass that everybody in the audience was delighted, and the applause was great and frequent. The Josephine of Miss Agnes Verity was a distinctive attraction. Her performance was followed with the keenest interest, and she manifested a dramatic power quite apart and beyond what one has been associated with in this particular part. In fact, even those who had over and over again witnessed the play were deeply impressed by this lady's acting. If space permitted, one would like to emphasise her merits by reference to the particular parts

in which she most distinguished herself. Suffice it, however, to say that those who patronise the Gaiety during the week will find in her a charming Josephine and an absolutely perfect performance of "A Royal Divorce."

কৃষিকর্ম্মে সমবায়

আয়র্ল্যাণ্ড ইউরোপের "পেরিয়া"—অস্পৃশ্য জাতি। এই অবনত সমাজ হইতেও জগতের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ একটা অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে। আইরিশ জাতির কৃষিকর্ম্ম সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত স্থল। ইংরাজেরা ইহাঁদের নিকট শিক্ষা করেন, স্কচেরা ইহাঁদের নিকট শিক্ষা করেন। ভারতবর্ষের আধুনিক কৃষি-"সমবায়" আন্দোলনও আয়র্ল্যাণ্ড হইতে উদ্ভূত।

আয়র্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা মাত্র ৪৩ লক্ষ। বাঙ্গালা দেশের ছোট খাট তিন চারিটা জেলায় যত লোক সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডদ্বীপে তাহা অপেক্ষা বেশী নয়। আমাদের ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা আয়র্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যার দেড়গুণ। অথচ সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০০ জন ধুরন্ধরকে এই ক্ষুদ্র সমাজের কৃষিকর্ম্ম দেখিবার ও বুঝিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল! প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, নব্য আমেরিকায় যে পল্লীসংস্কার আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে তাহার আদর্শস্থল আয়র্ল্যাণ্ড। ব্রিটিশ পার্ল্যামেন্ট হইতেও যোগ্য লোক পাঠাইয়া আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষিপ্রণালী বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বুঝিয়া ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে ইহা প্রবর্ত্তিতও হইয়াছে। ইউরোপের নানা দেশ হইতে আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষিকর্ম্ম বুঝিবার জন্য লোক প্রায়ই আসিয়া থাকেন।

আমাদের ভারতবর্ষের এক্ষণে কৃষি-বিষয়ক সমবায় সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ডাব্‌লিনের "আইরিশ য়্যাগ্রিকাল্‌চার্য়াল অর্গ্যানিজেশন সোসাইটির" সম্পাদক বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের পন্থাই আপনারা

অনুসরণ করিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে স্যর ফ্রেডরিক নিকলসন আমাদের কার্য্য দেখিয়া যান। পরিদর্শনের ফল তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের নিকট সমর্পণ করেন। অবশ্য তাঁহার গ্রন্থে আয়র্ল্যাণ্ড ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের কার্য্য-প্রণালীও বিবৃত হইয়াছিল। নিকলসনের বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর ভারতের প্রদেশে প্রদেশে আইরিশ কৃষি-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।"

অবনত আয়র্ল্যাণ্ডের এই গৌরবসূচক আবিষ্কার বিগত ২৫ বৎসর-ব্যাপী কার্য্যের ফল। Irish Agricultural Organisation Society ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান আন্দোলন চলিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের দেশে কৃষকেরা ভূমির মালিক ছিল না। তাহাদিগকে ভূমির স্বত্ব প্রদান করিবার পূর্ব্বে কোন কৃষি সংস্কার সম্ভবপর ছিল কি?" ইনি বলিলেন, "উহাই আমাদের কৃষি-সমস্যার প্রধান কথা ছিল সত্য। কিন্তু কৃষকেরা ভূমির মালিক হইতে পারিলেই কি সকল গোল চুকিয়া যায়? খাজনা ত সকল দেশের কৃষককেই দিতে হয়? খাজনা দেওয়াই ত কৃষিকর্ম্মের একমাত্র বিঘ্ন নয়! নূতন নূতন প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম চালান আবশ্যক। চাষ আবাদ, পশুপালন ইত্যাদির সম্বন্ধীয় নূতন বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া কৃষিকর্ম্মের পরিচালনার নিয়মও পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।"

২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষকগণ অতি দুর্ব্বল ছিল। তাহাদের ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। বাজারের দরদস্তুর বুঝিয়া মাল জোগান তাহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কাজেই তাহারা বিদেশীয় কৃষকদিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে পারিত না। রুশিয়া এবং ডেনমার্কের ব্যবসায়ীরা ইংলণ্ডের বাজারে সস্তায় মাখন,

ডিম এবং অন্যান্য জিনিষ আনিতে পারিত। ইংলণ্ডের এত নিকট থাকিয়াও আয়র্ল্যাণ্ডের কোন উপকার হইত না।

কাজেই আইরিশ জাতিকে একটা নূতন ব্যবসায়-পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্বপ্রধান কৃষকের শক্তি সমবেত না করিতে পারিলে বর্ত্তমান যুগের বাজারে দাঁড়ান অসম্ভব। লোকেরা আজকাল সস্তায় মাল চায়, ভাল মাল চায় এতদ্ব্যতীত নিয়মিতরূপে একই ধরণের জিনিষ চায়। আমি একবার সস্তায় ভাল জিনিষ পাইলেই সুখী হই না। আমার নিকট প্রতিদিনই নিয়মিতরূপে যথাসময়ে আমার পছন্দসই জিনিষ আসিয়া উপস্থিত না হইলে আমার মন উঠিবে না। দুনিয়ার নিয়মই এই। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষকেরা দুনিয়ার এই নিয়মানুসারে মাল জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। তাহারা ভাল মাল সস্তায় দিতে পারিত বটে, কিন্তু একই ধরণের বেশী মাল যথারীতি জোগাইয়া উঠা ইহাদের অসাধ্য ছিল।

তাহাদের এই দুর্ব্বলতা কিসে নিবারিত হইবে? তাহারা পাইকারী ক্রেতাদিগের জুয়াচুরি এবং অসাধুতা বা প্রতারণা হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? বাজার খুঁজিয়া ভাল ক্রেতা তাহারা কিরূপে পাইবে? লোকের পছন্দসই মাল অধিক পরিমাণে তাহারা কেমন করিয়া জোগাইবে? নব্য বিজ্ঞানের সাহায্য তাহারা কি উপায়ে গ্রহণ করিবে? তাহাদের স্বার্থ দেশের কর্ত্তাদিগকে কিরূপে জানাইবে ও বুঝাইবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর ভাবিতে ভাবিতেই আইরিশ জন-নায়কগণ সমবায়-আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসরের ভিতর প্রচুর সুফল দেখিতে পাইতেছি। বিদেশীয়দিগকে পরাজিত করিয়া আইরিশ কৃষকেরা ইংলণ্ডের বাজার অনেকটা স্ববশে আনিতে পারিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে। ইঁহারা আইরিশ সমাজে একটা নূতন আদর্শও

আনিতে পারিয়াছেন। যথার্থ পল্লীসমাজ, পল্লীসভ্যতা এবং পল্লী-স্বরাজ এই দ্বীপে গড়িয়া উঠিতেছে। আইরিশ সমবায়-ধুরন্ধরেরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধার ধারেন না। ইঁহারা Nationalist দলের স্বরাজ-আন্দোলনেও বিশেষ প্রীত নন, আবার Unionist দলের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও বিচলিত নন। ইঁহারা বিবেচনা করেন যে যদি আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষিক্ষেত্রে সমবায়-নীতি অবলম্বিত হয় তাহা হইলেই আইরিশজাতির যথার্থ সুখ ও উন্নতির পথ প্রস্তুত হইবে। পল্লী-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে আয়র্ল্যাণ্ডে অন্য কোন স্বরাজের আবশ্যকতা থাকিবে না অথবা কোন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই প্রয়োজন হইবে না। "Agricultural Co-operation in Ireland—A plea for Justice by the I. A. O. S." নামক গ্রন্থে সম্পাদক বলিতেছেন:—

"Movements have souls as well as bodies, ideals as well as achievements, and the organisation movement has created new ideals in rural life. The societies stimulated by their leaders have set about the building up of a rural civilisation; village halls are springing up in connection with the societies and libraries are being promoted. The women are also being organised to promote industries peculiarly associated with womankind, to raise the standard of living in Ireland, and to brighten rural life. The dry bones of Economics are being clothed with humanity. Economics have become spiritualised in Irish air, and where other movements in other countries have thought only in terms of Gold,

Silver and Copper, in Ireland we have substituted the finer ideal of men, women and children, and made it our aim to create a true brotherhood of countrymen and women in Ireland, who forgetting political destructions, can work together in making Ireland a country no person would wish to emigrate from."

কৃষিকর্ম্ম বলিলে এ সকল দেশে পশুপালন, দুগ্ধব্যবসায়, মাখন, মাংস ও চর্ব্বির কারবার এবং মধু ও ডিমের চাষ বুঝা যায়। কোন কৃষকই কেবলমাত্র ভূমি কর্ষণকেই জীবিকালাভের একমাত্র উপায় বিবেচনা করে না। প্রত্যেকেই আনুষঙ্গিকরূপে শূকর পালন, অথবা মধুমক্ষিকার চাক-সৃষ্টি, অথবা ডিম সরবরাহ ইত্যাদি নানা কর্ম্ম করিয়া থাকে। কৃষি-সমবায়ের আন্দোলনে এই সকল ব্যবসায়ই লাভবান্ হইয়াছে।

পল্লীজীবন

আজ সমস্ত দিন ডব্লিনের বাহিরে কাটাইলাম। প্রায় ১০।৮০ মাইল দক্ষিণে একটা নূতন জেলায় গিয়াছিলাম। সমুদ্রের কূলে কূলে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে—প্রায় সমস্তই পার্ব্বত্য পথ।

এই জেলার ভিতর কৃষি-সমবায়-সমিতির অন্তর্গত কতকগুলি কারবার চলিতেছে। এখানকার পল্লী-কেন্দ্রের একজন সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি নিজেই একজন ধনী কৃষক—লোক লাগাইয়া নিজ ভূমির চাষ করাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া শূকরের ব্যবসায়ও আছে, ইনি "গেলিক লীগে"রও একজন পাণ্ডা। প্রাচীন সাহিত্য, উৎসব, ভাষা ও রীতিনীতি আয়র্ল্যাণ্ডে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার উৎসাহ ইঁহার যথেষ্ট। ইঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইয়া আয়র্ল্যাণ্ডের পল্লী-জীবন বুঝিতে পারা গেল।

কো-অপারেটিভ য়্যাগ্রিকাল্‌চার্য়্যাল সোসাইটির কার্য্যালয় দেখিলাম। পল্লীর কৃষকেরা সমবেত হইয়া এই "Store" বা দোকান খুলিয়াছে। প্রত্যেককে এজন্য Share বা অংশ কিনিতে হইয়াছে। এই অংশী-দারেরাই ইহার কর্ত্তা। চাঁদার টাকায় পাইকারীদরে সহর হইতে জিনিষ খরিদ করা হয়। সেই সকল জিনিষ এই ষ্টোরে জমা থাকে। সাধারণতঃ অংশীদারেরাই এই জিনিষ কিনিয়া থাকে। তাহাদের নিকট পাইকারী দরে বিক্রয় করা হয়। ষ্টোরের কর্ম্মচারীরা অংশীদারগণের মতানুসারে নিযুক্ত হন। তাঁহারা নিজেও কো-আপারেটর অর্থাৎ সমবায়পন্থী।

এই সমবায়-ষ্টোর স্থাপন করিয়া কৃষকেরা সস্তায় নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন এই সমবেত দোকান ছিল না তখন

ইহাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হইত। সহর হইতে মাল আনিতে অনেক দাম লাগিত। ভাল মালও পাওয়া যাইত না। পছন্দ অনুসারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য জুটান অসম্ভব হইত। এক্ষণে ইহারা হাল, লাঙ্গল, বীজ, শস্য, ঘোড়ার লাগাম, গাড়ীর আসবাব, খন্তা, খুরপী, বালতী, কৃত্রিম মৌচাক, পশু খাদ্য, ইত্যাদি সকল জিনিষই সহজে পাইতে পারে। এই দোকানের কর্ম্মচারীরা দূর হইতে এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ মাল খরিদ করিয়া আনেন। এজন্য সস্তায় পাওয়া যায়। কৃষক অংশীদারেরাও একটা বড় ষ্টোর নিজ পল্লীর ভিতর পাইয়া পছন্দসই জিনিষ কিনিবার সুযোগ পায়। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে ইহারা খুচরা দরের দাম পাইকারী দরেই দিয়া মাল আনাইত। এক্ষণে খুচরা ক্রয় করিয়াও সুবিধা পায়। কারণ ষ্টোরের যাহারা সমবেতরূপে মালিক তাহারাই ব্যক্তিগতরূপে ক্রেতা। ক্রেতা এবং বিক্রেতা একই লোক। কাজেই লাভ করিবার প্রয়োজন কি? ষ্টোরের কর্ম্মচারীরা সস্তায় মাল কিনিয়া আনিয়াছেন; সেই সস্তাদরেই তাঁহারা অংশীদারগণের নিকট বেচিতেছেন। সুতরাং ভাল মাল, সস্তামাল এবং পছন্দসই মাল ষ্টোরের সাহায্যে সমবায়পন্থীরা পাইতেছে।

কেবল তাহাই নহে। দোকান চালাইতে গেলে লাভ কিছু না কিছু হয়ই। নিতান্ত কম হারে লাভ জমাইলেও বৎসরান্তে অনেক টাকা জমিয়া যায়। এই পল্লীর ষ্টোরেও বৎসর বৎসর বেশ মোটা লাভ জমিয়া থাকে। এই লাভ কাহারা পায়? যাহারা ক্রেতা তাহাদিগের ভিতর বিভক্ত করা হয়। কৃষকেরা কিনিবার সময়ে সস্তায় মাল পাইয়া একবার লাভ করিয়াছে—আবার বৎসরান্তেও দ্বিতীয়বার লভ্যাংশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য কো-অপারেটিভ ষ্টোরের নিয়মে যে যত ক্রেতা সেই তত লাভের অধিকারী! তাহা ছাড়া অংশ ক্রয় করিবার ফলেও সুদ ত আছেই।

আয়র্ল্যাণ্ডের এই পল্লী-ষ্টোর দেখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের "কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি"-নিয়ন্ত্রিত পল্লী-সমবায়-সমিতির কথা মনে পড়িল। বাস্তবিক দুইই এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তবে এই ষ্টোরে কৃষক, পল্লীজীবন, কৃষিকার্য্য, পশুপালন, ইত্যাদি সম্পর্কিত দ্রব্য বেশী রাখা হয়। অন্যান্য কো অপারেটিভ-সমিতির দোকানে লোকজনের খাওয়া পরার জিনিষ বেশী থাকে। এই যা প্রভেদ। কিন্তু দুইই "সমবেত ক্রয়-সমিতি।" দুইয়ের কার্য্যপ্রণালীই একরূপ। দুই প্রতিষ্ঠানেই যাঁহারা অংশীদার অর্থাৎ ষ্টোরের মালিক অর্থাৎ দোকানের বিক্রেতা তাঁহারাই আবার ক্রেতা। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থে সাধারণতঃ যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে তাহা দেখা যাইতে পারে না।

এই দোকানের সকল বিভাগ দেখা হইয়া গেল। পরে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের গুদামে এতগুলি মূল্যবান্ কৃষিবিষয়ক যন্ত্র দেখিতেছি। কোনটার দাম ৪০০'৫০০৲। কিন্তু আপনাদের কৃষকেরা এগুলি ক্রয় করিতে পারে কি? করিয়াই বা লাভ করিবার সুবিধা আছে কি? কারণ একটা কলে দুইদিনের বেশী কাজ করিবার উপযুক্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র কয়জন কৃষকের থাকিতে পারে? অক্সফোর্ডে দেখিয়াছি একজন কৃষক মূল্যবান যন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু বৎসরের ভিতর এক সপ্তাহের অধিক কার্য্য ঐসমুদয় কলের সাহায্যে করা হয় না। কিন্তু আইরিশ কৃষকেরা এগুলি লইয়া কি করে?"

ইঁহারা বলিলেন, "সমবায়-পন্থী হইবার লাভই এই। এই ষ্টোরের টাকায় আমরা দামী যন্ত্রগুলি কিনিয়া রাখিয়াছি। এই সমুদয় যন্ত্র আমাদের কৃষকেরা কখনও পূর্ব্বে চোখে দেখে নাই। দেখিয়া থাকিলেও ইহাদের ব্যবহার জানিত না। ব্যবহার জানিলেই বা কি হইবে? ইহাদের দাম অত্যধিক। কোন একজন আইরিশ কৃষকের পক্ষে এগুলি

কিনিয়া কাজে লাগান আশাতীত। কিন্তু আমাদের ষ্টোর হইতে সকলেই ভাড়া করিয়া লইতে পারে। দুধ, মাখন, মাংস, আবাদ, ডিম, পাখী ইত্যাদি সকল কারবারের জন্যই যন্ত্র হাতিয়ার ইত্যাদি ভাড়া দিতে পারি। কৃষকেরাও সস্তায় বহুমূল্য যন্ত্রের সাহায্য পায়।”

কৃষি-সমাবায়ের আদর্শ অনুসারে ক্রয়-সমিতি বা ষ্টোর ভারতবর্ষে এখনও স্থাপিত হয় নাই। নব্য বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম এবং কলকব্জা ইত্যাদির ব্যবহার দরিদ্র পল্লীবাসীর সমাজে আর কোন উপায়ে প্রচলিত করা অসম্ভব। আয়র্ল্যাণ্ডের এই পল্লীতে কৃষি-সমবায়ের নিদর্শন প্রথম চোখে দেখিলাম। এতদিন পুঁথিগত বিদ্যা মাত্র ছিল!

সমবায়ের আন্দোলন আয়র্ল্যাণ্ডে একসঙ্গে বহু কার্য্যক্ষেত্রেই আরব্ধ হইয়াছে। সমবেত-ক্রয়-মণ্ডলীর কার্য্য পরিচালনা দেখা শেষ হইয়া গেলে কর্ম্মকর্ত্তারা অন্য বিভাগে লইয়া গেলেন। এইখানে সমবেত-বিক্রয়-মণ্ডলীর কার্য্য বুঝিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনাদের পল্লীর সকল কৃষকই কি তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য এখানে রাখিয়া যায়? আপনারা কি তাহাদের সকলের জন্যই বাজার বা ক্রেতা অনুসন্ধান করিয়া দেন?” ইঁহারা বলিলেন, “আমাদের লক্ষ্য তাহাই। তবে সকল বিভাগে এইরূপ বিক্রয় মণ্ডলীর কার্য্য সফল করিয়া উঠিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে আমরা কৃষকগণের নিকট হইতে নমুনা মাত্র আনাইয়া রাখিয়াছি। এই সকল নমুনা সমীপবর্ত্তী ক্রেতাদিগকে দেখাইয়া থাকি, তাহা ছাড়া দূরদেশেও পাঠাইয়া দর দস্তুর করিয়া দেই। ইহার ফলে কৃষকদিগের লাভের ক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা যে কোন দরে মাল ছাড়িতে বাধ্য হইত। বাজার বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না। সমবায়ের ফলে ইহারা বাজার যাচাই করিবার সময়, সুযোগ এবং কর্ম্মচারী পাইয়াছে।”

শুনিলাম আয়র্ল্যাণ্ডে মাখন ডিম এবং পাখীর কারবারে যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলীর কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়াছে। সস্তায় দূরস্থ বাজারে মাল চালান করা হইয়া থাকে। অনেকের মাল এক সঙ্গে পাঠান হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। তাহার ফলে সহজে তাজা জিনিষ দূরে সরবরাহ করা হইতেছে। বিক্রয়মণ্ডলীর ব্যবস্থায় মাল পাঠাইবার সুবিধা ছাড়া অন্যান্য লাভও পাওয়া যায়। যথাস্থানে মাল জমা রাখিয়া বেচিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দোকানদারেরা বেশী লাভবান হইবে—ইহাত সহজেই বুঝিতে পারি? যাহারা চাষ আবাদে মাল প্রস্তুত করিতেছে তাহারাই দোকানদার হইয়া ক্রেতার নিকট মাল পৌছাইতেছে। কাজেই দোকানদারীর লভ্যাংশ বাজে লোকেরা পাইতে পারে না। কৃষক নিজেই বণিক হইতে পারে। মাখন ও ডিমের ব্যবসায় আইরিশ কৃষকেরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে।

পূর্ব্বে আয়র্ল্যাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর ভিন্ন ভিন্ন কৃষকগৃহে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ডিম ও মাখন প্রস্তুত হইত। সকলগুলি একরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত না। তাহাদের বর্ণ ও স্বাদ বিভিন্ন প্রকার হইত। কিন্তু ইংরাজ ক্রেতারা আজ কাল বড় সৌখীন। তাঁহারা সামান্য মাত্র বিস্বাদ বা বিবর্ণতা পছন্দ করেন না। প্রতিদিন যথাসময়ে একই ডিম ও মাখন তাঁহাদের নিকট পৌছান চাই। বলা বাহুল্য আয়র্ল্যাণ্ডের স্বল্পপ্রধান কৃষকেরা এই বাজারের মাল জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। বিলাতের বাজারে দশ বিশ গণ্ডা করিয়া ডিম অথবা দেড় দুই সের মাখন পাঠাইলেই বা কি হইবে? এখানকার বাজারের বড় বড় মহাজনেরা সহস্র সহস্র মণ মাখন এবং লক্ষ লক্ষ ডিম প্রতিদিন ক্রয় করেন। এই মহাজনদিগের নিকট হইতে পাইকারী দোকানদারেরা মাল লইয়া যায়। সেখান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সহরের দোকানে, হোটেলে ও গৃহস্থগৃহে ডিম

ও মাখন উপস্থিত হয়। সুতরাং বিলাতের বাজারে কারবার করিতে হইলে সেই বড় বড় মহাজনদিগের সঙ্গে দর যাচাই করিতে হইবে। তাঁহারা ২।৪।১০ গণ্ডা ডিমের জোগানদারের সঙ্গে কথা বলেন না—২।৪ সের মাখনের দর যাচাই করিবার সময় তাঁহাদের নাই। সুতরাং আইরিশ কৃষকগণকে মহাসমস্যায় পড়িতে হইয়াছিল। ইহাঁদের দেশে মাখন এবং ডিম প্রচুর পরিমাণেই হইত। ইহাঁদের বাজারও অতি সন্নিকটেই ছিল। অথচ বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও রুশিয়ার কৃষকেরা ইংরাজ পরিবারের অভাব মোচন করিতেছিল। এই দুরবস্থা নিবারণ করিবার জন্য ব্যবসায়ের নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইল। এই পন্থার নাম সমবেত-বিক্রয়মণ্ডলী। সমবায়ের ফলে এক রংয়ের, এক আকারের এক স্বাদের জিনিষ প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ডের বড় বড় মহাজনদিগের নিকট পাঠান হইতেছে। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে যথেষ্ট পরাজিতও করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জর্জ্জ রাসেল কর্ত্তৃক সম্পাদিত Irish Homestead নামক পল্লীজীবনবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রে একজন লিখিয়াছেন :—" The introduction of the co-operative creamery system and the centralising of the butter-making of a parish is one building equipped with the latest scientific appliances enabled Ireland to offer butter of improved quality, and in a short time the business was brought to a point which led to a removal of the industry. The change was an inspiring one. From the same land and the same class of cattle we are now producing a butter held in high esteem, competing at the top of the market, selling freely at remunerative

prices. It made all the difference between a bare existence and a fair profit for his work to the Irish dairy farmer."

কৃষি-সমবায়ের ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। পল্লীজীবনের সকল কর্ম্মেই সমবায়পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। সমবেত ঋণদান-সমিতি বা Co-operative Credit Society ভারতবর্ষে আজকাল নানা স্থানে স্থাপিত হইতেছে। আয়র্ল্যাণ্ডের সমবায় আন্দোলনের ভিতর Agricultural Banks বিশেষ রূপেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এগুলি দেখিবার সময় পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাকালে ডাব্লিনে ফিরিয়া আসিলাম।

সমবেত ক্রয়মণ্ডলীর ব্যবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বন্দ্ব থাকে না—যে ক্রেতা সেই বিক্রেতা। সমবেত উৎপাদনমণ্ডলীর ব্যবস্থায় মহাজন ও শ্রমজীবীর দ্বন্দ্ব থাকে না—যে মহাজন সেই শ্রমজীবী। সমবেত বিক্রয়-মণ্ডলীর ব্যবস্থায় দোকানদার ও মহাজনের দ্বন্দ্ব থাকে না—যে উৎপাদন করিয়াছে সেই দোকানদার। সেইরূপ সমবেত ঋণদান-মণ্ডলীর ব্যবস্থায় উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের দ্বন্দ্ব থাকে না—যে ঋণ দিয়াছে সেই ঋণ পায়। অংশীদারেরা টাকা জমা দিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করে—এই যৌথ ব্যাঙ্ক হইতে অংশীদারদিগকে প্রয়োজনানুসারে টাকা ধার দেওয়া হয়। কাজেই ঋণদাতা এবং ঋণ-গ্রহীতা একই ব্যক্তি।

পল্লীর কৃষকেরা পরস্পর পরস্পরের আর্থিক অবস্থা জানে। টাকা ধার লইয়া কোন ব্যক্তি বাজে খরচে উড়াইয়া দিবে কি না ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তারা বেশ বুঝিতে পারে। সকলের ঘরের কথাই সকলের সুবিদিত। কাজেই ঠকাইবার সুযোগ, ঋণ শোধ না করিয়া পলাইবার সুযোগ অথবা ধার করা টাকা বিলাসে ব্যয় করিবার সুযোগ কেহই

পায় না। পল্লীর লোকেরা ঋণ-গৃহীতার অভিভাবক স্বরূপ কার্য্য করে। ইহার ফলে কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, ডিমের কারবার ইত্যাদির জন্য মূলধন সহজেই পাওয়া যায়। এদিকে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ একই ব্যক্তি—কাজেই সুদের হারও কম।

তাহা ছাড়া কারবারের প্রকৃতি বুঝিয়া ঋণ শোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কোন কারবারে সপ্তাহের মধ্যেই হয় ত লাভ পাওয়া যায়। এই কারবারের জন্য টাকা ধার লইলে সপ্তাহের ভিতরই শোধ দিতে হইবে। কোন কারবারে হয় ত ছয় মাস অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তাহার জন্য ছয় মাসের প্রতিজ্ঞায় ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে। অধমর্ণদিগের পক্ষে এত সুবিধা আর কোন ব্যবস্থায় হইতে পারে না। "Irish Homestead" হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইতেছে —"The Societies serve a very useful purpose in country districts, taking from the wealthy their superfluous capital for which they pay a fair interest, and lending it out again to those who require it for reproductive purposes. The money of the district is in this way kept in the district, where it is always producing more money and doing more good. The farmers also are instructed in the true use of credit, which is to borrow money to make more money and not merely to fill up some gap by throwing good money after money that is gone. This system introduced into Ireland by the I. A. O. S. is the system of credit for farmers which is most widely used over Europe."

আয়র্ল্যাণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে সমবেত ঋণদান-মণ্ডলীর টাকা ধনী মহাজনগণের নিকট হইতে আসে। তাঁহারা কিছু অল্প সুদে এই সকল ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। এই জন্য মণ্ডলীর মেম্বর-কৃষকেরা তাহাদের সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া থাকে। এই বন্ধকের মূল্য অনুসারে তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা পায়। এই গচ্ছিত টাকা হইতেই পরে কৃষকগণের অভাবানুসারে ধার দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষকেরা নিজে টাকা জমা না রাখিলে সমবায়ের ব্যবস্থায় ধার পাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে খাঁটি সমবায়ের ব্যবস্থা বলা চলে না।

আয়র্ল্যাণ্ডের নব্য কৃষি ব্যবস্থায় দুই প্রকার বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হইতেছে। প্রথমতঃ, পদার্থবিজ্ঞান। ইহার সাহায্যে ভূমি, পশু, ইত্যাদি হইতে সস্তায় বেশী জিনিষ বাহির করা হইতেছে। যন্ত্রবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সার-বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান ইত্যাদির ব্যবহার করিয়া মাল সরবরাহ সম্বন্ধে আইরিশ কৃষকেরা উন্নতিলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ-বিজ্ঞান। ইহার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পল্লী, ভিন্ন ভিন্ন কৃষক, ভিন্ন ভিন্ন নরনারী এক উদ্দেশ্যে, এক লক্ষ্যে, এক আদর্শে পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ পরিচালনার প্রভাবেই দরিদ্র সমাজে পদার্থবিজ্ঞানের মূল্যবান উপকরণগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র—উদ্যোগপর্ব্ব

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধের আয়োজন

আজ নয় দিন হইল অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী সার্ভিয়ার নিকট Ultimatum-পত্র পাঠাইয়াছেন। যুদ্ধ-ঘোষণায় এবং আল্টিমেটাম-পত্রে প্রকৃত প্রভেদ নাই। শত্রুপক্ষ আল্টিমেটাম-পত্রের জবাব সন্তোষজনক না দিলেই লড়াই আরম্ভ হইয়া থাকে। আজকালকার রাষ্ট্রমণ্ডলে এই নীতি সুপ্রচারিত। আল্টিমেটাম-পত্র পাইয়া শত্রুপক্ষকে "হাঁ" কিম্বা "না" বলিতে হইবে। উত্তরস্বরূপ কোন পত্র-ব্যবহারের সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হয় না। সুতরাং আল্টিমেটাম-পত্রকে আমরা চরম-পত্র বা "পত্র-ব্যবহার-নিষেধ বিজ্ঞাপন" বিবেচনা করিতে পারি। এই সঙ্গেই যুদ্ধ-ঘোষণাও হইল বুঝিতে হইবে।

১৯০৭ সালে হেগের (Hague) আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনে সাব্যস্ত হইয়াছিল যে লড়াই আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শত্রুপক্ষকে এবং সভ্য জগতের রাষ্ট্রসমূহকে পত্র বা তার দ্বারা জানান কর্ত্তব্য। Declaration of War বা 'যুদ্ধঘোষণা' বর্ত্তমান কালের এক নূতন কায়দা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং অষ্ট্রিয়ার আল্টিমেটামকেই সকলে যুদ্ধঘোষণাস্বরূপ বিবেচনা করিতেছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার প্রবল ক্ষমতা—সার্ভিয়া ক্ষুদ্র নগণ্য মূষিক মাত্র। এই মূষিক নাশ করিবার জন্য কি সম্রাট যুদ্ধঘোষণা সত্য সত্যই করিবেন? মশা মারিতে কি কামান দাগিবার আবশ্যক? এই সন্দেহ ইউরোপীয় রাষ্ট্র-মণ্ডলে এখনও রহিয়াছে। অনেকেই ভাবিতেছেন—বোধ হয় সার্ভিয়াকে ভয় দেখাইবার জন্যই অষ্ট্রিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ "ভীতিপ্রদর্শন"কে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় Reprisal বলা হয়। বাস্তবিকপক্ষে রিপ্রাইস্যাল এবং যুদ্ধঘোষণায় কার্য্যতঃ কোন প্রভেদ নাই। দাঙ্গাহাঙ্গাম, মারকাট দুই নীতিরই অন্তর্গত। কাজেই লড়াইয়ের সূত্রপাত দেখিয়াও ইহাকে ভীতিপ্রদর্শন মাত্র বিবেচনা করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রবীরেরা শান্তির আশা ছাড়েন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস অষ্ট্রিয়া চোখ-রাঙ্গান-নীতি বা reprisal-নীতি মাত্র অবলম্বন করিয়াছেন। সার্ভিয়া কাবু হইলেই অষ্ট্রিয়া কোপ সংবরণ করিবেন।

এই বুঝিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিয়া, ইতালী সকলে পরস্পর পত্রব্যবহার করিতেছেন। রাজায় রাজায়, মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে, রাজায় মন্ত্রীতে, দিবারাত্র পরামর্শ, আনাগোনা, কানাকানি চলিতেছে। এই ৮।৯ দিন ধরিয়া কোন রাষ্ট্রে ধুরন্ধরগণের নিদ্রা নাই।

ইতিমধ্যে সুর উঠিয়াছে—অষ্ট্রিয়া এরূপ কঠোর আল্টিমেটাম না পাঠাইলেই ভাল করিতেন। এই পত্র পাইয়া আত্মসম্মানশীল কোন রাষ্ট্রই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ সার্ভিয়া নিজে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মীয় রুশ স্বজাতির অপমান সহ্য করিতে পারেন কি? অষ্ট্রিয়া এই বিবাদ মিটাইবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র-সম্মিলন বা Concert of Europeএর সাহায্য লইলেন না কেন? সামান্য বিষয়ের জন্য এই বিপুল আয়োজন তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই। শান্তির সহিত

সার্ভিয়াকে জব্দ করা যাইতে পারিত। তাহা না করিয়া অষ্ট্রিয়া ইউরোপের সকল রাষ্ট্রকে মজাইতে বসিয়াছেন।

এ কয়দিন—আর একটা কথাও উঠিয়াছে। লড়াই অষ্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার ভিতর চলিতে থাকুক। ইউরোপের সকলকে জড়াইবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ যখন এই সংগ্রামে সিদ্ধ হইবে না তখন ইংরাজ রাষ্ট্রবীরেরা যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলেই ভাল। এই মতকে ইংরাজীতে "Localisation of war" বা "যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বিস্তার-প্রতিরোধ" বলা যাইতে পারে।

লড়াইয়ের ঘোষণা সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে করা হইয়াছে মাত্র। লড়াইয়ের ক্ষেত্র এখনও বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু সকলেই বুঝিতেছেন যুদ্ধ বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ করা অসম্ভব। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রেই যুদ্ধের আয়োজন সুরু হইয়াছে। লাখ কথায় বিবাহ হয়—লাখ কথায় লড়াইও হয়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে Conversations, কথাবার্ত্তা, টেলিগ্রাফের আদান প্রদান, ভাব-বিনিময় চলিতেছে শুনিতে পাই—অথচ "Precautionary measures" "সাবধানের মার নাই"-নীতিও সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হইতেছে। কেহই অন্যের অপেক্ষা যুদ্ধের আয়োজন কম করিতেছেন না। যুদ্ধ বাধুক বা না বাধুক, যুদ্ধের আয়োজন পাকা হইয়া থাকিতেছে। খাঁটিভাবে যুদ্ধ বাধিলে আয়োজন ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি হইত তাহাত বুঝিতে পারিতেছি না। সত্য কথা "যুদ্ধের আয়োজন" এবং "যুদ্ধ-ঘোষণা" প্রায় একই বস্তু।

পূরাদমে সকল দেশেই সৈন্য ও রণতরীর চলাচল হইতেছে। এই চলাচলের নাম mobilisation. সাধারণতঃ যুদ্ধের সময়েই এবং যুদ্ধ-ঘোষণার পর মুহূর্ত্তেই mobilisation হইবার কথা। কিন্তু এ নিয়ম

কেহই এ যাত্রায় মানিতেছেন না—কখনও কেহ মানিয়াছেন কি না ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য নাই। বর্ত্তমানে দেখিতেছি mobilisation-এর চূড়ান্ত হইতেছে তথাপি কথা কাটাকাটি বন্ধ হয় নাই। সত্যই, লাখ কথায় লড়াই!

কোথায় বেল্‌গ্রেড, আর কোথায় ডাব্‌লিন। এই ৮।৯ দিনের ভিতর আয়র্ল্যাণ্ডের সকল স্থানে সৈন্য ও রণতরী সাজান হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ বলিতেছেন—ইঁহারা mobilise করেন নাই—যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধ সজ্জা ইত্যাদি করেন নাই। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় এবং জার্ম্মাণি বা রুশিয়ার mobilisation-এ প্রভেদ কি?

ডাব্‌লিনের রেলপথ, সুড়ঙ্গ, সেতু, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সকল স্থানেই সৈন্য সমাবেশিত হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেসনে সেনাবিভাগের লোকেরা পাহারা দিতেছে। যথাস্থানে রেলপথের কিনারায় তাঁবু পড়িয়াছে। যাতায়াতের সুবিধাগুলি রক্ষা করা লড়াইয়ের প্রধান কথা। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান মিশর-অভিযানের সময়ে তাঁহার জলপথে সংবাদ প্রদান এবং যাতায়াতের সুবিধা তৈয়ারী করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার কুফল ইতিহাসে সুবিদিত। কাজেই লড়াইয়ের ক্ষেত্র হইতে বহুদূরেও এই দ্বীপের সকল পথ সুরক্ষিত করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করা হইল।

আয়র্ল্যাণ্ডের নগরে নগরে যেখানে দুর্গ আছে সে গুলিতেও সৈন্য রক্ষিত হইয়া গেল। মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্ট্রিক কারখানাতেও রক্ষিবর্গ নিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য অতি নীরবে নিশীথ রজনীর অন্ধকারে সম্পন্ন হইয়াছে। নগরের কোন লোক পূর্ব্বে বিন্দুমাত্র জানিতে পায় নাই। এমন কি দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সৈন্যগণকে হঠাৎ জাগিবার হুকুম

দেওয়া হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধবেশে প্রস্তুত। কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে—কোন্ কোন্ দল মিলিত হইয়া যাত্রা করিবে—ইত্যাদি কোন আদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইল না। রাস্তায় কোন কথা কেহ না বলে এইরূপ হুকুম প্রচার করা হইল। অবশেষে যাহারা যেখানে যাইবার কথা তাহা বলা হইল। কিন্তু কোন হুকুমই মুখের কথায় দেওয়া হয় নাই। ইসারায় ইঙ্গিতে, Signal এর সাহায্যে উঠা, চলা, দাঁড়ান ইত্যাদি কার্য্য করান হইয়াছে। দেশের ভিতর কোন Panic বা হুজুগ সৃষ্টি না করিবার জন্য সেনাবিভাগের কর্ত্তারা এত সতর্ক হইয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে জানাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহা সমস্তই Confidential বা গোপনীয়। সেনাবিভাগের হুকুম না পাইলে কোন সম্পাদকই যেন কোন সংবাদ প্রকাশ না করেন। জাহাজ, সৈন্য, আকাশযান, বন্দুক কামান, গোলাগুলি, রসদ, দুর্গ পোতাশ্রয়, ডক, তেল-কারখানা, ইলেক্ট্রিক কারখানা ইত্যাদি সকল বিষয়ের সংবাদই সম্পাদকেরা নানা স্থান হইতে পাইতেছেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের আদেশে তাঁহারা কেহই কোন সংবাদ প্রচার করিতেছেন না! এরূপ সতর্কতার প্রথম উদ্দেশ্য—জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত না করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শত্রু পক্ষকে সংবাদ না দেওয়া।

এদিকে অষ্ট্রিয়া হইতে তার বন্ধ করা হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার ভিতর দিয়া যে সকল রেল চলিতেছে তাহাতে একমাত্র লড়াই সংক্রান্ত লোক জন জিনিষ পত্র চালান হইতেছে। অন্য দেশের সঙ্গে যাতায়াত, খবরাখবর অষ্ট্রিয়া বন্ধ করিয়াছেন। জার্ম্মাণি এবং রুশিয়াতেও ডাকঘর, তারপথ, রেলপথ সবই সেনাবিভাগের অধীন হইয়াছে। সাধারণ

ব্যবসায় বা কাজ কর্ম্ম এই সকলের সাহায্যে এখন আর হয় না। যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বেই এত কাণ্ড—যুদ্ধ বাধিলে কি হইবে!

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে যাইয়া সকল রাষ্ট্রই নিজ নিজ পথ ঘাট তার ডাক ইত্যাদি প্রথম রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য নগদ টাকা মজুত রাখা। তৃতীয় চেষ্টা দেখিতেছি রসদ সংগ্রহ করা। এই দুই লক্ষ্য সাধন করা আজকালকার দিনে বড়ই কঠিন ব্যাপার। রাস্তা ঘাট রেল ডাকঘর ইত্যাদি রক্ষা করা তত কঠিন নয়—এগুলি নিজের হাতে। নিজ দেশের ভূগোল সম্বন্ধে অতটুকু জ্ঞান সকলেরই আছে, বাহিরের শত্রু আসিয়া শীঘ্র এগুলি বন্ধ করিতে পারে না। কিন্তু নগদ টাকা এবং শস্য তৃণ পশু ইত্যাদি জমাইয়া রাখা সহজসাধ্য নয়। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই সব যুদ্ধ সরঞ্জাম মজুত রাখা কঠিন ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশশতাব্দীর শিল্প-নীতি এবং ব্যবসায়-নীতির প্রভাবে কাঁচা টাকা যথাসময়ে ঘরে রাখা এক প্রকার অসম্ভব। তাহা ছাড়া ডাল চাউল ঘোড়া বলদ ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ করাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য।

আজকালকার কারবার সবই "ধারে" হয়—নগদ টাকা ব্যবহার প্রায়ই করিতে হয় না। কাগজের রসিদ পাইলেই মহাজনেরা টাকা পাইলেন এইরূপ রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে, কিম্বা জার্ম্মাণিতে রুশিয়াতে যে ব্যবসায় চলে তাহার জন্য এইরূপ "রসিদ" ব্যবহৃত হয় মাত্র। একদেশ হইতে অন্য দেশে টাকা চালান অতি অল্পমাত্র হইয়া থাকে। রসিদে রসিদে কাটাকাটি হয়—শেষ পর্য্যন্ত যে পক্ষের পাওনা তাহার নিকট টাকা পাঠান হইয়া থাকে। এই রসিদ-গুলির নাম Bill of Exchange.

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একটা করিয়া বড় বাজার আছে। তাহার নাম Exchange, এই এক্সচেঞ্জ-বাজারের সাহায্যে সেই দেশের সকল

প্রকার বিদেশীয় বাণিজ্য চলিয়া থাকে। বিল বা রসিদগুলি এই বাজারেই কেনাবেচা হয়। যতদিন দেশে দেশে শান্তি বা বন্ধুত্ব থাকে ততদিন বিলগুলির কেনাবেচায় কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। কিন্তু লড়াই বাধিলে কেনাবেচায় আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি জার্ম্মাণির মহাজনের নিকট মাল বেচিয়া রসিদ পাইয়াছি। কিন্তু এই রসিদ যদি না বেচিতে পারি তাহা হইলে আমি নূতন কারবারের জন্য টাকা পাইব কোথায়? কাজেই আমি এক্সচেঞ্জ বাজারে যাইয়া সর্ব্বদা এই রসিদের খরিদদার খুঁজিতেছি। কিন্তু এদিকে জার্ম্মাণির সঙ্গে লড়াই সুরু হইয়াছে—তাহার সঙ্গে এক্ষণে ব্যবসায় বাণিজ্য চালান অসম্ভব। কাজেই আমার রসিদ আর বিক্রীত হইল না। আমার টাকা হাতে পাইলাম না—আমি ফেল মারিলাম।

লড়াই বাধিলে এইরূপে প্রত্যেক দেশেই শত শত মহাজন ফেল মারিতে পারেন। এই অবস্থায় কি করা যুক্তিসঙ্গত? এক্সচেঞ্জ বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল। কারণ তাহা হইলে বিলগুলি কেনাবেচার হুজুগ কমিয়া যাইবে—তাহাতে মহাজনগণ শীঘ্র ফেল মারিতে পারিবেন না। বড় বড় মহাজনগণকে ফেল না মারিলেই দেশে আর্থিক অবস্থার শান্তি থাকিবে। এইরূপ বুঝিয়া ইউরোপের সকল দেশের বিনিময়-বাজার বন্ধ করা হইয়াছে। এমন কি লণ্ডনের Stock Exchangeএ কয়দিনে কেনাবেচা হইতেছে না। লণ্ডনের এ অবস্থা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। আশ্চর্য্যের কথা আমেরিকার নিউইয়র্ক একস্‌চেঞ্জও এক্ষণে দুয়ার বন্ধ করিয়াছেন। আমেরিকার লড়াই বাধিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু টাকার বাজার দুনিয়ায় এক। ইহাই ঊনবিংশশতাব্দীর বিশেষত্ব। বর্ত্তমানকালে ইহাই লড়াইয়ের প্রধান অসুবিধা।

যাহাহউক, লড়াই সুরু হইবার পূর্ব্বেই দুনিয়ার বিনিময়-বাজারগুলি

বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং আমদানী রপ্তানী ব্যবসায় বাণিজ্যও স্থগিত থাকিল। এইখানেই আসল বিপদ উপস্থিত। বর্ত্তমানকালে বাণিজ্য বন্ধ হইলেই লক্ষ লক্ষ নরনারীর খাদ্যাভাব ঘটিতে বাধ্য। কারণ উনবিংশ-শতাব্দীর কার্য্যফলে কোন দেশের লোকই একমাত্র স্বদেশীয় দ্রব্যে তাঁহাদের অভাব মোচন করিতে পারেন না। চাল ডাউল শস্য তেল নুন ডিম মাখন হইতে আরম্ভ করিয়া মদ তামাক মোটরকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র শিল্পযন্ত্র ইত্যাদি সকল বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আসিযা থাকে। কোন এক বিষয়ের অভাব হইলে শীঘ্র শীঘ্র সেগুলি নিজদেশে উৎপন্ন করা অসম্ভব। আমদানী রপ্তানীর সম্বন্ধ না থাকিলে এক মুহূর্ত্তে রাষ্ট্র রসাতলে যাইতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে ইংলণ্ডেরই বিশেষ ভয়ের কথা। কারণ ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিয়া ইত্যাদি দেশে পরের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন বেশী নাই। তাঁহারা খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণেই স্বদেশে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড তাঁহার জগদ্ব্যাপী সাম্রা-জ্যের উপর অন্নের জন্য নির্ভর করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হইলে ইংলণ্ডেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি। ইংলণ্ডকে আত্মরক্ষার জন্য প্রধানতঃ সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্য রক্ষা করিতে হইবে। ইংরাজেরা বাণিজ্য রক্ষার পর অবশিষ্ট শক্তি যাটি লড়াইয়ের কাযে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

তথাপি ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিযা ইত্যাদি কোন রাষ্ট্রই রসদ সম্বন্ধ নিতান্ত নিশ্চিন্ত নন। ইঁহারা জানেন যে, বিদেশ হইতে মাল আমদানী আর হইতে পারিবে না। ব্যাপার বুঝিয়া ইঁহারা নিজ নিজ জাহাজের কাপ্তেনদিগকে তার করিয়াছেন, "তোমরা যে যেখানে আছ সেখানকার নিকটবর্ত্তী কোন উদাসীন বা neutral রাষ্ট্রের বন্দরে প্রবেশ কর। স্বদেশে ফিরিতে যত সময় লাগিবে তাহার পূর্ব্বেই ইউরোপে মহা সমর

আরব্ধ হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে তোমরা রক্ষা পাইবে না।" তাহা ছাড়া রপ্তানীও বন্ধ করা হইয়াছে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, রুশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রের উৎপন্ন কোন দ্রব্যই বিদেশে চালান করা যাইতে পারিবে না—এই কঠোর আইন জারি করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং যুদ্ধসরঞ্জাম ও পশুরসদ আমদানী করিতে পারিবে তাহাদের Import duty বা আমদানী শুল্ক লওয়া হইবে না। ৭।৮ দিন পূর্ব্বে জগতে শান্তি ছিল। আমদানী-রপ্তানী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি সরল নিয়মে চলিতেছিল। আজ লড়াই বাধিবার পূর্ব্বক্ষণেই নূতন নিয়ম দেখিতেছি। লড়াইয়ের ধন-বিজ্ঞান এবং শান্তির ধন-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক সপ্তাহের ভিতর টাকার বাজার ওলট পালট হইয়া গেল। আজ খাদ্যাভাবের চিন্তায় সকল রাষ্ট্রবীর বিষণ্ণ—ক্রোরপতিরা ক্ষতির আশঙ্কায় উন্মত্ত প্রায়। ঊনবিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানবলে এতদিন মানবের ক্ষমতা, গৌরব ও প্রভুত্ব দেখিয়াছি। আজ সেই বিজ্ঞান বলেই তাহার প্রায়শ্চিত্তও দেখিতেছি। তাহারই অপর ফল মানবের অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, ও সর্ব্বনাশ। বিংশ-শতাব্দীর মানবের ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে ?

এক্স্‌চেঞ্জবাজার বন্ধ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য স্থগিত রাখিয়া রাষ্ট্রবীরেরা এক্ষণে রসদ সংগ্রহের চিন্তা করিতেছেন। অপরদিকে তাঁহারা নগদ টাকা হাতে রাখিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও মুস্কিল কম নয়। ঊনবিংশশতাব্দীর সভ্য মানব আজকাল ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন। ব্যাঙ্কগুলি ঋণ-গ্রহীতা—তাঁহারা টাকা ধার লইয়া কারবার রাখেন না। সমস্ত টাকার কোন না কোন ব্যবসাতে খাটিতেছে। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে মহাজন বা ব্যবসাদারেরা টাকা ধার লইয়া কারবার করেন। এদিকে যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়াছেন তাঁহারা ব্যাঙ্কের

নিকট কাগজের রসিদ বা চেক্-বহি মাত্র পান। এক দেশের মহাজনেরা অন্য দেশের মহাজনের সঙ্গে কারবার করিবার সময়ে Bills of Exchange ব্যবহার করেন। সেইরূপ দেশের ভিতর লোকেরা খাওয়া-পরার খরচ অথবা লেন দেন, বেতন দান, বেতন গ্রহণ, ব্যবসায় ইত্যাদি চালাইবার জন্য Bank Cheques ব্যবহার করেন। মোটের উপর সোনারূপার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রায় লোকেরই হয় না।

ইহাত গেল শান্তির সময়কার ধন-বিজ্ঞান। কিন্তু লড়াইয়ের ধন-বিজ্ঞান দেখিতেছি অন্যরূপ। এখন সকলেই নগদ টাকা ট্যাকে রাখিতে যত্নবান্। প্রত্যেকেই ব্যাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত—"চেক্‌বহির পরিবর্ত্তে আমার টাকা ফিরাইয়া দিন মহাশয়"—এই কথা আজ লক্ষ লক্ষ লোক ইউরোপের সকল দেশেই বলিতেছে। ব্যাঙ্কের ঘরে কি এত টাকা আছে? সব টাকা ত দেশ বিদেশের ব্যবসায়ে আবদ্ধ। কাজেই ব্যাঙ্ক-ফেল মারা লড়াইয়ের এক আনুষঙ্গিক ফল। লড়াই এখনও বাধে নাই। বাধিবার উপক্রম মাত্র হইয়াছে—তাহাতেই ব্যাঙ্কপাড়ায় যেরূপ "Panic" বা হুজুগ যে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা হইয়া-পড়িতেছে।

জনসাধারণের এই অবস্থা। কিন্তু রাষ্ট্র স্বয়ং কি করিবেন? রাষ্ট্রের হাতে টাকা না থাকিলে ত এক মূহূর্ত্তও চলিবে না। কাজেই ব্যাঙ্কের সুদ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারেরা লোকজনকে বলিতেছেন, "কোন ভাবনা নাই। আমাদের টাকা মারা যাইবে না। আগে শতকরা ৪৲ সুদ পাইতেন, এক্ষণে ৮৲ দিতে প্রস্তুত আছি। প্রয়োজন হইলে তাহাও বাড়াইয়া দিব।" ইংলণ্ডের লণ্ডন-ব্যাঙ্ক এই সুদ-বর্দ্ধন-রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে দেশের টাকা নিজ ব্যাঙ্কে রাখিবার চেষ্টা সকল রাষ্ট্রেই চলিতেছে। ব্যাঙ্কের সুদ-বৃদ্ধি করিলে

লোকেরা টাকা তুলিয়া লইতে চাহিবে না। বরং নূতন নূতন লোক এবং বিদেশের লোকও আরও টাকা জমা রাখিবে। ফলতঃ ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুকে বেশী টাকা মজুদ থাকিবে। শান্তির সময়ে এট টাকা ব্যবসায়ে খাটান হইত—এক্ষণে ইহা লড়াইয়ের জন্য পুঁজি রাখা হইবে। সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়াই রাষ্ট্র-তহবিল বাড়াইবার একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়। ইউরোপের সকল রাষ্ট্র এই উপায়ে জনগণের নিকট হইতে প্রচুর ঋণগ্রহণ করিতেছেন। লণ্ডনব্যাঙ্ক পূর্ব্বে কখনও এত উচ্চহারে সুদ দিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, ইংরাজ সরকারের টাকার অভাব এত বেশী পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী যুদ্ধের জন্য যেরূপ উদ্বেগ ও আয়োজন হইতেছে এরূপ উদ্বেগ ও আয়োজন পূর্ব্বে কখনও করিতে হয় নাই।

থার্ম্মমেটার-যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের তাপ পরিমাণ করা যায়। ব্যারোমেটার-যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাণ করা যায়। সেইরূপ এক্সচেঞ্জবাজারের দর দেখিয়া দুনিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতিবিধি বুঝিতে পারি। সেইরূপ ব্যাঙ্কের সুদ-হার দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের টাকার খাঁকতি বা প্রয়োজন বুঝিতে পারি। ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান এবং এক্স-চেঞ্জ-বিজ্ঞান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মাপকাঠি স্বরূপ। আবার ধন-বিজ্ঞান ও লড়াই-বিজ্ঞান পরস্পরসম্বদ্ধ। কোন দেশের আর্থিক অবস্থা দেখিলে লড়াইয়ের অবস্থা বুঝিতে পারি—আবার লড়াইয়ের অবস্থা জানিলে আর্থিক অবস্থা বুঝিতে পারি। এজন্য ইউরোপীয়েরা কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আর্থিক ও বৈষয়িক ব্যবস্থাগুলি সুচারুরূপে সাজাইয়া লইতেছেন। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া একবার দাঁড়াইলে স্থিরভাবে এসব গুছাইবার সহিষ্ণুতা ও সুযোগ থাকিবে কি না সন্দেহ। এজন্য পাঁয়তারা করিবার অবসরে ব্যবসায়, বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী, টাকার বাজার,

ব্যাঙ্ক পরিচালনা ইত্যাদি গুছাইয়া লইতেছেন। পরিষ্কাররূপে কথাবার্ত্তায় যুদ্ধঘোষণা করা হয় নাই বটে। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন দস্তুরমতই হইয়া থাকিতেছে। এখন কেবল হুঙ্কারসহ "যুদ্ধং দেহি" বলিতে বাকী আছে। যে কোন মুহূর্ত্তেই হুঙ্কার উত্থিত হইতে পারে।

যুদ্ধ সজ্জায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

আয়র্লণ্ডের "হোম-রুল" ধামাচাপা রহিল বোধ হইতেছে। ইউরোপের সমরপ্রান্তরে ঢাক বাজিয়াছে। জার্ম্মাণি রুশিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের সৈন্য চলাচলের অর্থ কি? ইহার নাকি সন্তোষজনক উত্তর রুশিয়া দেন নাই। জার্ম্মাণেরা ফরাসীকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "রুশিয়ার সঙ্গে আপনাদের মিত্রতা আছে, জানি। রুশিয়া ইতিমধ্যে Mobilise করিয়াছেন। সম্ভবতঃ জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্যসজ্জা হইতেছে। আমরা আত্মরক্ষার জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারি না। আমরা যুদ্ধের আহ্বান স্বীকার করিয়া লইয়াছি। আমাদের দেশ এখন হইতে যুদ্ধ-নীতির নিয়মে শাসিত হইবে। আপনারা রুশিয়াকে সাহায্য করিবেন, না উদাসীন থাকিবেন, স্থির করিয়াছেন—এই প্রশ্নের উত্তর ১২ ঘণ্টার ভিতর চাই। না পাইলে আপনাদিগকে রুশিয়ার মিত্রজ্ঞানে আমাদের শত্রুপক্ষ বিবেচনা করিব।"

ইউরোপের এই ঢক্কানিনাদে আয়র্লণ্ডের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল। সম্প্রতি কিছুকালের জন্য Unionist, Nationalist, Labour Party, Conservative, Radical সকল দলই এক দলভুক্ত হইলেন। সেই দলের নাম "সাম্রাজ্য-নীতি"র দল। এদিকে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ক্যানাডা এবং অন্যান্য উপনিবেশ হইতেও ইংরাজকে সাহায্য করিবার আয়োজন হইতেছে শুনিতেছি। পঞ্চপাণ্ডব ঘরে ঘরে যে কলহই করুন না কেন, শত্রুর বিরুদ্ধে ইঁহারা এক। ইংরাজসাম্রাজ্য এই ঐক্যশক্তিতে বলীয়ান হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ব্রিটিশ রাজ্যের সর্ব্বত্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ডাব্‌লিনেও বাজার দর চড়িতেছে। বিদেশ হইতে আমদানী আর নাই। বেলজিয়াম্ হইতে রসদ আসা বন্ধ হইয়াছে।

তবে ইংরাজের বিশ্বাস—

Moreover, the people of these countries—so far as we may dare to predict anything when all is oppressively uncertain—will be in a far better position as regards food than the nations with which we may be in conflict. We are an island Power, we have a vast mercantile marine: our great Colonies furnish rich sources of supply; and we have the British Navy. The last is, of course, the vital factor in the situation. So long as our Navy controls the seas the food supplies of Great Britain and Ireland, though they may be stinted, will be continuous. Not until our sea power suffers a crushing blow—which may God forbid!—will these islands be face to face with national starvation. For the present, while there is every necessity for prudence and economy, there is no occasion for panic. In this crisis, indeed, panic would be a crime against the State.

অর্থাৎ যতদিন ইংরাজের নৌবল রহিয়াছে ততদিন ইহাদের অন্নের অভাব হইবে না। তবে এখন হইতে মিতব্যয়ী হইবার জন্য সম্পাদকগণ গৃহস্থদিগকে উপদেশ দিতেছেন। যুদ্ধ বাধিলে খাওয়া পরার কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইবে—তাহা ইঁহারা বেশ বুঝিতেছেন। কিন্তু তাহা

বলিয়া এখন হইতেই ভয়ে জড়সড় হইলে দেশের ক্ষতি করা হইবে—এই উপদেশ আজকাল প্রত্যেক কাগজেই প্রচারিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে টাইম্‌স্ পত্রেও নরনারীগণকে জানান হইয়াছে যে, "লড়াই বাধিলে নানাপ্রকার কষ্ট ঘটিয়াই থাকে। লোকক্ষয়, জাহাজ নাশ, দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি, নগর ধ্বংস ইত্যাদি ঘটিতে বাধ্য। এই দুঃসময়ে হতাশ না হওয়াই কর্ত্তব্য। কত লোক মরিবে তাহার স্থিরতা নাই, কত যুদ্ধে পরাজয় হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কত টাকা নষ্ট হইবে, তাহার হিসাব করা অসাধ্য। সুতরাং কেহ বিচলিত হইও না। হুজুগে পড়িয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিও না। দেশের কর্ত্তারা দেশ রক্ষা করিবার জন্য, সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য, লোকরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন ও করিবেন। জন সাধারণ যদি দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অধীর হইয়া পড়ে তাহা হইলে নেতারা স্থির ও সহিষ্ণুভাবে কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিবেন না। কাজেই সকলের নিশ্চিন্তভাবে ধীরতার সহিত যুদ্ধের সময়ে জীবন যাপন করা উচিত। তাহা না হইলে স্বদেশদ্রোহিতা আচরণ করা হইবে—নিজেরাই নিজেদের শত্রু হইয়া পড়িবে। যুদ্ধকালে নরনারীগণের অতি সংযমী ও স্থিরচিত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দু একটা পরাজয়ে হতাশ হইবার কারণ নাই।"

এক পত্রের সম্পাদক ব্যাঙ্কের সুদ বৃদ্ধির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

"To-day the Bank of England raised the Bank rate to 10 per cent., having yesterday raised it by doubling it from 4 per cent. to 8 per cent. A 10 per cent. rate is, of course, a war figure ; and there is some reason to believe that the Bank of England by this manœuvre

has struck a shrewd blow at those who are calculating the chances of waging a successful war. By offering a high rate for money, Great Britain, whose security is possibly the best in the world, will attract gold to London, and so prevent the Continental nations, who must have gold to wage war, from being able to import bullion from America, Africa, Australia, and other places, as well as from such Continental nations as are not likely themselves to be involved in the impending struggle. Finance plays a tremendous part in modern warfare, and the action of the Bank of England will produce a sharp effect. It may not, perhaps, be able now to avert the outbreak of hostilities, but it will be a strong hint to the Continental Powers of the serious fina-ncial difficulties which may arise if anything like a con-tinuous attempt is made to draw a new map of Europe. In the meantime, the world is waiting with nervous and excited apprehension, for the formal declaration of war. In the existing state of tension and apprehension, they cannot long be delayed. Nor shall we have long to wait before we know what is to be out own position in this matter. But we believe that we are ready for whatever emergency may arise, and are rightly confident that if trial is before us, we shall emerge triumphant from it."

মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে এক পত্র বলিতেছেন :—

"Another and very natural feature of the situation is that a general rise in prices has begun. The price of sugar has gone up rapidly during the last few days. Yesterday on the Baltic Exchange the price of oats went up a quarter, and English wheat advanced by four shillings a sack. We are probably on the eve of a rise in the price of bread. The prices of ham, beef, and bacon are rising. Prussia and Belgium have prohibited the export of provisions. These countries, in fact, are probably in for a period of great hardship, from which, of course, the poor and the workers will be the greatest sufferers. War may be glorious but it brings indescribable tragedies in its train. Everyone hops that this threatened Armageddon may be avoided—except, perhaps, some of those people whose business is war."

উদাসীনীকৃত রাষ্ট্র

ইউরোপের গণ্ডগোলে ইংলণ্ড বিশেষ বিব্রত। এই সুযোগে আইরিশ স্বরাজের পাণ্ডারা বন্দুক কামান গোলাগুলি সংগ্রহ করিতেছেন। আয়র্ল্যাণ্ডে অস্ত্র সংগ্রহের বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু লুকাইয়া সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

কয়েকদিন হইল ন্যাশন্যালিষ্টদলের লোকেরা নৌকা হইতে অস্ত্র নামাইতেছিল। তাহা লইয়া সরকারী পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে ন্যাশন্যালিষ্ট ভলাণ্টিয়ারদের একটা ছোট খাট দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কয়েকজন নিরপরাধ দর্শকের মৃত্যু হয়। স্বরাজ আন্দোলনে যে হুজুগ তাহা অপেক্ষা এই মৃত্যু ঘটনায় শতগুণ হুজুগ দেখিতে পাইলাম। সরকারী শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে আয়র্ল্যাণ্ডের সকল স্থান হইতে তিরস্কার করা হইতে লাগিল। নিরপরাধ প্রজার মৃত্যুতে সমস্ত জাতি মিলিত হইয়া শোক প্রকাশ করিল। প্রায় একলক্ষ লোক রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া ইহাদের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এখনও চলিতেছে।

তাহার পর ৩।৪ দিন চলিয়া গিয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের জনসাধারণ এক্ষণে এই নূতন হুজুগেই মত্ত। ইতিমধ্যে ইউরোপের আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। পার্লামেণ্টে বসিয়া ন্যাশন্যালিষ্ট, ইউনিয়নিষ্ট ও শ্রমজীবীদল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পার্ল্যামেণ্টের আইরিশ ধুরন্ধরেরাই কি আইরিশ জাতির বাণীমূর্ত্তি? তাহা নহে। ইহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন যে, ইংরাজের দুর্দ্দৈবে

আয়র্ল্যাণ্ডের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ফলতঃ ভলাণ্টিয়ারেরা অস্ত্র সংগ্রহ স্থগিত রাখে নাই। বরং যে উপলক্ষ্যে ডাব্লিনে রক্তারক্তি এবং লোকমৃত্যু ঘটিয়া গেল তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত সমারোহের সহিত বন্দুক কামান ইত্যাদি ডাব্লিনের গৃহে গৃহে লুকাইয়া রাখা হইতেছে। নিরস্ত্র লোকজনকে সশস্ত্র করা তুমুল বেগেই চলিতেছে।

এদিকে ডাব্লিন-নগর ইউরোপীয় সমরাশঙ্কায় যথারীতি সুরক্ষিত হইয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায়, ষ্টেসনে ষ্টেসনে সৈন্য দেখিতে পাইতেছি। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। নগর যেন শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়।

কাল জার্ম্মাণি লাক্সেম্বার্গ দখল করিয়াছেন। ইহার দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইয়াছে। প্রথমতঃ ফ্রান্স আক্রমণের সোজাপথ হস্তগত হইল। দ্বিতীয়তঃ লাক্সেম্বার্গ ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলকর্ত্তৃক রক্ষিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণি Concert of Europe এবং আন্তর্জ্জাতিক শক্তিসমূহকে তৃণবৎ জ্ঞান করিলেন। এইক্ষেত্রে ইংলণ্ড স্বয়ং লাক্সেম্বার্গের অন্যতম অভিভাবক। প্রকারান্তরে জার্ম্মাণি ইংলণ্ডকেই "যুদ্ধং দেহি" রবে আহ্বান করিলেন।

অভিভাবকগণের রক্ষণাবেক্ষণস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের পরিভাষায় Neutralised বা উদাসীনীকৃত State বলে। ইউরোপের ভিতর এইরূপ রক্ষিত স্বাধীন রাষ্ট্র বর্ত্তমানে তিনটি—সুইজর্ল্যাণ্ড, লাক্সেম্বার্গ এবং বেলজিয়াম। তিনটিই জার্ম্মাণির সংলগ্ন—এবং তিনটিই প্রধানতঃ ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত হইতে রক্ষিত। এই রক্ষার জন্য ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্র মিলিয়া কতকগুলি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাহার সর্ত্তে এই সমুদয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সকলকেই বজায় রাখিতে হয়। ইহারাও কোন সময়ে কাহারও বিরুদ্ধে

যুদ্ধ সজ্জা করিবার অধিকারী নয়। আত্মরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহারা সৈন্য সাজাইতে অধিকারী।

অষ্ট্রিয়া-সার্ভিয়ার লড়াই আরব্ধ হইবার পর রুশ ও জার্ম্মাণি এবং ফরাসী পরস্পর সম্বন্ধ ভাতিজনক হইয়া পড়ে। এই ভয়ে লাক্সেম্বার্গ, বেলজিয়াম এবং সুইজর্ল্যণ্ড আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়। ইউরোপের সকলেই জানেন যে, কোন প্রবল রাষ্ট্র এইগুলির অস্তিত্ব নাশ করিতে চাহিলে ইহাদিগকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন। এমন কি এরূপ বিশ্বাসও ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলে বিরাজ করিয়া আসিতেছে যে, জার্ম্মাণি স্বয়ংই এগুলি গ্রাস করিয়া ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টিত হইবেন। কাজেই যুদ্ধারম্ভের কাল হইতেই Neutralised Stateগুলি mobilise করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাদের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা একেবারেই নাই। ফ্রান্স কিম্বা ইংলণ্ড অথবা উভয়েই ইহাদের মারাপ স্বরূপ, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে ইহারা বাঁচিবে না। জার্ম্মাণি এই সকল ক্ষুদ্র উদাসীনীকৃত রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াই ইংলণ্ডকে যুদ্ধক্ষেত্রে নাবাইতে প্রয়াসী। এই নীতি ইংরাজরাষ্ট্রবীরেরা বেশ জানেন।

লাক্সেম্বার্গ-আক্রমণের পর ইংরাজেরা নিজ রণতরী যুদ্ধের জন্য সাজাইতে আদেশ দিলেন। আজ ডাব্‌লিন হইতে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছি। আইরিশ সমুদ্র পার হইয়া ওয়েল্‌সের পারে আসিলাম। আসিয়াই দেখি গণ্ডায় গণ্ডায় নাবিকেরা আমাদের রেলে উঠিল। তাহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ষ্টেসনে আসিয়াছে। বিদায়-দৃশ্য অতিশয় হৃদয়বিদারক। দর্শকমাত্রের অশ্রুসংবরণ করা অসম্ভব।

আমাদের গাড়ীতে কয়েক ষ্টেসন পর্য্যন্ত দুইটি বালিকা আসিল। তাহারা লড়াইয়ের কথা বলাবলি করিতেছে। বেচারারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। একজন বলিল, আজ সকালে আমার পিতার নিকট

জরুরি তার আসিয়াছিল। এক ঘণ্টার ভিতর তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। কোথায় লড়াই হইবে জান কি? শুনিলাম জার্ম্মাণেরা নাকি লণ্ডন আক্রমণ করিয়াছে। তাহা হইলে আমাদের কি হইবে?" অপর বালিকা বলিল, "কি জানি ভাই কি ঘটনা! আমার দাদাকেও চলিয়া যাইতে হইয়াছে। এই গাড়ীতে আরও কত লোক হোলিহেড হইতে রওনা হইল। আমাদের খাওয়া পরার অবস্থা কি হইবে কে জানে? কতদিন পরে লড়াই শেষ হইবে বলিতে পার কি?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা গাড়ীর ভিতরে। গাড়ী ছাড়িয়া দিল—জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিতেছি, রেলপথের দুইধারে নগর পল্লীর লোকেরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা বিষণ্ণবদনে গাড়ীর ভিতরকার নাবিকগণকে লক্ষ্য করিয়া রুমাল উড়াইতেছে।

কয়েক ষ্টেসন পরে বালিকারা নামিয়া গেল। যেখানে গাড়ী দাঁড়াইল সেখানে হাজার হাজার লোক জমা হইয়াছে। এই স্থান হইতে বহু নাবিক গাড়ীতে উঠিল। আমাদের গাড়ীর ভিতরেই ১৪।১৫ জন প্রবেশ করিল। আমাদের কামারাতে ৭।৮ জন বসিয়া গেল। তার পর লড়াইয়ের কথা, মদ্য পান এবং উল্লাস ও স্বদেশী সঙ্গীত। ইহারা উন্মত্ত-প্রায় লড়াইয়ের সময়ে মানুষের চরিত্র স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। পশুভাবাপন্ন এবং উন্মাদগ্রস্ত হইয়া না উঠিলে রক্তারক্তি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যোগদান করা অসম্ভব। যাহারা সমরক্ষেত্রের বাহিরে শান্ত সংযত ও স্থিরচিত্ত তাহারাই জয়ঢাকের শব্দে লাফাইয়া উঠে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের চরিত্র দেখিয়াই কোন লোকের স্বভাব বিচার করা উচিত নয়। অথবা যদি বিচার করাই প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সামরিক জীবনের এবং রণ-নীতির মাপকাঠিতে বিচার করা কর্ত্তব্য। সাধারণ সাংসারিক নীতি এবং সমর-নীতির মাপকাঠি একরূপ হইতে পারে না।

নাবিকেরা বলাবলি করিতেছে। কেহ বলিল, "আরে ভাই, আমি রাত্রি ৪॥ টার সময়ে তার পাইয়াছি।" আর একজন বলিল, "দেখি দেখি, তোমার আদেশ পত্র দেখি।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"বুঝিয়াছি, তোমার নিকট urgent আদেশ আসিয়াছে।" অপর একজন বলিল, "আঃ, এতদিন লড়াই ছিল না—ছিলাম ভালই। বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন সব ছাড়িয়া এখন যাওয়া কি কম কষ্টকর!" অমনি উৎসাহভরে একজন বলিল—"কুচ্‌পরোয়ানাই। জার্ম্মাণিকে ২৪ ঘণ্টার ভিতর রসাতলে পাঠাইব।" আর একজন গম্ভীরস্বরে সাবধান করিয়া দিল, "আরে বাপু, ফিরিয়া আসিতে পারিলে হয়!" অমনি একজন সাহস দিয়া বলিল, "ব্রিটিশ নেভির পরাজয়! ইহাও কি কখন সম্ভব? আমাদের টাকা কি কম? আমাদের শস্য কি কম? আমাদের লোকবলই কি কম? এই দেখ আমার বাহুর মাংসপেশী। এই শক্তি যতক্ষণ আছে, ইংরাজকে হঠাইতে জার্ম্মাণির সাধ্য নাই।" একজন বলিল "জার্ম্মাণি তাহার জাহাজের বড়াই করে। কিন্তু আমাদের মত নির্ভীক স্বদেশসেবক রাজভক্ত লোক জার্ম্মাণি কোথায় পাইবে? We shall blow Germany to hell within 24 hours."

কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। মদের বোতল দুইটা ফুরাইয়া গেল। একজন বলিল, "কিহে ভায়া, তোমরা ত হিন্দুস্থানী—আমাদের বন্ধু। জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়াই করিবে ত? রাজার নামে এক গ্লাস মদ খাওনা? নেশা হইবে না।" বলিলাম "মদ খাই না।" সাধাসাধি চলিতে লাগিল,—"কোন দোষ নাই—যুদ্ধের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কোন দোষ হইবে না।" মদ খাইতে নিতান্ত নারাজ দেখিয়া বোতল হইতে মদ ঢালিয়া ওভারকোটের কোণে মাখাইয়া দিল। আর সকলে মিলিয়া গাহিতে লাগিল—"Britons

never shall be slave". আমায় মদ মাখান হইয়া গেলে একজন বলিল—"ভায়া রাগ করিলে না ত? তোমরা আমাদের নিজের লোক না হইলে এরূপ করিতাম না। ইহা আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন স্বরূপ।"

আমরা এতক্ষণে ওয়েল্‌স প্রদেশের চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের ডাহিনে অনুচ্চ তরঙ্গায়িত সবুজ পাহাড় এবং বামে নীল সমুদ্র। সমুদ্রের বালুকায় বালক বালিকারা খেলা করিতেছে এবং জলের ভিতর অসংখ্য নরনারী সাঁতার কাটিতেছে। এই দৃশ্য দেখাইয়া একজন নাবিক বলিল,—"এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছ? এই সমুদ্র, এই পাহাড়, এই সমতল ক্ষেত্র, এই নরনারী—ইহাদিগকে বর্ব্বর জার্ম্মাণেরা দখল করিবে? এই সোণার ব্রিটিশ দ্বীপে ভূতের নৃত্য চলিতে থাকিবে? না কখনই না। Briton never shall be slave." এই বলিতে বলিতে সকলে মিলিয়া গাহিতে লাগিল

"Rule Britannia, Rule the Waves,
Britons never shall be slaves."

গাড়ী হইতে দেখিলাম রেলপথের নিকট সুবিস্তৃত প্রান্তরে সৈন্য-সমাবেশ হইয়াছে। সৈন্যেরা তাঁবু খাটাইয়া বসবাস করিতেছে। কোথাও ঘোড়ার পাল, কোথাও ঘাশের স্তূপ, কোথাও খোলা আকাশের নীচে চা-পানের জন্য জল গরম করিবার আয়োজন। ওয়েল্‌সের সমুদ্রকূল রক্ষা করিবার জন্য ইহারা নিযুক্ত।

ওয়েল্‌স ছাড়াইয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলাম। গাড়ী ৮'৫ ঘণ্টা পরে লণ্ডনে উপস্থিত হইল। ট্যাক্সিতে ট্রাফাল্গারস্কোয়ারের সম্মুখীন হইতে না হইতে লোকের ভিড় দেখা গেল। এখান হইতে পার্ল্যামেণ্ট স্কোয়ার পর্য্যন্ত বিরাট জনতা প্রবাহ—ক্যাবিনেট-গৃহ, হোয়াইটহল-গৃহ এবং পার্ল্যামেণ্ট-গৃহ ইত্যাদির সম্মুখে সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবণিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম

আজ সন্ধ্যাকালে ইংরাজরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবে। পার্ল্যামেণ্টে মহাসভার আয়োজন হইয়াছে—স্বয়ং রাজা আজ সভায় উপস্থিত।

হোটেল পার্ল্যামেণ্ট-পাড়াতেই অবস্থিত। তাড়াতাড়ি জিনিষ পত্র ঘরে রাখিয়া সন্ধ্যা ৮ টার সময়ে লোকের ভিড়ে যোগদান করিলাম। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রত্যেক লোকের হাতে দুই তিনখানা করিয়া সংবাদ-পত্র। শুনিলাম লণ্ডনে একয়দিন প্রত্যেক সংবাদ পত্রের ৬।৭ টা করিয়া সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কোন কোন কাগজওয়ালারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন সংবাদ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাত্রি ১০॥ টার সময়ে শেষ সংস্করণ বাহির হয়। আজ রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত জনতা দেখা গেল। এত লোকের ভিড় এবং শোভাযাত্রা একসঙ্গে কখনও আর দেখিব কি না সন্দেহ।

তথাপি আশ্চর্য্যের কথা—বেশী হুজুগ হৈ চৈ বা উন্মাদনা নাই। মোটের উপর একটা গম্ভীরতা, সহিষ্ণুতা এবং স্থিরচিত্ততাই যেন সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। একে লণ্ডন সহর—তাহার উপর সাম্রাজ্যরক্ষা ও স্বদেশ-রক্ষার জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের কাল। ইতিমধ্যে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে বেল্‌জিয়ামকে জার্ম্মাণি প্রাণের ভয় দেখাইয়াছেন, এবং বেল্‌জিয়াম-রাজ ইংরাজরাজের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এতগুলি কথা মনে রাখিয়া এই লক্ষ লক্ষ নরনারীর গতিবিধি দেখিতে লাগিলাম। আর রোমাঞ্চিত হইলাম,—ইহাদের স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা,সংযমশীলতা ও আদেশপালন-ক্ষমতা কি অসীম। ফরাসীরা এরূপ ধীরতা অবলম্বন করিতে পারে কি? বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ্যে বার্লিন, ভিয়েনা এবং সেণ্টপিটার্সবার্গের জনসাধারণ এরূপ সংযম দেখাইতে পারিয়াছে কি? অবশ্য শত্রুপক্ষীয়েরা ইংরাজের এই চরিত্রকে হয়ত কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বিবেচনা করিবেন।

কেবল তাহাই নহে—ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নীতিও কি ধীর স্থির ও সংযত। ফরাসীরা প্রাণপণে ইংরাজকে দলে লইতে চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মাণেরা ছলে বলে কৌশলে ইহাঁদিগকে আসরে নামাইতে চাহেন। বিগত ৭।৮ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণি এজন্য নানা ফন্দী অবলম্বন করিয়াছেন। জার্ম্মাণির বিশ্বাস, এ যাত্রায় ইংরাজ সাম্‌নাসাম্‌নি না লড়িয়া পারিবেন না। ইংরাজ এতদিন কথাবার্ত্তা, Conversations, Conference, সম্মিলন, আনাগোনা, ডিপ্লমেসী ইত্যাদির সাহায্যে ইউরোপের শান্তি রক্ষা করিয়াছেন—তাহার দ্বারা নিজ সাম্রাজ্য, বাণিজ্য এবং স্বদেশেরও গৌরব অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। "বার বার এইবার"—এইরূপ ভাবিয়া জার্ম্মাণি সম্প্রতি কাজে নামিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—১২ দিন হইল যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়াছে—তথাপি ইংরাজের সাড়া নাই। ইংরাজ এখনও বিচলিত হইলেন না—জার্ম্মাণ রাষ্ট্র-নীতি ব্রিটিশ রাষ্ট্র-নীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে চলিল। ইংরাজজাতির মাথা এতই ঠাণ্ডা যে ইহাদের নেতারা শত্রুপক্ষের নিন্দা অপমান সহ্য করিয়াও জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখিতে জানেন। সাম্রাজ্য-নীতির জন্য ইহাঁরা "লাজ-মান-ভয়" সবই জলাঞ্জলি দিতে পারেন। ইহাঁদিগকে হুজুগে মাতান অসম্ভব। স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ নিশ্চিতরূপে উপস্থিত না হইলে ইহাঁরা কখনও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না।

আজ পার্ল্যামেণ্টে ইংরাজের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করা হইল। তাহাতে জার্ম্মাণি নিশ্চয়ই হতাশ হইবেন। মোটের উপর বুঝা যাইতেছে, যে ইংরাজেরা এখনও লড়িতে রাজী নন। ইহাঁদের রণতরী কল্য হইতে যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। আজ সন্ধ্যাকাল হইতে স্থল-সেনাও প্রস্তুত হইতেছে। প্রয়োজন হইলে ইহাঁরা লড়িবেন। কিন্তু রণ-সচিব প্রচার করিলেন, "এখনও আমাদের পালা আসে নাই। দেখা যাউক কত

দূর গড়ায়। সময় উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা ফরাসীকে সাহায্য করিবেন এবং বেলজিয়ামের স্বাধীনতাও নিরাপদ করিবেন। সম্প্রতি আমরা যুদ্ধব্যাপারে neutral বা উদাসীন।”

এই সংবাদ কাগজে কাগজে ছাপা হইয়া গেল। যুদ্ধের জন্য সৈন্যের চলাচল (mobilisation) আরব্ধ হইয়াছে শুনিয়া নরনারীরা মহা খুসী। নানা দলে বিভক্ত হইয়া যুবকেরা স্বদেশী গীত গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেক দলের হাতেই ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ। কাগজ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা আজ রাস্তায় অসংখ্য বিক্রী হইয়াছে। রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত এই সমারোহ দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি ১ টা ১॥ টা পর্য্যন্ত রাস্তায় হৈ চৈ শুনা গেল।

ইংরাজ সম্প্রতি দূর হইতে আল্‌গাভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রতিযোগিতা এবং পরস্পর বিনাশ-সাধন দেখিবেন। এই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাষ্ট্র-নীতির গহনকাননে প্রবেশ করা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য। একরাত্রির ভিতর বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে কতই না কি ঘটিবে!

ইংরাজের যুদ্ধ-ঘোষণ

[৪ আগষ্ট. ১৯১৪]

জার্ম্মাণি বেলজিয়াম আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের পক্ষে আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব। আজ রাত্রি ১২টার সময়ে জার্ম্মাণির সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধঘোষণা করা হইল।

যুদ্ধঘোষণার দৃশ্য দেখিতে রাত্রিকালে "বাকিংহাম প্যালাসের" সম্মুখস্থ চৌরাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। লক্ষাধিক লোক জমা হইয়াছিল। রাজার আদেশে যুদ্ধঘোষণা পঠিত হইল। লক্ষকণ্ঠে জয়-ধ্বনি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল মুখরিত করিল।

আজ যুবকগণের অদম্য উৎসাহ এবং উচ্ছৃঙ্খল গতিবিধি বেশ লক্ষ্য করিতে পারিলাম। জার্ম্মাণদিগকে নানারূপ বিদ্রূপ করিয়া মিছিল বাহির হইয়াছিল। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতের ভবনের জানালাগুলি কোন কোন যুবকদল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মিছিলের পতাকায় Down with the Germans লেখা ছিল।

লণ্ডনের কোন কোন ধনী পরিবার যুদ্ধের সময়ে অন্নাভাব আশঙ্কা করিয়া ২।৩ মাসের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। দোকানদারেরা খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। একয়দিনকার কাগজে ইঁহাদিগকে যারপর নাই নিন্দা করা হইতেছে। টাইম্‌স্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পত্রের সম্পাদকই বলিতেছেন, "ধনী মহাশয়েরা, আপনারা দুর্ভিক্ষের ভয়ে যে পথ অবলম্বন করিতেছেন তাহাতেই দুর্ভিক্ষ দেশে আসিয়া পড়িবে। দরিদ্র শ্রমজীবীরা একে কর্ম্মহীন, তাহার উপর মহার্ঘ দ্রব্য ক্রয় করিতে অসমর্থ। আপনারা এত স্বার্থপর হইলে অর্থহীন জনগণের কি অবস্থা হইবে? জাতীয় বিপদের সময়ে আপনারা স্বদেশ-দ্রোহী হইয়া উঠিলেন কেন?"